A

DISCOURSE ON THE BENGALI LANGUAGE AND LITERATURE.

(WITH A BRIEF ACCOUNT OF THE LIVES OF THE FAMOUS BENGALI AUTHORS TOGETHER WITH SHORT CRITICISMS ON THEIR WORKS.)

BY

RAMGATI NYAYARATNA.

EDITED BY

GIRINDRA NATH BANERJEA, B. L.

THIRD EDITION.

Confirmed to Library.

বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব।

(বিখ্যাত বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকলের কিঞ্চিৎ সমালোচনাসমেত)

৺রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

চুঁচুড়া।

সন ১৩১৭ সাল।

Price Three Rupees 8 Annas.] [মূল্য ৩॥০ টাকা।

কলিকাতা
৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি হইতে
প্রকাশিত।
৪৭নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট বাণী প্রেসে,
শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গপত্র।

পরমার্চ্চনীয়

৺ হলধর চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য

পিতৃঠাকুরমহাশয়চরণেষু—

পিতঃ!

পূজ্য, শ্রদ্ধাস্পদ হিতৈষী ও আত্মীয়জনকে লোকে প্রিয়বস্তু দান করিয়া থাকে। তোমার ন্যায় পরমপূজ্য, পরমশ্রদ্ধাস্পদ, পরমহিতৈষী ও পরম-আত্মীয় ব্যক্তি জগতে আমার কেহই ছিল না। অতএব আমার অনেক পরিশ্রমের বস্তু এই 'বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' খানি তোমার স্বর্গীয় চরণোপান্তে সমর্পণ করিলাম ইতি। তাং ১২ই আষাঢ় শকাব্দাঃ ১৭৯৫।

ত্বদীয় বৎসলপুত্র

শ্রীরামগতি দেবশর্ম্মা।

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

Printed by K. V. Seyne & Bros.

সূচনা।

পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় এই গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ বঙ্গসাহিত্যসেবী অনেকেরই সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে উদ্দেশ্যে ঐ সকল জীবনী গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য তাঁহারও জীবনী এই গ্রন্থমধ্যে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় সংক্ষেপে উহা বিবৃত করা গেল।

আমাদের বাসভূমি হুগলী জেলার অন্তর্গত ইলছোবা গ্রাম। আমার পিতামহ ঠাকুর ৺হলধর চূড়ামণি মহাশয় শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। অর্থসঙ্গতি তেমন বেশী না থাকিলেও তিনি বাড়ীতে দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকাণ্ড বাদ দিতেন না। ঐ সকল উপলক্ষে ইতর ভদ্র বিস্তর লোককে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। পূজনীয় পিতৃদেব ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় আমার পিতামহ ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পিতৃদেবের জন্ম হয়।

পিতামহ ঠাকুরের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তাঁহার নাম ৺দিগম্বর ন্যায়বাগীশ। উভয় ভ্রাতায় বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। তাঁহার অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল। পিতামহ ঠাকুর উহাদিকে বড়ই স্নেহ করিতেন, তাহারাও তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত ছিল। পিতামহ ঠাকুর প্রত্যহ নিজের পুত্র এবং কনিষ্ঠের পুত্রকন্যাগুলিকে লইয়া একত্রে ভোজন করিতে তৃপ্তি বোধ করিতেন। ফলে, কনিষ্ঠ অকৃতী না হইলেও তাঁহার পুত্রকন্যাগুলিকে পিতামহ ঠাকুর নিজের পোষ্য মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছিলেন। ছেলেমেয়েগুলি জেঠামহাশয়ের নিকট অতিশয় যত্নে থাকায় উক্তরূপ ব্যবহারে উহাদের পিতামাতার কোন আপত্তির কারণ ছিল না এবং ইহাতে সাংসারিক ব্যয়ের বাহুল্য হইতে থাকিলেও পিতামহ ঠাকুর তাহাতে বিচলিত হইতেন না, বরং আনন্দানুভবই করিতেন।

খুল্লপিতামহ পিতৃদেবকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থায় খুল্লপিতামহী কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আমার উপায় কি করিয়া যাইতেছেন।" তাহাতে খুল্লপিতামহ পিতৃদেবকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই গতি রহিল। গতি তোমাকে দেখিবে। তুমি কষ্ট পাইবে না।" খুল্ল-পিতামহ আমার পিতাকে রামগতি না বলিয়া "গতি" বলিয়া ডাকিতেন।

দশবৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পিতৃদেব গ্রামের পাঠশালায় পড়িয়া উপনয়নের পর গ্রামস্থ অধ্যাপক কালিদাস ঘটকের নিকট প্রায় দুই বৎসর কাল ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৪ অব্দের জানুয়ারী মাসে তের বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শ্রেণীতে তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। কলেজে ভর্ত্তি হইয়া তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করিতে থাকেন এবং প্রতি পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল দেখাইয়া প্রশংসা ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। ধাতুপাঠ তাঁহার আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ ছিল এবং যাহাতে উহা ভুলিয়া না যান তজ্জন্য পঠদ্দশায় প্রত্যহ বাসা হইতে গঙ্গাস্নানে যাওয়া ও তথা হইতে বাসায় ফিরিয়া আসার সময়ে স্তবাদির আবৃত্তির ন্যায় পথে সমগ্র ধাতু পাঠের আবৃত্তি করিয়া শেষ করিতেন। সংস্কৃত কলেজে পিতৃদেব ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, সাংখ্য, ন্যায় প্রভৃতি সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন পাঠ্য সমুদয় এবং কিছু ইংরেজীও অধ্যয়ন করেন।

১৮৫০—৫১ অব্দে পিতৃদেব সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে সংস্কৃত কলেজে আটটি পনর টাকার এবং চারিটি কুড়ি টাকার সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি ছিল। যে সকল ছাত্র সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া ১৫ টাকা বৃত্তি পাইত, তাহাদের মধ্যে কেহ বিশেষ যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে ২। ৩ বৎসর পরে কুড়ি টাকায় ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইত। কিন্তু পিতৃদেবকে একেবারেই ঐ কুড়ি টাকার বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল। কাপ্তেন জি, টি, মার্শেল সাহেব ঐ বৎসরে পরীক্ষক ছিলেন, তিনি পিতৃদেবের যোগ্যতা দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্বীয় রিপোর্টে তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কেবল মার্শেল সাহেব বলিয়া নয়, প্রতি পরীক্ষাতেই পরীক্ষকেরা নিজেদের লিখিত মন্তব্যে বিশেষভাবে

পিতৃদেবের প্রশংসা করিতেন। কলেজের যে যে অধ্যাপকের নিকট তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, সকলেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাবচরিত্রের জন্য তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীত ছিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। এই সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃদেব "ন্যায়রত্ন" উপাধির সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন।

সংস্কৃত কলেজের সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি পাইতে হইলে ছাত্রকে ৬ বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইত। ঐ ছয় বৎসর অতীত হইয়া গেলেও কলেজের অধ্যক্ষ ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল যে গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া পিতৃদেবের জন্য আর দুই বৎসর সময় বাড়াইয়া দিবেন এবং সেই কালমধ্যে ইঁহাকে ইংরাজী বিদ্যায় অধিকতর শিক্ষিত করিবেন। কিন্তু নানা কারণে পিতৃদেবের আর কলেজে থাকিয়া অধ্যয়নের সুবিধা না হওয়ায় তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই হিতকর প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না।

১৮৫৬ সালে হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ২য় শিক্ষকের পদ শূন্য হয়। ঐ পদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ উপাধিধারীও কেহ কেহ আবেদন করিয়াছিলেন, পিতৃদেবও আবেদন করেন; মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে উঁহাকেই ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। এই উপলক্ষে উক্ত বৎসর ২৫ শে আগষ্ট ইনি হুগলীতে আসেন। এই খানেই পিতৃদেবের জীবনের দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বে পঞ্চদশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সময়ে হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। পিতৃদেবের বিদ্যা ও গুণ তাঁহার নিকট অপ্রকাশ রহিল না। উভয়ের মধ্যে অচিরেই বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিল। কি সরকারী, কি সাংসারিক অধিকাংশ বিষয়েই পরস্পরে পরামর্শ না করিয়া কার্য্য করিতেন না। মণিকাঞ্চন সংযোগের ন্যায় উভয়ের সম্মিলনে হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয় ঐ সময়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

পিতৃদেব ও পূজ্যপাদ ভূদেব বাবুর মধ্যে প্রথম হইতেই যে সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল আজীবন তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল। শেষাবস্থায় উভয়েই অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী

হইলে, একদিন ভূদেব বাবুকে তাঁহার ইচ্ছামত একখানি চৌকিতে বসাইয়া আমাদের বাড়ীর ফটকের নিকট আনা হইলে আমরাও পিতৃদেবকে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া আনিলাম। ভূদেব বাবু কয়েকটি যুঁই ফুল লইয়া অসিয়াছিলেন। সেগুলি পিতৃদেবের হাতে দিলেন। উভয়ের পরস্পর সন্দর্শনে কাহারও মুখ দিয়া একটিও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; কেবল পরস্পরে পরস্পরের মুখ চাহিয়া অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিলেন। কথা কওয়া অপেক্ষাও যেন গভীর একটা ভাব ইহাতে প্রকাশিত হইল। অতঃপর ভূদেব বাবু চৌকি উঠাইতে আদেশ দিলেন। পিতৃদেবকেও আমরা গৃহমধ্যে লইয়া গেলাম। উভয়ের মধ্যে এই শেষ দেখা।

১৮৫৮ অব্দে পিতৃদেব কাপ্তেন রিচার্ডসন প্রণীত "হিষ্টরী অফ্ দি ব্ল্যাক হোল" নামক ক্ষুদ্র ইংরাজী পুস্তকের বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া 'অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮৫৮ অব্দের শেষে ইনি 'বস্তুবিচার' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বস্তুবিদ্যা বিষয়ক কোন পুস্তক ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আর কেহ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। বিষয়গুলি এমন হৃদয়গ্রাহিভাবে এবং প্রাঞ্জল ভাষায় নিবদ্ধ হইয়াছে যে, শৈশবাবস্থায় এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিণত বয়সেও ইহার সকল কথাই স্মরণ রাখিতে পারিয়াছেন এমন লোক এখনও অনেকেই আছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধক্রমে ১-৫৯ অব্দে ইনি বাঙ্গালা ইতিহাসের প্রথম ভাগ ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন; এই ইতিহাস পুস্তকখানি বালক পাঠার্থীদিগের পক্ষে এত উপযোগী হয় যে, পূজ্যপাদ বিদ্যা-সাগর মহাশয় এই খানিকেই বাঙ্গালা ইতিহাসের প্রথম ভাগ স্বীকার করিয়া পরবর্ত্তী ঘটনা অবলম্বনে বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন এবং তৎপরবর্ত্তী ঘটনা সমূহ অবলম্বনে পূজ্যপাদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত ইতিহাসের তৃতীয় ভাগ রচনা করিয়াছেন। এই তিনখানি পুস্তক একত্রে একখানি সম্পূর্ণ এবং অতি সুন্দর বাঙ্গালার ইতিহাস পুস্তক হইয়াছে।

১৮৬২ অব্দের প্রথমে ইহার 'রোমাবতী' প্রকাশিত হয়। ঐ সালেই তিনি

একশত টাকা বেতনে বর্দ্ধমান (লাকুড্ডি) গুরু ট্রেণিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৫ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে বহরমপুর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে উন্নীত হন।

বহরমপুরে যাইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নী মহামায়া দেবীর মৃত্যু হয়। তাঁহার নামানুসারে তিনি "মায়া ভাণ্ডার" নাম দিয়া এক ক্ষুদ্র পেটকে অর্থ সঞ্চয় করিতেন এবং ঐ সঞ্চিত অর্থ অতি সঙ্গোপনে বিতরণ করিতেন। পিতামহের মৃত্যুও পিতৃদেবের বহরমপুরে যাইবার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

বহরমপুরে অবস্থানকালেই ইনি ১৮৬৬ অব্দে ঋজুব্যাখ্যা, ১৮৬৯ অব্দে দময়ন্তী, এবং ১৮৭২ অব্দে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ এবং ১৮৭৩ অব্দে 'শিশুপাঠ' ও 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' প্রকাশ করেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থখানি ইঁহার প্রধানতম কীর্ত্তি। বঙ্গভাষায় এই ধরণের এই প্রথম পুস্তক। এরূপ পুস্তক প্রণয়নের চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই, এবং পরবর্ত্তী গ্রন্থকার-দিগের বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক পুস্তক ও প্রবন্ধাদি রচনাস্থলে পিতৃদেবের এই পুস্তকখানি বিশেষ অবলম্বন স্বরূপই হইয়া আছে। এই পুস্তকখানির প্রণয়ন সময়ে পিতৃদেবকে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ অর্থব্যয় ও যেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করা অন্যের পক্ষে সহজ নহে। এই উপলক্ষে তিনি ছোট বড় অনেক গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করিয়াছেন। কত পাণ্ডুলিপি, কত গ্রাম ও প্রদেশের কতস্থান যে সন্ধান করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পঠদ্দশাতেই ইনি কয়েকজন বন্ধুর সহিত সমবেত হইয়া নিজ বাসগ্রামে একটি বাঙ্গালা ও ইংরাজী বিদ্যালয়, একটি ডাক্তারখানা ও একটি পোষ্টাফিস সংস্থাপন করিয়াছিলেন; ঐ বাঙ্গালা স্কুলের ছাত্রবৃত্তি দানার্থী ছাত্রদিগের নানা কারণে ভারতবর্ষীয় ইতিহাস পাঠের অসুবিধা হয় দেখিয়া ১৮৭৪ অব্দে ইনি ভারতবর্ষের একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন ও তৎপরে 'গোষ্ঠী কথা' প্রকাশ করেন।

১৮৭৯ খৃঃঅব্দের ২৯শে জানুয়ারী পিতৃদেব হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের (প্রিন্সিপ্যালের) কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৮১ খৃঃঅব্দে

ভবভূতি প্রণীত সংস্কৃত মহাবীর চরিতের অনুবাদ 'রামচরিত' প্রকাশিত হয়। পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'মহাবীর চরিত' পাঠে বড়ই আনন্দানুভব করিতেন। তিনি একসময়ে পিতৃদেবকে বলিয়াছিলেন যে, ঐ নাটকের উচ্চ, উদার, বিশুদ্ধ এবং মানব চরিত্রের পরমোৎকর্ষ প্রদর্শক সুশৃঙ্খলা-বদ্ধ ভাবপরম্পরা বাঙ্গালা ভাষায় অবতারিত হইলে, এই নীতি বিপ্লবের সময়ে উপকারের সম্ভাবনা আছে। এই কথায় প্রোৎসাহিত হইয়াই পিতৃদেব এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পুস্তকখানি ভূদেববাবুর নামেই উৎসর্গ করা হইয়াছে। উৎসর্গপত্রে পিতৃদেব এই সকল কথা বিবৃত করিয়াছেন।

১৮৮২ খৃঃঅব্দে "নীতিপথ" নামক পুস্তক রচনা করেন। অতি সুললিত ভাষায় কেবল শিশুর বলিয়া নয়, সকলেরই শিক্ষণীয় এবং সদালাপের বিষয়ীভূত প্রকৃত আখ্যান লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে।

১৮৮৮ সালে পিতৃদেব "ইলছোবা" নামক একখানি উপন্যাস রচনা করেন। পুস্তকখানির নাম ইলছোবা বা স্বপ্নলব্ধ উপাখ্যান"। কোন প্রকৃত নায়ক নায়িকা বা ঘটনা লইয়া পুস্তকখানি রচিত না হইলেও ইহাতে পিতৃদেবের স্বগ্রাম ইলছোবার (ইলাসভার) ইতিবৃত্তের ছায়া পাওয়া যায়। এই পুস্তক খানির সমালোচনা উপলক্ষে পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়-পরিচালিত এডুকেশন গেজেট পত্রিকায় লেখা হইয়াছে "যিনি বস্তুতত্ত্ববিৎ, ইতিবৃত্ত লেখক, বৈয়াকরণ, নাটককার, কাদম্বরীর ধরণের উপন্যাস রচয়িতা, তিনি একখানা ইংরাজী ধরণের নভেল লিখিবেন বিচিত্র নহে। পুস্তকখানির ভাষা প্রাঞ্জল ও বিশদ।"

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই পিতৃদেব সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিন বৎসর তিন মাস মাত্র পেন্সন ভোগ করিয়াছিলেন। ১৩০১ সালের ২৪শে আশ্বিন ১৮৯৪ সালের ৯ই অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন চুঁচুড়ার বাটীতে প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে তাঁহার জীবাত্মা অনন্ত কালসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছে।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" নামক পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের উপসংহারে লিখিয়াছিলেন—"যদি আমাদিগের জীবদ্দশায় এ পুস্তকের ভাগ্যে পুনঃসংস্করণ সঙ্ঘটিত হয়, তাহা হইলে তৎকালে আবার বাঞ্ছানুরূপ কার্য্যের কিছু না কিছু সংশোধন করিবার চেষ্টা করিব। এবার এই পর্য্যন্ত।" ইহাতে আমাদের আশা হইয়াছিল যে পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থখানিকে আমরা বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের পঞ্জীরূপে দেখিতে পাইব। সে আশা ফলবতী হইতে না হইতেই তিনি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন; কিন্তু সুখের বিষয় আজ আমাদের সে আশা ফলবতী হইয়াছে। তাঁহার সুযোগ্য ও কৃতী পুত্র শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, মহাশয় পিতৃপ্রতিশ্রুতি স্বয়ং পালনপূর্ব্বক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি অত্যুৎকৃষ্ট ইতিহাস দিতেছেন। তিনি তাঁহার পিতৃকৃত গ্রন্থের নূতন সংস্করণে কোন বিশেষ পরি-বর্ত্তন করেন নাই। তবে যে সময়ে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ হয়, তখন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-লিখনোপযোগী সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করিবার বড় সুবিধা ছিল না। এক্ষণে ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের ইতিহাসের অনেক তথ্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থের বর্ত্তমান সম্পাদক মূল গ্রন্থের অঙ্গহানি না করিয়া পুস্তকখানিকে বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিবার জন্য বহু পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া পাদটীকায় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থখানির যে যে বিষয়ে অভাব ও অসম্পূর্ণতা ছিল, নিপুণ সম্পাদকের সুলিখিত পাদটীকায় সে গুলি যথাসম্ভব পূর্ণতালাভ করিয়াছে। এ ছাড়া, গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় যে সমস্ত সাহিত্যিক জীবিত ছিলেন অথবা যাঁহারা তাদৃশ প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই কিংবা অনবধানতাবশতঃ যাঁহাদের নাম গ্রন্থে স্থান পায় নাই,

বর্ত্তমান সম্পাদক তাঁহাদের বিবরণগুলিও মূল গ্রন্থের অঙ্গীভূত করিয়া দিয়াছেন। কাজেই কবি বিহারিলাল ও সুরেন্দ্রনাথ, কবি নবীনচন্দ্র, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবান্ রমেশচন্দ্রের বিবরণ পুরাতন পুস্তকে না থাকিলেও নূতন সংস্করণে বাদ পড়ে নাই। যে সমস্ত গ্রন্থকারদিগের বিবরণ পুস্তকের বিষয়ীভূত হয় নাই, সম্পাদক মহাশয় পরিশিষ্টে সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ তাঁহাদের একটী সুন্দর বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়া পুস্তকখানির অঙ্গসৌষ্ঠব করিয়াছেন। সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে কোন্‌খানি কখন্ কাহাদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা জানিতে হইলে কতদূর শ্রম স্বীকার করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থের শেষভাগে এতাবৎকালপ্রচলিত সাময়িক পত্রের একটি সুদীর্ঘ তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিয়া সাহিত্যসেবী মাত্রের বহু ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সম্পাদককে বাধ্য হইয়া দুই এক স্থলে পরিচ্ছেদের ক্রম পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। এখন বাঙ্গালীর কবিগুরু কৃত্তিবাসের আত্মজীবনবৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে; তৎসাহায্যে ও নানাবিধ অনুসন্ধানের ফলে এই অমর কবির সময় স্থির হইয়াছে; সুতরাং কৃত্তিবাসও নূতন সংস্করণে একটু নড়িয়া বসিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় বঙ্গলিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট না হইলেও হইতে পারে, এবং পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইদানীং যে সকল মতের আবিষ্কার করিতেছেন, সেগুলির মধ্য হইতেও বাঙ্গালার বর্ণমালার উৎপত্তি বিষয়ক কিছু কিছু উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে এই মনে করিয়া সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থের এই নূতন সংস্করণে "বঙ্গলিপির উৎপত্তি" শীর্ষক অধ্যায়টী নূতন করিয়া সংযোজিত করিয়াছেন। এ বিষয়ে চুঁচুড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে এম্, এ, বি, এল, এম, এ, এস, বি, মহাশয় তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার সাহায্য না পাইলে তিনি কোন ক্রমেই ইহাতে সফলকাম হইতেন না।

ন্যায়রত্ন মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার কুলজি প্রস্তুত করিয়া তাহার অজ্ঞাত কুলশীলত্বের নিন্দা ঘুচাইয়া, অনাদৃত ভাষার আদর বর্দ্ধন ও সাহিত্য-সমাজে

তাহার উচ্চাসন-প্রাপ্তির ব্যবস্থা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীরও একটা কলঙ্ক মোচন করিয়াছেন।

জন্মের তারিখ ও লগ্ন লইয়া জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করাই চিরন্তন প্রচলিত প্রথা। লগ্ন তারিখের অভাবে জন্মপত্র প্রস্তুত হয় না; কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার অভাব সত্ত্বেও করকোষ্ঠী দেখিয়া জন্ম পত্রিকা প্রস্তুত করিয়াছেন এইটুকুই তাঁহার অভিনবত্ব।

সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতেই বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির একটা সুন্দর চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে এরূপ ভাবের আলোচনা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পূর্ব্বে কেহই করেন নাই। তাঁহার পরে গঙ্গাচরণ সরকার, পদ্মনাভ ঘোষাল, মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি অনেক মহাশয়ই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু সকলকেই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে হইয়াছে। নিবিড় নির্জন অরণ্য-মধ্য দিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় যে পথ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, সাহিত্য-পথের পরবর্ত্তী পথিকেরা সকলেই সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া বন অতিক্রম করিয়াছেন; কেহই কোন নূতন মার্গে বিচরণ করিতে পারেন নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয় যে চিত্রের অঙ্কপাত করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী চিত্রকরেরা সেই অঙ্কিত চিত্রের উপর তাঁহাদের ঈষিকা ঘর্ষণ করিয়াছেন মাত্র, অন্য কোন নূতন চিত্র আঁকিতে পারেন নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয় যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী স্থপতিরা সেই অট্টালিকায় চুণ-বালি ধরাইয়া রঙ্‌ ফলাইয়া শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন মাত্র, নক্সা বদ্‌লাইতে পারেন নাই।

ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যে" বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার অবস্থা-পরিবর্ত্তনের চিত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আদ্যকাল, মধ্যকাল ও ইদানীন্তনকালের ভাষাকে তিনি পর্য্যায়ক্রমে বাঙ্গালা ভাষার বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় চিত্রিত করিয়াছেন। অনির্দ্দিষ্ট উৎপত্তিকাল হইতে চৈতন্যদেবের

প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (১৪৮৫ খৃঃ) আদ্যকাল এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসকে আদ্যকালের লেখক বা বাঙ্গালা ভাষার সেবকরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আদ্যকালের শিশু বাঙ্গালাভাষা ঐ সকল সেবকের পরিচর্য্যাধীনে থাকিয়া কিরূপে সাধারণের দুর্ব্বোধ্য অথচ শ্রবণ-মধুর অস্পষ্টজড়িত ভাষায় কথা কহিয়া বাল্য-ক্রীড়ায় দিনপাত করিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। পরে চৈতন্যদেবের সময় হইতে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়কে বাঙ্গালা ভাষার মধ্য বা যৌবনকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং যৌবন-কালে বাঙ্গালা ভাষা মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ, কাশীরাম, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিদের সহিত কিরূপ কেলিতে দিনযাপন করিয়াছে এবং ইদানীন্তন বাঙ্গালা ভাষা প্রৌঢ়াবস্থার সীমায় পদার্পণ করিয়া যৌবন-সুলভ আড়ম্বর-প্রিয়তা পরিত্যাগ করিয়া মাধুর্য্য-মিশ্রিত গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়াছে এবং কিরূপে তাহার ক্রম বিকাশ হইয়াছে, স্তরে স্তরে একটীর পর একটী আবরণ উঠাইয়া তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে অতি বিচিত্রভাবে সাহিত্যের সকল বিভাগের সকল রসের একত্র সমাবেশ করিয়াছেন। কাব্য, ইতিহাস, জীবনী, পুরাবৃত্ত, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি যাবতীয় বিভাগের তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া, বিবিধ ভাব ও রসের বৈচিত্র্যময় পুষ্পহার রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। সাহিত্য সেবার জন্য সাহিত্য-সেবী মাত্রের এই পুষ্পহার একান্ত উপযোগী। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়, প্রতি পত্র যেন পাঠককে বলিতেছে,

মাল্যাদীনি সুগন্ধীনি মালত্যাদীনি বৈ প্রভো
ময়াহৃতানি পূজার্থং পুষ্পাণি প্রতিগৃহ্যতাম্॥

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য লিখিত ভাষায় যে সকল পুস্তকের সৃষ্টি হয় তাহাই সাহিত্য, সুতরাং দেশের ও জাতির উন্নতি-বিধানকল্পে সাহিত্য একটী প্রকৃষ্ট পন্থা এবং সেই সাহিত্য যাঁহারা প্রচার করেন সমগ্র দেশ ও সমষ্টিভাবে সমগ্র জাতি তাঁহাদের নিকট চির কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। ভবিষ্যৎ সাহিত্য-সেবিগণ যদি সেই আদি সাহিত্যপ্রচারকদের স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা

না করেন সেটা সাহিত্যিকদিগের কর্ত্তব্যের ত্রুটি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

বৌদ্ধযুগে পালবংশীয় রাজাদিগের সময় হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম প্রচার আরম্ভ হয়। ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-প্রচারই সেই সকল সাহিত্যের লক্ষ্যস্থল। গানের পালা সাজাইয়া সেই গান গাহিয়া সাধারণের মধ্যে সেই ধর্ম্ম-ঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করা হইত। যোগীপাল, মহীপাল, গোপীপাল, মাণিকচাঁদ, রমাই পণ্ডিত, ঘনরাম, ময়ূরভট্ট, রূপরাম, খেলারাম, মাণিকরাম, প্রভুরাম, সীতারাম, রামনারায়ণ, রামচন্দ্র, শ্যামপণ্ডিত, রামদাস আদক প্রভৃতি অনেকেই ধর্ম্মের গানের পালাকর্ত্তা ছিলেন। তদ্ব্যতীত ডাকপুরুষের কথা, খনার বচন, সাহিত্য-আকারে লোক-শিক্ষার বেশ দুইটী বিস্তৃত সোপান ছিল। ডাক পুরুষের কথা ও খনার বচন ধর্ম্ম ঠাকুরের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক গানের পালা নহে। উহা প্রচলিত ও সাধারণের সহজ বোধগম্য ভাষায় পদ্যে রচিত ছোট ছোট ছড়া। তাহাতে রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, ধর্ম্মনীতি, কৃষিনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞাতব্য ও শিক্ষিতব্য বিষয় ছোট ছোট কথায় শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু ইঁহাদের বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার উপযুক্ত উপকরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সময়ে ছিল না। তবে তিনি যতটুকু করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

অনেক সময় অমঙ্গল-নিদান হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ধর্ম্ম বিশ্বাসের মতভেদ হইতে ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতাজনক সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি এবং সেই সাম্প্রদায়িক মত প্রচার করণোদ্দেশে সাহিত্যের আদিভূত পদাবলী, পৌরাণিক উপাখ্যান, পাঁচালী ও কথকতা ইত্যাদির উদ্ভব হইয়া থাকে। প্রবল বৌদ্ধ মতের খরস্রোতকে মন্দীভূত করিবার নিমিত্ত সেন-বংশীয় রাজাদের শাসনকালে প্রচারিত ধর্ম্ম-ঠাকুরের আবরণে আবৃত করিয়া নূতন শৈবমত প্রচারের চেষ্টা হইল এবং সেই উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ দাস কবিচন্দ্র শিবায়ন রচনা করিলেন। পরে তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রাম রায় ও

শ্যাম রায় 'মৃগব্যাধসংবাদ,' রতিদেব 'মৃগলুব্ধক,' রঘুরাম রায় 'শিব-চতুর্দ্দশী' ভগীরথ 'শিবগুণ-মাহাত্ম্য,' হরিহর সুত 'বৈদ্যনাথ-মঙ্গল' রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থও ক্রমশঃ ধর্ম্মের গানের মত গীত ও শ্রুত হইয়া শৈব মতটা এক প্রকার বেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

ধর্ম্ম-বিবাদ সকল দেশে সকল সময়েই আছে। ইউরোপে এই ধর্ম্ম-বিবাদ উপলক্ষে কত রক্তপাত হইয়াছে। সুখের বিষয় ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতে যুদ্ধ-বিগ্রহে শোণিত-প্রবাহ না বহিয়া সাহিত্যের প্রবাহ ছুটিয়াছে।

শৈবমত প্রচারিত ও বেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শাক্ত সম্প্রদায় মাথা নাড়া দিয়া এক নূতন স্রোত প্রবাহিত করিলেন। বসন্ত রোগ ও তাহার চিকিৎসা উপলক্ষ করিয়া শীতলা-দেবীকে বসন্তের অধিষ্ঠাত্রীরূপে খাড়া করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য-বর্ণনা ও পূজা-অর্চ্চনার জন্য শীতলা-মঙ্গল বা শীতলা-গানের সৃষ্টি হইল। ক্রমে শাক্ত সম্প্রদায় বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার পালার আকারে ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আবিষ্কার ও প্রচার করিতে লাগিলেন। কবিবল্লভ দৈবকী নন্দন, নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণরাম, রাম প্রসাদ, শঙ্করাচার্য্য—ইঁহারা 'শীতলা-মঙ্গল' বা শীতলা-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। কিছু দিন পরেই হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, অনুপচন্দ্র, আদিত্যদাস, কমললোচন, ক্ষেমানন্দ, শ্রীরামজীবন ইত্যাদি প্রায় ৬০ জন পালাকর্ত্তা মনসা দেবীকে সর্প-ভয়-নিবারিণীরূপে খাড়া করিয়া মনসা-মাহাত্ম্য বর্ণনা-চ্ছলে বিষহরির গান বা 'পদ্মাপুরাণ' নামে মনসা-মঙ্গল রচনা করেন। মনসা-মঙ্গলের মধ্যে নারায়ণদেব-রচিত চাঁদ সদাগর ও বেহুলা নখিন্দরের কাহিনী বিশেষরূপে বিদিত।

মনসা মঙ্গলের পরই মঙ্গলচণ্ডীর গান বা চণ্ডী-মঙ্গল নামে খ্যাত শুভ চণ্ডীর গান বা সুবচনীর কথা প্রচলিত হইল। দ্বিজ জনার্দ্দন, মাণিক দত্ত, দ্বিজ রঘুনাথ, মদন দত্ত, মুক্তারাম সেন, দেবীদাস সেন, শিবনারায়ণ দেব, ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস, জয় নারায়ণ সেন, শিবচরণ, কবিকঙ্কণ বলরাম, ভবানী শঙ্কর, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই চণ্ডীমঙ্গলের

রচয়িতা ; তন্মধ্যে দ্বিজ জনার্দ্দনের মঙ্গল চণ্ডীর পাঁচালী, মুক্তারাম সেনের 'সারদা মঙ্গল' ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'জাগরণ' বা অষ্ট মঙ্গল বিশেষরূপে খ্যাত।

চণ্ডীমঙ্গলের পরই কালিকা মঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর-কথা। নায়ক নায়িকার উপাখ্যান-ছলে আদ্যাশক্তি মহাকালীর মাহাত্ম্য-বর্ণনাই কালিকা-মঙ্গলের প্রধান বিষয়। গোবিন্দ দাস, কৃষ্ণরাম দাস, ক্ষেমানন্দ দাস, মধুসূদন কবীন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, রায় গুণাকর ভারত চন্দ্র, দ্বিজ দুর্গারাম, অন্ধ কবি ভবানী প্রসাদ, রূপনারায়ণ ঘোষ, নিধিরাম কবিরত্ন, দ্বিজ রাম নারায়ণ, প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী, রাজা পৃথ্বীচন্দ্র, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বা দ্বিজ রামচন্দ্র, মুক্তারাম নাগ, দ্বিজ দুর্গারাম প্রভৃতি অনেকেই কালিকা-মঙ্গলের রচয়িতা। তন্মধ্যে গোবিন্দ দাসের বিদ্যাসুন্দর কথাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের গৌরীমঙ্গল, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দুর্গামঙ্গল বা গৌরী বিলাস, মুক্তারাম নাগের দুর্গাপুরাণ ও কালীপুরাণ, দ্বিজ দুর্গারামের কালিকা-পুরাণ ও দ্বিজ রাম নারায়ণের শক্তি-লীলামৃত বিশেষরূপে পরিচিত।

বহুশক্তিরূপিণী আদ্যাশক্তি মহামায়ার ধাত্রীরূপকে ষষ্ঠীদেবীরূপে কল্পনা পূর্ব্বক কৃষ্ণরাম, কবিচন্দ্র ও গুণরাজ ষষ্ঠীমঙ্গল রচনা করিয়া ষষ্ঠী-মাহাত্ম্য প্রচার ও ঘরে ঘরে ষষ্ঠী পূজার প্রচলন করেন। তাহার অব্যবহিত পরেই গুণরাজ খান্, শিবানন্দ কর, মাধবাচার্য্য, ভরত পণ্ডিত, পরশুরাম, দ্বিজ অভিরাম, জগমোহন মিত্র, রণজিৎরাম দাস প্রভৃতি অনেকেই কমলা-মঙ্গল বা লক্ষ্মী-চরিত্র রচনা করিয়া কমলা-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে অমনি দয়ারাম দাস ও গণেশ মোহন সারদা-মঙ্গল বা সরস্বতী মাহাত্ম্য প্রচারে অগ্রসর হইলেন। কমলামঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে জগমোহন মিত্র ও সারদামঙ্গল-রচয়িতাদের মধ্যে দয়ারাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

স্ব স্ব বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশের সুযোগ কোন সম্প্রদায়ই ছাড়িয়া দেন নাই। চণ্ডীমঙ্গল, কালিকা-মঙ্গল যখন প্রচারিত হইল, তখন গঙ্গা-মঙ্গলই বা বাকী থাকে কেন। মাধবাচার্য্য, দ্বিজ গৌরাঙ্গ, দ্বিজ কমলাকান্ত, জয়রাম দাস,

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মঙ্গল-কর্ত্তৃগণ গঙ্গা-মঙ্গল রচনা করিয়া গঙ্গা-মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন। গঙ্গা-মঙ্গলের মধ্যে দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত 'গঙ্গা-ভক্তি-তরঙ্গিণী' সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহিত্য-জগতে, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ন্যায় সৌর সম্প্রদায়ও সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন-পক্ষে কিছু কিছু সাহায্য করিয়াছেন। দ্বিজ কালিদাস ও দ্বিজ রামজীবন বিদ্যাভূষণ সূর্য্যের পাঁচালী লিখিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

এই পর্য্যন্ত যাহা উল্লিখিত হইল তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি ও মধ্য এই উভয় কালের অন্তর্গত। ন্যায়রত্ন মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি, মধ্য ও বর্ত্তমান এই তিন যুগের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আদি যুগের অনেক সাহিত্য-সেবীকে তাঁহার গ্রন্থমধ্যে স্থান দেন নাই। তবে ভবিষ্যৎ সংস্করণে বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় সে অভাব পূরণ করিয়া দিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন।

ধর্ম্ম-বিবাদের ন্যায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও সাহিত্যোৎকর্ষ সাধন-পক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছে। মুসলমান রাজত্ব-কালে মুসলমানেরা হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ না ঘটিয়া যাহাতে একটা প্রীতির ভাব সংস্থাপিত হয় সে জন্য মুসলমান রাজপুরুষেরা হিন্দুসমাজের আচার-ব্যবহার ও হিন্দু শাস্ত্র এবং ধর্ম্ম অবগত হইবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন। হিন্দুগণ তাঁহাদের সকল কার্য্যেই রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবতের দৃষ্টান্ত দিয়া চলিতেন; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের ঐ দিকেই লক্ষ্য পড়িল এবং উপযুক্ত লোক দিয়া ঐ সকল গ্রন্থের অনুবাদ করাইয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করাইতে লাগিলেন। এই সময় হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুবাদ-শাখার আরম্ভ হইল।

কৃত্তিবাস, অদ্ভুতাচার্য্য, অনন্তদেব, ফকির রাম কবিভূষণ, কবিচন্দ্র, ভবানী শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ দাস, ষষ্ঠীবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন, জগৎ বল্লভ, ভিষক্ শুক্র দাস, দ্বিজ রাম প্রসাদ, দ্বিজ দয়ারাম, রামমোহন ও রঘুনন্দন গোস্বামী রামায়ণ অনুবাদ করেন। ইহাদের মধ্যে কৃত্তিবাসই সর্ব্বজন-বিদিত এবং তাঁহার অনূদিত রামায়ণই বাঙ্গালা ভাষায়

সাধারণতঃ প্রচলিত। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে কৃত্তিবাস ব্যতীত অপর কোন অনুবাদকের উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু এই সংস্করণে অপর অনুবাদক-দিগের নাম সংযোজিত হইয়াছে।

ন্যায়রত্ন মহাশয় রামায়ণ অনুবাদকদের মধ্যে যেমন কেবল কৃত্তিবাসেরই উল্লেখ করিয়াছেন তেমনই আবার বিজয় পণ্ডিত, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কৃষ্ণানন্দ বসু, অনন্ত মিশ্র, নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজ রামচন্দ্র খান্, শঙ্কর কবিচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পণ্ডিত, দ্বিজ নন্দরাম, ঘনশ্যাম দাস, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন, উৎকল ব্রাহ্মণ সারণ, কাশীরাম দাস, নন্দরাম দাস, দ্বৈপায়ন দাস, রাজেন্দ্র দাস, গোপীনাথ দত্ত, রামেশ্বর নন্দী, ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী, নিমাই পণ্ডিত, মধুসূদন নাপিত প্রভৃতি অনেক মহাত্মাই মহাভারতের অনুবাদ বা ভারত বর্ণিত বিষয় অবলম্বনে বহু কাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও, উপযুক্ত প্রমাণাভাবে মহাভারতকারের মধ্যে কেবল কাশীরামেরই উল্লেখ করিয়াছেন। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতখানি মহাভারত মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীনত্বের গৌরব করিতে পারে। সুলতান আলাদ্দিন হোসেন শাহের সময় বিজয় পণ্ডিতের 'বিজয়-পাণ্ডব কথা' বা 'ভারত পাঁচালি' প্রণীত হয়।

রামায়ণ, মহাভারতের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়া অথবা ভাগবতের অনুবর্ত্তী হইয়া বহু সংখ্যক গ্রন্থরচনা দ্বারা অনেকে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে গুণরাজ খাঁ মালাধর বসু একজন। তাঁহার অনুবাদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' বা শ্রীগোবিন্দ বিজয়। গুণরাজ খাঁর পর রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য সমগ্র শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুবাদ করেন। তাঁহার অনুবাদের নাম 'শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিণী'। এতদ্ব্যতীত ভবানন্দ 'হরিবংশ' এবং সঞ্জয় ও বিদ্যাবাগীশ ভগবদ্গীতা অনুবাদ করেন। সাহিত্য-গ্রন্থে ইঁহাদের নামও উল্লেখ-যোগ্য।

কেবল গীত রচনা দ্বারা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়া সাহিত্য-জগতে অনেকে খ্যাতি-লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে রাম প্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তদ্বংশীয়

শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র, কুমার শরচ্চন্দ্র ও মহারাজ শ্রীশচন্দ্র, নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ, দাশরথি রায়, রাম দুলাল সরকার, কালী মীরজা, মিরজা হোসেন আলি, সৈয়দ জাফার খাঁ প্রভৃতি বিখ্যাত। বর্ত্তমান গ্রন্থে ইঁহাদের বিষয়েও কিছু কিছু উল্লেখ আছে।

বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব সকলেই সাহিত্য-সেবা করিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকেরা সাহিত্যের লালন-কার্য্য করিয়াছেন। বৈষ্ণব মহাপ্রভুরা সেই সাহিত্যের হাতে খড়ি দিলেন। বৈষ্ণবযুগে বাঙ্গালা সাহিত্য লালনের অবস্থা অতিক্রম করিয়া তাড়নার অবস্থায় পদার্পণ করে। বাস্তবিক বাঙ্গালা সাহিতের বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থা বৈষ্ণবদিগেরই অনুগ্রহে।

বৈষ্ণব সাহিত্যের অনেকগুলি শাখা। ১। পদশাখা—অনন্তদাস, অনন্তআচার্য্য, আকবর আলি, আত্মারাম দাস, উদ্ধবদাস, কবির, কানাই দাস, কৃষ্ণদাস, গতিগোবিন্দ, গোবিন্দ দাস, ঘনরাম দাস, ঘনশ্যামদাস, চণ্ডীদাস, চম্পতি ঠাকুর, চৈতন্যদাস, জগন্নাথ দাস, জ্ঞানদাস, প্রসাদ দাস, প্রেমদাস, বলাই দাস, বিদ্যাপতি, বৃন্দাবন দাস, তুলসী দাস, দীনহীন দাস, দুঃখী কৃষ্ণদাস, ধরণীদাস, নরসিংহ দাস, নরহরিদাস, নরোত্তম দাস, নসির মামুদ, পরমানন্দ দাস, পীতাম্বর দাস, মথুর দাস, মধুসূদন দাস, মুরারি গুপ্ত, যশোরাজ খান, যাদবেন্দ্র, রসিক দাস, রামানন্দ দাস, লোচন দাস, লক্ষ্মীকান্ত দাস, শিবানন্দ, শ্রীনিবাস, সুন্দর দাস, সুবল, সেখ জালাল, সেখ ভিক, সেখ লাল, সৈয়দ মর্ত্তুজা, হরিদাস, হরিবল্লভ প্রভৃতি ১৬৬ জন বৈষ্ণব পদকর্ত্তার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই প্রায় চৈতন্য দেবের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী। কেবল চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। ইঁহাদের সকলের পরিচয় ক্ষুদ্র ভূমিকায় দেওয়া অসম্ভব। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গীতরচনাদ্বারা প্রেম-প্রচার এই শাখার উদ্দেশ্য।

২। চরিত শাখাঃ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন বৃত্তান্তই এই

শাখার প্রধান অবলম্বন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত, জয়ানন্দের ও লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃত এই শাখার প্রধান গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত অন্য ক্ষুদ্র গ্রন্থও আছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য চরিতামৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দ দাসের 'কড়চা' ও শ্যাম দাস-প্রণীত 'অদ্বৈত মঙ্গল,' শ্রীখণ্ডনিবাসী আত্মারাম দাসের পুত্র নিত্যানন্দ দাস রচিত 'প্রেম-বিলাস' গ্রন্থ এই শ্রেণীভুক্ত।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের হস্তাক্ষর—মুরশিদাবাদের অন্তর্গত ভরতপুর বিভাগে একটী গ্রামে মহাপ্রভুর পার্ষদ, শ্রীরাধিকার অবতার শ্রীগদাধর আচার্য্যের পাট। এখনও ঐ গ্রামে তাঁহার বংশধরেরা তাঁহারই ভিটায় বাস করিতেছেন। এইখানে গদাধরের স্থাপিত বিগ্রহ আজিও বর্ত্তমান। মহাপ্রভু গদাধরের মুখে ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে বিশেষ আনন্দিত হইতেন। যে পুঁথিখানি আচার্য্য মহাপ্রভুর সম্মুখে পাঠ করিতেন, সেইখানির একস্থানের টীকায় মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর আছে। একে ভাগবত, তাহাতে মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর সংযুক্ত থাকায় পুঁথিখানি পরম পবিত্র বস্তুরূপে দেবমন্দিরে নিত্য পূজিত হইয়া থাকে। গত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যখন ভারতীয় শিল্প-কৃষি-প্রদর্শনীক্ষেত্রে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একটি সাহিত্যিক প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন, সেই সময়ে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের এবং গদাধর বংশের বর্ত্তমান বংশধরের অনুগ্রহে সেই পুঁথি হইতে মহাপ্রভুর হস্তাক্ষর-যুক্ত পৃষ্ঠাখানির ফটোগ্রাফ পরিষৎ আনাইয়াছিলেন। সম্পাদক মহাশয় এই সংস্করণে তাহারই প্রতিরূপ প্রদান করিয়াছেন। তাহার পাঠ এইরূপ—

"সর্ব্বমতিব্যাপ্য সর্ব্বেষাং পু ।ৎ ২ পূর্ব্বসখাযো যস্মিন্ ৩ (?) আতামমতাস্পদীয় ৩ এতৎ শরীরং চ তবাপিতং ৮বিনা ৩ হে সূর্য্যোপম······কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্। ত্ব মেব জগতাং নাথো জগচ্চৈ তত্তবার্পিতং॥ শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুল পুষ্কর জো······ল্ল মার্ক মহ ন্ ভগবন্নমস্তে॥ শুক উবাচ॥ ইত্যভিষ্টুয় ভূমানং ত্রিঃ পরিক্রম পাদয়োঃ। বৎসান্ পুলিন মানি ন্যে যথাপূর্ব্বশঁখং স্বঁকং॥

• একস্মিন্নপি জাতে দ্বে প্রাণেশ কাঁন্তরাত্মনঃ। শ্রীগুরু……তসঃ। যণ্মোহিতং জগৎসর্বমভীক্ষ্ণং বিস্মৃতাত্মকম্॥ উচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণং স্বাগতন্তেতি……দশয়ং শ্চর্মাজগরং নিববর্তবনাদ্‌ব্রজং॥ বর্হপ্রসূন বন ধাতু বিচিত্রিতাঙ্গঃ প্রোদ্দাম বেণুদল শৃঙ্গব বিস্মৃত আত্মা যেন তৎ ৪”

৩। **অনুবাদ ও ব্যাখ্যাশাখা**—সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে পৌরাণিক সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ এই শাখার অন্তর্ভুক্ত। অকিঞ্চনদাস, রসকদম্ব রচয়িতা কবিবল্লভ, শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস-রচয়িতা কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণকিঙ্কর, জগৎ-মঙ্গল-রচয়িতা গদাধর দাস, জয়দেব-কৃত গীতগোবিন্দের বঙ্গানুবাদক গিরিধর, চৈতন্য চন্দ্রামৃতের অনুবাদক গোপীচরণ দাস, গোবিন্দ-রতিমঞ্জরীর অনুবাদক ঘনশ্যাম দাস, গৌর গণোদ্দেশদীপিকার অনুবাদক দীনহীন দাস, ভ্রমর গীতার অনুবাদক দেবনাথ দাস, শ্রীরূপ গোস্বামীর হংসদূত-অনুবাদক নরসিংহ দাস, উদ্ধবসংবাদের ভাগবত-অনুবাদক নরসিংহ দ্বিজ, মুক্তাচরিত্র গ্রন্থের পদ্যানুবাদক নারায়ণ দাস, মনঃশিক্ষার বঙ্গানুবাদক প্রেমদাস, গীত-গোবিন্দের অপর পদ্যানুবাদক ভগবান দাস, উদ্ধব সংবাদের অপর অনুবাদক মাধব গুণাকর, জগন্নাথ মঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা মুকুন্দ দ্বিজ, কর্ণামৃতানুবাদক যদুনন্দন দাস, রঘুনাথ দাস, রাধাবল্লভ দাস, রূপনাথ দাস ও লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস এই শাখান্ত-র্ভুক্ত গ্রন্থকার।

৪। **ভজন শাখা**—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভজনা-প্রণালী এই শাখান্ত-র্গত, এই শাখান্তর্গত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। ভক্তিরসাত্মিকা—অকিঞ্চন দাস, ২। গোপীভক্তিরসগীত—অচ্যুতদাস ৩। রসসুধার্ণব—আনন্দ দাস, ৪। ভজনমালিকা—কৃষ্ণরাম দাস, ৫। স্মরণ মঙ্গল—গিরিধর দাস, ৬। প্রেমভক্তিসার—গুরুদাস বসু, ৭। গোলোক বর্ণন—গোপাল ভট্ট, ৮। হরিরাম কবচ—গোপীকৃষ্ণ দাস, ৯। সিদ্ধ সার—গোপীনাথ দাস, ১০। নিগম—গোবিন্দ দাস, ১১। রসভক্তিচন্দ্রিকা—চৈতন্য দাস, ১২। রসোজ্জ্বল—জগন্নাথ দাস, ১৩। সহজ রসামৃত—দুঃখী কৃষ্ণদাস, ১৪। বৈষ্ণবামৃত—দীনভক্ত দাস, ১৫। দর্পণচন্দ্রিকা—নরসিংহ দাস, ১৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—নরোত্তম দাস, ১৭। রাগময়ী কণা ও রসকল্পসার—নিত্যানন্দদাস, ১৮। উপাসনা

পটল ও আনন্দভৈরব—প্রেমদাস, ১৯। মনঃশিক্ষা—প্রেমানন্দ, ২০। আনন্দ-লহরী—মথুরাদাস।

ইহা ব্যতীত রতিবিলাস, সহজতত্ত্ব, ক্রিয়া-যোগসার প্রভৃতি আরও কতকগুলি গ্রন্থ আছে। বাহুল্যভয়ে তাহাদের উল্লেখ করা হইল না।

৫। বিবিধ শাখা—ইহার সবিস্তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইংরেজ প্রভাবের পূর্ব্বে ঈশানচন্দ্র দের কৃষ্ণলীলা, গোপালদাসের কর্ণানন্দ, নন্দকিশোর দাসের বৃন্দাবনলীলামৃত ও রসপুষ্পকলিকা, ভক্তরামের গোকুলমঙ্গল প্রভৃতি উপাদেয় বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে।

আগামী সংস্করণে আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থে বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্ণব গ্রন্থ সকলের বিশদতর আলোচনা দেখিব, এইরূপ আশা করিতে পারি।

বাঙ্গালা সাহিত্য যে কেবল হিন্দুর নিকটেই ঋণী তাহা নহে। হিন্দু যে হিন্দু সাহিত্যের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য প্রাণপণ করিবে তাহাতে হিন্দুর পৌরুষ নাই, কারণ নিজ পরিবার পালন কে না করিয়া থাকে? সেই পালনী বৃত্তিকে স্ব-সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরে লইয়া যাওয়াই গৌরবের বিষয়। মুসলমান সেই গৌরবে গৌরবান্বিত। মুসলমান গ্রন্থকার রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করিয়া হিন্দু মুসলমানের পরস্পর প্রীতি ও সদ্ভাব এবং মুসলমানের মধ্যে দেবচরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

মুসলমানের মধ্যেও অনেক বৈষ্ণব ছিলেন। করম আলি একজন মুসলমান বৈষ্ণব কবি, তাঁহার রচিত রাধার বিরহ-সূচক পদাবলী অনেক পাওয়া যায়। মুসলমান কবিগণ পণ্ডিতদিগকে মহাভারতাদি অনুবাদে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, রাজ পুরুষেরা অর্থ সাহায্যও করিয়াছিলেন। মুসলমান গ্রন্থকার ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলি এই—

১। জ্ঞানপ্রদীপ—সৈয়দ সুলতান, ২। তনুসাধন—সৈয়দ সুলতান, ৩। তউফা—কবি আলোয়াল, ৪। মুর্সিদের বারমাস—মহম্মদ আলি, ৫। জ্ঞান-সাগর—কানুফকির, ৬। সিরাজকুলুপ—ফকির আলিরাজা, ৭। মুছার ছোয়াল—কবি নসরল্লা, ৮। জ্ঞান-চৌতিশা—সৈয়দ সুলতান, ৯। হানিফার পত্র—মহম্মদ

খাঁ, ১০। মুক্তাল হোছেন—মহম্মদ খাঁ, ১১। ইমাম চুরি—মহম্মদ খাঁ, ১২। লতী ময়নাবতী ও লোর চন্দ্রাণী—দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল সাহেব, ১৩। পদ্মাবতী—আলাওল, ১৪। রাগনামা, ১৫। তালনামা, ১৬। সৃষ্টিপত্তন, ১৭। ধ্যানমালা।

সত্যনারায়ণের কথা, কবির লড়াই ইত্যাদিতেও মুসলমানগণ বাঙ্গালা সাহিত্যকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

রামবসু, হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, এণ্টুনি সাহেব ইঁহারা সকলেই কবিওয়ালা, সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে ইঁহারাও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। যাত্রা ও কথকতাদ্বারাও সাহিত্যের কিয়ৎপরিমাণে পুষ্টিসাধন হইয়াছে। সাহিত্য আলোচ্য -গ্রন্থে ইঁহাদেরও অল্প বিস্তর বর্ণনা আছে।

এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা লইয়াই বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরিশ্রমের ফলে আমরা সাহিত্যের একটী সুন্দর প্রতিকৃতি পাইয়াছি। তিনি ভাষা, বর্ণমালা, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ও ছন্দঃ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়েরই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা করা ধৃষ্টতামাত্র। ন্যায়রত্ন মহাশয় ও তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বজনবিদিত। বহুকাল পরে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই গ্রন্থরত্নের নূতন সংস্করণ দেখিয়া বাঙ্গালীমাত্রেই যে আনন্দিত হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে হওয়ায় বিষয়ের গুরুত্বহিসাবে কিছু কিছু ত্রুটি থাকারই সম্ভাবনা। ত্রুটি যাহা থাকিবে আশা করি তৎসমুদয় আগামী সংস্করণে সংশোধিত হইবে। সাধারণের নিকট এই সচিত্র নূতন সংস্করণ আদৃত হইলে সুখী হইব। গিরীন্দ্রবাবু এই গ্রন্থপ্রকাশে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদ-ভাজন। অলমতিবিস্তরেণ, ইতি

শ্রীঅমূল্যচরণঘোষ বিদ্যাভূষণ।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। এই সংস্করণে স্থলবিশেষে অনেক পরিবর্ত্তন ও অনেক পরিবর্দ্ধন হইয়াছে—এবং কোন কোন বিষয় নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথমবার মুদ্রিত পুস্তকের কতিপয় খণ্ড প্রথমভাগ ও কতিপয় খণ্ড দ্বিতীয়ভাগ নামেও প্রকাশিত হইয়াছিল, এবারে আর তাহা করা হইল না—একখণ্ডেই সমগ্র পুস্তক প্রকাশিত হইল। ইতি

হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়,
২২শে ভাদ্র সংবৎ ১৯৪৪। } শ্রীরামগতি শর্ম্মা।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক বৃহৎ হইয়া উঠিল, দেখিয়া ইহার কিয়দংশের কতিপয় খণ্ড প্রথমভাগ নামে পূর্ব্বে প্রচারিত করিয়াছিলাম। এক্ষণে অবশিষ্টাংশের কতিপয় খণ্ড দ্বিতীয়ভাগ নামে প্রকাশ করিয়া উভয় ভাগেরই অপর সমুদয় খণ্ড এক সম্পূর্ণ খণ্ডে প্রকাশিত করিলাম। এই সমগ্র গ্রন্থ ৪টী পরিচ্ছেদে বিভক্ত। বর্ত্তমানাবস্থ বাঙ্গালা অক্ষর ও বাঙ্গালা ভাষা কোন্ সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রথম পরিচ্ছেদে তদ্বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। বাঙ্গালা অক্ষরের সময় নিরূপণ প্রসঙ্গে রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত যে তাম্রশাসনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তদঙ্কিত সমগ্র বিষয়টী লিথোগ্রাফে মুদ্রিত করিয়া এক এক খণ্ড এই পুস্তকমধ্যে নিবেশিত করিতে আমাদের অতিশয় ইচ্ছা ছিল, কারণ তাহা হইলে, সেই সময়ে এদেশে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা পাঠকগণ স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও সে তাম্রশাসনখানি আর এক বার হস্তগত করিতে পারিলাম না! মজীলপুরের জমীদার শ্রীযুত

বাবু হরিদাস দত্ত মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত উহার একটী প্রতিলিপি আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, গ্রন্থের শেষভাগে আমরা উহা অবিকল মুদ্রিত করিলাম। ত্রিবেণীর ৺হলধর চূড়ামণি মহাশয় বিস্তর পরিশ্রম করিয়া ঐ সনন্দের লিপি পাঠ করিয়াছিলেন। তিনিও সমুদয় অক্ষর বুঝিতে পারেন নাই—অবুদ্ধ স্থলে স্বয়ং যোজনা করিয়া দিয়াছেন। সন তারিখের স্থল অস্পষ্টই রহিয়াছে। এইরূপে উহার রচনা অনেক বিকৃত হওয়ায়, স্থানে স্থানে স্পষ্টরূপে অর্থ বুঝিতে পারা যায় না—এই জন্যই আমরা উহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিলাম না, সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণ যতদূর পারেন, উহার অর্থ করিয়া লইবেন। ঐ তাম্রশাসনে যে, 'খাড়ীমণ্ডলী' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপি সুন্দর বনমধ্যে ঐ খাড়ী পরগণা ও খাড়ী গ্রাম বর্ত্তমান আছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথম ভাগ প্রচারিত হইলে পর কয়েকখানি প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্র এবং কয়েকজন বিজ্ঞ মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাতে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমাদের এই সামান্য পুস্তকের পক্ষে বিলক্ষণ উৎসাহ-বর্দ্ধকই হইয়াছে। তবে কোন কোন মহাশয় ভাষার সময়-নিরূপণ ও রূপান্তরতা প্রাপ্তিবিষয়ে স্থল বিশেষে আমাদের মতের প্রতিকূলেও কিঞ্চিৎ বলিয়াছেন। তাহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরাও যেমন কেবল যুক্তি ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ওবিষয়ে যাহা কিছু বলিয়াছি, প্রতিকূলবাদীরাও তাহাই করিয়াছেন। যেহেতু অন্য কোনরূপ প্রমাণদ্বারা উহাতে কিছু প্রতিপন্ন করিবার উপায় নাই। হইতে পারে যে, তাঁহাদের যুক্ত্যাদি আমাদের যুক্ত্যাদি অপেক্ষা প্রবল, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়াও আমাদের বিবেচনায় তাহা কোন মতে বোধ হইল না। অতএব আমরা নিরপেক্ষ পাঠক মহাশয়দিগকে মধ্যস্থ মানিলাম, তাঁহারা এবিষয়ের যথার্থ মীমাংসা করিবেন।

বাঙ্গালা ভাষার অবস্থাভেদে আমরা আদ্য, মধ্য ও ইদানীন্তন নামে তিনটী কালের কল্পনা করিয়াছি, এবং প্রথম হইতে চৈতন্য দেবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালকে আদ্যকাল, চৈতন্য দেব হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালকে

মধ্যকাল এবং ভারতচন্দ্র হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কালকে ইদানীন্তনকাল নামে অভিহিত করিয়াছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আদ্যকালোৎপন্ন কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বিবরণ, তাঁহাদের রচিত গীত সমূহের সংক্ষিপ্ত সমালোচন এবং ঐ কালে বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ অবস্থা ছিল, বোধ হইয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবকর্ত্তৃক, বিদ্যাপতি বিরচিত গীত শ্রবণ এবং গোবিন্দদাসকর্ত্তৃক চৈতন্যলীলা বর্ণন—এই উভয়ের প্রদর্শনদ্বারা আমরা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপাদন করিয়াছি যে, বিদ্যাপতি চৈতন্যদেবের পূর্ব্বকালীন ও গোবিন্দদাস উত্তরকালীন লোক ছিলেন। অতএব সে বিষয়ে অন্যরূপ অভিপ্রায় যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা তত বিশ্বাসার্হ হয় না। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস উভয়ের ভণিতিযুক্ত ২। ৪টী কল্পিত গীত, যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, অনেকে এই উপাখ্যান বলিয়া তাহার সমাধান করেন যে, রাজা শিবসিংহের মহিষী লছিমাদেবীর সহিত বিদ্যাপতির প্রসক্তি ছিল এবং লছিমাকে না দেখিলে তাঁহার কবিত্ব নিঃসৃত হইত না। রাজা এই বিষয় অবগত হইয়া সন্দেহ ভঞ্জনার্থ মধ্যে মধ্যে বিদ্যাপতিকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া কবিতা রচিতে বলিতেন; বিদ্যাপতি তাহাতে অসমর্থ হইলে লছিমা কার্য্যান্তরব্যপদেশে ঐ গৃহের গবাক্ষপথে উপস্থিত হইয়া দেখা দিতেন এবং অমনি বিদ্যাপতির মুখ হইতে কবিতা নিঃসৃত হইত। এইরূপে যে সকল কবিতা রচিত হয়, তাহা অসম্পূর্ণ ছিল। যাহা হউক রাজা ইহাতে পরম ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যাপতিকে শূলে দেন, বিদ্যাপতি শূলবিদ্ধ-হৃদয় হইয়াও অকস্মাৎ লছিমাকে তথায় দর্শন ও গীতার্দ্ধ রচনা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অনন্তর বহুকাল পরে (কাহার মতে ১৪৮৯ শকে) গোবিন্দদাস প্রাদুর্ভূত হইয়া ঐ সকল গীতার্দ্ধের পূরণ করেন, এই জন্য ঐ সকল গীতে উভয়ের ভণিতি দেখিতে পাওয়া যায়' ইত্যাদি—

যাহা হউক এই পরিচ্ছেদে আমরা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের জীবনবৃত্ত সংক্রান্ত অধিক কথা বলিতে পারি নাই—যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহাও অনুমানমাত্র মূলক। কিন্তু গত ১০ই পৌষের সোম-প্রকাশে কোন পত্র-প্রেরক

এই ভাবে লিখিয়াছেন যে, "জিলা যশোহরের অন্তর্গত ভূর্শটুর নামক গ্রামে ১৩৫৫ শকে ব্রাহ্মণ জাতীয় ভবানন্দরায়ের ঔরসে বিদ্যাপতির জন্ম হয় এবং ১৪০৩শকে ৪৮ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে তাঁহার পরলোক হয়। উহার প্রকৃত নাম বসন্তরায়—বিদ্যাপতি উপাধি মাত্র। উহার রচিত পদাবলীর নাম বসন্তসুকুমার কাব্য। চণ্ডীদাসের ১৩৩৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়। ইহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী—ইহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহার রচিত গ্রন্থের নাম গীত-চিন্তামণি" ইত্যাদি—যাহা হউক, পত্র-প্রেরক মহাশয়দিগের এই সকল উক্তি কতদূর প্রামাণিক, তাহা আমরা জানি না।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ভিন্ন আর কাহারও পদ্য রচনার কথা আমরা এই পরিচ্ছেদে উল্লেখ করি নাই—কিন্তু ঐ কালে যে আর কাহারও পদ্য রচনা ছিল না, সে কথাও বলি নাই। প্রসিদ্ধ 'খনার বচন' সকল ঐ কালের পদ্য। যেরূপ প্রসিদ্ধি, তাহাতে খনা রাজা বিক্রমাদিত্যের নব-রত্নান্তর্গত মিহিরের পত্নী ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সময় প্রায় ২০০০ বৎসর হইল। এ প্রসিদ্ধি যদি সত্য হয়, তবে তৎকালোৎপন্না খনা যে, বাঙ্গালা ভাষায় বচন রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কোন মতে সম্ভব নহে। অতএব বোধ হয়, এক্ষণকার প্রচলিত খনার বাঙ্গালা বচন সকল খনার রচিত নহে—কাহারও কর্ত্তৃক সংস্কৃত বা প্রাকৃতাদি হইতে ভাষান্তরিত। কিন্তু সেই ভাবান্তরও যে, অল্পকালের নহে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা এক ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইয়াছি যে, ১৩১৪ (১৩৯২ খৃঃ অঃ) শকে লিখিত এক বাঙ্গালা পুস্তকে খনার বচনার্থ সকল প্রকাশিত আছে—যদি তাহা সত্য হয়, তবে তাহারও বহুদিন পূর্ব্বে খনার বচন সকল প্রচলিত ছিল, বলিতে হইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, মধ্যকালোৎপন্ন কবি বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ—কেতকাদাস, কাশীরামদাস, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও রামপ্রসাদ সেন ইহাদের

যথালব্ধ জীবনবৃত্ত ও ইহাদের রচিত চৈতন্যভাগবতাদি গ্রন্থ সকলের সমালোচনা সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দর সমালোচনাবসরে আমরা প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত কালিকামঙ্গল পাই নাই লিখিয়াছিলাম এবং ঐ পুস্তকের সন্ধান পাইবার বাসনায় কয়েক সপ্তাহ ব্যাপিয়া এডুকেশন গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে কোন মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের বাসনা পূরণ করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি যে, গত ৫ই মাঘ হইতে ৪ সপ্তাহের এডুকেশন গেজেটে একজন পত্রপ্রেরক কালিকা-মঙ্গলের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ যদি প্রকৃত হয়, তবে ১৫৮৮ শকে অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনার কিঞ্চিদধিক ১০০ বৎসর পূর্ব্বে কালিকামঙ্গল রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল এবং উহাতে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সমগ্রভাবে বর্ণিত আছে; কিন্তু যখন এপর্য্যন্তও সে পুস্তক দেখিতে পাই নাই, তখন তদ্বিষয়ে এখনও কিছু বলিতে পারিলাম না।

চতুর্থ বা শেষ পরিচ্ছেদে ইদানীন্তনকালে প্রাদুর্ভূত ভারতচন্দ্র রায়, দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রামনিধি গুপ্ত, রামবসু, হরুঠাকুর, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রামমোহন রায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দাশরথি রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি (লোকান্তরগত ও জীবিত) কতিপয় বাঙ্গালা গ্রন্থকার মহাশয়ের বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকলের সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে; বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা এবং তাহা কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ও কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছে; বাঙ্গালা ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কারের কথাও যথাস্থলে অভিহিত হইয়াছে; এবং পরিশেষে যে সকল গ্রন্থকারের বিষয়ে আমরা এক্ষণে বিশেষরূপে কিছু বলিতে পারিলাম না, তাদৃশ কতিপয় মহাশয়ের নামাবলীও কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সমালোচনা পাঠ করিলে সমালোচ্য গ্রন্থ দর্শনে পাঠকদিগের ইচ্ছা জন্মিতে পারে, কিন্তু অমুদ্রিত গ্রন্থের সমালোচনা করিলে তাঁহাদের সে ইচ্ছা সকল স্থলে চরিতার্থ হইতে পায় না। এইজন্য যেসকল গ্রন্থাদি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা তাহারই সমালোচনা করিয়াছি, সমালোচনার বিশেষ যোগ্য হইলেও অমুদ্রিত বলিয়া অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। মুদ্রিত গ্রন্থাদিও যে, অনেকই অস্পৃষ্ট রহিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে 'শিশুবোধ' নামক পুস্তকখানি দেশমধ্যে বড়ই প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় ইহা অতিশয় সমাদৃত ছিল। ইহাতে বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষয়িক নানাবিধ জ্ঞানগর্ভক বিষয়ের উপদেশ আছে। শুভঙ্করদাস নামক (বোধ হয়) কোন কায়স্থের রচিত অঙ্ক ও নানারূপ হিসাব বিষয়ক আর্য্যা সকল ইহাতে নিবিষ্ট আছে এবং কবিকঙ্কণ রচিত গঙ্গাবন্দনা, কবিচন্দ্ররচিত কলঙ্কভঞ্জন ও দাতাকর্ণ, অযোধ্যারামকৃত গুরুদক্ষিণা, এবং প্রহ্লাদচরিত ও চাণক্যশতক নামে কয়েকটী পদ্য আছে। পূর্ব্বে কেবল সেইগুলি অভ্যাস করিয়াই অনেকে বাঙ্গালা ভাষায় কৃতবিদ্য বলিয়া পবিচয় দিতেন। নিশ্চিত সময় বলিতে পারা না যাউক, কিন্তু ভাষাগত কোন কোন শব্দ দর্শন করিলে, এদেশে মুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাব হইবার পর যে, শুভঙ্করের আর্য্যা সকল রচিত হইয়াছিল, তাহা অনুমিত হয়।

ইদানীন্তনকালের মধ্যে কত কত মহাশয় যে, নানাবিষয়ক রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। তন্মধ্যে কলিকাতার ঠনঠনে নিবাসী ৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের ও শোভাবাজার নিবাসী ৺গঙ্গানারায়ণ লস্করের পাঁচালী, পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত তাঁবা গ্রামনিবাসী ৺পরমানন্দ অধিকারীর তুক্ক, মুর্শীদাবাদান্তর্গত বেলডাঙ্গানিবাসী ৺রূপ অধিকারীর ঢপ, বর্দ্ধমানান্তঃপাতী চুপীগ্রাম নিবাসী ৺রঘুনাথ রায়ের (দেওয়ান মহাশয়ের) ও ৺নরচন্দ্রের শ্যামাবিষয়ক গীত, উলুসেগোপালনগর নিবাসী ৺মধুসূদন কাইনের কীর্ত্তন, বাঁশবেড়ে নিবাসী ৺শ্রীধর কবিরত্নের আদিরস সংক্রান্ত গীত,

গোপালে উড়ে, ৺গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী, ৺বদনচন্দ্র অধিকারী, ৺নীলকমল সিংহ, ৺দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল, ৺মদনমোহন মাষ্টার প্রভৃতি যাত্রাওয়ালাদিগের সঙ্গীত—এ সকলও বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধনপক্ষে সাধারণ সাহায্য করে নাই। আমরা বাহুল্য ভয়ে এ সমস্তে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিয়া দুঃখিত রহিলাম।

অতঃপর আমার উপকার প্রাপ্তি জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার অবসর। আমি এই পুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে কত মহাশয়ের নিকট—কত বিষয়ে—কতরূপ যে সাহায্য পাইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই, সুতরাং সেই সমস্ত সাহায্য-দাতৃ মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার। অতএব আমি বিনয়াঞ্জলি সহকারে একবারে সাধারণ্যে স্বীকার করিতেছি যে, এই পুস্তক সম্পর্কে যে কোন মহাশয় যে কোন বিষয়ের জন্য আমার যে কিছু সাহায্য কবিয়াছেন, আমি তদর্থ তাঁহার নিকট যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব; কখনও তাঁহার কৃত উপকার বিস্মৃত হইব না। কিন্তু এস্থলে আমার প্রিয়তম ছাত্র বহরমপুর নিবাসী পরমক্ষেমাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেনের নাম পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ না করা আমার পক্ষে অনুচিত কার্য্য করা হয়। রামদাস ধনিসন্তান ও অল্প বয়স্ক পুরুষ, কিন্তু ধন ও বয়সের অল্পতা একত্র সমবেত হইলে সচরাচর যে সকল দোষের সঙ্ঘটন হয়, রামদাসে সে সকলের কিছু মাত্র নাই। রামদাস অতি বিনয়ী, নিরহঙ্কার, প্রিয়ভাষী ও সদনুষ্ঠানরত। বিদ্যানুশীলনই তাঁহার একমাত্র উপজীব্য। তিনি এ পর্য্যন্ত 'বিলাপতরঙ্গ', 'কবিতালহরী' ও 'কবিতা-কলাপ' নামে ৩ খানি পদ্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই প্রধান প্রধান সাময়িক পত্রে স্বরচিত প্রবন্ধ সকল প্রকাশ কবিতেছেন। তিনি নিজ ভবনে একটী উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা যে সকল পুস্তক ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, সে সকল পুস্তকই প্রায় ঐ পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। আমি এই পুস্তকের রচনা সময়ে আবশ্যক বোধে যখন যে বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে চাহিয়াছি, রামদাস বাবু আহ্লাদ ও আগ্রহসহকারে তখনই সেই পুস্তক আমাকে প্রদান করিয়াছেন। অধিক কি, রামদাস বাবুর

ঐ পুস্তকালয় নিকটে না থাকিলে বহরম পুরে থাকিয়া এই পুস্তক রচনা করা আমার পক্ষে কতদূর কঠিন হইত তাহা বলিতে পারি না।

পরিশেষে বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়দিগের নিকট আমার বিনয় বচনে নিবেদন ও প্রার্থনা এই যে, আমি এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য সংবাদ সংগ্রহে সাধ্যমত যত্ন করিতে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু এ প্রকার গ্রন্থ যেরূপ হইলে লোকের শ্রদ্ধাস্পদ হইতে পারে, সেরূপ করিতে পারিয়াছি, তাহা কোন মতে সম্ভব নহে। ইহাতে বিস্তর ভ্রম—বিস্তর অসঙ্গতি—ও বিস্তর দোষ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্বিধ পুস্তক রচনাপক্ষে ইহা এক প্রকার প্রথম উদ্যম, অন্ততঃ এ অনুরোধেও যদি তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সেই সকল ভ্রমাদি মার্জ্জনা করেন এবং উপদেশ বাক্যে সেই গুলি আমাকে দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট অপরিসীম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। ইত্যলম্।

বহরমপুর কলেজ।
১২ই আষাঢ় সংবৎ ১৯৩০।

শ্রীরামগতি শর্ম্মা।

সূচী পত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিষয়		পৃষ্ঠা

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

——(*)——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কোন ভাষার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। যেরূপেই কর, তাহা অনায়াসে অন্যের হৃদয়ঙ্গম হয় না। 'বাঙ্গালীদিগের মাতৃভাষারই নাম বাঙ্গালাভাষা' ইহা বাঙ্গালাভাষার এক প্রকার লক্ষণ হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে দোষস্পর্শশূন্য হয় না। অতএব এস্থলে আমরা বাঙ্গালা-ভাষার লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিতে না যাইয়া এই মাত্র বলিব যে, এই প্রস্তাব বাঙ্গালাভাষাতেই লিখিত হইতেছে।

ভাষাতত্ত্বের প্রকৃতি ভূতত্ত্বশাস্ত্রের প্রকৃতির ন্যায়;—উভয়েরই মূলভাগ নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যেরূপ ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন না যে, কোন্ কালে অমুক ভূভাগের প্রথম স্তরের সৃষ্টি হইয়াছে—কোন্ কালে ও কিরূপ ক্রমে উহার দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতির স্তর সকল উহাতে বিন্যস্ত হইয়াছে, এবং কোন্ কালেই বা ঐ সকল স্তর বিসারিত, বিপ্লুত বা বিপর্য্যস্ত হইয়া ঐ ভূভাগকে বর্ত্তমান অবস্থায় অবস্থাপিত করিয়াছে; সেইরূপ ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও কোন ভাষার প্রারম্ভবিষয়ে অথবা সেই ভাষায় পূর্ব্বপূর্ব্বে অসঙ্খ্যরূপ যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে কালের ক্রম কিছুই বলিতে পারেন না। ভূতত্ত্ববিৎ বলিতে পারেন যে, অমুক দেশের উপরিস্থ মৃত্তিকার প্রকৃতি এইরূপ; সেই মৃত্তিকার নিম্নে অমুক প্রকার মৃত্তিকা বা প্রস্তর আছে, কিন্তু সেই সকল মৃত্তিকা বা প্রস্তর কোন্ সময়ে এবং কিরূপে ঐ স্থানে

উপস্থিত হইয়াছে, তাহার তিনি কিছুই বলিতে পারেন না। ভাষাতত্ত্বজ্ঞও সেইরূপ বলিতে পারেন যে, অমুক ভাষার প্রকৃতি এইরূপ—ঐ ভাষার মূলে অমুক ভাষা বা অমুক জাতীয় ভাষার শব্দের যোগ আছে; কিন্তু কোন্ সময়ে যে ঐ মূল ভাষার শব্দ জন্মিয়াছিল, বা তাহা বর্ত্তমান ভাষার মধ্যে আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছিল, প্রায়ই তাহার তিনি কিছুই বলিতে পারেন না। মাতৃভাষার তত্ত্বনিরূপণ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া অনেকে এরূপ মনে করেন যে, স্বদেশের তাদৃশ প্রাচীন ইতিহাস থাকিলে, ভাষার সৃষ্টি বিবরণ অনেক দূর জানা যাইত, কিন্তু অপরে তাহা সম্ভব মনে করেন না! তাঁহারা কহেন, কোন দেশেরই তাদৃশ ইতিহাস নাই—এবং থাকিতেও পারে না। কারণ, ইতিহাস যতই প্রাচীন পুরুষ হউন না কেন, তিনি ভাষারই একটি অপত্য ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তিনি কেমন করিয়া আপনার জননীর জন্মবিবরণ জানিবেন? যেরূপ অগ্রে দেশ জন্মে, তৎপরে তাহাতে লোকের বসতি হয়, সেইরূপ অগ্রে ভাষা জন্মে, তৎপরে তাহাতে পুরাণই বল—ইতিহাসই বল—আর যাহাই বল—বিরচিত হয়।

বাঙ্গালাভাষার প্রারম্ভ কোন্ সময়ে ও কিরূপে হয় এবং কোন্ সময়ে কোন্ ভাষান্তর তাহাতে আসিয়া মিশ্রিত হয়, এ সকল চিন্তা করিতে গেলে মনকে অপার অতীত কালসাগরে নিক্ষিপ্ত করিতে হয়; কিন্তু তাহা করিয়াও আশানুরূপ ফললাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তাহা না করিয়া শেষের যে কয়েক শতাব্দীর লিপিবদ্ধ গ্রন্থাদি পাওয়া যায়, তাহা হইতেই তথ্যানুসন্ধান করা আবশ্যক বোধ হয়। ভূতত্ত্বজ্ঞেরা পৃথিবীর তলাতল রসাতল পর্য্যন্তের কোন সংবাদ রাখেন না; তাঁহারা উহার উপরিস্থ ত্বক্-মাত্রের বিবরণ লিখিয়াই আপনাদের বিশাল শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরাও সেইরূপ ইতিহাস জন্মিবার পূর্ব্বসময়রূপ রাত্রিকালের কোন সংবাদ দিতে পারেন না—কাব্যারুণের উদয় হইলেই তাঁহাদের চক্ষুঃ উন্মীলিত হয়, এবং তাহার আলোকেই যাহা দেখিতে পান, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন।

সংস্কৃত ভাষায় ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায়। তন্ত্রশাস্ত্র সংস্কৃতে লিখিত, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে বাঙ্গালা অক্ষরের বর্ণনা আছে। 'কামধেনু-তন্ত্রে' লিখিত আছে—

"অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি ককারতত্ত্ব মুত্তমং।
বামরেখা ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণু র্দক্ষিণরেখিকা॥
অধোরেখা ভবেদ্ রুদ্রো মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী।
কুণ্ডলী অঙ্কুশাকারা মধ্যে শূন্যঃ সদাশিবঃ॥
ঊর্দ্ধ কোণে স্থিতা কামা ব্রহ্মশক্তি রিতীরিতা।
বামকোণে স্থিতা জ্যেষ্ঠা বিষ্ণুশক্তি রিতীরিতা
দক্ষকোণে স্থিতা বিন্দু রৌদ্রী সংহারকারিণী।
ত্রিকোণ মেতৎ কথিতম্" ইত্যাদি।

'এক্ষণে আমি ককারের তত্ত্বনিরূপণ করিব। উহার বামরেখা ব্রহ্মা, দক্ষিণরেখা বিষ্ণু, অধোরেখা মহেশ্বর, মাত্রা সরস্বতী, অঙ্কুশাকারা অর্থাৎ আকুঁড়ি কুণ্ডলীনামক দেবতা এবং মধ্যস্থ শূন্য সদাশিব। ককারের ঊর্দ্ধ-কোণে কামানামে ব্রহ্মশক্তি, বামকোণে জ্যেষ্ঠানামে বিষ্ণুশক্তি এবং দক্ষিণ-কোণে বিন্দু নামে রুদ্রশক্তি অবস্থিতি আছেন। ককার ত্রিকোণ' ইত্যাদি।

এইরূপ বর্ণনা বাঙ্গালা ককার ব্যতিরেকে দেবনাগরের ককারে কখন সঙ্গত হয় না। কারণ উহা (क) ত্রিকোণ নহে। তন্ত্রে অপরাপর বর্ণেরও এইরূপ বিবরণ আছে সুতরাং স্মৃতি ও রামায়ণাদির ন্যায় তন্ত্র-শাস্ত্রকে অতি প্রাচীন কালের গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করিলে বাঙ্গালা অক্ষরও অতি প্রাচীন কালের অক্ষর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তন্ত্রের ভাষা ও বর্ণিত বিষয়াদির পর্য্যালোচনা করিয়া এক্ষণে অনেকেই তন্ত্রকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের গ্রন্থ বলিয়াই বিবেচনা করেন। যাহাই হউক কোন কোন তন্ত্র আধুনিক হইতে পারে, কিন্তু সকল তন্ত্রই যে আধুনিক, তাহা বোধ হয় না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য 'দীক্ষাতত্ত্ব' নামেএকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। দীক্ষা তান্ত্রিক সংস্কার—বৈদিক নহে।

ঐ পুস্তকে তিনি বীরতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। রঘুনন্দন গৌড়ের নবাব হোসেন সাহের (১) সমসাময়িক—অর্থাৎ এক্ষণ হইতে প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, রঘুনন্দনের সময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষ প্রাদুর্ভাব না থাকিলে তিনি 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' মধ্যে দীক্ষাতত্ত্ব লিখিতেন না। আমাদের দেশে—যেখানে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার ছিল না, সেখানে যে অতি অল্পকালের মধ্যেই কোন গ্রন্থ বিশেষরূপে প্রচলিত হইবে, তাহা সম্ভব নহে। অতএব রঘুনন্দনের বহু পূর্ব্বে যে, তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল ও তন্ত্রবর্ণিত বাঙ্গালা অক্ষর বিদ্যমান ছিল, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। *ঐ কামধেনুতন্ত্র যে কত কালের গ্রন্থ তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।*

সুন্দরবনের মৃত্তিকার মধ্য হইতে যে কয়েক খানি তাম্রশাসন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার একখানি (২) আমরা দেখিয়াছি। উহা রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে কোন ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত ভূমির সনন্দপত্রস্বরূপ। ঐ তাম্রসাশন সংস্কৃত পদ্য ও গদ্যে অঙ্কিত। কলিকাতার দক্ষিণ জয়নগরনামক গ্রামের কোন জমীদার উহা পাইয়াছিলেন। উহার অক্ষরসকল অন্যবিধ;—তাহা না দেবনাগর না বাঙ্গালা;—কতকগুলির দেবনাগরের, ও কতকগুলির বাঙ্গালার সহিত সাদৃশ্য আছে। এই সনন্দদাতা লক্ষ্মণসেন যে, বল্লাল সেনেরই পুত্র, তাহা সনন্দেই উল্লিখিত আছে। এই লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল প্রায় ৮০০ বৎসর হইতে চলিল। অতএব বলা যাইতে পারে যে, ঐ সময়েই দেবনাগর হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের উদ্ভব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

দেবনাগর হইতেই যে বাঙ্গালা অক্ষর উদ্ভূত হইয়াছে, * তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অদ্যাপি দেখা যায়—

---

(১) হোসেন সা ১৪৯৮ হইতে ১৫২০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জ্যোতিস্তত্ত্বের "বিষুবং মীনকন্যার্দ্ধে ত্র্যেকাক্ষীন্দ্র শকাব্দকে" এই বচনে যে, ১৪৩১ শকের (১৫০৯ খৃঃ অব্দের) উল্লেখ আছে, তাহাও এ অনুমানের বিসম্বাদী হইতেছে না।

(২) ঐ তাম্রশাসনে লিখিত বিষয়ের প্রতিলিপি পুস্তকের শেষে প্রকাশিত হইল।

* এবিষয়ে আমদের মতামত এই পরিচ্ছেদের শেষে লিখিত হইল।

গ ঘ ঙ ভ থ ন প ম য ম

গ ঘ ঙ ড থ ন প ম য শ

প্রভৃতি বর্ণগুলি উভয় বর্ণমালাতেই প্রায় একরূপ। দেবনাগর ভারতবর্ষের প্রায় সমস্তদেশব্যাপক ও অতিপ্রাচীন বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধ; বাঙ্গালা কেবল এই দেশেই প্রচলিত এবং আধুনিক বলিয়াই উহাকে সকলে জানে, সুতরাং বিপরীত অনুমান সঙ্গত হয় না। এক্ষণকার পুস্তকে মুদ্রিত যে বাঙ্গালা অক্ষর দেখা যায়, তাহা যে প্রাচীনকালের বাঙ্গালাঅক্ষর নহে, তদ্বিষয়ে স্পষ্টই প্রমাণ আছে। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগের গৃহে ৩।৪ শত বৎসরের হস্তলিখিত যে সকল সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অক্ষর সকল এক্ষণকার অক্ষর অপেক্ষা অনেকাংশে বিভিন্ন। সচরাচর ঐ সকল অক্ষরকে তিরুটে' (ত্রিহুটে) অক্ষর বলে। ঐ অক্ষরে দেবনাগরের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। দেবনাগরে অন্তঃস্থ ব ও বর্গীয় ব বিভিন্ন প্রকার; ঐ তিরুটে অক্ষরেও দুই বকারের বিভিন্নতা দেখা যায়—যথা অন্তঃস্থ বকার (র) এইরূপ, বর্গীয় বকার (ব) এইরূপ এবং রকার (ব) এইরূপ। এক্ষণকার বাঙ্গালা বর্ণমালায় বকারদ্বয়ের কিছু মাত্র ভেদ নাই এবং রকার পূর্ব্বকালীন অন্তঃস্থ বকারের সমানাকার হইয়াছে। প্রাচীন রকার যে অধিক দিন ভিন্নবেশ হইয়াছে তাহা নহে। অদ্যাপি পল্লীগ্রামের প্রাচীন গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় 'করপারা ব পেটকাটা' বলিয়া রকার লেখান হইয়া থাকে।

যাহা হউক বাঙ্গালা অক্ষর যে ৮০০ বৎসরেরও পূর্ব্ব হইতে ইহার বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এক প্রকার বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বাঙ্গালাভাষা যে, কোন্ সময়ে ঐরূপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।—ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া কহিয়া থাকেন যে, অতি পূর্ব্বকালে ইরাণ দেশে (প্রাচীন পারস্যে) এক প্রকার ভাষা ছিল, তাহা ইয়ুরোপে যাইয়া রূপান্তর গ্রহণপূর্ব্বক লাটিন, গ্রীক, জর্ম্মন্ প্রভৃতি এবং এসিয়ায় উপস্থিত

হইয়া ঐ প্রকারে সংস্কৃত ও জেন্দ (প্রাচীন পারস্য) ভাষার উৎপাদন করিয়াছে। উক্ত সমুদায় ভাষাকে এক্ষণে সাধারণতঃ এরিয়ান্ অর্থাৎ আর্য্যভাষা কহে। আর্য্যভাষাসকলের বর্ণমালা, উচ্চারণ, প্রকৃতি, প্রত্যয়, বিভক্তি, বচন, ধাতু, উপসর্গ প্রভৃতির অনেকাংশে সুন্দররূপ সৌসাদৃশ্য আছে—এরূপ সৌসাদৃশ্য যে, অনেক স্থলে বোধহয় যে, একই কথা কেবল ভিন্ন ভিন্ন রূপে উচ্চারিত হয় বলিয়াই কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ শুনায়। প্রফেসর্ বপ্, মাক্স মূলর, মিউর্ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ ভূরি ভূরি প্রমাণসহকৃত বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়া এবিষয়ের মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তদ্বিষয়ে আর বাগাড়ম্বর না করিয়া কেবল উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি আর্য্যভাষার একবিধ কথা নিম্নভাগে প্রদর্শন করিলাম।

সংস্কৃত।	জেন্দ্।	গ্রীক্।	লাটিন্।	সংস্কৃত।	জেন্দ্।	গ্রীক্।	লাটিন্।
প্রথমা	ফ্রাথিমা	প্রোতা	প্রাইমা	নামন্	নাম	অনমা	নোমেন্
দ্বিতীয়া	বিত্যা	দিউতেরা	„	মাতৃ	মাদর্	মাতর্	মাতর্
তৃতীয়া	থ্রিত্যা	ত্রিতা	„	পিতৃ	পদর্	পাতর্	পাতর্
ষষ্ঠী	„	হেক্তা	সেক্ষ্টা	ভ্রাতৃ	ব্রদার্	ফ্রাতিয়া	ফ্রাতর্
সপ্তমী	হপ্তমা	হেব্দমা	সেপ্তিমা	দুহিতৃ	দোখ্তর	থুগাতর্	„
অহম্	আজেম্	„	„	দ্বি	দো	দুও	দুও
ত্বম্	তুম্	„	তু	পঞ্চন্	পঞ্জ	পেন্‌চি	„
দন্তম্	„	অদন্ত	দেন্তেম্	দশন্	„	দেকা	দেশেম্
নক্তম্	„	নক্তম্	নক্তম্	ইত্যাদি—ইত্যাদি			

এই সমস্ত ভাষাকে প্রধানভাষা অথবা ইংরাজিতে ক্লাসিকাল লাঙ্গোএজ্ কহে। ইংরাজি স্বয়ং classical নহে। উহা লাটিন, গ্রীক, সাক্সন প্রভৃতি নানা ভাষার সহযোগে উৎপন্ন হওয়ায় অপ্রধান ভাষা মধ্যে পরিগণিত। নিম্নলিখিত কয়েকটী উদাহরণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে যে, উহাতেও সংস্কৃতসম শব্দের বহুল অন্তর্নিবেশ আছে—যথা

সংস্কৃত	ইংরাজি		সংস্কৃত	ইংরাজি	
স্থা	ষ্টে	Stay.	ঘাস	গ্রাস্	Grass.
গো	কৌ	Cow.	উপরি	অপর্	Upper.
উক্ষা	অক্‌স	Ox.	দ্বিবাদ	ডিবেট্	Debate.
কেন্দ্র	সেণ্ট্র	Centre.	রূঢ়	রুড্	Rude.
ত্রিপদী	ত্রিপদ্	Triped.	অন্তর্	ইণ্টর্	Inter.
হোরা	আউয়ার	Hour.	জ্ঞা	(ক্না) নো	Know.
মানব	মান্	Man.	সর্প	সর্পেণ্ট	Serpent.
নস্	নোস্	Nose.	অক্ষ	অক্‌জিল্	Axle.
ত্রিকোণ	ত্রিগণ্	Trigon.	দ্বার	ডোর্	Door.
দ্বৈধ	ডাউট্	Doubt.	মূষা	মৌস্	Mouse.
স্বস্থ	সিষ্টর্	Sister.	অন্ত্র	এণ্ট্র্ল্স্	Entrails.
দ্বিপদ	বাইপদ্	Biped.	পথ	পাথ্	Path.
নাভি	নেভেল্	Navel.	উলূক	আউল	Owl.
নাবী	নেবি	Navy.			&c &c.
নূ	নিউ	New.			

কোরাইওলেনস্, রোমিয়স্, জুলিয়স্, ব্রুটস্ ইত্যাদি স্থলে শেষে যে স্‌কার দৃষ্ট হয়, অনেকে কহেন উহা সংস্কৃতের প্রথমাবিভক্তির একবচন নিষ্পন্ন পদের অন্তভাগের অনুরূপ; অর্থাৎ সংস্কৃতে অকারান্ত শব্দের প্রথমাবিভক্তির একবচনে স্‌কার আগম হয়—যথা রাম শব্দে 'রামস্; পরে ঐ সকার বিসর্গ হইয়া 'রামঃ' হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের মতে কোরাইওলেন, রোমিয়, জুলিয় ও ব্রুট ইত্যাদি অকারান্ত শব্দই প্রথমে ছিল; পরে উহা প্রথমা-বিভক্তিযুক্ত হইয়া ঐরূপ সকারান্ত হইয়াছে এবং কালক্রমে সেই প্রথমান্তপদ-সকলই শব্দরূপে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে। যাহাহউক, এ সকল দুর্ব্বিগাহ বিষয়ে অবগাহন চেষ্টা ত্যাগ করিয়া এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

৪ অনেকে কহিয়া থাকেন যে, ঐ সংস্কৃতভাষা বাঙ্গালার জননী—অর্থাৎ

পূর্ব্বোল্লিখিত সংস্কৃত হইতেই বাঙ্গালাভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের তাহা বোধ হয় না;—আমাদের বোধে বাঙ্গালা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নহে, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে। সংস্কৃত গ্রন্থগণের মধ্যে বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত। বেদের সংস্কৃত এক্ষণে আমাদের নিকট দুরূহ ও দুরুচ্চার্য্য বলিয়া বোধ হয়। বেদরচনার বহুকাল পরে রামায়ণ, মহাভারত, তন্ত্র, পুরাণ ও কাব্যাদি অপেক্ষাকৃত সুখোচ্চার্য্য ও সুকোমল ভাষায় ক্রমশঃ রচিত হইয়াছে। এমন কি পশ্চাল্লিখিত গ্রন্থসকলের ভাষা ও বেদের ভাষা এরূপ বিভিন্ন যে আপাতমাত্র উহাকে যেন একভাষা বলিয়াই বোধ হয় না। এক্ষণকার প্রচলিত সাহিত্যশাস্ত্রে অধ্যয়ন করিয়া বেদের ভাষাবোধে সম্যক্ অধিকারী হওয়া যায় না। প্রাচীন পাণিনীয় ব্যাকরণে বেদভাষাবোধার্থ 'বৈদিকপ্রক্রিয়া' নামে একটি পৃথক প্রকরণ আছে। বর্ত্তমানকালে বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনাদির তাদৃশ চর্চ্চা না থাকায় উহা সচরাচর অধীত হয় না এবং আধুনিক ব্যাকরণসমূহে ঐ ভাগ একবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। মুগ্ধবোধকার বোপদেবগোস্বামী সর্ব্বশেষে একটি সূত্র দিয়াছেন—

"বহুলং ব্রহ্মণি"

"যদিদং লৌকিকপ্রয়োগব্যুৎপত্তয়ে লক্ষণ মুক্তং তদ্বৈদিক প্রয়োগ ব্যুৎপত্তৌ বহুলং জ্ঞেয়ং; ক্বচিদ্বিহিতং নস্যাৎ, ক্বচিন্নিষিদ্ধং স্যাৎ, ক্বচিদ্বাস্যাৎ ক্বচিত্ততোঽন্যস্যাপীত্যর্থঃ—পূর্ব্বেভিঃ ব্রাহ্মণাস্ ইত্যাদৌ বেদসিদ্ধেঃ।"

লৌকিক প্রয়োগসিদ্ধির নিমিত্ত যে সকল সূত্র কথিত হইল, বৈদিক-প্রয়োগে তত্তৎ সূত্রের অনেক বিপরীত কার্য্যও সম্পাদিত হইবে—অর্থাৎ কোন স্থলে বিহিত কার্য্যও হইবে না—কোন স্থলে নিষিদ্ধ কার্য্যও হইবে—কোন স্থলে বিকল্পে হইবে ইত্যাদি—যথ—পূর্ব্ব শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে 'পূর্ব্বৈঃ' না হইয়া 'পূর্ব্বেভিঃ'; ব্রাহ্মণ শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'ব্রাহ্মণাঃ' না হইয়া 'ব্রাহ্মণাস্' ইত্যাদি—

যাহা হউক আমাদিগের বোধ হইতেছে যে, বেদের ভাষা কালক্রমে

পরিবর্ত্তিত হওয়ায় যেরূপ পুরাণাদির কোমলতর সংস্কৃত জন্মিয়াছিল, সেইরূপ পুরাণাদির সংস্কৃতও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত এবং স্থল বিশেষে ভারতবর্ষের আদিম নিবাসিগণের ভাষার সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া সহজতর প্রাকৃতভাষার আকারে পরিণত হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই স্পষ্ট বোধ হইবে যে, উক্ত উভয় ভাষা সর্ব্বাংশে অবিকল একরূপ। অর্থাৎ—ঐ দুই ভাষার কারক, বিভক্তি, ক্রিয়া, রচনাপ্রণালী প্রভৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই, কেবল স্থানে স্থানে শব্দবিশেষের বর্ণগত কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। যথা—প্রতিকূলঃ = পড়িউলঃ; রাজা = রাআ; চন্দ্রম্ = চন্দম্; ভবন্তি = হোন্তি ইত্যাদি— *

হেমচন্দ্র নামক প্রাচীনপণ্ডিত প্রাকৃত শব্দের এই অর্থ করেন—

প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্, তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতং সংস্কৃতমূলকমিত্যর্থঃ।

'সংস্কৃত প্রকৃতি অর্থাৎ মূল, তাহা হইতে উৎপন্ন এই অর্থে প্রাকৃত—অর্থাৎ 'সংস্কৃতমূলক'। কিন্তু এ অর্থ আমাদিগের সম্যক্ প্রীতিকর হয় না। আমাদের বোধ হয়, সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ (Refined) এবং প্রাকৃত শব্দের অর্থ সাধারণ (Common)। * সংস্কৃত আমাদিগের আর্য্যপুরুষদিগেরই চলিত ভাষা ছিল। তাঁহাদিগের সহিত ভারতবর্ষের আদিমনিবাসীদিগের যেমন সংস্রব বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বিশুদ্ধ সংস্কৃতেরও তেমনই রূপান্তরতা ঘটিতে আরম্ভ হইল। সেই রূপান্তরিত ভাষা সাধারণ বা প্রাকৃত লোকের বলিয়াই উহার নাম প্রাকৃত হইল। প্রাকৃত যেরূপই হউক উহার গ্রন্থনের সূত্র সমুদয় সংস্কৃতেরই অনুরূপ হইল।

কৃতবিদ্য ও সাধারণ লোকদিগের ভাষা যে অনেকাংশে বিভিন্ন হয়, তাহার প্রামাণ্যার্থ অন্যত্র যাইতে হইবে না—আমাদিগের নিজের ভাষা, আমাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের ও প্রতিবেশী ইতর জাতীয়দিগের ভাষার প্রতি অভিবেশসহকারে কর্ণপাত করিয়া তুলনা করিয়া দেখিলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ঐ সকল ভাষার বাস্তবিক স্বরাদিগত অনেক বৈলক্ষণ্য আছে—কেবল নিয়তশ্রবণজন্য অভ্যাসবশতঃ আমাদিগের তাহা

বুঝিতে ক্লেশবোধ হয় না।* সংস্কৃত নাটকেও অবিকল এই ব্যবহার দৃষ্ট হয়—যেখানে রাজা, মন্ত্রী, তপস্বী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পুরুষেরা সংস্কৃতে বাক্যালাপ করেন, সেই স্থলেই তপস্বিনী ভিন্ন স্ত্রীজাতি ও ভৃত্য প্রভৃতি সাধারণ লোকেরা স্ব স্ব পদোচিত প্রাকৃতভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

সংস্কৃত যেরূপ অতিপ্রাচীন বলিয়া প্রথিত, প্রাকৃত তাহা নহে। পাণিনীয়াদি প্রাচীন ব্যাকরণে প্রাকৃতের উল্লেখমাত্রও নাই। ইহাতে বোধ হয় তৎকালে উহাতে গ্রন্থাদি রচিত হইতে আরম্ভ হয় নাই। পরে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে, গ্রন্থাদিপ্রণয়ন আরম্ভ হইলে উহার ব্যাকরণেরও সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। বররুচি, শাকল্য, ভরত, কোহল, বৎসরাজ, মার্কণ্ডেয়, ক্রমদীশ্বর প্রভৃতি অনেকানেক মহোদয় কর্ত্তৃক প্রাকৃতব্যাকরণ বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে বররুচি কৃত 'প্রাকৃতপ্রকাশ'কেই সর্ব্ব প্রথম প্রাকৃতব্যাকরণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। যেরূপ প্রসিদ্ধি, তাহাতে বররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের বয়ঃক্রম প্রায় ১৯৬০ বৎসর হইল। সুতরাং প্রাকৃতপ্রকাশ যদি ঐ সময়ে রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বহুকাল পূর্ব্বে যে প্রাকৃতভাষায় গ্রন্থাদি প্রচার হইয়াছিল, একথা বলা যাইতে পারে। খৃষ্টের প্রায় ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধরাজ অশোকের অধিকারকালে অন্তিওকস্ প্রভৃতি যে গ্রীক্ রাজাদিগের বিবরণ প্রস্তরাঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার ভাষাও এক প্রকার প্রাকৃত—অতএব তদ্দ্বারা বিলক্ষণ অনুমান হইতে পারে যে, তৎকালে প্রাকৃতভাষাই দেশমধ্যে সাধারণ্যে চলিত ভাষা ছিল, এবং তাহা হইলেই উহা যে, প্রদেশভেদে মহারাষ্ট্রী, মাগধী, শৌরসেনী, পৈশাচী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিবে, তাহা বিলক্ষণ সম্ভব বোধ হয়। বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র যে মাগধী* বা 'পালী' ভাষায় লিখিত, উহাও একপ্রকার প্রাকৃত।

---

* বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব কালে ভারতে মগধরাজ্যের অত্যন্ত প্রাধান্য ছিল। মহারাজ অশোক প্রভৃতি এই মগধ সাম্রাজ্যেরই অধীশ্বর ছিলেন। মগধ সাম্রাজ্যের প্রচলিত ভাষার নাম 'মাগধী'।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঐ ভাষা প্রথমে পল্লীগ্রামের লোককর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া ছিল, এজন্য উহার নাম 'পালী'* হইয়াছে।

সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত অনেক সহজ। সংস্কৃতে ষত্ব ণত্বের যে এক দুরূহ কাণ্ড আছে. প্রাকৃতে সে ব্যাপার কিছুমাত্র নাই—প্রাকৃতে সর্ব্বস্থলেই (সাধারণতঃ) এক দন্ত্য সকার, এক মূর্দ্ধন্য ণকার এবং এক বর্গীয় জকার প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আধুনিক অপরাপর ভাষার ন্যায় প্রাকৃতেও দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই—কেবল একবচন ও বহুবচন। সুতরাং ইহার রচনাপ্রণালী সহজতর; এবং এই ভাষা যে সুখগ্রাহ্য অর্থাৎ অনায়াসবোধ্য, তাহা মহাকবি কালিদাস নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বারা অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন—

দ্বিধাপ্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব।
সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং বধূং সুখগ্রাহ্যনিবন্ধনেন॥ কুমারসম্ভব ৭ম সর্গ।

'সরস্বতী দুইপ্রকার পদাবলী দ্বারা হরপার্ব্বতীর স্তব আরম্ভ করিলেন;—সংস্কৃত দ্বারা হরের এবং সুখগ্রাহ্যনিবন্ধন অর্থাৎ প্রাকৃত দ্বারা পার্ব্বতীর।'

এক্ষণে আমাদের প্রকৃত বক্তব্য বিষয় এই যে, পূর্ব্ববর্ণিতরূপ প্রাকৃত ভাষাই বাঙ্গালার জননী; সংস্কৃত উহার জননী নহেন—কিন্তু মাতামহী। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভাষা জনসাধারণের ব্যবহার্য্য হইতে হইতেই তাহার রূপান্তরতা ঘটিতে থাকে। রূপান্তরতা-সঙ্ঘটন নানাপ্রকারে হয়। তন্মধ্যে ভাষাগত সংযুক্ত শব্দ সকলের শিথিলতা সম্পাদনদ্বারা এক প্রকার রূপান্তরতা ঘটে। ঐ শিথিলতাকরণও দুইপ্রকারে সম্পন্ন হয়—এক প্রকার সম্প্রসারণ, দ্বিতীয়প্রকার বিপ্রকর্ষণ। নদ্যাদি শব্দের সন্ধিচ্ছেদ করিয়া 'নদী আদি' করাকে সম্প্রসারণ এবং 'ধর্ম্ম' শব্দের সংযুক্ত বর্ণের বিশ্লেষ করিয়া 'ধরম' করাকে বিপ্রকর্ষণ কহে। এই সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণ প্রক্রিয়া দ্বারা দুরুচ্চার্য্য শব্দ সকলের সুখোচ্চার্য্যতা সম্পাদিত হয়—নিম্নলিখিত শব্দ-

* পালী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মত প্রচলিত আছে, বিশ্বকোষ অভিধান, একাদশ ভাগ ৩২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—'পালী' শব্দের অর্থ 'ধর্ম্মগ্রন্থ' বা 'ধর্ম্মানুশাসন'। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মানুশাসন যে ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তাহাই 'পালী' ভাষা।

গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা উৎপন্ন হইবার সময়ে অনেক স্থলেই যে, সেই ক্রিয়া বিলক্ষণরূপে ঘটিয়াছিল তাহা স্পষ্ট বোধ হইবে—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা	সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা
ত্বম্	তুমম্	তুমি	বিদ্যুৎ	বিজ্জুলী	বিজলী
অহম্	অহম্মি	আমি	দংষ্ট্রা	দাঢ়া	দাড়া
লবণ	লোণ	লুন	বহিঃ	বাহির	বাহির
প্রস্তর	পত্থর	পাথর	বধূ	বহূ	বহু—বৌ
শ্মশান	মসাণ	মশান	চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ
গৃহ	ঘর	ঘর	মধ্য	মজ্ঝ	মাঝ্
স্তম্ভ	থম্ভ	থাম্বা	বৃদ্ধ	বুড্‌ঢ	বুড়া
চক্র	চক্ক	চাক বা চাকা	জ্যেষ্ঠ	জেট্‌ঠ	জেঠা
কার্য্য	কজ্জ	কাজ	ভক্ত	ভত্ত	ভাৎ
অদ্য	অজ্জ	আজ	স্নান	হ্নাণ	নাহা
মিথ্যা	মিচ্ছা	মিছা	সন্ধ্যা	সঞ্‌ঝা	সাঁঝ্
বৎস	বচ্ছ	বাছা	উপাধ্যায়	উবজ্‌ঝাঅ	ওঝা
কার্ষাপণ	কাহাবণ	কাহণ	যষ্টি	লট্‌ঠী	লাঠী
হস্ত	হত্থ	হাত			ইত্যাদি।

ভাষার পরিবর্ত্তনসময়ে যে, পূর্ব্বোক্তরূপ সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণ কার্য্যই কেবল হইয়া থাকে তাহা নহে; অনেক স্থলে নূতন বর্ণের আগম—কোন স্থলে বর্ণবিশেষের লোপ এবং স্থলবিশেষে কোন কোন বর্ণের অন্যথাভাবও হইয়া থাকে। উপরিপ্রদর্শিত শব্দসকলের মধ্যেই ইহার উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত উৎপন্ন হইবার যেরূপ প্রণালীবদ্ধ নিয়মপদ্ধতি পাওয়া যায়, প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা উৎপন্ন হইবার সেরূপ নিয়মাদি কিছুই পাওয়া যায় না। সুতরাং কি প্রণালীতে ও কি ক্রমে প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা হইয়াছে, তাহা নিরূপণকরা অতি দুরূহ ব্যাপার। বোধহয় কেবল প্রাকৃতই বর্ত্তমান বাঙ্গালার উপাদান নহে। দেশভেদে ভাষাভেদ হইয়া

থাকে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ভাষাভেদকে দেশভেদেরই লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

বাচো যত্র বিভিদ্যন্তে গিরির্ব্বা ব্যবধায়কঃ।

মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তরমুচ্যতে॥ উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহন্মনুবচন।

"যেদেশে ভাষার বিভিন্নতা হয়—গিরি বা মহানদী যাহাতে ব্যবধান থাকে, তাহাকে দেশান্তর কহা যায়।" সুতরাং যৎকালে বঙ্গদেশে কোনরূপ প্রাকৃতভাষা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তৎকালে এদেশে যে একটি আদিমভাষা ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধ হয় সেই ভাষার সহিত প্রাকৃতভাষার সর্ব্বতোভাবে মিশ্রণ হওয়ায় এই বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। অদ্যাপি এই ভাষায় ঢেঁকি, কুলা, ধুচুনি প্রভৃতি এমত কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় যে, সে সকল না প্রাকৃত, না সংস্কৃত, না পারসী, না আরবী। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালার ক্রিয়া, কারক, বিভক্তি প্রভৃতি এ প্রকার ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইহাকে কোন মতেই কেবল প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত, একথা বলিতে পারা যায় না—অবশ্যই ভাষান্তরসহকৃত প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্বীকার করিতে হয়। এক ভাষা কিরূপে ও কি প্রণালীতে ভাষান্তরে পরিণতা হয়, তাহা নিরূপণ করিবার উৎকৃষ্ট উপায় ঐ ভাষার প্রাচীন গ্রন্থ পরম্পরা। কিন্তু বাঙ্গালার মূলে যে আদিম ভাষা ছিল, তাহার কথা দূরে থাকুক, বাঙ্গালা ভাষারই অতি প্রাচীন গ্রন্থ একখানিও পাওয়া যায় না। ইহার কারণ এই বোধ হয় যে, পূর্ব্বকাল হইতে সংস্কৃত দেবভাষা বলিয়া সাধারণের পরমশ্রদ্ধাস্পদ হইয়া আছে। সংস্কৃতভিন্ন অপর ভাষাকে লোকে কেবল ব্যবহারিকভাষা বলিয়া বোধ করিত; বিদ্যানুশীলনও পূর্ব্বে সাধারণতঃ এরূপ প্রবলপ্রচার ছিল না। সুতরাং যাঁহারা তৎকালে বিদ্যালাভ করিতেন এবং যাঁহাদের গ্রন্থাদিরচনা করিবার সামর্থ্য জন্মিত, তাঁহারা সেই শক্তি সংস্কৃতগ্রন্থরচনে প্রযুক্ত করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিতেন; সুতরাং কৃতবিদ্যদিগের কর্ত্তৃক বাঙ্গালা অনাদৃত ও উপেক্ষিত হওয়ায় বহুকাল-পর্য্যন্ত ইহার বিলক্ষণ দুরবস্থা ছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলী

ও জীবগোস্বামীর করচা প্রভৃতি যাহা বাঙ্গালার প্রাচীন পুস্তক বলিয়া পরিচিত, তাহাও ৫ শত বৎসরের অধিক পূর্ব্বের নহে; সুতরাং তদ্দ্বারা ভাষার মূলানুসন্ধান হওয়া অসম্ভব। যাহাহউক ওরূপ অশক্য ব্যাপারে অধ্যবসায় ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার ক্রিয়া, কারকাদি যেরূপে প্রযুক্ত হয় এবং সে সকল যেরূপে উৎপন্ন বলিয়া আমাদের প্রতীতি জন্মিয়াছে, কেবল তদ্বিষয়ের কয়েকটি স্থূল স্থূল কথা বলিয়া আমরা এ প্রকরণ পরিত্যাগ করিব।

সন্ধি—সংস্কৃতে যেরূপ পদদ্বয়ের অন্ত্য ও আদ্যবর্ণের পরস্পর মিলন হইয়া সন্ধি হয়, বাঙ্গালাতেও অবিকল সেইরূপ সন্ধির ব্যবহার আছে; সুতরাং এ অংশে বাঙ্গালা সংস্কৃতের সম্পূর্ণরূপ অনুকারক। তবে কোন কোন প্রযোক্তা স্থলবিশেষে ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্ধি করেন না এবং তাহা না করাতেও বিশেষ দোষ হয় না।

সমাস—সমাসও সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালাতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লিঙ্গ—সংস্কৃতে যে শব্দ যে লিঙ্গ, বাঙ্গালাতেও সেই শব্দকে সেই লিঙ্গ বলিয়াই ব্যবহার করা হইতেছে। তবে যে স্থলে শুনিতে কদর্য্যবোধ হয়, কেবল সেই স্থলেই লিঙ্গসূচক চিহ্নাদি দেওয়া হয় না।

কারক ও বিভক্তি—সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালাতেও কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অপাদান, সম্প্রদান, অধিকরণ এই ছয় কারক ও সম্বন্ধপদ আছে এবং সেই সকল স্থলে যথাযথ প্রথমাদি বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় দ্বিবচন নাই; কেবল একবচন ও বহুবচনের বিভক্তি যোগ হইয়া বাঙ্গালাপদ সম্পন্ন হয়। এই সকল বিভক্তির আকার কিছু ভিন্নরূপ। কর্ত্তায় 'রা', এরা, কর্ম্মে 'কে' 'দিগকে' 'রে', করণে 'দ্বারা' 'দিয়া', অপাদানে 'হইতে', অধিকরণে 'তে' ও সম্বন্ধে 'র' 'এর' 'দিগের' প্রভৃতি যোগ হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল বিভক্তির চিহ্ন যে, কোথা হইতে আসিল তাহা ঠিক বলা যায় না।

'দ্বারা ও 'দিয়া' * এদুইটি করণ-কারক চিহ্ন যে সংস্কৃত হইতেই আসিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। অধিকরণের 'এ' চিহ্ন ও সংস্কৃত-মূলক এবং ঐ 'এ'

* দ্বারা শব্দ সংস্কৃত দ্বার শব্দ হইতে আগত, উহা কথিত ভাষায় 'দিয়া'তে পরিণত।

চিহ্নই স্থল ভেদে উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ 'তে' হইয়া যায়। কর্ত্তৃপদচিহ্ন 'রা' এবং সম্বন্ধের চিহ্ন 'র' কোন অনার্য্য আদিম-ভাষা হইতেই সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ কহেন অনেক অনার্য্য ভাষায় 'আর' শব্দে পুরুষ বুঝায়—পুরুষেরা প্রধান বা কর্ত্তা বা অধিকারী। ঐ 'আর' হইতেই কি কর্ত্তার 'রা' বা 'এরা' বিভক্তির উৎপত্তি এবং উহা হইতেই কি অধিকারি-বোধনার্থ সম্বন্ধ চিহ্ন 'র' এর উদ্ভব হইয়াছে? সংস্কৃত সুবন্তপদে উপান্তিমবর্ণের পূর্ব্বে 'অক' হইবার নিয়ম আছে যথা, রামঃ=রামকঃ, ত্বাং=ত্বকাং, মাং=মকাং, যং=যকম্, দরিদ্রং=দরিদ্রকম্ ইত্যাদি। ঐ অকযুক্ত সংস্কৃত বা প্রাকৃত পদ হইতে বাঙ্গালার কর্ম্ম ও সম্প্রদান বিভক্তির চিহ্ন 'কে'র উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব বোধ হয় না। অকারান্ত শব্দের সংস্কৃত পঞ্চম্যন্ত পদ 'আৎ' ভাগান্ত এবং সকল প্রকার শব্দেরই ঐ পদ 'তস্' ভাগান্ত হয়। যথা রামাৎ—রামতঃ, হরিতঃ ইত্যাদি। ঐ 'আৎ' বা 'তস্' ভাগ হইতেই বহু পরিবর্ত্তনে বাঙ্গালার অপাদান কারক চিহ্ন 'হইতে'র উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হইতেও পারে।

ধাতু ও ক্রিয়া=বাঙ্গালায় যে সকল ক্রিয়াপদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ধাতু সকল প্রায় সমস্তই সংস্কৃত-মূলক। সেই সংস্কৃত ধাতুহইতে প্রাকৃত-ভাষায় যে ক্রিয়া জন্মে, সেই ক্রিয়া অপভ্রংশিত হইয়া বাঙ্গালাক্রিয়াপদের উৎপাদন করিয়াছে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ইহার প্রমাণ জন্য কতকগুলি সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ প্রদর্শিত হইতেছে—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা-ক্রিয়া	সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা-ক্রিয়া
ভবতি	হোই	হয়	কথয়তি	কহই	কহে
করোতি	করই	করে	অস্তি	অচ্ছি	আছে
বক্তি	বোলই	বলে	ক্ষিপতি	ফেলদি	ফেলে
ক্রীণাতি	কিণই	কেনে	পঠতি	পঢ়ই	পড়ে
বর্দ্ধতে	বড্ঢই	বাড়ে	পততি	পড়ই	পড়ে
স্মরতি	সুমরদি	সুমরে	মৃদ্নাতি	মলদি	মলে
নৃত্যতি	ণচ্চই	নাচে			ইত্যাদি।

উপরিপ্রদর্শিত পদগুলির প্রতি অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, 'হোই' প্রভৃতি প্রাকৃত ক্রিয়া হইতেই 'হয়' প্রভৃতি বাঙ্গালাক্রিয়ার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয় যে, 'হইতেছে' প্রভৃতিক্রিয়া একমাত্র ভূ ধাতু হইতে উৎপন্ন নহে, কিন্তু ভূ ও অস্ এই উভয় ধাতুর যোগে উৎপন্ন। অস্ ধাতুর সংস্কৃত ক্রিয়া 'অস্তি' হইতে ক্রমশঃ বাঙ্গালায় 'আছে' হইয়াছে। পরে ভূ ধাতুর অসমাপিকাক্রিয়া 'হইতে' ও অস্ ধাতুর সমাপিকাক্রিয়া 'আছে' এই দুই ক্রিয়া একত্র মিলিত হইয়া ও 'আছে' র আকারের লোপ হইয়া 'হইতেছে' ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। 'দেখিতেছে' 'করিতেছে' 'কিনিতেছে' এবং 'হইয়াছে' 'দেখিয়াছে' 'করিয়াছে' ইত্যাদি স্থলেও বোধ হয় ঐরূপ প্রক্রিয়া হইয়া থাকিবে। অস্ ধাতুর অতীতকালিকা সংস্কৃতক্রিয়া 'আসীৎ' হইতে বোধ হয় বাঙ্গালায় 'আছিল,' ক্রিয়া জন্মিয়াছে। প্রাচীন পুস্তকে 'আছিল' ক্রিয়ার অনেক প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

'যখন্ আছিল সব ঘোর অন্ধকার' (জীবগোস্বামীর করচা)।
'আছিল দেউল এক পর্ব্বতপ্রমাণ' (শুভঙ্করের আর্য্যা)।

এক্ষণে আর কলিকাতার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে 'আছিল' ক্রিয়ার প্রয়োগ নাই; তৎপরিবর্ত্তে 'ছিল' হইরাছে। বোধহয় 'হইয়া' ও 'আছিল' এই দুইক্রিয়ার যোগে 'হইয়াছিল' ক্রিয়ার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। 'করিয়াছিল' 'দেখিয়াছিল' প্রভৃতি স্থলে এবং 'হইতেছিল' 'করিতেছিল' ইত্যাদি স্থলেও ঐরূপ প্রক্রিয়া হইয়াছে বলাযাইতেপারে। 'হউক' 'করিল' 'দেখিবে' 'কিনিতাম' ইত্যাদি অন্যান্য যে সকল ক্রিয়াপদ আছে, তৎসমস্তের মূলাকর্ষণ করিতে পারা যাউক বা না যাউক কিন্তু সকলই যে, ঐরূপ সংস্কৃতমূলক কোন না কোন ধাতু বা ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র সমাপিকাক্রিয়া অল্প আছে। অনেক স্থলে ভাবক্রিয়াকে কর্ম্মপদ ও কৃ ধাতুর ক্রিয়াকে সমাপিকাক্রিয়াপদ করিয়া বাক্য নিষ্পন্ন করা যায়। যথা, গমন করিতেছে, ভক্ষণ করিয়াছে, ক্রীড়া করিয়াছিল, বধ করিব ইত্যাদি। ক্রিয়াপদের এইরূপ অপর্য্যাপ্ততা ভাষার পক্ষে সুবিধা

নহে। বাঙ্গালার এই অসুবিধা অনেকেই সময়ে সময়ে বিলক্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে 'হইতে' 'হইয়া' প্রভৃতি যে সকল অসমাপিকা ক্রিয়ার কথা উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে বোধ হয় 'হইতে' নিমিত্তার্থক তুমন্ত 'ভবিতুং' বা 'হোত্থং' হইতে এবং 'হইয়া' অনন্তরার্থক ক্ত্বাজন্ত 'ভূত্বা' বা 'ভবিঅ' হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দেখিতে, দেখিয়া; করিতে, করিয়া ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়াকেও ঐরূপে উৎপন্ন বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ ক্ত্বাজন্ত পদগুলির প্রাকৃত যাহা হয়, অনেক স্থলেই তাহা হইতে বাঙ্গালা করা (প্রধানতঃ) কেবল এক আকারযোগে নিষ্পন্ন হয়। যথা করিঅ—করিয়া, মিলিঅ—মিলিয়া, শুনিঅ—শুনিয়া, ভণিঅ—ভণিয়া ইত্যাদি।

যাহা হউক, এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলা গেল, তদ্দারা ইহা প্রতিপন্ন হইয়া থাকিবে, অথবা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে যে বাঙ্গালা-ভাষা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ও সমধিক পরিমাণে প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত; কিন্তু প্রাকৃতের উপাদান, উপকরণ প্রভৃতি প্রায় সমুদয়ই সংস্কৃত, সুতরাং বাঙ্গালাও পরম্পরা-সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃত-মূলক। ইহা যেরূপ প্রণালীতে ও যেরূপ ক্রমে সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে, তাহাও সঙ্ক্ষেপতঃ কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইল। পরে কালক্রমে ইহার যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাও যথাযোগ্যস্থলে ক্রমশঃ উল্লেখ করিবার চেষ্টা করা যাইবে।

বঙ্গলিপির উৎপত্তি।*

'ললিত-বিস্তর' নামক বৌদ্ধগ্রন্থের দশম অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, বুদ্ধদেব তাঁহার অধ্যাপক বিশ্বামিত্রের নিকট লিপিশিক্ষাকালে জিজ্ঞাসা করিতেছেন আপনি কোন্ লিপিতে শিক্ষা দিবেন? ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, পুষ্করসারী, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধলিপি প্রভৃতি চৌষট্টি লিপির মধ্যে কোন্ লিপির

---

* এই গ্রন্থের চতুর্থ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিক্ষা দিবেন? এই চৌষট্টি লিপিসম্বন্ধে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র * বলেন 'The sixtyfour names may be classed under four heads, viz, first referring to particular countries, 2nd to particular tribes or classes, 3rd implying peculiarities in the configuration of the letters, 4th cryptic or imaginative forms. Under the first head may be reckoned the writings of Anga, Banga, Kalinga and these probably imply certain *then* existing and current forms of writing'। অর্থাৎ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে তৎকালে বঙ্গদেশে কোন এক লিপি প্রচলিত ছিল, তাহা এক্ষণে চলিত নাই। বর্ত্তমানকালের বাঙ্গালালিপি যে তখন প্রচলিত ছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই এবং সে লিপিও যে কি ছিল তাহার কোন নিদর্শন নাই।

ডাঃ বর্ণেল সাহেব বলেন †

'The word Na'ga(ri) first occurs, it seems as the name of an Alphabet in the Lalitavistara, a life of Buddha that is in its original form perhaps two thousand years old; but as it exists in Sanskrit and Tibetan, it would be very unsafe to put it at an earlier date than about the seventh century A. D. The Tibetan version (of which Prof. Foucaux has published a most excellent edition and translation) was made in the ninth century by three natives of India named Jinamitra, Da'nasila and Munivarma' with the assistance of a Tibetan Lotsava named Bandeye-ses-sdes; this fact is stated in the Tibetan index to the great collection called Bkah-hgyur (Kandjur) in the description of the work in question (Rgya-tcher-rol-pa i.e. Lalitavistara), and is to be found on p. 16 (No. 95) of this index as reprinted at St. Petersburg. Na'ga(ri) occurs

* Dr. Rajendralala Mitra's 'Lalitavistara', Ch X, P. 189.

† Dr. Burnell's South Indian Palæography, P. 52, note 2.

as the name of an alphabet in Ch. X (v. p. 113 of vol. I of Prof. Foucaux's edition) which describes how the young prince, afterwards known as Buddha, was taken to a school and completely posed the pedagogue. Sixty-four alphabets are mentioned some of which are, no doubt, mythical, but others are real (e. g. Dra´vida, Anga and Banga), though it is against all the evidence of the inscriptions that they existed as distinct alphabets before the ninth or tenth century A. D. If therefore the framework of the Lalitavistara be old, this passage is certainly an interpolation, though very valuable evidence regarding the ninth century A. D. The Tibetan text has here the ordinary name (in that language) of the Na'gari character—'Klu-i-yege' (as a translation of the Sanskrit, "Na´galipi") and this is also literally "writing of the Na´gas." [ললিতবিস্তরের দশম অধ্যায়ে বর্ণিত চৌষট্টি লিপির মধ্যে ইহা ষড়্‌বিংশলিপি] It is evident, therefore, what the natives of India understood Na'galipi or Na'gari to mean in the 9th century A. D. and it only remains to be seen if this derivation is possible. I think this question must be answered in the affirmative as not only Pra'krit but also Sanskrit words exist which are formed in the same way." ডাঃ বার্ণেল সাহেবের মতে দেখা যাইতেছে ললিতবিস্তরের দশম অধ্যায়ের যে স্থলে অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি প্রভৃতির উল্লেখ আছে, সেই অংশ টুকু প্রক্ষিপ্ত, সুতরাং এই অমূলক ভিত্তির উপর সৌধনির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা যে কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। বার্ণেল সাহেব আরও বলেন যৎকালে ললিতবিস্তর গ্রন্থ রচিত হয়, অন্ততঃ সেই সময়ে নাগরীলিপি প্রচলিত ছিল এবং তাহা নাগলিপি নামে অভিহিত হইত।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর দুই শত বৎসর পরে মগধরাজ অশোক তাঁহার অনুশাসনমালা ক্ষোদিত লিপির দ্বারা প্রচার করেন। সেই লিপিকে 'অশোক

লিপি' কহে এবং উহা পূর্ব্বতন 'ব্রাহ্মী'লিপিরই প্রকারভেদমাত্র।* ইহা হইতে অনুমান হয় যে বুদ্ধদেবের সময়েও পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মীলিপি প্রচলিত ছিল, তবে প্রদেশবিশেষে অক্ষরের তারতম্য থাকিতে পারে।

ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ প্রায় সর্ব্বদিকেই অশোক আপন অনুশাসন প্রচার করেন। উত্তর ভারতের প্রায় সকল অনুশাসনগুলি অশোকলিপিতে লিখিত, কেবলমাত্র সাব্বাজগড়্হি (যাহাকে কপূরদি-গিরিও বলে) ও মানসেরা এই দুইস্থানের লিপি খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ। অনুশাসন-গুলির যাহাতে সর্ব্বত্র প্রচার হয় এবং সর্ব্বসাধারণে যাহাতে উহা বুঝিতে পারে, এইরূপ করাই রাজা অশোকের উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন বলেন "অপর সমস্ত অনুশাসনে অশোকের রাজসভার অক্ষরই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে"; † অশোকলিপি যে রাজসভার লিপি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ‡ ঐ লিপি তখন উত্তর ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, সুতরাং উহা যে তখনকার সাধারণের বোধগম্য লিপি ছিল ইহা স্পষ্ট বোধ হয়। যেখানে এই লিপি লোকে বুঝিত না, সেখানে তিনি সেই স্থানের লিপি ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন সাব্বাজগড়্হি ও মানসেরায় তিনি খরোষ্ঠী লিপিতে আপন অনুশাসন প্রচার করেন। পূর্ব্বোক্ত অশোকলিপিই কালক্রমে 'গুপ্ত' লিপি আদিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া শেষে দেবনাগর অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। §

লাটমণ্ডলে অর্থাৎ আধুনিক গুজরাট প্রদেশে আনন্দপুর নামে এক নগর ছিল, এক্ষণে উহা 'বড় নগর' বা 'নগর' নামে বিখ্যাত। এই নগরই গুজরাট প্রদেশের প্রভাবশালী নাগর ব্রাহ্মণদিগের আদিম বাসস্থান ছিল। কেহ কেহ বলেন এই নাগর ব্রাহ্মণেরা নাগরী অক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু ঐ কথা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে, নাগরীলিপির

* Dr. Macdonell's History of Sanskrit Literature p. 17.

† বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, ৮ম পৃষ্ঠা।

‡ ভট্টি প্রোলু স্তূপের ক্ষোদিত লিপি—Epigraphia Indica, Vol. II, pp. 323-329.

§ Epigraphia Indica, vol. I, p. 295.

ব্যুৎপত্তিসাধন জন্য নাগর ব্রাহ্মণদিগের উপর ইহা আরোপিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেনের মতে 'নাগরী অক্ষর অপেক্ষা আমাদের বঙ্গাক্ষর প্রাচীন'।* আবার তিনিই বলেন যে 'উড়িয়া-লিপি ও বঙ্গীয়-লিপি প্রায় একই প্রকারের, প্রভেদ এই যে উড়িয়া অক্ষরগুলির মাত্রা গোলাকার'।† আমরাও স্বীকার করি যে বঙ্গ-লিপি ও উড়িয়া-লিপির পরস্পর অনেক সাদৃশ্য আছে। বঙ্গদেশে অশোকের কোন অনুশাসন নাই, তবে তাঁহার অনুশাসন কলিঙ্গ (অর্থাৎ উড়িষ্যা) দেশে ধৌলি ও জৌগড় নামক স্থানে প্রচারিত ছিল। ধৌলি ভুবনেশ্বরের সন্নিকট। যদি 'উড়িয়া-লিপি' অর্থাৎ বঙ্গ-লিপির সদৃশ কোন স্বতন্ত্র লিপি তৎকালে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে অশোক রাজা ধৌলি ও জৌগড়ে সেই লিপিতেই আপন অনুশাসন প্রচারিত করিতেন, অশোকলিপিতে প্রচার করিতে যাইতেন না। কারণ লোকে তাঁহার অনুশাসন পাঠ করিয়া বুঝিবে ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বুগুড় তাম্রফলক ‡ হইতে জানা যায় যে দেবনাগরলিপি মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিস্থ গঞ্জাম জেলাতেও প্রচলিত ছিল। এই গঞ্জাম প্রদেশ পূর্ব্বে কলিঙ্গের অন্তর্গত ছিল। যখন দেবনাগরীলিপি অশোকলিপি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন অশোকলিপি এক সময়ে যে কলিঙ্গ প্রদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ইহা হইতেও বোধ হয় যে এক সময়ে উত্তর ভারতে, কলিঙ্গ দেশে ও বঙ্গদেশেও অশোকলিপির প্রচলন ছিল।

ললিতবিস্তরে যে বঙ্গ-লিপির উল্লেখ দেখা যায়, বোধ হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মীলিপিরই এক প্রকারভেদ।

লোকের বুঝিবার সুবিধার জন্য দেশভেদেও অশোক তাঁহার অনুশাসনে নিজলিপির ব্যবহার সত্ত্বেও ভাষারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করেন। সাব্বাজগড়্হি

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সং, পৃষ্ঠা ১১।

† বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সং, পৃষ্ঠা ১১।

‡ Epigraphia Indica, Vol. III, p. 41 (1894)

ও মানসেরার অনুশাসন খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ থাকায় জনসাধারণকে বুঝানই যে তাঁহার অনুশাসনের উদ্দেশ্য ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়; সেই হেতু তিনি স্থল বিশেষে এরূপ লিপির ব্যবহার করিয়াছেন যাহা সাধারণে পাঠ করিতে ও বুঝিতে পারে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বর্ত্তমান দেবনাগরঅক্ষর প্রাচীন অশোকলিপির পরিণতি মাত্র। দেবনাগরঅক্ষরের পূর্ব্বতন অবস্থাকেই 'কুটিল' অক্ষর কহে।

দীনেশ বাবুও বলেন যে 'গুপ্তবংশের অবনতির পর গুপ্তলিপি হইতে 'কুটিল' প্রভৃতি প্রাচ্য অক্ষরের উদ্ভব হইয়াছে'।* তিনি আরও এক স্থানে বলেন যে 'খৃষ্ট জন্মাইবার ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ অশোক রাজার সময়ে) নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি হয় নাই'।† অশোক রাজার সময়ে নাগরী অক্ষরের উৎপত্তি হয় নাই, এ কথা অপ্রকৃত নহে। তিনিই স্বীকার করিয়াছেন যে অশোক লিপি হইতে গুপ্তলিপি এবং গুপ্তলিপি হইতে 'কুটিল' অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। ডাঃ বুহলার (Bülher) সাহেব দেবল-প্রশস্তির ক্ষোদিতলিপির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, পুরাতন দেবনাগর লিপি ("ancient Nagari") ও প্রিন্‌সেপ সাহেবের মতে যাহা কুটিললিপি তাহা একই লিপি, কুটিল অক্ষর বলিয়া কোন অক্ষর নাই।‡ ডাঃ ফ্লিট সাহেব ডাঃ বুহলার সাহেবের ঐ কথা অনুমোদন করেন, তবে তিনি বলেন যে 'কুটিল লিপি' নামটি এতদিন হইতে প্রচলিত আছে যে তাহা চলিত থাকিবার পক্ষে কোন আপত্তি নাই।§

যাহা হউক, এই প্রাচীন দেবনাগরলিপি পরিবর্ত্তন অর্থাৎ লৌকিক কুটিললিপি

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সং, ১০ পৃষ্ঠা।

† ঐ ঐ ঐ

‡ Epigraphia Indica, Vol. I, p. 75.

§ Record of the Soma Vansi kings of Katak: Epigraphia Indica, Vol. III, p. 328, note.

যে আধুনিক বাঙ্গালা অক্ষরের জননী তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দীনেশ বাবুও স্বীকার করেন 'প্রাচীন বঙ্গাক্ষর, কুটিল ও মাগধাদি লিপি এক বংশেরই লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়'।* বঙ্গ-লিপি যখন 'কুটিল' অক্ষর (অর্থাৎ নাগরী অক্ষর) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তখন ইহা যে 'কুটিল' অক্ষরের লক্ষণাক্রান্ত হইবে ইহাতে বিচিত্র কি?

দেবনাগর অক্ষর হইতে বাঙ্গালা অক্ষর কিরূপ পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে তাহা স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেবনাগরী লিপি নামক পুস্তিকা দৃষ্টি করিলে বুঝা যাইবে।†

দীনেশ বাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠার সম্মুখে প্রাচীন লিপিমালার যে প্রতিরূপ দিয়াছেন, তাহাতে তৃতীয় (কোথাও কোথাও চতুর্থ) পংক্তির পরে যদি পালবংশীয় রাজাদিগের সময়ের কুটিল (অর্থাৎ পুরাতন দেবনাগরঅক্ষর) দিতেন, ও তৎপরে বিজয় সেন ও লক্ষ্মণ সেনের সময়ে ক্ষোদিতলিপির অক্ষর দিতেন, তাহা হইলে বঙ্গলিপি দেবনাগর হইতে কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে তাহা একবারেই প্রতিপন্ন হইত।

এলবেরুণীর ইণ্ডিয়া ‡ নামক পুস্তক হইতে জানা যায় যে একাদশ শতাব্দীতে কাশী ও কান্যকুব্জের সন্নিহিত প্রদেশসমূহে 'সিদ্ধমাতৃকা' লিপি ও বঙ্গে 'গৌড়ী' লিপি প্রচলিত ছিল। ডাক্তার বর্ণেল সাহেব বলেন যে একাদশ শতাব্দীতে উত্তর ভারতের কাশী অঞ্চলে যে দেবনাগরীর প্রকারভেদ প্রচলিত ছিল এবং যাহা সিদ্ধমাতৃকা লিপি নামে অভিহিত হইত, তাহা হইতে দক্ষিণদেশের নন্দিনাগরীলিপি § উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে উক্ত নন্দিনাগরী দেবনাগরীর প্রকারভেদ। গৌড়ীয় লিপি

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সং, ১০ পৃষ্ঠা।

† A Note on the Devanagari Alphabet (1894)

‡ Alberuni's India, Vol. I, p. 173.

§ Dr. Burnell's South Indian Palæography, p. 53.

সিদ্ধমাতৃকা লিপি হইতে উৎপন্ন হয় নাই, তথাপি এই নন্দিনাগরীলিপির কতক অক্ষর, যেমন গ, জ, ট, ণ, ল প্রভৃতি লক্ষ্মণসেনের তর্পণদীঘির তাম্র ফলকের * ঐ সকল অক্ষরের সহিত অনেক মিল আছে। যাঁহারা বলেন যে বঙ্গলিপি দেবনাগরী লিপি হইতে স্বতন্ত্র, তাঁহাদের কথা যে যথার্থ তাহা স্বীকার করিতে পারা যায় না, কারণ, সিদ্ধমাতৃকা যদি দেবনাগরী হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং গৌড়ী বা বঙ্গলিপি স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলে সিদ্ধমাতৃকা হইতে উৎপন্ন যে নন্দিনাগরী তাহার কোন কোন অক্ষরের দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গলিপির অক্ষরের সহিত সাদৃশ্য থাকিত না! ইহাতে বুঝা যায় যে সিদ্ধমাতৃকা ও বঙ্গলিপি উভয়েই দেবনাগরলিপির প্রকারভেদ।

অপর দিক হইতে দেখিলেও দেবনাগর অক্ষরে যেরূপ শ, ষ, স, ণ, ন, ব, ব অক্ষর আছে, বাঙ্গালা লিপিতেও অবিকল তাহাই আছে। বঙ্গলিপি স্বতন্ত্র লিপি হইলে এইরূপ থাকিবার আদৌ সম্ভাবনা ছিল না এবং ইহা বলা বাহুল্য কেহ বলেন না যে বঙ্গলিপি হইতে দেবনাগরলিপির উদ্ভব হইয়াছে।

অধুনাপ্রচলিত বঙ্গলিপি দেবনাগরলিপিরর পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল, কি উহা দেবনাগরলিপির প্রকারভেদ তাহা স্থির করিতে হইলে কল্পনার সাহায্য লইলে চলিবে না। সময়ে সময়ে দেবনাগরের কোন্ কোন্ অক্ষর কিরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া অধুনা প্রচলিত বঙ্গাক্ষরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা কেবল বঙ্গদেশের তাম্রশাসনে ও প্রস্তরক্ষোদিত লিপির তুলনা করিলেই জানা যাইতে পারে।

যদিও কোন্ সময় হইতে দেবনাগর অক্ষর বঙ্গাক্ষরে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে, তথাপি পালরাজাদিগের সময় হইতে লক্ষ্মণসেনের সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত সময়ের যে সকল ক্ষোদিতলিপি (inscriptions) পাওয়া গিয়াছে, তাহার তুলনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে দেবনাগর অক্ষর ক্রমে ক্রমে আধুনিক বঙ্গলিপিতে পরিণত হইয়াছে।

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1875, No. I, p. 1.

পালবংশীয় পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের ক্ষোদিত লিপির অক্ষরের সহিত পরবর্ত্তী রাজাদিগের ক্ষোদিত লিপির অক্ষর তুলনা করিলে দেখা যায় যে, দেবনাগর অক্ষর ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯০৮ সালের 'এসিয়াটিক সোসায়িটির জর্ণাল' হইতে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত হইল।— 'The JA (জ) in the inscription of Dharmapa'la year 26, is exactly like that of the early nailheaded type. Further progress shows the gradual curvature of the other two horizantal lines, which gradually assume the Bengali form to be found in the inscriptions of the 10th and 11th centuries as well as in those of Gopa'ladeva *

নবম শতাব্দীর শেষে বা দশম শতাব্দীর প্রথমে (অর্থাৎ এখন হইতে হাজার বৎসর পূর্ব্বে) নারায়ণপাল দেবের সময়ের দিনাজপুরের বাদল স্তম্ভের † (Badal Pillar) ক্ষোদিতলিপির সহিত একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর রাজসাহীজেলায় প্রাপ্ত বিজয়সেনের দেওপাড়াপ্রস্তরফলকের (Deopara stone inscription) ‡ ক্ষোদিত লিপির তুলনা করিলে দেখা যায়, যে দেওপাড়া শিলালিপির অক্ষর বর্ত্তমান বাঙ্গালা লিপির অনেকটা অবয়ব ধারণ করিয়াছে। এই বিজয় সেন বল্লাল সেনের পিতা এবং লক্ষ্মণ সেনের পিতামহ। ডাঃ কীলহর্ণ (Dr. Kielhorn) সাহেব এই দেওপাড়ার লিপিসম্বন্ধে লিখিয়াছেন † যে ই, এ, খ, জ, ট, ন, ত, ফ, ভ, র, ল, ক্ষ, জ্ঞ, হ্ম, অক্ষর গুলি তৎকালে চলিত নাগরী অক্ষর হইতে বিভিন্ন, কিন্তু হ, ব, ছ, দ, প্রভৃতি অক্ষর দেবনাগরী অক্ষরের ন্যায় ঠিক আছে; আবার কতকগুলি অক্ষর যেমন প, শ, ণ প্রভৃতি না দেবনাগরী না বাঙ্গালা, কিন্তু

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1908, pp. 103-104.

† Epigraphia Indica Vol II, p. 160.

‡ Epigraphia Indica Vol I, p. 305.

কোন কোন স্থানের ক, ব, ন, ও, স, ব, কোন কোন স্থলের র প্রভৃতি অক্ষর একবারে বাঙ্গালার আকার ধারণ করিয়াছে।*

দিনাজপুরের তর্পণদীঘির † তাম্রফলকে লক্ষ্মণসেনের ক্ষোদিত লিপি পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, দেওপাড়ার ক্ষোদিতলিপি অপেক্ষা তর্পণদীঘির তাম্রফলকের অক্ষর পূর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা অক্ষরের ঘনিষ্টরূপবিশিষ্ট। ডাঃ কীলহর্ণের মতে লক্ষ্মণ সেন ১১১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরূঢ় হন ‡ এবং সেই সময় হইতে লক্ষ্মণাব্দ প্রচারিত হয়।

আবার বাখরগঞ্জ জেলার ইদিলপুর পরগণায় § প্রাপ্ত লক্ষ্মণ সেনের পুত্র কেশব সেনের তাম্রফলকের অক্ষর দেখিলে উক্ত তাম্রফলকের অক্ষর এখনকার বাঙ্গালা অক্ষরের অনেক সদৃশ হইয়াছে বুঝা যায়।

উক্ত লক্ষ্মণ সেনের ও কেশব সেনের তাম্রফলকদ্বয়ের অক্ষর সম্বন্ধে ওয়েষ্টমেকট সাহেব কি বলেন নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"Both are of a type rather Bengali than Devana'gari, and of a type which has advanced nearer to the Bengali than the A'mga'chhi' plate of the Pals, or the inscription in the pillar in the Di'na'jpur Ra'jba'ri'. The र in both Sen plates is the Bengali one, while in the A'mga'chhi and Raj'ba'ri' inscriptions it is the Devana'ga ri. क, ज, न, ङ, ह, म, ष, व and most of the letters are identical in both Sen plates, and more Bengali than Devana'gari. ह, प, च, य are the same, and at first sight remote from either Bengali or Devana'gari; प and य are undistinguishable in both plates being nearer the Devana'gari form than the Bengali, which ap-

* Ibid, page 305.

† Journal of the Asiatic Society of Bengal 1875, No I, p. 1.

‡ Epigraphia Indica Vol I, page 305.

§ Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol VII page 40.

pears first in the Buddha Gaya inscription engraved after the death of Lakshman Sen. The letters in which Lakshman Sen's plate appear nearer Bengali than the Amga'chi' plate of Vigraha Pal, are ন, ধ, ম, য়, ব and those in which Keshab Sen's plate seem to show a further step in the same direction, are ধ, ম, গ, স, and the composite form of হ।" *

পৃথিবীর সকল বস্তুই পরিবর্ত্তনশীল। ভাষা ও লিপিও পরিবর্ত্তনশীল। আমরা যতদূর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাহা হইতে এখনকার বঙ্গলিপি যে দেবনাগর অক্ষরের রূপান্তর তাহাই প্রতীয়মান হয়।

ব্রাহ্মীলিপির প্রকার ভেদে অশোকলিপি, অশোকলিপি হইতে গুপ্তলিপি, গুপ্তলিপি হইতে কুটিল বা দেবনাগর লিপি এবং দেবনাগর হইতে বর্ত্তমান বঙ্গলিপি উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব যাঁহারা বলেন বঙ্গলিপি দেবনাগব অক্ষরের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল ও তাহা বুদ্ধদেবের সময়ে প্রচলিত ছিল, তাঁহাদের দেখাইতে হইবে যে এই বঙ্গলিপি পূর্ব্বের কোন্ লিপির পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে; সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব। বঙ্গলিপি, বুদ্ধদেবের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যে একই ভাবে, একই আকারে, বর্ত্তমান আছে, তাহাও বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

আমাদের হিন্দুদের মতে সংস্কৃতভাষা দেবভাষা, তাহা যে অক্ষরে লিখিত হয় তাহা দেবনাগর বা দেবনাগরী অক্ষর, তাহাও হিন্দুদের মতে দেবতাদের লিপি। সংস্কৃতভাষা ও দেবনাগরলিপিকে যে দেবভাষা ও দেবলিপি বলে, তাহার অর্থ উহা আর্য্যদিগের ভাষা ও আর্য্যদিগের লিপি।

যদি বাঙ্গালা লিপি দেবনাগরী লিপি হইতে উৎপন্ন না হইয়া থাকে ও বঙ্গলিপি দেবনাগরের অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহা হইলে কি আমরা পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অনার্য্যজাতি ছিলাম, এখন সভ্য হইয়া কি আর্য্যজাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি?

সংস্কৃত ভাষা হইতে আমাদের বঙ্গভাষার উৎপত্তি হইয়াছে

---

* J. A. S. B, 1875, p. 2.

এ কথা যখন অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তখন আমরা যে সংস্কৃত ভাষায় চলিত লিপি ব্যতীত অন্য কোন লিপির দ্বারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতাম তাহা কোন প্রকারে সম্ভব হইতে পারে না; কারণ যদি ইংরাজী বা আরবি ভাষা শিক্ষা করিতে চাই তাহা কখন বাঙ্গালালিপিতে শিক্ষা করিতে পারিনা, যে লিপিতে ইংরাজী বা আরবি ভাষা লেখা আছে সেই লিপি সাহায্যেই শিক্ষা করিয়া থাকি। ইহাতেই বোধ হয় যে বাঙ্গালা লিপি ক্রমে ক্রমে দেবনাগর লিপি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে যে, বাঙ্গালাভাষার উদ্ভব ও প্রচার বহু পূর্ব্বকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সজীব প্রাণীমাত্রেই জন্মলাভকালে যদবস্থ থাকে, বয়স হইলে কখনই তদবস্থ থাকে না। আমরা যৎকালে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, আমাদিগের তাৎকালিক অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থা কতদূর পৃথক্‌ভাব ধারণ করিয়াছে তাহা অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করিতে গেলে বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয়। ভাষা যদিও স্বয়ং সজীব প্রাণী নহে, কিন্তু সজীব প্রাণীর সর্ব্বাপেক্ষা সারপদার্থ যে অন্তঃকরণ, তাহা হইতেই ইহার উৎপত্তি; সজীবপ্রাণীর বাগিন্দ্রিয়েই ইহার চিরনিবাস এবং ইহা সজীবপ্রাণীকে নিয়ত পরিচালন করিবার যন্ত্রস্বরূপ; সুতরাং ইহারও কৌমার, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা যে একভাবেই যাইবে, তাহা কখন সম্ভব নহে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া এদেশের যে ভাষা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ অত্রত্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ ভাষায় কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছিলেন, আমরা আজিও যে, সেই ভাষাই ব্যবহার করিতেছি, তাহা কখনই নহে। কিন্তু সেই ভাষাই না হউক, ভিন্ন ভাষাও নহে—যদি রামচন্দ্রনামক কোন দুইবর্ষবয়স্ক বালককে আমরা

কিয়দ্দিন দেখিয়া তৎপরে একবারে বিংশতিবৎসর পরে তাহাকে আবার দর্শনকরি, তাহা হইলে কখনই সেই রামচন্দ্র বলিয়া প্রথমে চিনিতে পারিনা—কিন্তু চিনিতে পারিনা বলিয়াই যে, সে ব্যক্তি সেই রামচন্দ্র নহে, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ সেই রামচন্দ্রনিষ্ঠ অনন্যসাধারণ কিঞ্চিৎ পদার্থ সর্ব্বক্ষণই তাহাতে বিদ্যমান আছে। সেইরূপ আমাদিগের কান্যকুব্জাগত পূর্ব্বপুরুষেরা যদি এই সময়ে একবার গাত্রোত্থান করেন, তাহাহইলে তাঁহারা প্রথমতঃ আমাদিগের এই চলিত ভাষাকে অন্যবিধ ভাষা বলিয়াই বোধ করিবেন; কিন্তু তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের সন্তানেরা যে ভাষা ব্যবহার করিতেছেন, তাহা তাঁহাদিগের সমসাময়িক সাধারণ লোকদিগের সেই পূর্ব্বব্যবহৃত ভাষাই—অন্য কিছু নহে; তবে সেই ভাষার শরীরে অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এইমাত্র—মূল প্রকৃতির কিছুমাত্র বিপর্য্যয় হয় নাই। জগতীতলস্থ সমস্ত বস্তুর ন্যায় ভাষাও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। সেই পরিবর্ত্তের অবস্থা বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।

প্রথম হইতে অদ্যপর্য্যন্ত সময়কে ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া তদনুসারে বাঙ্গালা ভাষার বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থার নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত বোধ-হয়না। আমাদিগের বিবেচনায় প্রথম হইতে চৈতন্যচন্দ্রের উৎপত্তির পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৪০৭ শক [১৪৮৫ খৃষ্ট অব্দ] পর্য্যন্ত সময়কে আদ্যকাল; তৎপরে চৈতন্যের সময় হইতে ভারতচন্দ্ররায়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৬৭৪ শক [১৭৫২ খৃঃ অঃ] পর্য্যন্ত সময়কে মধ্যকাল এবং তৎপরে ভারতচন্দ্রের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত সময়কে ইদানীন্তনকাল বলা অযৌক্তিক হয় না। ঐ তিনকালের বাঙ্গালাভাষার অবস্থা যথাক্রমে বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। এক্ষণে আমরা প্রথমতঃ বাঙ্গালার সেই বাল্যাবস্থার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আদ্যকাল।

কোন ব্যক্তিই আপনার বাল্যাবস্থার বিবরণ নিশ্চয় বলিতে পারে না। আমরা কোন্ পিতামাতা কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইয়াছি, কোন্ দেশে বা কোন্ সময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, বাল্যকালে আমাদের কে কে অভিভাবক ছিলেন, কাহার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছি, এ সকল কথা অন্য কেহ বলিয়া না দিলে, আমরা কখনই জানিতে পারি না। ভাষার পক্ষেও সেইরূপ। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গালাভাষা প্রথমাবস্থায় কিরূপ ছিল, তাহা বলিয়া দিতেপারে এরূপ গ্রন্থ নাই। আমরা যে সকল বাঙ্গালাগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—দেখিতেছি, সে সমস্তই প্রায় চৈতন্যদেবের উৎপত্তির পরকালীন গ্রন্থ—পূর্ব্বকালীন নহে। কেবল বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কতকগুলি গীতই চৈতন্যের পূর্ব্বকালে বিরচিত বলিয়া জানিতে পারা যাইতেছে। যেহেতু বৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত পদকল্পতরু নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে চৈতন্যদেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গীতাবলী শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন যথা—

> জয় জয়দেব কবিনৃপতিশিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম।
> জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিলভুবনে অনুপাম॥
> যাকর রচিত মধুররস নিরমল গদ্য পদ্যময় গীত।
> প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত॥ (পদকল্পতরু ১৫)

বিদ্যাপতির ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাষা ধরিলে ও তাঁহার জন্মস্থান মিথিলাকে বাঙ্গালা দেশ ধরিলেও তাঁহার ও তাঁহার সমসাময়িক চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কবি কৃত্তিবাসকে বাঙ্গালার আদি গ্রন্থকার বলা যাইতে পারে। কবিত্বে চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠ হইলেও তিনি পদকর্ত্তামাত্র, কৃত্তিবাস গ্রন্থকার, তখনকার ভাষায় পাঁচালিকার। পাঁচালিতে ছড়া ও গীত থাকিত, এখনও থাকে, পদে কেবল গান মাত্র থাকে।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রধানতঃ বৈষ্ণব কবি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বৈষ্ণব গ্রন্থ হইলেও সকল শ্রেণীর পাঠ্য, সকল শ্রেণীকে আনন্দ ও উপদেশ প্রদান

করে। বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে কেবল আদিরস ও ভক্তি রসের বিস্তার, কৃত্তিবাসী রামায়ণে সর্ব্বরসের সমাবেশ ও সম্পূরণ আছে।

যাহা হউক এই তিনজন কবিকে লইয়া ও তাঁহাদের রচনার উপর নির্ভর করিয়া আমরা বাঙ্গালাভাষার প্রথমাবস্থার বিষয় নিঃশেষিত করিলাম।

বিদ্যাপতি ঠাকুর।

বিদ্যাপতি ঠাকুর মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ এবং মিথিলারই ব্রাহ্মণ রাজা শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন। মিথিলার প্রচলিত রাজপঞ্জী হিসাবে শিবসিংহ ১৩৬৮ শকে (খৃঃ ১৪৪৬) সিংহাসনে আরোহণ করেন। কবি তাঁহারই আদেশানুসারে সংস্কৃত ভাষায় 'পুরুষপরীক্ষা' নামক পুস্তক রচনা করেন; এই গ্রন্থে শিবসিংহ পরম শৈব এবং কৃষ্ণবর্ণ-দেহবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সম্প্রতি কবির নিজ রচিত একটি মৈথিল পদ * পাওয়া গিয়াছে,

---

* "অনলরন্ধ্র কর লকখণ নরবই সক্কসমুদ্দকর অগিনি সসী।
চৈতকারি ছঠি জেঠা মিলি আবোর বেহপ্পই জাউলসী॥
দেবসিংহ জংপুহমী ছড্ডুই অদ্ধাসন সুররাঅ সরু।
দুহু সুরতান নিঁদে অব সোঅউ তপনহীন জগ ভরু॥
দেখ হুও পৃথিমীকে রাজা পৌরুস মাঁঝ পুন্ন বলিও।
সতবলে গঙ্গা মিলিত কলেবর দেবসিংহ সুরপুর চলিও॥
একদিন জবন সকল দল চলিও একদিস সৌ জমরাঅ চরু।
দুহুএ দলটি মনোরথ পুরুও গরুএ দাপ দিবসিংহ করু॥
সুরতরু কুসুম ঘালি দিস পুরও দুন্দুহি সুন্দর সাদ ধরু।
বীরছত্র দেখনকো কারণ সুরগণ সোভেঁ গগন ভরু॥
আরম্ভী অথন্তেটি মহামখ রাজসুঅ অশ্বমেধ জহাঁ।
পণ্ডিত ঘর আচার বখানিঅ যাচককাঁ ঘরদান কহাঁ॥
বিজ্জাবই কইবর এহু গাবএ মানত মন আনন্দ ভও।
সিংহাসন সিবসিংহ বইট্টো উছবৈ বিসলি গও"॥ অর্থাৎ

"হেনগরবাসিগণ! তোমাদের পূর্ব্বরাজা দেবসিংহ এই ২৯৩ লাক্ষ্মণাব্দে চৈত্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে স্বর্গে দেবরাজের সিংহসনার্দ্ধভাগী হইয়াছেন। রাজা

তাহাতে দেখা যায় যে শিবসিংহ ১৪০০ খৃঃ অব্দে সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিসপী (বিসফী) নামক গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন।

দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন "এই গ্রাম মিথিলা সীতামারি মহকুমার অধীন জরৈল (জরাইল) পরগণার মধ্যে কমলা নদীর তীরে অবস্থিত। এখন আর তদ্বংশীয়েরা কেহ সেখানে নাই, চারি পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা সৌরাট নামক অপর একখানি গ্রামে বাস করিতেছেন। কবির বংশধর বনমালী ও বদরী নাথ এখন বিদ্যমান আছেন।*

ভূমি দান পত্রের কাল ১৩২২ শক (১৪০০ খৃঃ অব্দ) এবং ঐ ভূমিদান পত্রে শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে 'নবজয়দেব' 'সুকবি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং বিদ্যাপতি তখন যে কবিত্বে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। উক্ত ভূমিদান পত্রের কালের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও পূর্ব্ব কথিত মৈথিল পদ রচনার কাল অনুসারে এবং কবির তৎকালে অন্ততঃ ২২ বৎসর বয়ক্রম ধরিলে ১৩০০ শকে (১৩৭৮ খৃঃ অব্দে) তিনি যে বর্ত্তমান ছিলেন তদ্বিষয়ে আর সংশয় থাকে না।

"বিদ্যাপতির পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই বিদ্বান্ ও যশস্বী ছিলেন। মহারাজ গণেশ্বরের পরম সুহৃদ্ গণপতি ঠাকুর তৎপ্রণীত প্রশংসিত গ্রন্থ "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী"র ফল মৃত সুহৃদের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য উৎসর্গ করেন। এই

রাজশূন্য হয় নাই; তাঁহার পুত্র শিবসিংহ রাজা হইয়াছেন; শিবসিংহ বাহুবলে বলীয়ান্। তিনি সম্মুখাগত যবনদিগকে তৃণের মত তুচ্ছ ভাবিয়া জননী জাহ্নবীর অমৃতধাম অঙ্কে পিতার দেহ ভস্মীভূত করিয়া কটাক্ষমাত্রে যবনরাজ সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়াছেন। তাহার পর যবনরাজ, তাঁহার সঙ্গে অগণিত সৈন্য; তোমাদের নূতন রাজা অকুতোভয়; ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তোমরা অনুপস্থিত ছিলে; দেখ নাই; আকাশে সারি গাঁথিয়া দেবতাগণ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে যবনরাজ পলায়ন করিল। স্বর্গে কতই না দুন্দুভি বাজিল। শিবসিংহের মাথার উপর কতই না সুরতরু কুসুম পড়িতে লাগিল। বিদ্যাপতিকবি কহিতেছেন, সেই সিবসিংহ এখন তোমাদের রাজা হইয়াছেন; তোমরা নির্ভয়ে বাস কর।"

* দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ৩য় সংস্করণ – ২১৯ পৃষ্ঠা।

গণপতি ঠাকুর * বিদ্যাপতির পিতা। কবির পিতামহ জয়দত্ত সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, এজন্য তিনি 'যোগীশ্বর' আখ্যা প্রাপ্ত হন। জয়দত্তের পিতা বীরেশ্বর স্বীয় পাণ্ডিত্যগুণে মিথিলারাজ কামেশ্বরের নিকট হইতে বিশেষ বৃত্তি-লাভ করিয়াছিলেন। এই বীরেশ্বর প্রণীত 'বীরেশ্বর পদ্ধতি' অনুসারে মিথিলার ব্রাহ্মণেরা আজিও তাঁহাদের 'দশকর্ম্ম' করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতির খুল্লপিতামহ চণ্ডেশ্বর মহারাজহরিসিংহদেবের মন্ত্রী ছিলেন। চণ্ডেশ্বর ধর্ম্মশাস্ত্রে সাতখানি রত্নাকর-কর্ত্তা (প্রণেতা) এবং তাঁহার উপাধি ছিল "মহামত্তক সান্ধি বিগ্রহিক"। এই বংশের আর একটি গৌরব এই যে, বিদ্যাপতির ঊর্দ্ধতন ৬ষ্ঠ স্থানীয় পূর্ব্ব পুরুষ ধর্ম্মাদিত্য (কাব্যবিশারদ মহাশয়ের † মতে কর্ম্মাদিত্য) হইতে সকলকেই রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়"। ‡

বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও তাঁহাকে আমরা বাঙ্গালার প্রাচীন কবিশ্রেণী হইতে অপসারিত করিব না; যেহেতু বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলা ও বঙ্গদেশে এক্ষণকার অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তৎকালে অনেক মৈথিল ছাত্র বঙ্গদেশে আসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতেন এবং অনেক এতদ্দেশীয় ছাত্র

---

* জনমদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর,
মৈথিলী দেশে করু বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ, শিব সিংহ ভূপ,
কৃপা করি লেউ নিজ পাশ।
বিসফি গ্রাম, দান করল মুঝে,
রহতহি রাজ সন্নিধান।
লছিমা চরণ ধ্যানে, কবিতা নিকশয়ে
বিদ্যাপতি ইহ ভণে।" পদসমুদ্র।

† সম্প্রতি 'বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ' হইতে শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয়ের ব্যয়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক 'বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী' শীর্ষক একটি সটীক, সুবৃহৎ ও সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। একালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণের পর ইহাই সুবিস্তৃত অভিনব সংস্করণ।

‡ দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ৩য় সংস্করণ, ২১৯-২২০পৃষ্ঠা।

মিথিলায় যাইয়া পাঠসমাপন করিয়া আসিতেন। প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও চৈতন্যদেব ইঁহারা তিন জনেই মিথিলার পক্ষধরমিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এরূপ জনশ্রুতি আছে। মিথিলার অক্ষর এ দেশের পণ্ডিতসমাজে এবং এ দেশের অক্ষর মিথিলার পণ্ডিতসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অনেকের মতে বাঙ্গালার সেনবংশীয় রাজাদিগের সময়ে বঙ্গদেশ ও মিথিলা অভিন্নরাজ্য ছিল, এবং সম্ভবতঃ উভয়দেশের ভাষাও অনেকাংশে একবিধ ছিল; তাহার প্রমাণস্বরূপ দেখা যাইবে যে, 'দ্বারভাঙ্গা' প্রদেশ ঐ সময়ে 'দ্বারবাঙ্গা' বা 'বঙ্গদ্বার' নামে আখ্যাত হইত, তাহার কারণ এই, সেন রাজারা ঐ প্রদেশকে তাঁহাদের বঙ্গরাজ্যের পশ্চিমদ্বার বিবেচনা করিতেন। সুতরাং তৎকালে বঙ্গরাজ্য বলিলে মিথিলাও তাহার অন্তর্ভূত হইত। তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের রাজা লক্ষ্মণসেনের শক এ দেশে নাই, কিন্তু ঐ দেশে 'ল সং' নামে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। অতএব যখন বঙ্গদেশ ও মিথিলায় এতদূর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ হইতেছে, তখন যেকবি বঙ্গদেশের কবি জয়দেবের প্রণীত 'গীতগোবিন্দের' অনুকরণে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন,—যে সকল সঙ্গীত বঙ্গদেশের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তয়িতা চৈতন্যদেব পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, যাহা বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কবির প্রণীত, এই বোধেই পরম ভক্তি সহকারে বঙ্গদেশীয় গায়কগণ বহুকাল হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন এবং যে সকল সঙ্গীতের অনুকরণেই বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শত শত গীত রচনা করিয়াছেন, আজি আমরা সেই কবিকে মিথিলাবাসী বলিয়া বঙ্গদেশীয় কবির আসন হইতে সরিয়া বসিতে বলিতে পারিব না। ফল কথা, যিনি যাহা বলুন, আমরা বিদ্যাপতিকে বঙ্গদেশেরই প্রাচীন কবি মনে করিব, এবং তাঁহার রচনা বঙ্গদেশেরই আদ্যকালের রচনা বলিয়া বোধ করিব।

বিদ্যাপতিবিরচিত কোন স্বতন্ত্র ভাষাগ্রন্থ * আমরা দেখিতে পাই নাই।

* নিম্নে কবির সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের পরিচয় দেওয়া গেল :—

(১) কীর্ত্তিলতা মহারাজ কীর্ত্তিসিংহের শাসনকালে ও তাঁহার আদেশে রচিত। তখন কবির বয়ঃক্রম অনুমান ১৫।১৬ বৎসর

কেবল 'পদামৃতসমুদ্র,' 'পদাবলী,' 'পদকল্পতরু,' 'প্রাচীন পদাবলী' প্রভৃতি বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে তাঁহার ভণিতাযুক্ত গীত সকল দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল গীতের সংখ্যা অল্প নহে, অতএব বোধ হয়, তাঁহার রচিত গ্রন্থ অবশ্য ছিল।

বিদ্যাপতির অনেক গীতেই তাঁহার আশ্রয়দাতা রাজা শিবসিংহ ও তাঁহার মহিষী লছিমা (লক্ষ্মী) দেবীর নামোল্লেখ আছে—যথা—

"কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে। রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে" ॥ (প, ক, ত, ২৫৫)।

"ভণয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ মূরতি, রাধারূপ অপার।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ একাদশ অবতার।" ॥ ঐ (২৩৮)

প্রবাদ এইরূপ যে, লছিমা দেবীর সহিত বিদ্যাপতির গূঢ় প্রণয় ছিল এবং মহিষীকে দেখিলেই তাঁহার কবিত্বস্রোতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত। বিদ্যাপতির কোন কোন গীতে যে রূপনারায়ণ, বিজয়নারায়ণ ও বৈদ্যনাথের নামোল্লেখ পাওয়া যায়, বোধ হয় তাঁহারা বিদ্যাপতির বন্ধু ছিলেন।

---

(২) 'পুরুষ পরীক্ষা'—মহারাজ শিবসিংহের আদেশে রচিত।

(৩) 'লিখনাবলী'—ইহাতে সংস্কৃতে পত্র লিখিবার রীতি বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তক সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়াছে। উহা হইতে জানা যায় সে সময়েও পত্র লিখিবার রীতি শিক্ষার এক অঙ্গ ছিল।

(৪) 'শৈবসর্ব্বস্বসার'—রাণী বিশ্বাস দেবীর আজ্ঞায় এই গ্রন্থ রচিত হয়।

(৫) 'গঙ্গাবাক্যাবলী'—পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাস দেবীর আদেশে লিখিত। এই গ্রন্থের শেষে লেখা আছে :—

কিয়ন্নিবন্ধমালোক্য শ্রীবিদ্যাপতিসূরিণা।
গঙ্গাবাক্যাবলী দেব্যা প্রমাণৈ র্বিমলীকৃতা।

(৬) বিভাগসার—নরসিংহদেব (দর্পনারায়ণ) এর উৎসাহে রচিত। এখানি একটি স্মৃতিগ্রন্থ। 'দান বাক্যাবলী' নামক স্মৃতিগ্রন্থ তাঁহার রচিত।

(৭) 'গয়া পত্তন'—নরসিংহদেবের স্ত্রী ধীরমতি দেবীর আদেশে রচিত।

(৮) 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'—এই গ্রন্থে গদ্যে পদ্যে দুর্গোৎসব পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে।

বিদ্যাপতির কোন কোন গীতে প্রেমিককবি জয়দেবের 'গীত গোবিন্দের' শ্লোক বিশেষের স্পষ্ট অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। জয়দেব বিরহবিধুর কৃষ্ণের উক্তিতে লিখিয়াছেন :—

হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়াবিরহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যাঽনঙ্গ! ক্রুধা কিমু ধাবসি।

গীতগোবিন্দ, ৩য় সর্গ ১১ শ্লোক।

জয়দেবের এই ভাব বিদ্যাপতির সঙ্গীতে এইরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে—

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি
হাম্ নহু শঙ্কর, হুঁ বরনারী॥
নহি জটা ইহ, বেণী বিভঙ্গ।
মালতী-মাল শিরে, নহ গঙ্গ॥
মোতিম-বন্ধ-মৌলি (১), নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ, সিন্দূর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ, মৃগমদসার।
নহ ফণিরাজ উরে, মণিহার॥
নীল পটাম্বর, নহ বাঘ-ছাল।
কেলিক-কমল ইহ, নাহ কপাল॥ (২)
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুচ্ছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জ পঙ্ক॥ *

---

(১) মুক্তাবাঁধা চূড়া।

(২) আমার হস্তে খেলিবার পদ্ম, নৃকপাল নহে। মহাদেবের ভিক্ষুকবেশে হস্তে নরকপাল বর্ণিত আছে।

* উত্তরকালে কবিরগান রচয়িতা রামবসুও জয়দেবের গানের ভাব লইয়া নিম্নলিখিত গীতটি রচনা করিয়াছেন।

জয়দেব শঙ্করের সহিত বিরহী কৃষ্ণের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। বিদ্যাপতি শঙ্করের সহিত বিরহিণী নারীর তুলনা করিয়াছেন। উভয়ের কবিতাতেই অনঙ্গকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, যে হেতু অনঙ্গ শঙ্করের প্রতি শর নিক্ষেপে সিদ্ধহস্ত।

বিদ্যাপতির প্রায় সমুদায় গীতেই বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, ভাব—গভীর, রসাঢ্য ও মধুর—সম্পূর্ণরূপ অর্থ পরিগ্রহ না হইলেও শ্রবণবিবরে যেন মধুধারা বর্ষণ করে। নিম্নভাগে তিনটি গীত উদ্ধৃত হইল। পাঠকগণ তাহাতে যথাক্রমে হিন্দীসম শব্দের বহুল মিশ্রণ, অল্প মিশ্রণ ও অমিশ্রণ দেখিয়া লইবেন।

হর নইহে আমি যুবতী।
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি ?
ক'রোনা আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য হয়েছে বিবর্ণ
ধরেছি শঙ্করের আকৃতি॥
ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ
একি রঙ্গ হে তোমার !
হর ভ্রমে শরাঘাত, কেন করিতেছ বারবার
ছিন্ন ভিন্ন কেশ, দেখে কও মহেশ
চেননা পুরুষ প্রকৃতি॥
হায় শুন শম্ভু-অরি, ভেবে ত্রিপুরারি
বৈরী হয়োনা আমার।
বিচ্ছেদে এদশা, বিগলিত-কেশা,
নহে এত জটাভার॥
কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পরেছি নীল রতন
অরুণ হ'ল লোচন, করে পতিবিরহে রোদন।
এ অঙ্গ আমার, ধূলায় ধূসর
মাখিনাই মাখিনাই বিভূতি॥

প্রেমক গুণ কহই সব্‌কোই। যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই॥
হাম যদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত। তব্‌কিয়ে যাওব পাবক অন্ত॥
অব্‌সব বিষসম লাগয়ে মোই। হরি হরি পিরীতি না কর জনি কই॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি। পানি পীয়ে পিছে জাতি বিচারি॥ ১॥
কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল। পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। তব হাম পিয়া দূর-দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিষীর বা। বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি। সুজনক দুখ দিবস দুই চারি॥ ২॥
আজি কেন তোমায় এমন দেখি। সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গে মোড়া দিয়া কহিছ কথা। না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥
দৈব অবঘাত হৈয়াছে পারা। সঘনে গগনে গণিছ তারা॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে। মরমি জনার মরম বাজে॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি। প্রেম কলেবরে দিয়াছে সাখী॥
বিদ্যাপতি কহে একথা দড়। গোপত পিরীতি বিষম বড়॥ ৩॥

চণ্ডীদাস।*

বিদ্যাপতির ন্যায় চণ্ডীদাসেরও পৃথক্ কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় নাই, কেবল নানা বৈষ্ণবগ্রন্থে তাঁহার রচিত পদাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন—নান্নুর নামক গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। এই গ্রাম বীরভূম জেলার অন্তর্গত সাকুলীপুর থানার অন্তর্গত সিউড়ির পূর্ব্বাংশে বার ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ঐ গ্রামে 'বাশুলী' নামে এক শিলাময়ী দেবী অদ্যাপি বিরাজ

* মেহেরপুর নিবাসী শ্রীযুত রমণীমোহন মল্লিক চণ্ডীদাসের একটি সুবৃহৎ ও সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

করিতেছেন। ইনি চণ্ডীদাসের উপাস্যদেবতা বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহার প্রকৃত নাম 'বিশালাক্ষী'; অপভাষায় 'বাশুলী' বলে। প্রবাদ আছে, চণ্ডীদাস প্রথমে ইঁহার উপাসনা করিতেন, পরে ইঁহারই উপদেশে কৃষ্ণপরায়ণ হন, এবং কৃষ্ণলীলাবিষয়ক নানা পদাবলী রচনা করেন। চণ্ডীদাসের স্বরচিত পদাবলীতে এই বৃত্তান্তের কতক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান। অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি। বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর। পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
যদি তুমি বঁধু মোরে নিদারুণ হও। মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়। পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয়॥

(প, ক, ত, ৮১৮)।

তথা— * * নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে, বাশুলী আছয়ে যথা।
তাঁহার আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে,—ইত্যাদি (প, ক, ত, ৮১৯)॥

চণ্ডীদাস কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে এই বলা যাইতে-পারে যে, বিদ্যাপতির জন্ম যদি ন্যূনাধিক ১৩০০ শকে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের উৎপত্তির ১০৭ বৎসর পূর্ব্বে হইয়া থাকে, তবে চণ্ডীদাসও সেই সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিতে হইবে। কারণ উঁহারা দুই জনেই এক সময়ে অবস্থিত ছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। তদ্ভিন্ন নিম্ন-লিখিত গীতেও উঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতিগুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব্ চণ্ডীদাসগুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল। সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল, বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডীদাস তব্ রহই ন পারই, চললহি দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুঁ জন, দুহুঁ গুণ গায়ত, দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহু জাগি॥
পন্থহি দুহুঁ দোঁহা দরশন পাওল, লখই ন পারই কোই।
দুহুঁ দোঁহ নাম শ্রবণে তহি জানল রূপনারায়ণ গোই॥ (প, ক, ত, ২৪১০)
তথা—ভণে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তথি, রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন, করল তখন, ভাসল প্রেমতরঙ্গে॥ (ঐ ২৪১২)

ঐ সাক্ষাৎকার সময়ে উভয়ের কবিত্ব, রসিকত্ব, পাণ্ডিত্য প্রভৃতির পরিচায়ক প্রশ্নোত্তরাবলীও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উঁহাদের সাক্ষাৎকারবিষয়ক উপাখ্যান কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয় না।

বিদ্যাপতির যেরূপ লছিমাপ্রসক্তির জনশ্রুতি আছে, চণ্ডীদাসেরও সেইরূপ 'রামী' বা 'রামতারা' (তারাধুবনী) নাম্নী রজক কন্যার সহিত সঙ্ঘটনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস স্বয়ংই "রজকীসঙ্গতি, চণ্ডীদাস গতি" ইত্যাদি গীতদ্বারা তাহা স্বীকার করিয়াছেন। চণ্ডীদাস ও রামীসংক্রান্ত অনেক অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে, অনাবশ্যকবোধে তাহা লিখিত হইল না।

চণ্ডীদাসের কল্পনাশক্তি বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মানবতী রাধাসমীপে শ্রীকৃষ্ণের নাপিতী, মালিনী, বিদেশিনী, বণিক্‌পত্নী প্রভৃতি বেশে গমনবিষয়ক যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাতে এবং অন্যান্য স্থলেও কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। কিন্তু বিদ্যাপতির গীতাবলীতে যেরূপ ভাবগাম্ভীর্য্য ও রচনাপারিপাট্য অধিক আছে, চণ্ডীদাসের গীতে সেরূপ পাওয়া যায় না। ইঁহার রচনা সাদাসিদা সামান্য ভাব লইয়াই অধিক— বিশেষতঃ অধিকাংশ গীতই নিতান্ত আদিরসসম্পৃক্ত হওয়ায় নব্যরুচির প্রীতিকর হয় না; কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাকে একজন প্রধান কবি বলিয়া অবশ্য গণনা করিতে হইবে। কারণ তিনি যে সময়ের লোক সে সময়ে ঐরূপ সুললিত ছন্দোবন্ধে রচনা করা সাধারণ ক্ষমতার কার্য্য নহে। তিনি তৎকালে অপরের অনুকরণ করিতে অধিক পান নাই, যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন তাহাই তাঁহার নৈসর্গিক-শক্তি-সম্ভূত। তাঁহার রচিত যে সকল গীত উদ্ধৃত হইয়াছে ও পরে হইবে, তৎপাঠেই পাঠকেরা এ বিষয়ের প্রমাণ পাইবেন।*

* 'বিশ্বকোষ'-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সুন্দর তুলনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—"বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস অপেক্ষা নানা বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু সরস, সরল কথায় চণ্ডীদাস যেরূপ মনের ভাব, হৃদয়ের যেরূপ নিখুঁত ছবি চিত্রিত করিয়াছেন, বিদ্যাপতির পদাবলীতে তেমন খাটিভাব অতি অল্পই লক্ষিত হয়। চণ্ডীদাস মনোরাজ্যের পরিদর্শক, বিদ্যাপতি বহির্জগতের চিত্রকর। একজন ভাবুক, অপর দার্শনিক।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনা যে অতি প্রাচীন, তদ্বিষয়ে সংশয়ই নাই। কিন্তু ইহাই বাঙ্গালার আদি রচনা—অর্থাৎ আদ্যকালে এই দুইজন ভিন্ন আর কেহই কোন বিষয়ে কোন রচনা করেন নাই—তাহা বলিতে পারা যায় না, প্রত্যুত ইহাঁদিগের রচনাতে যেরূপ কিঞ্চিৎ পারিপাট্য লক্ষিত হয়, তাহাতে

একজন সোজা কথায় সরল ভাবায় সাধারণের মন মাতাইয়াছেন, অন্তর্ব্যক্তি রচনা চাতুর্য্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও শব্দ বিদায় (বিন্যাসে?) যথেষ্ট পাণ্ডিত্য দেখাইয়া পণ্ডিতের সুখ্যাতি ভাজন হইয়াছেন। বিদ্যাপতি খাঁটি মৈথিল কবি, আর চণ্ডীদাস আমাদের স্বদেশীয় একজন বাঙ্গালী কবি।"—বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস "উভয়েই সুকবি ছিলেন, কিন্তু বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের আমরা বিশেষ প্রশংসা করি, কারণ বিদ্যাপতি কৃতবিদ্য ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষা হইতে অনেক রত্ন গ্রহণ করিয়া পদাবলী গ্রথিত করিয়া ছিলেন, কিন্তু চণ্ডীদাস, আপনার হৃদয় উৎস হইতে যাহা কিছু উৎসারিত হইয়াছে তাহাই সুমধুর সরল ভাষায় বিন্যাস করিয়াছেন। বিদ্যাপতির কবিতাতে ছন্দঃ পতন বা যতিঃ পতন প্রায় হয় না, চণ্ডীদাসের তাহা ভূয়োভূয়ঃ হইয়াছে, কিন্তু পিঞ্জরবদ্ধ শিক্ষিত পক্ষীর সুমিষ্ট গীতধ্বনির সহিত বনবিহঙ্গের মধুর কাকলীর যেরূপ প্রভেদ, বিদ্যাপতির সুললিত পদাবলীর চণ্ডীদাসের মর্ম্ম-উচ্ছসিত সঙ্গীত উল্লাসের সেইরূপ প্রভেদ"। ভারতী, ১ম বর্ষ ২৮৪। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন:—"আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কবি, এইগুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি একছত্র লেখেন ও দশ ছত্র পাঠকদের দিয়া লেখাইয়া লন।

বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন, তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় ও দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরও গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরও অধিক জানেন। চণ্ডীদাসের কথা এই যে, প্রেমে দুঃখ আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ করিবার নহে, প্রেমের যা কিছু সুখ সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে নিংড়াইয়া বাহির করিতে হয়। চণ্ডীদাস কহেন প্রেম কঠোর সাধনা। কঠোর দুঃখের তপস্যায় প্রেমের স্বর্গীয় ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

ইহাঁদেরও পূর্ব্বে যে, বাঙ্গালা রচনার কিছু অনুশীলন ছিল, কেহ কেহ কোন বিষয়ে কিছু লিখিয়াছিলেন—কালক্রমে সে সকলের লোপ হইয়াছে, অথবা

যখন মিলন হইল তখন বিদ্যাপতির রাধা কহিলেন,

"দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল
হরিমুখ হেরইতে সব দুর গেল।
যতহুঁ আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ।
রভসে আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল,
অধরহি পান বিরহ দূর গেল।
চির দিনে বিহি আজু পূরল আশ
হের-ইতে নয়ানে নাহি অবকাশ।
ভনহ বিদ্যাপতি আর নহ আধি,
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি।"

চণ্ডীদাসের রাধাশ্যামের যখন মিলন হয় তখন "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" কিছুতেই তৃপ্তি নাই।

..................চণ্ডীদাস জগতের চেয়ে প্রেমকে অধিক দেখেন। প্রাণের অপেক্ষা প্রেম অধিক।

"পরাণ সমান পিরীতি রতন
জুকিনু হৃদয়—তুলে,
পিরীতি রতন অধিক হইল
পরাণ উঠিল চুলে।"

প্রেমের পরিণাম নাই।

"নিতই নূতন পিরীতি দুজন
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়
পরিণামে নাহি থায়।"

এত বড় প্রেমের ভাব চণ্ডীদাস ব্যতীত আর কোন্ প্রাচীন কবির কবিতায় পাওয়া যায়?

অদ্যাপি স্থানে স্থানে আছে, আমরাই তাহার সন্ধান জানিতে পারি নাই, ইহাই বিলক্ষণ সম্ভব।+

যাহা হউক আদ্যকালে গদ্যে কোন গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল কি না, তাহা বিলক্ষণ সন্দেহস্থল। এই পুস্তকের ত্রিশ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ১৫ সংখ্যক পদে

বিদ্যাপতির সমস্ত পদাবলীতে একটিমাত্র কবিতা আছে, চণ্ডীদাসের কবিতার সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে :—

সখিরে, কি পুছসি অনুভব মোয়
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল। ইত্যাদি।

বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার মাধুর্য্য, বর্ণনার সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। যে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি একবারে মগ্ন হইয়া লিখিয়াছেন।

চণ্ডীদাসের প্রেম বিশুদ্ধপ্রেম। চণ্ডীদাস প্রেম ও উপভোগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন।

একস্থলে চণ্ডীদাস কহিয়াছেন,

"রজনী দিবসে হব পরবশে
স্বপনে রাখিব লেহা,
একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা।"

এ প্রেম বাহ্য জগতের দর্শন-স্পর্শনের প্রেম নহে, ইহা স্বপ্নের ধন, স্বপ্নের মধ্যে আবৃত থাকে, ইহা শুদ্ধমাত্র প্রেম আর কিছুই নহে। (সমালোচনা, ১২৯৪।)

+ দীনেশ বাবুও লিখিয়াছেন :—"বাঙ্গালা প্রাচীন কাব্যের এখনও ভালরূপ খোঁজ হয় নাই। আমরা যাঁহাদিগকে আদি কবির যশোমাল্য দিতেছি, তাঁহারাই আদি কি না, ঠিক বলা যায় না। প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের দ্বারা এই প্রাচীন ক্ষেত্রের আবাদ হইলে তাঁহাদের চেষ্টা ও গবেষণার হলাগ্রভাগে নূতন কবির কঙ্কাল প্রকাশ পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র হইবে না।" বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সং ১১৪

উল্লিখিত আছে যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস 'গদ্যপদ্যময় গীত' রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে গদ্য কখন দেখা যায় নাই এবং 'গদ্যপদ্যময় গীত' কিরূপ হইতে পারে, তাহাও সহজে বুঝিতে পারা যায় না; এই জন্য ওরূপলেখার উপর বিশেষ আস্থা প্রদর্শন অনাবশ্যক। বিশেষতঃ ইহা এক সাধারণ নিয়ম বলিয়া বোধ হয় যে, সকল দেশেই গদ্যের পূর্ব্বে পদ্যই প্রথম রচিত হয়। গ্রীসদেশে লিনস্, অর্ফিয়স্, মিউজিয়স্, হোমর এবং ইতালী অর্থাৎ রোমে লিবিয়স্, এণ্ড্রানিকস্ প্রভৃতি কবিগণ সর্ব্বপ্রথমে পদ্যেরই রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃতেও বেদ,* সংহিতা, রামায়ণ প্রভৃতি পদ্য গ্রন্থেরই প্রথম সৃষ্টি হয়। অতএব বাঙ্গালাতে যে, সে নিয়মের ব্যভিচার হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। পদ্যের মধ্যেও গীতই প্রথমে রচিত হয়। লোকে চিত্তবিনোদনজন্য স্বরসংযোগে গান গাইতে প্রবৃত্ত হইয়াই কবিত্বশক্তির প্রথম অঙ্কুর রোপণ করে। ঐ সকল গান প্রথমতঃ লিপিবদ্ধ থাকে না—বহুকাল পর্য্যন্ত জনগণের রসনা মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে; পরে ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বোক্ত লিনস্ হোমরাদির রচনা এবং বেদ রামায়ণাদি সকলই ঐরূপ গীতময়। অতএব বাঙ্গালারও আদ্যকালে পূর্ব্বোক্ত কবিদ্বয়ের অথবা তাদৃশ অন্য কোন কবির গীতময় রচনাই যে, প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই সম্ভব বোধ হয়।

এক্ষণে আদ্যকালে ভাষার কিরূপ অবস্থা ছিল, তদ্বিষয়ে অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক। বিদ্যাপতির যে কয়েকটি গীত পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে ও নিম্নে যে—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি-অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহিঁ শুনলু শ্রুতি-পথে পরস না গেল॥

* বেদকে আপাততঃ গদ্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহাতে এক প্রকার ছন্দ আছে এবং উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত নামক তিন স্বরের সহযোগে উহা উচ্চারিত হয়, অতএব উহাও পদ্য ও গীতগ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত।

কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইনু না বুঝিনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া যুড়ন না গেলি॥
কত বিদগধজন রস অনুমগন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে, প্রাণ যুড়াইতে, লাখে না মিলিল এক॥

প্রাচীন পদাবলী।*

এই গীতটি উদ্ধৃত হইল ইহাতে—এবং তৎপ্রণীত এইরূপ অপরাপর গীতে দৃষ্টিপাত করিলেই আপাততঃ বিলক্ষণ এই প্রতীতি জন্মিবে যে, ঐ সময়ে বাঙ্গালাভাষা হিন্দির সহিত অত্যন্ত মিশ্রিত ছিল—অন্যথা বাঙ্গালা গীতে হাম, কৈছন, মোয়, সোই, ঐছে ইত্যাদি ভূরি ভূরি হিন্দি শব্দ এবং হিন্দির ন্যায় ক্রিয়া কেন রহিল? কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, বিদ্যাপতি রচিত গীতে যেরূপ হিন্দিমিশ্রণ আছে, যদি ঐ সময়ের দেশভাষাই ঐরূপ হিন্দিমিশ্রিত হইত, তাহা হইলে তৎকালে যাহা কিছু রচিত হইয়াছে, তৎসমস্তেই ঐরূপ হিন্দিমিশ্রণ থাকিত—কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা নহে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস ইহাঁরা সমসাময়িক লোক। চণ্ডীদাসের যে সকল গীত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এবং পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত—"তোমার প্রেমে বন্দী হইলাম শুন বিনোদ রায়। তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥ শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি। ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লিখি॥

---

* চণ্ডীদাস হইতে একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

* * * * *

গুরুজনমাঝে যদি থাকিয়ে বসিয়া। পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥
পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল। তাহা নেহারিয়ে আমি হই যে বিকল॥
নিশিদিশি বন্ধু তোমায় পাসরিতে নারি। চণ্ডীদাসে কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥"

(প, ক, ত, ৭৮৬)

এই গীতে এবং এইরূপ সকল গীতেই হিন্দির ভাগ প্রায় কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব বিবেচনা কর যে, যদি ঐ সময়ের ভাষাই ওরূপ হিন্দিমিশ্রিত হইত, তাহা হইলে সমসাময়িক দুই কবির রচনা কখন এরূপ বিসদৃশ হইতে পারিত না।

দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যাপতিরও কোন কোন গীতে হিন্দির অংশ নাই—চণ্ডীদাসেরও দুই একটি গীতে হিন্দির অংশ বিলক্ষণ আছে এবং ইঁহাদিগের শতাধিকবৎসরপরবর্ত্তী গোবিন্দদাস প্রভৃতির প্রায় সমস্ত গীতেই বিদ্যাপতির অপেক্ষাও অধিক হিন্দি আছে। উদাহরণার্থ নিম্নভাগে আরও কয়েকটি গীত উদ্ধৃত হইতেছে।

"রাই জাগ রাই জাগ শুকসারী বলে। কত নিদ্রা যাও কাল মাণিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হইল বলি যে তোমারে। অরুণ কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
সারী বলে শুক তুমি গগনে উড়ি ডাক। নব জলধর আনি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে শুন সারী আমরা পশু পাখী। জাগাইলে না জাগে রাই ধরম্ কর সাখী
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজঠাঞি। অরুণ কিরণ হবে আমি ঘরে যাই"॥

(প, ক, ত, ৬৭১)

* * * "তুহু একে রমণীশিরোমণি রসবতী কোন্ ঐছে জগমাহ।
তোহারি সমুখে শ্যামসঞে বিলসব কৈছন রস নিরবাহ॥
ঐছন সহচরীবচন শ্রবণ ধরি সবমে ভরমে মুখ ফেরি॥
ঈষত হাসি মনে মান তেয়াগল উলসিত দোঁহে দোঁহা হেরি॥
* * দ্বিজ চণ্ডীদাস আবির জোগায়ত সকল সখীগণ সাথে"॥

ঐ ১৪৮৮।

"কাহে পুন, গৌরকিশোর। অবনতমাথে, লিখত মহীমণ্ডল,নয়নে গলয়ে ঘন লোর
কনক বরণ তনু, ঝামর ভেল জনু, জাগয়ে নিদ নাহি ভায়।
যোই পরশে পুন, তাকর বদন ঘন, ছল ছল লোচনে চায়॥
খেনে খেনে বদন, পাণিতলে ধারই, ছোড়ই দীঘ নিশাস।
ঐছন চরিতে, তারল সব নর-নারী, বঞ্চিত গোবিন্দদাস"। (ঐ ১৮৩৩)।

অতএব এ স্থলে বিবেচনা করিতে হইবে যে, এক সময়ের দুইজন কবির মধ্যে একের অধিকাংশ রচনাতেই হিন্দির অত্যন্ত মিশ্রণ, কিন্তু কোন কোন রচনাতে প্রায় কিছুই নাই এবং দ্বিতীয়ের সমস্ত রচনাতেই হিন্দির সংস্রব প্রায় কিছুই নাই কিন্তু কোন কোনটিতে বিলক্ষণ আছে। অতএব ঐ সময়ে এ দেশের সাধারণ ভাষাই ঐরূপ হিন্দিমিশ্রিত ছিল কি না এবং উক্ত কবি-দ্বয়ের ওরূপ বিসদৃশ রচনা কেন হইল? তদ্বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক।

আমরা যখন বিদ্যাপতিকে মিথিলাবাসী বলিয়াছি, তখনই এ প্রশ্নের সমাধান হইয়াগিয়াছে। যদিও তৎকালে বঙ্গদেশ ও মিথিলা অভিন্নরাজ্য ও সম্ভবতঃ এক-ভাষা-ভাষী ছিল স্বীকার করা যায়, তথাপি পরস্পর অত দূরবর্ত্তী উক্ত দুই দেশের ভাষাগত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ছিলনা, তাহা সম্ভব নহে। বিদ্যাপতির রচনায় সেই বৈলক্ষণ্য প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির কয়েকটি গীত কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত শব্দের দ্বারা এবং অধিকাংশ গীত মিথিলা-প্রচলিত শব্দ দ্বারা রচিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তৎকালে উভয় দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং কিয়ৎপরিমাণে এক-ভাষা-ভাষিত্ব থাকায় কবির এরূপ বোধও হইয়া থাকিবে যে, তাঁহার প্রণীত গীত সকল সাধারণতঃ উভয় দেশেরই কৃতবিদ্য লোকে বুঝিতে পারিবে।

বিদ্যাপতির রচনায় হিন্দীসম শব্দের মিশ্রণের হেতু উক্তরূপে নির্ণীত হইতে পারে সত্য বটে, কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা হয় যে, উহাঁরই সমসাময়িক প্রকৃত বঙ্গদেশবাসী চণ্ডীদাসের কোন কোন রচনায় এবং তদুত্তরকালবর্ত্তী গোবিন্দদাস প্রভৃতির রচনায় বহুল হিন্দীসম শব্দের মিশ্রণ কেন হইল? এ প্রশ্নের মীমাংসা

করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, যে সকল রচনার উপর নির্ভর করিয়া এই বিচার করা যাইতেছে, তৎসমস্তই রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনাবিষয়ক সঙ্গীত। উক্তরূপ সংগীত প্রথমে বৃন্দাবনের সন্নিহিত স্থানে এবং ব্রজভাষাতেই বিরচিত হইয়াথাকিবে। বঙ্গদেশবাসী কবিগণ তাহা হইতেই ঐ প্রথা প্রথমে শিক্ষা করেন এবং শিক্ষা করিয়া, যাঁহাদিগের ঐ ভাষা নিতান্ত মধুর বলিয়া বোধ হয়, তাঁহারা ঐ মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, কিছু দুর্ব্বোধ হইলেও ঐ ভাষার অনেক শব্দ ও ক্রিয়া স্বদেশীয়ভাষার সংগীতমধ্যে বিনিবেশিত করিয়াছেন; কিন্তু কেহ কেহ আবার মাধুর্য্য-বোধ-সত্ত্বেও কিছু দুর্ব্বোধ বলিয়া উহা গ্রহণে তাদৃশ যত্ন করেন নাই। অতএব গীতমধ্যে ব্রজভাষায় শব্দগ্রহণ লেখকের ইচ্ছানুরূপ থাকায় এবং প্রত্যেক লোকেরই রুচি বিভিন্নপ্রকার হওয়ায় চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসাদির রচনা ওরূপ বিসদৃশ হওয়া অসঙ্গত হয়না। পূর্ব্বোদ্ধৃত গীতাবলীতে যেসকল হিন্দিসম দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল হিন্দিই নহে; উহার কতক প্রাকৃত ও কতক ব্রজভাষা—অথবা তাহাদেরই কোনরূপ অপভ্রংশ। দহসি, পারই, পুছসি, ধারই, হম্, সো, তুহ ইত্যাদি শব্দ ত অবিকল প্রাকৃত এবং ঐছন, যৈছন, তৈছন, কৈছন, হিয়া, ঈসা, যীসা, তীসা, কীসা, কাহে ইত্যাদি শব্দ প্রাকৃতের অপভ্রংশ। তদ্ভিন্ন যাকর, কতিহুঁ, মোতিম, ভেল, রহই, চললহি, পন্থহি, গায়ত, পাওল, লখই, তহি, জানল, করল, ভাসল, নেহারনু, রাখনু, কাহু, না পেখ, তুহু, জগমাহ, বিলসব, জোগায়ত, জনু, লিখত—ইত্যাদি পদ সকলের একটিও খাঁটি হিন্দি নহে; বোধহয় ওগুলি ব্রজভাষা হইবে। তবে এক্ষণকার কাহারও কাহারও মতে হিন্দি ও ব্রজভাষা একই—অথবা ঘনিষ্ঠরূপে পরস্পর নিতান্তসম্পৃক্ত—হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দূভাষা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। যদি এ মত গ্রাহ্য করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রজভাষার শব্দ সকলেকে হিন্দি বলিলেও আমাদের কোন আপত্তি নাই। যাহাহউক দেখাযাইতেছে যে, কৃষ্ণচরিতবর্ণনে ব্রজ-ভাষামিশ্রিত রচনাই অনেকের অধিকতর প্রীতিকর হয়। বোধহয় ব্রজ-ভাষার মাধুর্য্যই ইহার একমাত্র কারণ নহে, পবিত্রতাবোধও কিছু কারণ

হইতে পারে। যে সকল কৃষ্ণপরায়ণ ভক্ত পরম পবিত্রবোধে ব্রজের মৃত্তিকা পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ব্রজের ভাষাকে ওরূপ সমাদর করা অসম্ভব নহে। পূর্ব্বে গোবিন্দদাসের যে গীতটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে ব্রজভাষার শব্দ অনেক আছে। গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী লোক। তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার পরেও জ্ঞানদাস, রাধামোহনদাস, কবিশেখর, রামানন্দ রায় প্রভৃতি যে সকল কবি সঙ্গীতরচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের রচনাতেও ব্রজভাষার কথা অনেক আছে—কিন্তু সেই সময়েই অথবা তাহারই সন্নিকট সময়ে চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, জীবগোস্বামীর করচা প্রভৃতি, সঙ্গীতময় নহে এরূপ, যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাতে ব্রজভাষার ভাগ অতি অল্পই দেখা যায়। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, বিদ্যাপতি প্রভৃতির সময়েও কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীতময় রচনাতে ব্রজভাষা বা হিন্দির সংস্রব যেরূপ অধিক ছিল, তৎকালের সাধারণভাষাতে সেরূপ ছিলনা। যে সময়ের ভাষাতে ব্রজভাবার সংস্রব কিছুমাত্র নাই, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, সে সময়েরও দুই এক জন কবি, যখন সাধ করিয়া ব্রজভাষামিশ্রিত গীত লিখিতে গিয়াছেন, তখন ও বিষয়ে আমাদের আর কিছুই বক্তব্য নাই। সে গীত এই—

"যতহুঁ নিরখত, অতহুঁ বরিখত, নয়ন অবিরত বরিখে" ৺ মদনমোহন তর্কলঙ্কার।

"কাহে, সোই জীয়ত মরত বিধান।

"ব্রজকিশোর সোই, কাঁহা গেল ভাগই, ব্রজজন টুটায়ল পরাণ।"

৺বঙ্কিমচন্দ্র।

তবে ইহাতে এরূপ সিদ্ধান্তও করা যাইতেছে না যে, আমরা যাহাকে আদ্যকাল বলিতেছি, তখন যেরূপ বাঙ্গালা ছিল, এখনও অবিকল সেইরূপ বাঙ্গালাই আছে; তাহা কখন হইতে পারে না। আকরোত্থিত অসংস্কৃত বস্তুর গাত্র নিরীক্ষণকরিলে তাহাতে যেমন আকরিক অন্যান্য দ্রব্যের সংযোগ লক্ষিত হয়, সেইরূপ আদ্যকালের বাঙ্গালাতে তদাকরস্থিত সংস্কৃত বা প্রাকৃতের অধিকসংস্রব লক্ষিত হইবে, তাহা যুক্তিসঙ্গতই বটে। এই-

জন্যই পুছসি, দহসি, করই, হসই, বোলে, ইত্যাদি সংস্কৃত বা প্রাকৃত ক্রিয়ার যোগ প্রাচীন বাঙ্গালায় অনেক দেখা যায়।

বাঙ্গালাভাষায় এক্ষণে যেরূপ শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, আমাদিগের অবলম্বিত আদ্যকালের বাঙ্গালাতেও রজনীপ্রভাত, মৃগমদসার, নবজলধর, বন্দী, ধরণী, গুরুজন, মধুযামিনী, পুলক ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ-সকলই অনেক ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এক্ষণকার ন্যায় সমাস-ঘটিত বড় বড় কথা ব্যবহৃত হইত না। বিশেষণও এক্ষণকার ন্যায়ই তখন প্রায় বিশেষ্যের পূর্ব্বেই বিনিবেশিত হইত। স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে তাহাতে যে, স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন ঈ-আ দিতেই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম ছিল না—মধুরতা ও শ্রুতিকটুতার অনুরোধে রচয়িতার ইচ্ছামতই প্রদত্ত হইত। ফলতঃ তৎকালে বাঙ্গালার কোন ব্যাকরণ ছিল না—সুতরাং রচয়িতাদিগকে ব্যাকরণের নিয়মে চলিতে হইত না। বাঙ্গালা সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইলেও সংস্কৃত মহামাহাত্ম্যশালী বলিয়া ক্রমশঃ উহারই অনুসরণ বাঙ্গালায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সুতরাং সংস্কৃতের বাক্যবিন্যাসপ্রণালী যেরূপ, বাঙ্গালা-রচয়িতারা ক্রমে ক্রমে সেইরূপই করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। স্থূল কথা এই যে, আদ্যকালের যে সকল গ্রন্থ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—তাহাদের রচনার সহিত এক্ষণকার রচনার আত্যন্তিকী বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না। তবে স্থল বিশেষে ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, কারক, বিভক্তি ও সর্ব্বনাম প্রভৃতিতে স্পষ্ট প্রাচীনতা দেখা যায়, তাহা অবশ্য বলিতে হইবে। তাৎকালিক দেশভাষায় প্রাকৃত, হিন্দি বা ব্রজভাষার অত্যধিকরূপে মিশ্রণ না থাকুক, কিন্তু অল্পমিশ্রণ ছিল তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন আর একটি কার্য্যে প্রাচীন ও আধুনিক বাঙ্গালায় অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা-যায়।—সংযুক্ত বর্ণের বিশ্লেষ-করণ-রূপ বিপ্রকর্ষণকার্য্য আধুনিকপদ্যেও অনেক আছে বটে, কিন্তু প্রাচীনপদ্যে ঐ কার্য্যের অত্যন্ত আধিক্য অনুভূত হয়। সেই বিপ্রকর্ষণকার্য্য এইরূপ—মূর্ত্তি=মূরতি, নির্ম্মল=নিরমল, নির্ব্বাহ=নিরবাহ, ধর্ম্ম=ধরম, কর্ম্ম=করম, প্রমাণ=পরমাণ, লক্ষ্মী—লছিমা,

ভস্ম=ভসম, প্রীতি=পিরীতি, দর্শন=দরশন, তৃপ্ত=তিরপিত, স্পর্শ=পরশ, ভ্রম=ভরম, প্রসঙ্গ=পরসঙ্গ, দ্রবে=দরবয়ে, ব্যক্ত=বেকত ইত্যাদি।

এ স্থলে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে—আদ্যকালে ষ কে লোকে অনেকস্থলে খ বলিয়া উচ্চারণ করিত, যথা—পুরুষ=পুরুখ, ঋষভ=ঋখভ ইত্যাদি। হিন্দিতে অদ্যাপি এইরূপ ব্যবহার আছে।

ছন্দ—আদ্যকালের যে সকল পদ্যরচনা দেখা যায়, তাহাতে পয়ার ও ত্রিপদী এই দুইটিমাত্র ছন্দ দৃষ্ট হয়। এক্ষণকার চলিত পয়ারের নিয়ম এই যে, উহার দুইটি সমান অংশ থাকে। তাহার প্রথম অংশটিকে পূর্ব্বার্দ্ধ ও শেষটিকে পরার্দ্ধ কহে। পূর্ব্বার্দ্ধের উপান্তিম ও অন্তিম বর্ণ যাহা হইবে, পরার্দ্ধের ঐ ঐ বর্ণও অবিকল তাহাই হওয়া চাই। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক অর্দ্ধেরই ৮ম ও ১৪শ অক্ষরে যতি—অর্থাৎ বিরাম থাকা আবশ্যক। ত্রিপদীতেও দুইটি অর্দ্ধ থাকে, প্রত্যেক অর্দ্ধে বিংশতিটি করিয়া অক্ষর; উভয় অর্দ্ধের শেষবর্ণে পয়ারের ন্যায় মিল, প্রত্যেক অর্দ্ধেই ষষ্ঠ, দ্বাদশ ও বিংশ অক্ষরে যতি এবং ৬ষ্ঠ ও ১২শ বর্ণে পয়ারের ন্যায় মিল। এই ত্রিপদীকে লঘুত্রিপদী কহে—এতদ্ভিন্ন অন্যবিধ ত্রিপদীও আছে। এই পয়ার ও ত্রিপদীর শেষবর্ণে মিলন থাকাতে ইহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দ কহে।

এক্ষণে যেরূপ অক্ষরগণনার নিয়মানুসারে বিশুদ্ধ পয়ার ও ত্রিপদী রচিত হইতেছে, আদ্যকবিরা সেরূপ নিয়মের বশবর্ত্তী ছিলেন না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাঁহাদের পদ্যসকল সঙ্গীতময়—সুতরাং সঙ্গীতের স্বরের অনুরোধে, যেখানে আবশ্যকবোধ করিয়াছেন সেইখানেই, তাঁহারা যতি দিয়াছেন—তাহাতে কোন স্থলে অক্ষর অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, কোন স্থলে বা কমিয়া পড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন তাঁহারা বর্ণের মিলনবিষয়েও অধিক সাবধান ছিলেন না। যে সকল বর্ণের উচ্চারণ কর্ণে প্রায় একবিধ বলিয়াই বোধ হয়, তাঁহারা তাদৃশ বর্ণেরও অর্থাৎ বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণের এবং ৩য় ও ৪র্থ বর্ণের—যথা ক ও খ এর, ত ও থ এর, গ ও ঘ এর এবং ব ও ভ এর—

মিল রাখিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহারা ওবিষয়ের একপ্রকার স্থষ্টিকর্ত্তা, তাঁহাদিগকে কাহারও শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় নাই, তাঁহাদিগেরই স্থষ্ট শৃঙ্খলা আমরা পরিতেছি।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, পয়ার ও ত্রিপদীর মূল কি?—যখন বাঙ্গালা-ভাষারই আদি মূল সংস্কৃত হইল, তখন তদঙ্গীভূত ছন্দের মূলও যে সংস্কৃতই হইবে ইহাই বিলক্ষণ সম্ভব। সংস্কৃতে অনুষ্টুপ্ ছন্দ যেরূপ সাধারণ, বাঙ্গালায় পয়ার সেইরূপ। স্থতরাং পয়ারকেই অনুষ্টুভের স্থানীয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা যে, অনুষ্টুপ্ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা সহসা বলিতে পারা যাইতেছে না। যেহেতু উভয়ের প্রকৃতি একরূপ নহে। প্রথমতঃ অনুষ্টুপ্ চতুষ্পদ, ইহা দ্বিপদ; অনুষ্টুভে সমুদয়ে ৩২ অক্ষর, ইহাতে ২৮; অনুষ্টুভে বর্ণের গুরু লঘুতার নিয়ম আছে, ইহাতে তাহার প্রায় কিছুই নাই—শুনিতেও দুই ছন্দ কর্ণে একবিধ বলিয়া কোনমতেই বোধ হয় না। এইজন্য কেহ কেহ কহেন, বাঙ্গালার বর্ত্তমান পয়ার সংস্কৃত কোন ছন্দের অনুরূপ নহে, উহা পারসীর 'বয়েৎ' নামক ছন্দের অনুকারক। একটি বয়েৎ নিম্নভাগে উদ্ধৃত হইল—

করীমা ববখ্সায় বর্হালমা। কে হাস্তেম্ আসিরে কমন্দে হাওয়া॥ (পন্দেনামা)

পারসীর শ্লোক বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিয়া তাহার বর্ণ সংখ্যাদি করা যুক্তিসঙ্গত হয় না বটে, কিন্তু আমরা ইহা অন্য অক্ষরে লিখিয়া বিচার করিতে পারি না—স্থতরাং ইহা বাঙ্গালাতেই লিখিয়া বিচার করা যাইতেছে।—দেখ এই শ্লোক ত্রয়োদশ অক্ষরে পরিমিত; ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে অষ্টাক্ষরের পর যতি আছে বটে, কিন্তু পরার্দ্ধে সপ্তাক্ষরের পর; পূর্ব্বার্দ্ধের যতির পর ৫টি অক্ষর এবং পরার্দ্ধের যতির পর ৬টি অক্ষর অবশিষ্ট থাকে, এবং কর্ণেও পয়ারের সহিত একরূপতা ঠিক বোধ হয় না। ফলতঃ পয়ারের সহিত উহার কিঞ্চিন্মাত্র সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তন্মাত্র দর্শনেই এক বিজাতীয় ভাষার ছন্দকে বাঙ্গালা পয়ারের মূল বলিতে যাওয়া অপেক্ষা সংস্কৃতের যে ছন্দের সহিত উহার কতক সাদৃশ্য আছে, তাহাকেই উহার

মূল বলা সঙ্গত। সম্ভ্রম নষ্ট করিয়া যার তার অধমর্ণ হওয়া অপেক্ষা, যাহার নিকট সম্ভ্রম রাখিবার প্রয়োজন নাই, তাদৃশ চিরন্তন মহাজনের খাদক বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেওয়াই ভাল। আমরা দেখিতেছি—গীতগোবিন্দের স্থানে স্থানে যে কতকগুলি গীত আছে সে সকলের সহিত পয়ারের কতক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। নিম্নে কয়েকটি সেই গীত উদ্ধৃত হইল—

রাধিকা তব বিরহে কেশব!—

সরস মসৃণমপি, মলয়জপঙ্কং। 'পশ্যতি বিষমিব, বপুষি সশঙ্কং'। ৪র্থ সর্গ, ১২ শ্লোক
শ্বসিত পবনমনুপমপরিণাহং। মদন দহনমিব, বহতি সদাহং॥ „ ১৩ „
দিশি দিশি কিরতি স-জলকণজালং। নয়ননলিনমিব, বিগলিতনালং॥ „ ১৪ „
নয়নবিষয়মপি, কিশলয়তল্পং। 'গণয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পং'॥ „ ১৫ „
হরিরিতি হরিরিতি, জপতি সকামং। 'বিরহবিহিত মরণেব নিকামং'॥ „ ১৭ „

এই সকল ছন্দোবদ্ধ গীত অক্ষরগণনানুসারে রচিত নহে, মাত্রা * গণনানুসারে রচিত। ইহার প্রতি অর্দ্ধে ষোল মাত্রা, অষ্টমমাত্রার পর যতি এবং উভয় অর্দ্ধের শেষবর্ণে মিল। সুতরাং মাত্রার নিয়মানুসারে গণনায় কোন অর্দ্ধের অক্ষর স্থলবিশেষে বাড়িয়া যায়, স্থলবিশেষে কমিয়া পড়ে। সেইজন্যই অপরাপর পাদ সকল পয়ারের তুল্য হইলেও ' ' চিহ্নিত ২য়, ৮ম ও ১০ম পাদে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যাহা হউক এক্ষণে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উপরিউক্তবিধ গীত-ময়বৃত্ত হইতেই পয়ারের সৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চারণস্বরেও এই বৃত্ত এবং পূর্ব্বলিখিত—

কতিহুঁ মদনতনু, দহসি হামারি। হাম নহু শঙ্কর হুঁ বর নারী॥

ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত পদকল্পতরুর ৮৬৮ সংখ্যক প্রাচীন পয়ার একরূপই বোধ হয়। 'ত্রিপদী'ও গীতগোবিন্দের নিম্নলিখিত প্রকার গীত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এ কথাও এক্ষণে বলা যাইতে পারে—

* লঘুস্বর একমাত্রা, গুরুস্বর দুইমাত্রা। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বস্বর এবং অনুস্বার ও বিসর্গ-বিশিষ্ট স্বর গুরু হয়।

পততি পতত্রে, বিচলতি পত্রে, শঙ্কিত ভবদুপযানং।
রচয়তি শয়নং, সচকিতনয়নং, পশ্যতি তব পন্থানং ॥
মুখরমধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং, রিপুমিব কেলিষু লোলং।
চল সখি কুঞ্জং, সতিমিরপুঞ্জং, শীলয় নীলনিচোলং ॥

৫ম সর্গ, ১০, ১১ শ্লোক,

এই বৃত্তের প্রতি অর্দ্ধে ২৮টি মাত্রা আছে, ৮ম এবং ১৬শ মাত্রায় যতি ও মিল এবং উভয় অর্দ্ধের শেষবর্ণেও মিল। ইহারও অনেক পঙ্‌ক্তি অক্ষরগণনানুসারেও ত্রিপদীর সহিত একরূপ হয় এবং কর্ণেও উভয়েরই উচ্চারণ একরূপ বলিয়াই বোধ হয়। অতএব এই সঙ্গীতময়বৃত্তেব অনুকরণেই যে, ত্রিপদীর উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সম্ভব বিবেচনা করিতে গেলেও ইহাই প্রতীয়মান হয়। কারণ জয়দেব বাঙ্গালাদেশের বীরভূমপ্রদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—তাঁহার গীতগোবিন্দ অতি কোমল, ললিত ও মধুর ভাষায় বিরচিত—তজ্জন্যই লোকের মন বিলক্ষণ আবর্জ্জিত হয়—বিশেষতঃ উহা পরমারাধ্য রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণন-সংক্রান্ত সঙ্গীতময় হওয়ায় এবং উক্ত সঙ্গীতের অন্যতমে "দেহি পদপল্লব মুদারং" এই অংশটি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক লিখিত হওয়ার প্রসিদ্ধি থাকায়, উক্তগ্রন্থ ভাগবতদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিল। সুতরাং আদ্য কবিরা বাঙ্গালায় উক্তরূপ গীতবিরচনে প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশসম্ভূত তাদৃশ শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকে আদর্শ করিয়া স্বকীয় গীতের ছন্দোরচনা করিবে, ইহা যুক্তি বহির্ভূত নহে। কিন্তু এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আধুনিক পয়ার ও ত্রিপদীতে অক্ষরগণনার যেরূপ নিয়ম হইয়াছে পূর্ব্বে তাহা ছিল না। আদ্য কবিরা বোধ হয় প্রথমে মাত্রানুসারেই উক্তরূপ পদ্যের রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—কতিহুঁ মদনতনু ইত্যাদি পদ্য মাত্রাগণনানুসারেও প্রায় ঠিক হয়। কিন্তু বাঙ্গালাতে মাত্রা গণনার রীতি রক্ষা করা তাদৃশ সুবিধাজনক হয় না দেখিয়া, তদ্বিষয়ে তাঁহারা ক্রমশঃ শিথিলাদর হন এবং সুরের অনুরোধে আবশ্যকমত বিরাম দিয়া যান। অক্ষরগণনাব রীতি কালক্রমে

আপনা আপনিই হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা তদ্বিষয়ে কোন নিয়ম পদ্ধতি করিয়া যান নাই এবং তদনুসারে চলেনও নাই।

'পয়ার' এই শব্দটি কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারা যায় না, কিন্তু বোধ হয়, ইহা 'পাদ' শব্দের অপভ্রংশে 'পায়া' বা 'পয়া' শব্দ উৎপন্ন—যথা—সেপায়া, চৌপায়া, খাটের পায়া ইত্যাদি এবং ঐ 'পয়া' হইতেই পয়ার শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে, অতএব 'পয়াঁর' শব্দের অক্ষরার্থ পাদ (চরণ) বিশিষ্ট। ক্রমশঃ উহা নির্দ্দিষ্টরূপ ছন্দো—বোধার্থ যোগরূঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

'ত্রিপদী' ইহা সংস্কৃত শব্দ। উহার প্রতি অর্দ্ধে ৩ স্থানে যতি, অথবা উহার ৩টি করিয়া পদ (চরণ) থাকাতে উহাকে 'ত্রিপদী' কহে।

কৃত্তিবাস-রামায়ণ *।

কবি কৃত্তিবাস কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বা কোন্সময়ে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার সপ্ত কাণ্ড রামায়ণের কোন স্থানে তাহার কিছু মাত্র উল্লেখ নাই। তাঁহার গ্রন্থ প্রসিদ্ধ প্রাচীনতম পুরাণের উপাখ্যান সুতরাং গ্রন্থবর্ণিত রীতি নীতি প্রভৃতি দর্শনে সময়ের সম্পূর্ণ অনুমান করিবার উপায় নাই।

কবি ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন প্রসঙ্গে আক্না, মাহেশ, মেড়তলা, খড়দহ, নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি মূল রামায়ণে অনুল্লিখিত কয়েকটি স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন।

নবদ্বীপ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

* 'বিশ্বকোষ' সঙ্কলয়িতা শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অভিধানের 'বাঙ্গালাসাহিত্য' প্রকরণের অষ্টাদশ ভাগ, ৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"রামায়ণের রচয়িতা বা অনুবাদকও বহু। তন্মধ্যে কৃত্তিবাস, অদ্ভুতাচার্য্য, অনন্তদেব, ফকির রামকবিভূষণ, কবিচন্দ্র, ভবানী শঙ্কর বন্দ্য, লক্ষ্মণ বন্দ্য, গোবিন্দ দাস, ষষ্ঠীবর ও তৎপুত্র

আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া। ...
সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম,
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করেন বিশ্রাম।
আদিকাণ্ড।

এখন কথা হইতেছে কৃত্তিবাস নবদ্বীপকে সপ্তদ্বীপের সার বলিলেন অথচ নবদ্বীপচন্দ্র চৈতন্যদেবের নাম উল্লেখ করিলেন না, ইহাতে বোধ হয় যে তিনি চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে আবির্ভূত হন এবং তাঁহার সময়েও নবদ্বীপে প্রধান প্রধান পণ্ডিতের বাস ছিল।

কবির কাল নির্ণয়ের আর একটি উৎকৃষ্ট উপায় পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানকালের রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে 'ফুলিয়া' মেলের জন্য ফুলিয়া গ্রাম বিখ্যাত হইয়াছে। কৃত্তিবাস ভরদ্বাজ গোত্রীয় ও মুখটি বংশীয় ছিলেন; কিন্তু তখন, 'মুখোপাধ্যায়', 'বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রভৃতি উপাধির সৃষ্টি হয় নাই; তিনি কৃত্তিবাস উপাধ্যায় বা ওঝা †; তাঁহার পিতা বনমালী উপাধ্যায়, পিতামহের নাম মুরারি ওঝা, মুরারি ওঝার পিতামহ নৃসিংহ (নরসিংহ) ওঝা রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য স্বীয় আবাস-স্থান ত্যাগ করিয়া নদীয়া জেলায় রাণাঘাটের এক ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ফুলিয়াতে আসিয়া বাস করেন। কৃত্তিবাসের সময়ে ভাগীরথী ফুলিয়া গ্রামের নিম্ন দিয়া

গঙ্গাদাস সেন, জগৎরাম বন্দ্য, জগৎবল্লভ, শিবচন্দ্র সেন, জগৎবল্লভ, ভিষক্ গুরুদাস, দ্বিজ রামপ্রসাদ, দ্বিজ দয়ারাম, রামমোহন ও রঘুনন্দন গোস্বামী এই ২৯ জন? কবির সন্ধান পাইয়াছি। এই সকল রামায়ণ রচক দিগের মধ্যে কবি কৃত্তিবাসই অগ্রণী।"

† পূর্ব্বে শাস্ত্র ব্যবসায়ী অনেক ব্রাহ্মণের ওঝা উপাধি ছিল, 'ওঝা' শব্দ সংস্কৃত উপাধ্যায় শব্দের অপভ্রংশ। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে সাঁই ওঝা, দনাই ওঝা প্রভৃতির বিবরণে ঐ কথাই সপ্রমাণ হইয়া থাকে। এক্ষণেও দিনাজপুর, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ওঝা উপাধি বিশিষ্ট অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। ঘটক দিগের মিশ্রগ্রন্থে অনেক কুলীন সন্তানের ও 'ওঝা' উপাধি দৃষ্ট হয়। এক্ষণে বিষবৈদ্য ও ডাইন পিশাচাবিষ্টদিগের চিকিৎসকদিগকে ওঝা বলিয়া থাকে।

প্রবাহিতা † ছিলেন। কবির স্বরচিত আত্মচরিত হইতে এই বিষয় জানা যায়।

বঙ্গের রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের অনেক গুলি মেল বা বিভাগ আছে, যথা—ফুলিয়া, খড়দহ, সর্ব্বানন্দী, বল্লভী ইত্যাদি। সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসের জীবিতাবস্থায় মেলবন্ধন হয় নাই, তাঁহার মৃত্যুর পরে হয়। কেননা তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র মালাধর খান ও তাঁহার খুল্লতাত পৌত্র চন্দ্রপতি ‡ প্রভৃতিকে লইয়া মেল বন্ধন হইয়াছিল। ফুলিয়া মেলের প্রথম ব্যক্তি গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য কৃত্তিবাসের পৌত্রপর্য্যায়ের লোক এবং তাঁহার সমপর্য্যায়

অপর অনুবাদ রচকদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। "কৃত্তিবাসের পর যতগুলি রামায়ণ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'অনন্ত রামায়ণ' ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার প্রাচীনত্বের আর একটি বিশেষ প্রমাণ—ভাষা। ভাষা অত্যন্ত জটিল, সুতরাং ইহার প্রাচীনত্ব স্বীকারে কাহারও ভিন্ন মত হইবার অবসর দেখা যায় না। ইহার রচনাকাল চারি শত বৎসরের কম নহে। গ্রন্থের শব্দ-বিন্যাস দৃষ্টে গ্রন্থকারকে কেহ কেহ শ্রীহট্ট বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের অধিবাসী বলিয়া মনে করেন। এ গ্রন্থের ভাষা কিছু স্বতন্ত্র ও দুরূহ শব্দ-বহুল। যথা—

কাহার ঝিয়ারি তুহ্মি কাহার ঘরণী।
কিবা নাম তুহ্মার কহিব সুলক্ষণি॥
জনকনন্দিনী মঞি নাম মোর সীতা।
দসরথ পুত্র ছীরাম বিবাহিতা॥
পিতৃবাক্য পালি রাম বনে আসিলেন্ত।
লক্ষ্মণের সহিতে মৃগ মারিব গৈছন্ত॥ ইত্যাদি

অদ্ভুতাচার্য্য রচিত একখানি প্রাচীন রামায়ণ পাওয়া গিয়াছে। এই কবির পূর্ব্বনাম নিত্যানন্দ, ব্রাহ্মণ বংশে ইঁহার জন্ম। ইনি অদ্ভুতাচার্য্য আখ্যা লইয়া সপ্তকাণ্ড রামায়ণ

† এক্ষণে গঙ্গা দুইক্রোশ পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছেন। সেই খানে বয়ড়া গ্রাম। বয়ড়া গ্রামের ডাকঘরের নাম ফুলিয়াবয়ড়া। এই ফুলিয়া গ্রাম হইতেই 'ফুলিয়ামেলের' নাম-করণ হইয়াছে।

‡ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ২৩৭ পৃষ্ঠা।

গোপাল ঘটক মেল বন্ধনের সময় জীবিত ছিলেন। ১৪০৭ শকে রচিত ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী গ্রন্থে 'কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ সৌম্যঃ শান্তো জনপ্রিয়ঃ' এই ছত্রটি পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪০২ শকে মেল বন্ধন হইয়াছিল; সে সময়ে কৃত্তিবাস জীবিত ছিলেন না। ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ধরিয়া লইলেও চৈতন্য দেবের ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩৪২ শকে (১৪২০ খৃঃ অব্দে) কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন বলা যাইতে পারে।

. . . .

প্রকাশ করেন। নিত্যানন্দ নিজে লেখাপড়া জানিতেন না, শুধু দৈবশক্তিবলে রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার উপাধি হইয়াছিল অদ্ভুতাচার্য্য। তাঁহার রামায়ণে সীতাকে কালীর অবতার রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত রামায়ণে উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ মালদহ, রাজসাহী ও বগুড়া জেলার প্রচলিত শব্দ যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে।

* * * * * *

"কৃত্তিবাসের প্রায় শত বর্ষ পরে পশ্চিম বঙ্গে একজন মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম শঙ্কর কবিচন্দ্র। ইঁহার পিতার নাম মুনিরাম চক্রবর্ত্তী। শঙ্কর মল্ল-বংশীয় বন-বিষ্ণুপুরাধিপ গোপাল সিংহের আদেশে সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ রচনা করেন, তজ্জন্য কবি মল্লরাজের নিকট হইতে পারিতোষিক স্বরূপ বহু ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি এবং 'কবিচন্দ্র' উপাধি লাভ করেন। ....তাঁহার রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ এবং অপরাপর গ্রন্থগুলি একত্র করিলে প্রকৃতই বিরাটকাণ্ড বলিয়া মনে হইবে।

"কবিচন্দ্রের পর প্রায় তিন শত বর্ষ হইল, ফকিররাম কবিভূষণ, ভিষক্ শুক্লদাস, জগৎবল্লভ, ভবানীশঙ্কর বন্দ্য ও লক্ষ্মণবন্দ্য রামায়ণ প্রকাশ করেন। তাঁহারা কেহ বাল্মীকি রামায়ণ, কেহ অধ্যাত্ম রামায়ণ, কেহ বা বাশিষ্ট রামায়ণের দোহাই দিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের গ্রন্থ উক্ত কোন একখানি মূল রামায়ণের অনুবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

"কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্রের রামায়ণের পর অপর যে সকল রামায়ণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রঘুনন্দন গোস্বামী কৃত 'রামরসায়ন'"ই শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্ববর্ত্তী রামায়ণগুলি হইতে এই রামায়ণ খানির রচনা সুন্দর ও সুশৃঙ্খল। ১১৯৩ সালে বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত মাড় গ্রামে রঘুনন্দনের জন্ম হয়। ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি এই 'রামরসায়ন' রচনা করেন। গ্রন্থকার আত্ম পরিচয় সম্বন্ধে রামরসায়নের উত্তর কাণ্ডের শেষভাগে লিখিয়াছেন :—

গ্রন্থের ভাষা দৃষ্টে অনেক স্থলে সময় অনুমিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতেও যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। কারণ এক্ষণে যে সকল মুদ্রিত রামায়ণ দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ বলেন, তাহা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পূর্ব্বতন সাহিত্যাধ্যাপক ৺ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়কর্ত্তৃক সংশোধিত; সুতরাং উহা কৃত্তিবাসের প্রকৃত রচনা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। অতএব তদ্দৃষ্টে কোন সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় না। প্রাচীন হস্তলিখিত রামায়ণ অতীব দুষ্প্রাপ্য। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের একখানি পুস্তক পাইয়াছি। উহা সন ১০৯৯ সালে লিখিত। উহার এবং মুদ্রিত রামায়ণের ভাষা, ছন্দ

"দেখিয়া কলির রীতি, শিখাইতে কৃষ্ণপ্রীতি,
কৃপাময় প্রভু বলরাম।
অবতার করি লোকে, নিস্তারিলা সব লোকে;
ধরি নিজে নিত্যানন্দ নাম।
বীরভদ্র তাঁর সুত, তার পুত্র গুণযুত,
গোপীজনবল্লভ বিদ্বান্।
তাঁর পুত্র গুণধাম, শ্রীরাম গোবিন্দ নাম;
তাঁর পুত্র বিশ্বম্ভরাখ্যান।
রামেশ্বর তাঁর সুত, নৃসিংহ তাহার পুত,
তাঁর পুত্র বলদেব নাম।
তিন পুত্র হল তাঁর, সর্ব্ব গুণ ভাণ্ডাগার,
জগৎ মাঝারে অনুপাম।
শ্রীলালমোহন আর, শ্রীবংশীমোহন তাঁর,
কনিষ্ঠ শ্রীকিশোরীমোহন।
শ্রীমধ্যম প্রভু তায়, কৃপাকরি সোম রায়,
করাছেন মন্ত্র সমর্পণ।
কনিষ্ঠ সৎগুণধাম, ভুবন বিখ্যাত নাম,
বেদ শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত।
অদ্বিতীয় ভাগবতে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-মতে,
করিলা যে গ্রন্থ সুবিদিত॥

ও আনুপূর্ব্বী বিষয়ে অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। নিম্নভাগে উভয় পুস্তকেরই কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

বালিবধে তারার উক্তি।

তারা বলে রাম তব জন্ম রঘুকুলে। আমার স্বামীকে কেন বিনাশিলে ছলে॥
সম্মুখে মারিতে যদি দেখিতে প্রতাপ। লুকাইয়া মারিলে পাইলাম বড় তাপ॥
শ্রীরাম তোমারে সবে বলে দয়াবান্। ভাল দেখাইলে আজি তাহার প্রমাণ॥
একবারে আমার করিতে সর্ব্বনাশ। সুগ্রীবের প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ॥
বিচ্ছেদ যাতনা যত জানহ আপনি। তবে কেন আমারে হে দিলে রঘুমণি॥
প্রভু শাপ নাহি দিলেন সদয়হৃদয়। আমি শাপ দিব তাহা ফলিবে নিশ্চয়॥
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে। সীতারে আনিবে বটে বহু পরিশ্রমে॥
কিন্তু সীতা না রহিবে সদা তব পাশ। কিছুদিন থাকিয়া করিবে স্বর্গবাস॥
কান্দাইলে যেমন এ কিষ্কিন্ধ্যা নগরী। কান্দাইয়া তোমারে যাইবে স্বর্গপুরী॥
আমি যদি সতী হই ভারতভিতরে। কান্দিবে সীতার হেতু কে খণ্ডিতে পারে॥

কলিকাতা মুদ্রিত রামায়ণ।

সেই প্রভু মোর পিতা, উষা নাম মোর মাতা,
বিমাতা শ্রীমতী মধুমতী।
মোর জ্যেষ্ঠ তিন জন, বিশ্বরূপ সঙ্কর্ষণ,
শ্রীমধুসূদন মহামতি।
চারি ভ্রাতা বৈমাত্রেয়, শ্রীরাম মোহন প্রিয়,
নারায়ণ গোবিন্দ আখ্যান।
সকলের কনীয়ান, বীরচন্দ্র অভিধান,
তিন ভগ্নী সদ্‌গুণ নিধান॥
সহোদর ভগ্নীপতি, দীপচন্দ্র মহামতি,
চট্টরাজ বংশ অগ্রগণ্য।
শ্রীরাম গোবিন্দ প্রাজ্ঞ, শ্রীদোলগোবিন্দ বিজ্ঞ,
বৈমাত্রেয় ভগ্নীপতি ধন্য॥

তারা বলে রাম তুমি জন্মিলা উত্তমকুলে। আমার পতি কাটিলে তুমি পাইয়া কোন্ ছলে
দেখাদেখি যুঝিতে যদি বুঝিতে প্রতাপ। আদেখা মারিলে প্রভু বড় পাইনু তাপ॥
প্রভু মোর শাপ না দিলেন করুণ হৃদয়। মুঞি শাপ দিব যেন হয় ত নিশ্চয়॥
সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপন বিক্রমে। সীতা ঘরে আসিবেন অনেক পরিশ্রমে॥
সীতা লইয়া ঘর করিবে হেন মনে আশ। কতো দিন রহি সীতা ছাড়িবে তোমার পাশ॥
তুমি যেমন কাঁদাইলে বানরের নারী। তোমা কাঁদাইয়া সীতা যাবেন পাতালপুরী॥

প্রাচীন হস্তলিখিত রামায়ণ।

পিতা রাশি অনুসারে, আর একনাম মোরে,
ভাগবত বলিয়া অর্পিলা।
কৃপাকণা প্রকাশিয়া, নানাশাস্ত্র পড়াইয়া,
যৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মাইলা।
বর্দ্ধমান সন্নিধান, গ্রাম 'মাড়' অভিধান,
তাহাতেই আমার নিবাস।
সন্তোষিত বন্ধুজন, এই গ্রন্থ বিরচন,
করিলাম পাইয়া প্রয়াস॥"

"শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র গোপীজনবল্লভ শ্রীপাট নোতায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র রামেশ্বর গোস্বামী শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ধামে গমন করেন ও তথা হইতে আসিয়া আর নোতায় না গিয়া ইচ্ছাপুর গ্রামে বাস করেন। নোতা ও ইচ্ছাপুর উভয় গ্রামই বর্দ্ধমানের অন্তর্গত। রামেশ্বর গোস্বামীর পুত্র নৃসিংহদেব গোস্বামী ইচ্ছাপুরের বাস ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খড়ি নদীর উৎপত্তি স্থান মাড়ো গ্রামে বাস করেন। এই গ্রাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ষ্টেষণ মানকরের সন্নিকট। নৃসিংহদেবের পুত্র বলদেব। বলদেবের তিন পুত্র—লালমোহন, বংশীমোহন ও কিশোরীমোহন। কিশোরীমোহনের দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহ মাড়োর তিন ক্রোশ পূর্ব্বে এরাল-বাহাদুরপুরে, দ্বিতীয় বিবাহ হয় নলসারুল গ্রামে। এই কিশোরীমোহন গোস্বামীর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী। রঘুনন্দনের সন্তান সংখ্যা আটটি। রঘুনন্দন পাঠশালার লেখাপড়া শেষ করিয়া এরাল বাহাদুরপুর নিবাসী গণেশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের নিকট ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করেন। ১৮ বৎসর বয়স হইতেই রঘুনন্দন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা লিখিতে পারিতেন।"

এই সকল সন্দর্শন করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, জয়গোপাল তর্কালঙ্কারমহাশয়দ্বারাই হউক বা যাঁহার দ্বারাই হউক, মুদ্রিত রামায়ণ মূল কৃত্তিবাসীরামায়ণ হইতে অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। উপরিউদ্ধৃত অংশে দৃষ্ট হইবে যে, কৃত্তিবাস ছন্দের অক্ষর গণনার প্রতি তাদৃশ মনোযোগ করেন নাই; তাঁহার গ্রন্থ সঙ্গীত হইবে, এই অভিপ্রায়ে গানের সুর মিলাইতে যেখানে যত অক্ষর দেওয়া আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই দিয়াছিলেন। মুদ্রিত রামায়ণ বিশুদ্ধ পয়ারের রীতিতে অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে কোন অংশ পরিত্যক্ত, কোন অংশ বা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফলতঃ কেবল মুদ্রিত রামায়ণ দর্শন করিয়া কৃত্তিবাসের রচনার সমালোচনা করা কোন মতেই সঙ্গত হয় না—কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রাচীন হস্তলিখিত রামায়ণ সমগ্ররূপে পাওয়া যায় না, সুতরাং আমাদিগকেও অধিকাংশস্থলেই মুদ্রিতরামায়ণের উপরেই নির্ভর করিতে হইয়াছে।

রঘুনন্দনের রচনা—কবিত্ব, অলঙ্কার, ভাব ও শব্দ সম্পদে পরিপূর্ণ।

রঘুনন্দনের রচনালালিত্যের একটু নমুনা লউন—

"এথা রঘুবর, করিতে সমর,
সুখেতে মগন হইয়া।
অতি সুকোমল, তরুণ বাকল
পরিলা কটিতে আঁটিয়া॥
শিরে অবিকল, জটার পটল
বাঁধিলা বেড়িয়া বেড়িয়া।
পরিলা বিকচ, কঠিন কবচ,
শরীরে সুদৃঢ় করিয়া"।

আরণ্য—৩য় অঃ।

শ্রীযুত দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন 'রামায়ণের কবি অসংখ্য, কিন্তু কৃত্তিবাসের আদি-গৌরব কেহই বিনষ্ট করিতে পারেন নাই' বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, ১১১ পৃষ্ঠা।

কবির রচিত গ্রন্থমধ্যে নিজপরিচয় জ্ঞাপক এই কয়েকটি কবিতা পাওয়া যায়—

"স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ'॥ (অরণ্যকাণ্ড)
"কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি
যাঁর কণ্ঠে সদা কেলি করেন ভারতী"॥ (কিষ্কিন্ধ্যা)
"কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিদিত সর্ব্ব লোকে
পুরাণ শুনিয়া গীত রচিল কৌতুকে"॥ (অরণ্যকাণ্ড)
"গীত রামায়ণ, করিল রচন
ভাষা কবি কৃত্তিবাস" (কিষ্কিন্ধ্যা)

কয়েক বৎসর হইল কবির স্বরচিত আত্মচরিত * (Auto-biography) পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কবির বংশপরিচয় ও পাণ্ডিত্যাদির কথা লিখিত আছে। নিম্নে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য উহা অবিকল উদ্ধৃত হইল।

কবির আত্মপরিচয়।

"পূর্ব্বেতে আছিল শ্রীদনুজ মহারাজা।
তাঁহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
সুখ ভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকুলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥

---

* কবির আত্মপরিচয়টি যখন একাধিক পুঁথিতে পাওয়া যাইতেছে তখন উহা প্রক্ষিপ্ত বলিবার যো নাই; মুকুন্দরাম, কাশীরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি পরবর্ত্তী কবিগণ স্ব স্ব গ্রন্থে নিজ নিজ পরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর ন্যায় এরূপ সুসংযত ও বিস্তৃত বিবরণ অন্য কোন কবির গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারি দিকে চায়।
হেনকালে আকাশ বাণী শুনিবারে পায়॥
মালী জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এ থানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রাম রত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গাতরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধন ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়য় সন্ততি॥
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি, সূর্য্য, গোবিন্দ, তাহার তনয়॥
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্য্যায় রত মহান্ত যে মানী॥
মদ-রহিত ওঝা সুন্দর মূরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি॥
সুশীল ভগবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভোগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥

কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়এ সম্পদে॥
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুসি।
শ্রীকর ভাই তাএ নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর।
আর এক বহিন হইল সতাই উদর॥
মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥
আপনার জন্ম কথা কহিব যে পাছে।
মুখটী বংশের কথা আরো কৈতে আছে॥
সূর্য্যপণ্ডিতের পুত্র হৈলা নাম বিভাকর।
সর্ব্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর॥
সূর্য্য পুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে জাহার॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোঁড়া।
পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া॥
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর॥
ভৈরব সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষএ জাঁহার॥
মুখটী বংশের পদ্ম শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে জাঁহার আচার॥

কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটী বংশের যশ জগতে বাখানে॥
আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥
শুভক্ষণে গর্ভ হইতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা নৈল কোলে।
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥
এগার নিবড়ে যবে বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবার উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গাপার॥
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে॥
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে॥
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথম হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যাসমাপন॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উম্মাকর।
হেন গুরুর ঠাঁঞি আমার বিদ্যার উদ্ধার॥
গুরু স্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে॥
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥

দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম ॥
সপ্ত ঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাইআ আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠী ॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখটী কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ ॥
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসন পরে ॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্র মিত্র সনে রাজা পরিহাসে মন ॥
গন্ধর্ব্বরায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তিঁহ গৌরব অপার ॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে ॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস্য আদি ধর্ম্মাধিকারিণী ॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর ॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিআ আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাড়াইয়া রাজার সম্মুখে ॥
চারি দিগে নাটগীত সর্ব্বলোকে হাসে।
চারি দিগে ধাওয়া ধাই রাজার আওাসে ॥

আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
তার উপরে পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরা পোহাঅ রাজা গৌড়েশ্বর॥
ডাণ্ডাইনু গিআ আমি রাজ বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাত সানে॥
রাজ আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে॥
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভাএ।
শ্লোক সুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চাএ॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হইআ মহারাজ দিলা পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্র মিত্র বলে রাজা জা হয় বিধান॥
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥
পাত্র মিত্র সভে বলে সুন দ্বিজরাজে।
জাহা ইচ্ছা হএ তাহা চাহ মহারাজে॥
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা জাই তথাএ গৌরব মাত্র সার॥

জত জত মহাপণ্ডিত আছএ সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোধ।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥
প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধাএ লোক আমা দেখিবারে॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সভে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস মহাগুণী॥
বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান॥
সাত কাণ্ড কথা হএ দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে॥"

মূল বাল্মীকিরামায়ণে অবর্ণিত কতকগুলি বিষয় কৃত্তিবাসী রামায়ণে সন্নিবেশিত আছে এবং মূল রামায়ণে বর্ণিত কতকগুলি বিষয় কৃত্তিবাসী রামায়ণে নাই। ইহার প্রমাণস্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :—

১। কৃত্তিবাস বাল্মীকির মত বলিয়া 'রাম না জন্মিতে ষাটি হাজার বৎসর। অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর' ইত্যাদিরূপ লিখিয়াছেন। বোধ হয় এইরূপ লেখা হইতেই 'রাম না হইতে রামায়ণ'—এই কথার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

বাল্মীকি স্বরচিত গ্রন্থের কোন স্থলে এমন কথা লেখেন নাই; বরং মূল রামায়ণে এক প্রকার স্পষ্টাক্ষরেই লেখা আছে যে, রামচন্দ্রের রাজ্যপ্রাপ্তির পর কবি এই গ্রন্থ রচনা করেন। মূল রামায়ণের প্রারম্ভে এইরূপ আছে। যথা—

"তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাম্বরং।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবং॥
কোঽস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্য্যবান্" ইত্যাদি।

"তপস্বী বাল্মীকি বেদাধ্যায়ন নিরত, বাগ্মী, মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বর্ত্তমানকালে এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি গুণবান্, বীর্য্যশালী আছেন" ইত্যাদি। নারদ এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিয়াছেন মুনে! এরূপ গুণসম্পন্ন লোক সংসারে অতি দুর্লভ; তথাপি সেরূপ যিনি আছেন, তাঁহার বিষয় শ্রবণ কর। এই বলিয়াই কহিয়াছেন—

"ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ। ইত্যাদি
তমেবং গুণসম্পন্নং (রামং) রাজা দশরথঃ সুতং।
যৌবরাজ্যেন সংযোক্তুমৈচ্ছৎ প্রীত্যা মহীপতিঃ॥
তস্যাভিষেকসম্ভারান্ দৃষ্ট্বা ভার্য্যাঽথ কেকয়ী।
পূর্ব্বং দত্তবরা দেবী বরমেনং যযাচত॥"

"ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত রাম নামে বিখ্যাত রাজা আছেন।" অনন্তর রামের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া পরে কহিতেছেন "এইরূপ গুণসম্পন্ন পুত্র রামকে রাজা দশরথ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে দত্তবরা তাঁহার ভার্য্যা কেকয়ী সেই অভিষেক সামগ্রী দর্শন করিয়া রাজার নিকট পূর্ব্বদত্ত সেই বর প্রার্থনা করিলেন" ইত্যাদিরূপে রাবণবধ ও রামের রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত রামায়ণের সমুদয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'ঐচ্ছৎ' 'অযাচত' এইরূপ অতীতকালের ক্রিয়াপদ প্রয়োগ দ্বারাই বর্ণনা করিয়াছেন; কেবল রামের রাজ্যপ্রাপ্তির উত্তরকালীন কার্য্য সকল যথা—

"ন পুত্র মরণং কেচিদ্ দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ ক্বচিৎ। নার্য্যশ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ॥ দশবর্ষ সহস্রাণি দশবর্ষ শতানি চ। রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি॥"

"রামরাজ্যকালে কেহ কখন পুত্রের মরণ দেখিবে না—নারীগণ কখন বিধবা হইবে না। রাম এগার হাজার বৎসর রাজ্য করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন"

ইত্যাদি 'দ্রক্ষ্যন্তি' 'ভবিষ্যন্তি' 'প্রবাস্যতি' এইরূপ ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া প্রয়োগ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল দর্শন করিয়া 'রামায়ণতিলক' নামক টীকার রচয়িতা বালকাণ্ডের ১ম সর্গের ৯০ তম শ্লোকের টীকায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—

অনেন রাবণ বধানন্তরং রামে রাজ্যং প্রশাসতি বাল্মীকের্নারদং প্রতি প্রশ্ন ইতি জ্ঞায়তে।

"ইহা দ্বারা রাবণ বধের পর রামের রাজ্যকালে বাল্মীকি নারদের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন ইহা জানা যাইতেছে।" এটি বাল্মীকির কথা নহে, পদ্ম-পুরাণান্তর্গত পাতাল খণ্ডের ৮৪ তম অধ্যায়ে শুকশারিকার উক্তিতে লিখিত আছে।

২। লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবধ প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—ব্রহ্মা রাবণকে অন্যান্য বর দিয়া শেষে কহিয়াছেন—

"মর্ম্মে যবে ব্রহ্ম-অস্ত্র পশিবে তোমার।
তখনি রাবণ তুমি হইবে সংহার॥
অন্য অস্ত্র না হইবে প্রবিষ্ট শরীরে।
তোমার যে মৃত্যু-অস্ত্র রবে তব ঘরে॥
সৃজিত করেছি আমি সেই ব্রহ্ম বাণ।
ধর ধর দশানন রাখ তব স্থান॥
বর পেয়ে অস্ত্র পেয়ে তুষ্ট দশানন।
স্বস্থানে রাবণ গেল বাল্মীকেতে কন॥" ইত্যাদি

ঐ প্রসঙ্গেই আবার—

"পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে।
বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকের মতে॥
বিভীষণ কহিলেন রামের গোচরে।
রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘরে॥"

ইত্যাদিরূপ উক্তির পরে বিভীষণের উপদেশে ছলনাপূর্ব্বক মন্দোদরীর

নিকট হইতে হনুমান কর্ত্তৃক মৃত্যুশর আনয়ন ও সেই শর দ্বারা রাবণবধ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু মূল বাল্মীকি রামায়ণে এ কথার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। তাহাতে এইমাত্র লিখিত আছে যে, ইন্দ্র-সারথি মাতলির উপদেশে রাম ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া রাবণের বধসাধন করেন।

৩। হতাহত বানরসৈন্যের সঞ্জীবতা সম্পাদনার্থ হিমালয় পর্ব্বত হইতে হনুমান দ্বারা ঔষধ আনয়ন করাইবার প্রস্তাবে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

"নাহিক এ সব কথা বাল্মীকি রচনে।
বিস্তারিত লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে॥"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অদ্ভুত রামায়ণের কোন স্থলে এই ঔষধ আনাইবার বিন্দু বিসর্গের উল্লেখ নাই! এদিকে বাল্মীকি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ৭৪৩ তম সর্গে ইহার সবিস্তর বর্ণন আছে।

এতভিন্ন, মহীরাবণ ও অহীরাবণ বধ, গন্ধমাদন পর্ব্বত আনয়ন সময়ে হনুমানের সূর্য্যানয়ন, মৃত্যুশয্যায় শয়ান রাবণের রামসমীপে রাজনীতি উপদেশ, সমুদ্রের সেতুভঙ্গ, ভূমিলিখিত রাবণের প্রতিকৃতির উপর সীতার শয়ন, কুশের অগ্রজত্ব না হইয়া লবের অগ্রজত্ব ইত্যাদি কৃত্তিবাস লিখিত ভূরি ভূরি বিবরণ মূল বাল্মীকি রামায়ণের সহিত বিসম্বাদী; এই সকল স্থলে কৃত্তিবাস পুরাণান্তরের আশ্রয় লইয়াছেন, অথবা কথকতায় আরোপিত আখ্যানে নির্ভর করিয়াছেন, ইহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি কারণে কৃত্তিবাস যে সংস্কৃত জানিতেন না, এমন অনুমান করা যায় না। মূল রামায়ণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি নানা পুরাণ হইতে তিনি উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়া ভাষা রামায়ণ রচনা করেন, এইজন্য পুরাণ শুনিবার কথা লিখিয়া থাকিবেন। কৃত্তিবাসের ভণিতার মধ্যে পুরাণ শুনিয়া গীত রচনার কথা লিখিত আছে, অথচ তাঁহার আত্মচরিতে জানা যায়, তিনি সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

আবার অনেকস্থলে কবি যে মূল বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাও দেখা যায়। কৃত্তিবাসের অযোধ্যাকাণ্ডের এক স্থল হইতে বাল্মীকির

পদানুসরণের পরিচয় দিতেছি। রাম সীতা বনবাসে গিয়া এক রাত্রি বৃক্ষতলে শষ্প শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, চিহ্ন দেখিয়া ভরত সেই স্থানে বলিতেছেন—

ইয়ং শয্যা মমভ্রাতুরিদমাবর্ত্তিতং শুভম্।
স্থণ্ডিলে কঠিনে সর্ব্বং গাত্রৈর্বিমৃদিতং তৃণং॥
মন্যে সাভরণা সুপ্তা সীতাস্মিঞ্ছয়নেশুভা।
তত্র তত্র হি দৃশ্যন্তে সক্তাঃ কনকবিন্দবঃ।
উত্তরীয়মিহাসক্তং সুরক্তং সীতয়া তদা।
তথাহ্যেতে প্রকাশন্তে সক্তাঃ কৌষেয়তন্তবঃ॥*

এই স্থলে কৃত্তিবাস লিখিতেছেন ঃ—

তৃণশয্যা দেখিলেন এক বৃক্ষতলে......
তদুপরে শুইলেন রাম বনবাসী।
তৃণলগ্ন আছে পট্ট কাপড়ের দশী॥
কাপড়ের দশীতে স্খলিত আভরণ।
ঝিকিমিকি করে যেন সূর্য্যের কিরণ॥
* * *
কেমনে লক্ষ্মণ ছিলা কেমনে জানকী।
চিনিলাম আভরণ করে ঝিকিমিকি॥

জয়গোপালের এত সম্মার্জ্জনের পরও আমরা কৃত্তিবাসের পদ্যে বাল্মীকির 'কনক-কণা' 'ঝিকিমিকি' করিতেছে বলিয়া চিনিতে পারিতেছি। এরূপ উদাহবণ অনেক দেওয়া যাইতে পারে।

আমরা এই কার্য্যপ্রসঙ্গে কয়েকখানি ভাষা-রামায়ণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার একখানি ১৮৩৩ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও অপরগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কলিকাতায় মুদ্রিত। এই সকল পুস্তকের পাঠও স্থানে স্থানে কিছুমাত্র মেলে না! বিশেষতঃ লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবধ প্রসঙ্গে ঐ সকল পুস্তকের পাঠ এক-বারে সম্পূর্ণরূপ বিভিন্ন। এমন কি শ্রীরামের ভগবতী পূজা ও রাবণের মৃত্যুবাণ

* 'বাল্মীকি রামায়ণম্' বঙ্গবাসী সংস্করণ, অযোধ্যাকাণ্ড, অষ্টাশীতিতম সর্গ, ১৩—১৫।

আনয়ন প্রভৃতির প্রস্তাব শ্রীরামপুর-মুদ্রিত পুস্তকে কিছুমাত্র নাই ; উত্তরকাণ্ডেও সীতা বনবাসকালে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত পুস্তক অপেক্ষা কলিকাতা মুদ্রিত পুস্তক সকলে অনেক অধিক আছে। কলিকাতা মুদ্রিত পুস্তক সকলের পাঠগুলি পরস্পর অধিক বিভিন্ন নহে। কিন্তু উহাদের সহিত শ্রীরামপুর মুদ্রিতের পাঠ অনেক স্থানেই যারপর নাই বিসম্বাদী।

ইহার কারণ কি? সংস্কৃত রামায়ণের ভাষা অতি সহজ, এজন্য অনেকে স্বরচিত ২।৪টি শ্লোক উহার মধ্যে মধ্যে প্রবেশিত করিয়াছেন—সেই কারণেই রামায়ণের অনেকস্থলেই পাঠব্যতিক্রম হইয়াছে, এই কথা এক্ষণে অনেকে বলিয়া থাকেন। ভাষা রামায়ণের পাঠব্যতিক্রম কারণেও কি ঐরূপ কথা বলিতে পারা যায়? আমাদের বোধে ভাষা রামায়ণের পাঠব্যতিক্রমের কারণ উহা নহে ; কেহ কেহ যে বলিয়া থাকেন, 'এক্ষণকার মুদ্রিত রামায়ণ সকল ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সংশোধিত'—তাহাতে আমাদের বোধ হয়, উহা কেবল তাঁহারই সংশোধিত নহে, ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ ভিন্ন ভিন্ন লোকের সংশোধিত। সংশোধকেরা আপনাদিগের ইচ্ছা ও ক্ষমতানুসারে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এবং সেইজন্যই এই প্রকার নানারূপ পাঠভেদ হইয়াছে।

ফলতঃ আমাদের বিবেচনায় মুদ্রিত রামায়ণ সমস্তই কাহারও না কাহারও সংশোধিত, উহার একখানিও কৃত্তিবাসের প্রকৃত নহে ;* কিন্তু দেখা যাইতেছে, কলিকাতা মুদ্রিত পুস্তক সকলের পাঠ প্রায় একরূপই, কেবল শ্রীরামপুর মুদ্রিত পুস্তকের পাঠই অনেক বিভিন্ন। অতএব এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে,

* "প্রচলিত রামায়ণে কৃত্তিবাসের রচনা যে কতটুকু তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই ; নিঃসন্দিগ্ধরূপে কখনও হইবে কিনা সন্দেহস্থল। বঙ্গভাষার অপর কোন গ্রন্থেরই পাঠ সম্বন্ধে এত পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; কিন্তু ভগীরথ সমানীত স্রোতের পূর্ব্ববারি এক্ষণে কণামাত্র না থাকিলেও ভাগীরথী যেমন পূজিত, কৃত্তিবাসপ্রণীত রামায়ণের পংক্তিমাত্রও অধুনা পূর্ব্ববৎ না থাকিলেও কৃত্তিবাসী রামায়ণও সেইরূপ সমাদৃত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের জাতির স্বাভাবিক ভক্তিপ্রবণতা এবং কৃত্তিবাসের কবিতাসম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধাই ইহার কারণ।" শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'সরল কৃত্তিবাস'।

শ্রীরামপুর মুদ্রিত পুস্তকই পণ্ডিতবর তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সংশোধিত। এই পুস্তকের পাঠে ছন্দোভঙ্গাদি দোষ তত নাই; রাবণবধ স্থলে বাল্মীকির মতই অনুসৃত হইয়াছে; এবং কৃত্তিবাস যে যে স্থলে অন্যান্য রামায়ণের মত লিখিত হইল বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, অথচ তত্তৎরামায়ণে সেরূপ প্রসঙ্গ নাই, সেই সেই স্থল সাবধানতাপূর্ব্বক পরিত্যক্ত বা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া বিপরীত অনুমান করা সঙ্গত বোধ হয় না। যাহা হউক একথা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, উক্তরূপ সংশোধন দ্বারা আসল নকল সমুদয় মিশিয়া গিয়াছে, উভয়কে পৃথক্ করা কঠিন দাঁড়াইয়াছে এবং কালক্রমে ঐ নকলই থাকিবে—আসল একবারে লুপ্ত হইবে। অতএব ঐ সংশোধন দ্বারা গ্রন্থের গৌরবের হ্রাস বই বৃদ্ধি হয় নাই।

যাহা হউক কৃত্তিবাস সংস্কৃত জানুন আর নাই জানুন—মূলরামায়ণের সহিত তাঁহার রচনার ঐক্য থাকুক বা নাই থাকুক—তাঁহার রচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ যে বহুলনীতিগর্ভপ্রস্তাবে পরিপূর্ণ ও অসাধারণ কবিত্বের পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি পুরাণ শুনিয়াই যদি এরূপ বৃহদ্-ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার গৌরবের বৃদ্ধি বই হ্রাস নাই। তিনি যৎকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে এরূপ ছন্দোবদ্ধ কাব্য ছিল না। সুতরাং তিনি অন্যের অনুকৃতি করিতে পান নাই, তাঁহার রচনা নিজ নৈসর্গিক-শক্তি-সম্ভূত। ভারতচন্দ্র ইদানীন্তনকালে মালিনীর বেসাতি পরিচয়-দানস্থলে যেরূপ শব্দচাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, কৃত্তিবাস তত প্রাচীনসময়েও মধ্যে মধ্যে সেরূপ করিয়া গিয়াছেন। ভরদ্বাজাশ্রমে বানরদিগের ভোজন-সময়ে তিনি লিখিয়াছেন—

অন্নের কি কব কথা কোমল মধুর। খাইলে মনেতে হয় কি রস মধুর॥
কি মনোরঞ্জন সে ব্যঞ্জন নানাবিধ। চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় ভক্ষ্য চতুর্বিধ॥
যথেষ্ট মিষ্টান্ন সে প্রচুর মতিচুর। যাহা নিরখিবা মাত্র হয় মতিচুর॥
নিখুঁতি নিখুঁতি মণ্ডা আর রসকরা। দৃষ্টিমাত্র মনোহরা দিব্য মনোহরা॥ ইত্যাদি

তাঁহার প্রসিদ্ধ 'অঙ্গদরায়বারে'ও অদ্ভুতরসের ও হাস্যরসের অপূর্ব্ব অবতারণা করা হইয়াছে। অঙ্গদ রাবণসভায় উপস্থিত হইলে তাহাকে অপ্রতিভ করিবার জন্য রাক্ষসীমায়ায় সভাশুদ্ধ সমস্ত লোকই রাবণরূপ ধারণ করিল, কেবল ইন্দ্রজিৎ পিতৃরূপ ধারণ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া নিজরূপেই রহিলেন; ইহা দেখিয়া অঙ্গদ ক্রোধ ও পরিহাস সহকারে তাঁহাকেই সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

অঙ্গদ বলে সত্যকরে কওরে ইন্দ্রজিতা।
এই যত বসে আছে সবাই কি তোর পিতা॥
ধন্য রাণী মন্দোদরী ধন্য তোর মাকে।
এক যুবতী এত পতি ভাব কেমনে রাখে॥
কোন্ বাপ তোর চেড়ীর অন্ন খাইল পাতালে।
কোন্ বাপ বাঁধাছিল অর্জ্জুনের অশ্বশালে॥
কোন্ বাপ তোর ধনুক ভাঙ্গতে গেছিল মিথিলা।
কোন্ বাপ তোর কৈলাস তুলিতে গিয়াছিলা॥
কোন্ বাপ জব্দ হলো জামদগ্ন্যের তেজে।
মোর বাপ তোর কোন্ বাপকে বেঁধেছিল লেজে॥
একে একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা।
ইহা সবাকে কাজ নাই তোর যোগী বাপটী কোথা॥

অনন্তর নানাবিধ কথোপকথন হইলে রাবণ কুপিত হইয়া কহিলেন, সমুদ্রের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলে, বিভীষণ আসিয়া শরণাপন্ন হইলে,—হনুমানকে বাঁধিয়া এই স্থানে আনিয়া দিলে, এবং রামলক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে, আমি কোনরূপে ক্ষান্ত হইতে পারি। ইহা শুনিয়া—

অঙ্গদ বলিছে রাবণ আমরা তাই চাই। কচ্‌কচিতে কাজ্‌কি মোরা দেশে চলে যাই॥
রামকে বলি গিয়া ইহা না করিলে নয়। সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিব দণ্ড চারি ছয়॥
বিভীষণে বান্ধিয়া আনিব তোর কাছে। বুঝিয়া করহ শান্তি মনে যত আছে॥
নির্ম্মাইয়া দিব লঙ্কা যত গেছে পোড়া। শূর্পণখার নাক কাণটী কেমনে দিব জোড়া॥

অরণ্যকাণ্ডস্থিত নিম্নলিখিত শ্লোকাবলীতে কবির সহৃদয়তারও বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইবে—

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে। ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে॥
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ। কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী। লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি॥
গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন। তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ?
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া। রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া?
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস। চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস?
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা। হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা?
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে। রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী নিল কোন জনে। কৈকয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে॥
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে। লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে॥
কনক লতার প্রায় জনক দুহিতা। বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা॥
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ। দিবানিশি করিতেছে তমো নিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার। এক সীতা বিহনে সকলই অন্ধকার॥
দশদিক্ শূন্য দেখি সীতার অভাবে। সীতাবিনা অন্য কিছু হৃদয়ে কে ভাবে॥
সীতাধ্যান সীতাজ্ঞান সীতা চিন্তামণি। সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণী॥
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ। সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন॥
আমি জানি পঞ্চবটি তুমি পুণ্যস্থান। সেই সে এখানে করিলাম অবস্থান॥
তাহার উচিত ফল দিলেহে আমারে। শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাই ঘরে॥
শুন পশু মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষ লতা। কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা; ইত্যাদি

কৃত্তিবাসের সময়ে অথবা তাহার পূর্ব্বেই বোধহয় দেশমধ্যে পাঁচালি * নামক

* পাঁচালি শব্দের অনেকে অনেক রকম ব্যুৎপত্তি করেন। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন 'পঞ্চালী' নামক গীত পঞ্চালেই (কনোজে) উদ্ভূত হওয়া সম্ভব' (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সং, ২৪৭)। কেহ বা 'আলী' সখী অর্থে পঞ্চালী শব্দে 'পঞ্চ সখীর গীত' এইরূপ অর্থ করেন। কোন বিজ্ঞ মহাশয় পাঁচালি শব্দে 'পঞ্চ জনের (সঙ্গীতরূপ, যোগরূঢ়) কার্য্য; এইরূপ অর্থ করেন' উদাহরণ

গীতের সৃষ্টি হইয়াছিল। লোকে মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, সত্যনারায়ণ প্রভৃতির পাঁচালি বাদ্য ও স্বর সংযোগে গান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কৃত্তিবাস সেইরূপ পাঁচালির অনুকরণেই ভাষারামায়ণের রচনা করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই আপনার রচনাকে গীত, পাঁচালি ও নাচাড়ি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয় গীতের অনুরোধেই তাঁহার রচিত শ্লোকগুলিতে অক্ষরগণনার ও যতির নিয়ম তত অনুসৃত হয় নাই। না হউক তিনি যে উদ্দেশে ঐ গ্রন্থের প্রণয়ন করেন, তাহা সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইয়াছে। শত সহস্র লোকে চামর-মন্দিরাসহযোগে রামায়ণগান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। রামযাত্রার পালাসকলেই ঐ রামায়ণকে অবলম্বন করিয়াই প্রণীত হইয়াছে। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই যে, রামায়ণের উপাখ্যান কহিতে পারে, ভাষা-রামায়ণই তাহার মূল কারণ। যাহার কিছুমাত্র অক্ষরপরিচয় আছে, সেই রামায়ণ পাঠকরিতে প্রবৃত্ত হয়। সামান্য দোকানদারেরাও ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে মধ্যে অবকাশ পাইলেই তারস্বরে রামায়ণপাঠ করিয়া থাকে; এরূপ সৌভাগ্য সকল কবির ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

রামায়ণের ভাষা—রামায়ণেরভাষা আদ্যোপান্ত সুমধুর ও ব্যাকরণানুসারে

স্বরূপ চতুরালি, ঘটকালি, ঠাকুরালি প্রভৃতি উল্লেখ করেন। সাহিত্যরথী শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১২৯৪ সালের 'নবজীবন' ৩য় ভাগ, 'জয়দেব' প্রবন্ধে এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

"গান সময়ে গায়কের স্থিতি ও গতির বিভেদ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালা গানপদ্ধতির বিভেদ হইয়াছে এবং ভিন্ন নামকরণ হইয়াছে। গায়কেরা পাদচারণ করিয়া বেড়াইলে পাঁচালি, নাচিয়া নাচিয়া গাহিলে নাচাড়ি, বসিয়া গান করিলে বৈঠকী ও কেবল দণ্ডায়মান থাকিয়া গান করিলে দাঁড়া গান। যে কোন প্রকারের গান, গায়ক যে কোন ভঙ্গিতে গাহিবেন এমন নহে; এক এক রূপ কেতার গান এক এক রূপ ধরণে গীত হইত; এখনও প্রায় তাহাই হয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রধানতঃ পাঁচালি। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে পাঁচালি ও নাচাড়ি দুই আছে, নাচাড়ি অতি অল্প। আমরা যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে ধর্ম্মের গানে নাচাড়ি খুব বেশী ছিল। তখনকার ধ্রুবপদ ও ভজন, সঙ্গে সঙ্গে এখনকার খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা এই সকল প্রধানতঃ বৈঠকী গান। কীর্ত্তনপত্তনে প্রধানতঃ বৈঠকী। প্রাচীন সখী সম্বাদাদি দাঁড়া কবি বলিয়া পরিচিত।"

সর্ব্বতোভাবে পরিশুদ্ধ না হউক, সকলস্থলেই যে, কবির মনোগত ভাবের প্রকাশক, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। ভাষার দুরূহতা বা জটিলতাদোষে ভাবগ্রহ করিতে পারা যায় না—সমস্ত রামায়ণের মধ্যে এরূপ স্থল অতি বিরল। ইহাঁর পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী অনেক কবির রচনায় এরূপ গুণ লক্ষিত হয় না।

রামায়ণের ছন্দ—ভাষারামায়ণে পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন অন্য ছন্দ প্রায় নাই। তবে কলিকাতামুদ্রিত একখানি পুস্তকে অকম্পনের যুদ্ধের পর বজ্রদংষ্ট্রের যুদ্ধস্থলে 'নর্ত্তকছন্দ' নামে একটি নূতন ছন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কলিকাতা-মুদ্রিত অপরাপর পুস্তকে ও শ্রীরামপুরমুদ্রিত পুস্তকে ঐ প্রস্তাবটি একবারে নাই, এবং ছন্দটিও—

"তবে দেখি তাহারে, সেইত দ্বারে, প্লবঙ্গমগণ।
তারা তরুশিখরী, করেতে ধরি, রহে সুখীমন॥" ইত্যাদি

নিতান্ত আধুনিকত্বগন্ধী—অতএব বোধ হয় ঐ প্রস্তাব কৃত্তিবাসের রচিত নহে—উহা কোন আধুনিক কবিকর্ত্তৃক রচিত হইয়া উহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যাহাহউক, রামায়ণে ত্রিপদী, পয়ার ভিন্ন অন্য ছন্দ প্রায় নাই যথার্থ বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে ঐ দুই ছন্দ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন দুই একটি অপরূপ ছন্দও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

শমনদমন রাবণ রাজা রাবণদমন রাম।
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম॥ ইত্যাদি

কৃত্তিবাসরচিত রামায়ণ ভিন্ন আরও দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমরা দেখিতে পাইয়াছি, তাহার একখানির নাম 'যোগাদ্যার বন্দনা' ও অপর খানির নাম 'শিবরামের যুদ্ধ'। দুইখানিতেই কৃত্তিবাসের ভণিতা আছে। রচনাদর্শনেও ঐ দুই পুস্তক তাঁহারই লেখনীনির্গত বলিয়া বোধ হয়। 'রুক্মাঙ্গদের একাদশী'তে কৃত্তিবাসের ভণিতা দেখা যায়।—

কৃত্তিবাস হিন্দিও ভালরূপ জানিতেন। তাঁহার লেখা হিন্দি 'অঙ্গদরায়বার'ও পাওয়া গিয়াছে। রায়বারটি দুই ভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থে হিন্দি সন্নিবেশিত করা একরূপ প্রথাই ছিল। রামেশ্বরের সত্য-নারায়ণে, ভারতচন্দ্রের মানসিংহে, কৃত্তিবাসের এই প্রথা অনুসরণ করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মধ্যকাল।

চৈতন্যদেবের উৎপত্তিকাল হইতে আমরা মধ্যকাল গণনা করিয়াছি। চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ অব্দে) নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হইয়া ১৪৫৫ শকে * (খৃঃ ১৫৩৩ অব্দে) নীলাচলে (জগন্নাথক্ষেত্রে) তিরোভূত হন। মৃতবৎসা মাতার পুত্র বলিয়া নারীগণ প্রথমে ইহাঁকে 'নিমাই' এবং অত্যুজ্জ্বলগৌরকান্তি বলিয়া কেহ কেহ 'গৌরাঙ্গ' বলিয়াও ডাকিত। অন্নপ্রাশনের সময়ে ইহাঁর নাম 'বিশ্বম্ভর' হয়; পরে চতুর্বিংশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৫০৯ খৃঃ অব্দে, কাটোয়ার প্রসিদ্ধ কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষিত হইয়া, বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ঐ সময়ে তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এই নূতন নামকরণ হইয়াছিল। ইনি অলৌকিক বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং অতি অল্পকালমধ্যেই ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, পুরাণ, ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। পরে বৃহন্নারদীয় পুরাণ লিখিত—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই বচন প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া কলিতে হরিনামোচ্চারণ, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও হরিভক্তি ভিন্ন জীবের পরিত্রাণ পাইবার উপায়ান্তর নাই, এই মত প্রচার করেন এবং নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, মাধব, হরিদাস, রূপ, সনাতন প্রভৃতি বহু সংখ্যক স্বগণ ও স্বসহচর সমভিব্যাহারে মৃদঙ্গের সহিত তানলয়-বিশুদ্ধ স্বর-সংযোগে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার লোকাতীত রূপ-লাবণ্য ও অমানুষীপ্রতিভা দর্শনে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের

---

* শাকেচতুর্দশশতে রবিবাজিযুক্তে গৌরোহরি র্ধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তদীয়লীলাগ্রন্থোঽয় মাবিরভবৎকতমস্য বক্ত্রাৎ॥ চৈতন্য চন্দ্রোদয়।

চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ। চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্ধান।

চৈতন্য চরিতামৃত, আদ্যখণ্ড।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও পারিষদবর্গ।

INDIA PRESS, CALCUTTA.

অবতার বলিয়া কতক লোকের বোধ হইয়াছিল। এক্ষণে আবার তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ে নূতনপ্রকার মতের উদ্ভাবন,—ও সঙ্কীর্ত্তন সময়ে অকৃত্রিম পরমানন্দে মগ্ন হইয়া নর্ত্তন এবং হরিনামোচ্চারণমাত্রেই রোমাঞ্চ, অশ্রুপাতাদি সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব অবলোকন করিয়া তাহাদিগের ঐ বোধ আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহার উদ্ভাবিত ধর্ম্ম, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতাদি সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থসকল হইতেই উদ্ধৃত বচনপরম্পরাদ্বারা সপ্রমাণ করা হইত—উহার অনুষ্ঠানপ্রণালী প্রচলিত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানপ্রণালী অপেক্ষা অনেক সহজ—কি হিন্দু, কি মুসলমান কাহাকেও উহা অবলম্বন করাইতে বাধা ছিল না—এবং তিনি নিতান্ত দুঃশীলের সুশীলতাসম্পাদন, কুষ্ঠীর কুষ্ঠবিমোচন প্রভৃতি কতকগুলি আশ্চর্য্যকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, এরূপ প্রবাদ দেশমধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, সুতরাং অচিরকালমধ্যেই তাঁহার শিষ্য অসংখ্য হইয়া উঠিল। সন্যাস-আশ্রম অবলম্বনের পর তিনি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বারাণসী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, জগন্নাথক্ষেত্র, সেতুবন্ধ প্রভৃতি নানাদেশে পর্য্যটন, এবং তত্তদ্দেশীয় প্রধান পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিয়া স্বমত সংস্থাপন করেন। ঐ সময়ে শিষ্যগণ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া সর্ব্বত্র প্রচারকরিত, সুতরাং তিনি যেখানে যেখানে যাইতেন, সেইখানেই শিষ্যসংখ্যাবৃদ্ধি হইত। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারাই বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ সকলের পুনরুদ্ধার করেন এবং তদীয় লীলাবর্ণন-সংক্রান্ত বহুলগ্রন্থ রচনাকরেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক রূপগোস্বামীই ১২।১৩ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনাকরিয়াছেন, তন্মধ্যে ২ খানি উৎকৃষ্ট নাটক, ১ খানি অলঙ্কার ও ১ খানি ব্যাকরণ আছে। তদ্ভিন্ন সনাতনগোস্বামী, জীবগোস্বামী, গোপালভট্ট, কর্ণপূর প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদিগের বিরচিত বহুল গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে। ফলতঃ চৈতন্যদেবের উৎপত্তি হইতে কিছুদিন পর্য্যন্ত সময়কে বাঙ্গালাদেশের সৌভাগ্যের কাল বলিয়া গণনা করিতে হইবে। ঐ সময়ে গৌড়ের বাদসাহ হোসেনসাহের সুবিচারে প্রজালোক অনেক নিরুপদ্রব ছিল; ঐ সময়েই তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি দুর্বিগাহ ধিষণা-শক্তি-সহকারে ন্যায়শাস্ত্রের নূতনরূপ পন্থা আবিষ্কৃত করেন।

ঐ সময়েই স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহা-পাণ্ডিত্য সহকারে তৎকালপ্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাসকল বিপর্য্যস্ত করিয়া 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' নামক অভিনব-প্রকার স্মৃতিসংগ্রহের প্রণয়ন করেন। অধিক কি বাঙ্গালাদেশে সংস্কৃতশাস্ত্রের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ঐ সময়েই হইয়াছে বা হইবার সূত্রপাত হইয়াছে, এ কথা অবশ্য বলা যাইতে পারে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে বলিতে গেলে ঐ সময়কেই ইহার উৎপত্তিকাল বলিলেও অসঙ্গত হয় না। চৈতন্যের সময় হইতেই বাঙ্গালাভাষায় গ্রন্থরচনা প্রকৃতপ্রস্তাবে আরম্ভ হয়। ইহাও একপ্রকার উল্লিখিত হইয়াছে যে, আদ্যকালের পণ্ডিতদিগের চিত্তভূমিতে যে কিছু নূতনভাব অঙ্কুরিত হইত, তাহা তাঁহারা পণ্ডিতসমাজেরই প্রদর্শনার্থ সংস্কৃতক্ষেত্রে রোপণ করিতেন—জনসাধারণকে দেখাইবার প্রয়োজনবোধ করিতেন না। চৈতন্যোপাসক দিগের ধর্ম্ম আপামর সাধারণ সকলেরই আশ্রয়ণীয়, অতএব তাঁহারা খৃষ্টীয় মিসনরিদিগের ন্যায় তৎপ্রচারার্থ দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া সর্ব্ববিধ লোকের চিত্তাকর্ষণের চেষ্টা করিয়া ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা স্বাবলম্বিত ধর্ম্মপ্রণালীসকল কেবল পণ্ডিতজনগম্য সংস্কৃতে নিবদ্ধ না করিয়া সাধারণের বোধার্থ চলিত ভাষায় বাঙ্গালায় গ্রন্থাকারে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অতএব ঐ সময়কে বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নের আদিকাল বলা অসঙ্গত হয়না। তাঁহাদিগের ঐ সকল গ্রন্থকেই আদর্শ করিয়া কবিকঙ্কণ প্রভৃতি পরবর্ত্তী কবিগণ লেখনীচালনা করেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতেই বাঙ্গালাকাব্যের উৎপত্তি ও উন্নতি হইয়াছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরস্পরবিবাদসংক্রান্ত যে সকল গল্প আছে, তাহাতে বীরধর্ম্মী শাক্তদিগের জয় ও নিরীহস্বভাব বৈষ্ণবদিগের পরাজয়ের কথাই বর্ণিত হয়; তচ্ছ্রবণে শাক্তেরা সহাস্যমুখ ও বৈষ্ণবেরা ম্লানকান্তি হইয়া থাকেন; কিন্তু কাহাদের হইতে বাঙ্গালাকাব্যের জন্মলাভ হইয়াছে? কাহারা মাতৃভাষাকে বসনভূষণাদি দ্বারা সাজাইবার চেষ্টা করিয়াছেন? এবিষয়ে ইতিহাস কাহাদের নাম চিরকাল সগৌরবে স্মরণ করিবে? ইত্যাদিরূপ বিচার ও বিবাদ

উপস্থিত হইলে, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিকট শাক্তদিগের মুখ অবশ্য মলিন ও অবনত হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই।

যাহাহউক উক্তসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ মহাত্মা বাঙ্গালাভাষায় প্রথমে লেখনীধারণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা দেখা আবশ্যক। কেহ কেহ জীব-গোস্বামীর করচাকেই বাঙ্গালার আদি (বৈষ্ণব) গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতকার জীবগোস্বামীকে রূপসনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া লিখিয়াছেন এবং এক্ষণে তাহাই স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে। জীবগোস্বামী কৃষ্ণবিষয়ক নানা সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন ; কিন্তু 'চৈতন্যচরিতামৃত'কার তাঁহার যে সকল গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার বাঙ্গালা করচার নামোল্লেখ নাই। আমরাও নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া জীবগোস্বামীর করচা প্রাপ্ত হই নাই ; বোধ হয় তাহা বিরলপ্রচার হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন জীবগোস্বামীর বংশীয়েরা এক্ষণে মুর্শীদাবাদের সন্নিহিত 'কোঙার পাড়া' নামক গ্রামে বসতি করেন ; তাঁহাদের বাটীতে উহা আছে কি না, বলিতে পারা যায় না। আমাদের কোন বন্ধু 'জীবগোস্বামীর করচা' বলিয়া যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমাদিগকে দিয়াছিলেন,তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। তবে কেহ কেহ জীবগোস্বামীর করচাকেই বাঙ্গালার প্রথম রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এই জন্যই আমরা সংক্ষেপে তাহার বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

জীবগোস্বামীর-করচা—এই পুস্তকে রূপ বৃন্দাবনে গমন করিলে পর কিরূপে সনাতন স্বপ্রভু হোসেনসাহের কারাগার হইতে পলায়ন করেন তাহার বিষয় এবং বারণসীতে গৌরাঙ্গের সহিত সনাতনের সাক্ষাৎকার, বৃন্দাবনে রূপের সহিত মিলন, দুই ভ্রাতার গোবর্দ্ধনদর্শন—তথায় নিত্যবস্তু বিষয়ক কথোপকথন—এবং ললিতা, বিশাখা, রূপমঞ্জরী, চম্পকলতা প্রভৃতি কৃষ্ণসহচরীদিগের বয়োনিরূ-পণাদি অতি সামান্য সামান্য বিষয় বর্ণিত আছে। সে বর্ণনায় গ্রন্থকারের কিছু মাত্র পাণ্ডিত্য প্রকাশ নাই। তবে রচনা কিছু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় বটে। পরলোকগত ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত বিবিধার্থসংগ্রহের মতানুসারে উক্ত করচা চৈতন্যের অন্তর্হিত হইবার প্রায় সমকালেই রচিত হইয়াছিল।

জীবগোস্বামীর করচার পরই বোধহয় বৃন্দাবনদাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যমঙ্গল + লিখিত হয়। ইহাভিন্নও বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, সে সমুদয়ের সমালোচনা করা তত আবকশ্য বোধ হয় না। আমরা প্রধানতঃ কেবল চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতেরই সমালোচনা করিয়া নিবৃত্ত হইব।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত।

পরমভাগবত বৃন্দাবনদাস 'চৈতন্যভাগবত' রচনা করেন। বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপবাসী ছিলেন। তিনি গ্রন্থমধ্যে সামান্যাকারে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন—যথা

সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবনদাস। অবশেষপাত্র নারায়ণীগর্ভজাত ॥ ১ম খ, ৫অ

এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

'চৈতন্যচরিতামৃত'কার কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন-রচিত চৈতন্যমঙ্গলের (চৈতন্যভাগবত) বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন, এবং উহাকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া তাঁহার চরিতামৃত লিখিত হইয়াছে, ইহা অনেকস্থলে স্বীকার করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তিনি বৃন্দাবনদাসের পরিচয় প্রদানে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই জানা যায় যে, চৈতন্যের সহচর ও শিষ্য কুমারহট্টবাসী শ্রীনিবাস পণ্ডিতের নারায়ণীনাম্নী এক কন্যা ছিলেন। পণ্ডিত, বোধ হয়, কোন কার্য্যবশতঃ নবদ্বীপেই অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার গৃহে চৈতন্যদেবের কীর্ত্তন এবং ভোজন হইলে পর নারায়ণী তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া চতুর্বর্ষ বয়ঃক্রমকালেও কৃষ্ণপ্রেমে মগ্না হইতেন; এজন্য চৈতন্যের বড় স্নেহাস্পদ হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ঐ নারায়ণীর

+ চৈতন্য ভাগবত পূর্ব্বে চৈতন্য মঙ্গল নামে অভিহিত হইয়াছিল। লোচনদাসও স্বকীয় গ্রন্থের নাম 'চৈতন্য মঙ্গল' রাখেন। কথিত আছে, গ্রন্থের নামকরণ লইয়া বৃন্দাবন দাস ও লোচন দাস উভয় কবির মতবিরোধ ঘটে; বৃন্দাবন দাসের জননী নারায়ণী দেবী বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যমঙ্গলের নাম 'চৈতন্য ভাগবত' রাখেন, ইহাতে সকল বিরোধের মীমাংসা হইয়া যায়।

গর্ভজাত। এই বিবরণ দ্বারা ইহা এক প্রকার স্থির হইতেছে যে, বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের জীবিতকালে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু চৈতন্যের তিরোধানের পর গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। কারণ চৈতন্যের সন্ন্যাসাবলম্বনের সময় অর্থাৎ যখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর মাত্র, তখন নারায়ণী ৪ বৎসরের ছিলেন—তৎপরে ১২ বৎসরের মধ্যে তাঁহার সন্তান হওয়া এবং বৃন্দাবনকেই প্রথম পুত্র বলিয়া ধরিয়া লইলেও চৈতন্যের অন্তর্ধান সময়ে বৃন্দাবনের বয়ঃক্রম ১২ বৎসরের অধিক হয় না। তৎকালে গ্রন্থ রচনা সম্ভব নহে। অতএব চৈতন্যের তিরোধানের ১৫।১৬ বৎসর পরে অর্থাৎ অনুমান ১৪৭০ শকে (খৃঃ ১৫৪৮ অব্দে) বৃন্দাবনের গ্রন্থ চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়া থাকিবে।

চরিতামৃতকার বৃন্দাবনরচিত চৈতন্যমঙ্গলের ভূরি ভূরি প্রশংসা ও ভূয়োভূয়ঃ নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু চৈতন্যভাগবতের বিষয়ে কোন স্থলে কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই—কিন্তু আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, বৃন্দাবনদাস বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল নামে কোন গ্রন্থ বিদ্যমান নাই—লোচনদাস * বিরচিত এক

* লোচনদাস অনুমান ১৪৪৫ শকে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোগ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কোগ্রাম ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে লুপ লাইনে গুস্করা ষ্টেষণের পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। ইঁহার পিতার নাম কমলাকর দাস, মাতার নাম সদানন্দী; ইঁহার সম্পূর্ণ নাম ত্রিলোচন দাস। 'চৈতন্যমঙ্গলই' তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। চৈতন্যমঙ্গলে তিনি এইরূপ আত্ম পরিচয় দিয়াছেন :—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস॥
মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ কাম॥
কমলাকর দাস নাম পিতা জন্মদাতা।
যাঁহার প্রসাদে কহি গোরাগুণগাথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়া দেবী নামে॥
মাতামহের নাম সে পুরুষোত্তম গুপ্ত।
নানা তীর্থে পূত তেঁহ তপস্যায় তৃপ্ত

'চৈতন্যমঙ্গল' আছে। চরিতামৃতকার যে যে বিষয়ের সবিস্তার বর্ণন জানিবার জন্য চৈতন্য মঙ্গলের উপর বরাত দিয়াছেন, তাহা চৈতন্যভাগবতেই বর্ণিত আছে —অতএব আমাদের বোধ হয়, চরিতামৃতকারের উল্লিখিত চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য ভাগবত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

'চৈতন্যভাগবত' কিছু বৃহৎ পুস্তক। ইহা আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে চৈতন্যের উৎপত্তি, বাল্যলীলা, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, বিবাহ ও গয়াধামে গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে—মধ্যখণ্ডে চিত্তের ভাবান্তর, অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেমাবেশ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত

মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র।
সহোদর নাহি মোর মাতামহের যে সূত্র।
০ ০ ০ ০
মাতৃকুলের পিতৃকুলের কহিলাম কথা।
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেম ভক্তিদাতা॥"

লোচনদাস স্বীয় গ্রন্থের ঐতিহাসিক বিবরণ মুরারি গুপ্তের সংস্কৃত চৈতন্যচরিত (কড়চা) হইতে সংগ্রহ করিলেও গ্রন্থের বহুল স্থান তাঁহার নিজ অনুভূতির উপর রচিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা লোচন দাসের সুনিপুণ তুলিতে যেরূপ উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইয়াছে, যেরূপ মধুময়ী চিত্তাকর্ষিণী ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে, অন্য কোন লীলালেখক সেরূপ মাধুর্য্যময়ী ভাষায় উক্ত লীলা লিখিতে সমর্থ হন নাই।

চৈতন্য ভাগবতের ন্যায় চৈতন্যমঙ্গল ও আদি, মধ্য ও শেষ এই তিন খণ্ডে বিভক্ত, কিন্তু লোচনদাস এই গ্রন্থে একটি সূত্রখণ্ড লিখিয়াছেন। এই খণ্ডে মঙ্গলাচরণ, বন্দনা, প্রশ্ন ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তর, নারদ মুনির গৌররূপ দর্শন, কলি যুগাবতারের প্রমাণ, শ্রীকৃষ্ণের অবতার ও নিজ নিজ অংশে দেবগণের জন্ম ইত্যাদি বিষয় লিখিত হইয়াছে। এই অংশ গ্রন্থকারের অনুভব লব্ধ। অতঃপর আদি খণ্ডে মহাপ্রভুর বাল্যলীলা ও বিবাহ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যখণ্ডে প্রেমময় গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনে অতি অদ্ভুত কবিত্বপ্রতিভা প্রতিফলিত হইয়াছে। শেষখণ্ডে মহাপ্রভুর দক্ষিণ ও পশ্চিম তীর্থের বর্ণনা আছে এবং উপসংহারে মহাপ্রভুর তিরোধান কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। "চৈতন্যমঙ্গল" ব্যতীত 'দুর্ল্লভসার' "রাগ লহরী" "বস্তুতত্ত্বসার", 'আনন্দ লতিকা" "প্রার্থনা", "শ্রীচৈতন্যপ্রেম বিলাস" ও "দেহনিরূপণ" নামক তাঁহার আরও সাতখানি গ্রন্থ আছে।

সম্মিলন, সঙ্কীর্ত্তন, ভক্তদিগের নিকট ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ, পাতকীদিগের উদ্ধারকরণ প্রভৃতি বহুবিধ লোকাতিগ কার্য্যের সবিস্তার বর্ণনা আছে। অন্ত্য বা শেষ খণ্ডে সংসারে বীতরাগ হইয়া কাটোয়া (কণ্টক নগর) স্থিত কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসাবলম্বন, শিরোমুণ্ডন, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামগ্রহণ, নীলাচলে গমন, গৌড়দেশে পুনরাগমন, সর্ব্বত্র সঙ্কীর্ত্তনপ্রচার, শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিশেষে নীলাচলে গিয়া পুনরবস্থান প্রভৃতি অনেক বিষয় লিখিত আছে। কিন্তু কোন স্থানে চৈতন্যের মৃত্যু বর্ণিত হয় নাই—বোধ হয় ভাগবতেরা তাহা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করেন না বলিয়া সে অংশ ত্যাগ করা হইয়াছে।

গ্রন্থকার সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। পুরাণাদি অনেক গ্রন্থ হইতে অনেক বচন মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তিনি বড় গোঁড়া বৈরাগী ছিলেন। নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা চৈতন্যকে অবতার বলিয়া মানিতেন না, এজন্য তিনি যেখানে সুযোগ পাইয়াছেন, সেইখানেই তাঁহাদিগের প্রতি কটূক্তি করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মার তার শিরের উপরে॥

ইত্যাদিরূপে সাধুজনগর্হিত প্রণালী অবলম্বন করিয়াও গালি দিতে ত্রুটি করেন নাই। এমন কি বোধ হয়, তাঁহার হস্তে যদি কোন রাজশক্তি থাকিত, তাহা হইলে তিনি একদিনেই চৈতন্যোপাসক ভিন্ন সকল লোকেরই প্রাণসংহার করিতেন। তিনি নিজে যেরূপ উদ্ধত ছিলেন, বর্ণিত নায়ককেও সময়ে সময়ে সেইরূপ উদ্ধত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি যখন গৌরাঙ্গকে সঙ্কীর্ত্তনের প্রতিষেধকারী নবদ্বীপস্থ কাজীর ভবনে উপস্থিত করিয়াছেন, তখন গৌরাঙ্গ শিষ্যসমভিব্যাহারে কাজীর বাগানবাগিচা নষ্ট করিয়া ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়াছেন! পরিশেষে লঙ্কাকাণ্ডের ন্যায় কাজীর গৃহে অগ্নি দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন! কিন্তু আমরা চৈতন্যকে ওরূপ উদ্ধত বলিয়া জানিতাম না। ধর্ম্মসংস্থাপক দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে ওরূপ হওয়াও উচিত বোধ হয় না। চৈতন্যচরিতামৃতকার ওরূপ স্থলে গৌরাঙ্গকে তত উদ্ধত বর্ণন করেন নাই।

যাহা হউক, বৃন্দাবনদাসের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব মন্দ ছিল না। তিনি হাস্য

করুণ প্রভৃতি রসের বিলক্ষণ উদ্দীপন করিয়াছেন। কাজীর অনুচরেরা কীর্ত্তন, মূর্চ্ছা ও ক্রন্দনের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ কথোপকথন করিয়াছে, তাহাতে বিলক্ষণ পরিহাসরসিকতা আছে এবং গৃহ হইতে বহির্গমন-কালে শচীসমীপে গৌরাঙ্গের বিদায়গ্রহণ সময়ে করুণরসের সুন্দর উদ্দীপ্তি হইয়াছে। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ উহার কিয়দংশ নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম।——

কাজির আদেশে তার অনুচর ধায়। সমৃদ্ধি দেখি আপনার শাস্ত্র গায়॥
রড় দিয়া কাজীরে কহিল ঝাট্ গিয়া। কি কর চলহ ঝাট্ যাই পলাইয়া॥
যে সকল নাগরিয়া মারিল আমরা। আজি কাজি মার বলি আইসে তাহারা॥
এক যে হুঙ্কার করে নিমাই আচার্য্য। সেই সে হিন্দুর ভূত তাহারই সে কার্য্য॥
কেহ বলে বামনা এতেঁক কান্দে কেন। বামনার ছুই চক্ষে নদী বহে যেন॥
কেহ বলে বামনা আছাড় যত খায়। সেই দুঃখে কান্দে হেন সমুঝি সদায়॥
কেহ বলে বামনা দেখিলে লাগে ভয়। গিলিতে আইসে যেন দেখি কম্প হয়॥

১ম খ, ২৩ অ।

প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা। হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে। নিরবধি ধারা পড়ে না পারে রাখিতে॥
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন। কহিতে লাগিল শচী করিয়া ক্রন্দন॥
না যাইহ আরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া। পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ দেখিয়া॥
কমল নয়ন তোমার শ্রীচন্দ্র বদন। অধর সুরঙ্গ কুন্দ মুকুতা দশন॥
অমিয়া বরিষে যেন সুন্দর বচন। কেমনে বাঁচিব না দেখি গজেন্দ্র গমন॥
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি তোমার অনুচর। নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর॥
পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে। গৃহে রহি সঙ্কীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ তোর অবতার। জননী ছাড়িবা কোন্ ধর্ম্ম বা বিচার॥
তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা। কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥
প্রেম শোকে কহে শচী শুনে বিশ্বম্ভর। প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ না করে উত্তর॥

(ঐ শেষ অ,)

গ্রন্থকারের ভাবগ্রাহিতারও কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক, তন্নিমিত্ত নিম্নভাগটি উদ্ধৃত হইল—

পক্ষী যেমন আকাশের অন্ত নাহি পায়। যত শক্তি তাকে তত দূর উড়ি যায়॥
এই মত চৈতন্য কথার অন্ত নাই। যার যত শক্তি সবে তত তত গাই॥

(ঐ ঐ)

চৈতন্যভাগবতের ভাষা খুব মিষ্ট না হউক, বিশদ বটে। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় ভাষাদ্বারা সর্ব্বত্রই ব্যক্ত হইয়াছে। তবে প্রাচীনকালের ভাষা, এ জন্য ইহাতে কতক সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত, এবং কতক নিতান্ত অপভ্রংশ শব্দও দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রিয়াপদও স্থানে স্থানে প্রাচীনরূপ আছে। উদাহরণস্বরূপ ঐরূপ কয়েকটি শব্দ ও ক্রিয়ার উল্লেখ করা হইতেছে—(সংস্কৃত) কথংকথমপি, বাকোবাক্য, সাঙ্গোপাঙ্গ, কাষায়,—(প্রাকৃত) পহুঁ, চন্দ, তান, যহি ; (অপভ্রংশ) তছু, মুঞি, যৈছে, কথি ; (ক্রিয়া) কদর্থিবে, বোলে, করিমু, লখিতে ইত্যাদি।

এই গ্রন্থ সমুদয়ই পয়ারে গ্রথিত, কেবল কয়েকটি গীতস্থলে ত্রিপদী আছে। ইহার সময়ে মিত্রাক্ষরতা ও মিতাক্ষরতার নিয়ম সম্যক্ অনুসৃত হয় নাই—নাম= স্থান ; অবাক্য=অবাহ্য ; প্রভাব=অনুরাগ ; যোগ=লোভ ; দুগ্ধ=মুদ্গ ; বাস=জাত ; নহে=লয়ে ইত্যাদি শব্দ সকলও মিত্রাক্ষরস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এই কবির পরবর্ত্তী কবিদিগেরও রচনায় মিতাক্ষরতার যেরূপ ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, ইহার কিছু নৈসর্গিক শক্তি ছিল বলিয়া ইঁহার রচনায় সেরূপ ব্যতিক্রম অধিক লক্ষিত হয় না। পূর্ব্বোদ্ধৃত সন্দর্ভ মধ্যেই ইহার প্রমাণ দৃষ্ট হইবে।

চৈতন্যভাগবত ভিন্ন বৃন্দাবনদাসের আর কোন গ্রন্থ * ছিল কিনা, তাহা স্থির বলা যায় না। কিন্তু ঐ গ্রন্থাতিরিক্ত তাঁহার রচিত কতকগুলি গীত ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৃন্দাবনের সময়ে মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরির গীতের প্রচার ছিল—তিনি মধ্যে মধ্যে তাহার উল্লেখ করিয়া তদুপরি কটু কটাক্ষ করিয়াছেন।

* দীনেশ বাবু 'নিত্যানন্দ বংশমালা' নামক গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা তাঁহার অনুমানে ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে রচিত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত।

চৈতন্যভাগবতের রচনার কিছুকাল পরেই পরম ভাগবত কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত নামক গ্রন্থের রচনা করেন। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাটোয়ার সন্নিহিত ঝামট্‌পুর নামক গ্রামে কৃষ্ণদাসের নিবাস ছিল। কৃষ্ণদাস জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থের আদিখণ্ডান্তর্গত পঞ্চম অধ্যায়ে এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন যে, নিত্যানন্দরূপী বলরাম স্বপ্নযোগে তাঁহাকে দর্শন দিয়া বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করেন। তদনুসারে তিনি বৃন্দাবন গমন করিয়া রূপ, সনাতন ও রঘুনাথ দাসের আশ্রয় ও শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। চরিতামৃতগ্রন্থ বোধ হয়, ঐ স্থানে বসিয়াই রচনা করিয়া থাকিবেন। কারণ অনেক স্থানে "আইনু বৃন্দাবন", "এই বৃন্দাবন" এইরূপ কথা গ্রন্থ মধ্যে উল্লিখিত আছে।

গ্রন্থকার কোন স্থানে নিজের সময় নির্দ্দেশ করেন নাই, কিন্তু তাঁহার উপরিলিখিতরূপ পরিচয়দানদ্বারাই ইহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি ১৪৯৫ শকের (খৃঃ ১৫৭৩ অব্দের) পর ১০।১৫ বৎসরের মধ্যেই এই গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। কারণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃতনাটক ১৪৯৪ শকে লিখিত হয়। চরিতামৃতে ঐ নাটকের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত আছে—সুতরাং ইহা তৎপূর্ব্ব সময়ে রচিত হওয়া সম্ভব নহে। না হউক, কিন্তু উহার অধিককাল পরে রচিত একথাও বলা যাইতে পারে না—কারণ তিনি যাঁহাদের শিষ্যতাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই চৈতন্যের সমসাময়িক লোক—চৈতন্যের অন্তর্ধানের পর অধিককাল তাঁহাদের জীবিত থাকা অসম্ভব।

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'ও চৈতন্যের সমস্ত লীলাসংক্রান্ত পদ্যময় বৃহৎ গ্রন্থ। ইহাও আদি, মধ্য ও অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। চৈতন্যভাগবতের খণ্ডত্রয়ে যেরূপ বিবরণ বর্ণিত আছে, ইহারও খণ্ডত্রয়ে প্রায় সেইরূপ বিবরণ ; তবে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে এই মাত্র। ইনি অনেকবার বলিয়াছেন, বৃন্দাবন

দাসের গ্রন্থে যে বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা নাই, তাহারই সবিস্তার বর্ণনা করিবেন। ফলতঃ তাহাই বটে ; চরিতামৃতে চৈতন্যের যত দেশ ভ্রমণের কথা আছে, চৈতন্য-ভাগবতে তাহা নাই। অনেক ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্যেরও বৈপরীত্য লক্ষিত হয়।

কবি সংস্কৃতে একজন সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। প্রতি অধ্যায়ের প্রথমেই কয়েকটি করিয়া স্বরচিত শ্লোক দিয়াছেন। প্রথম কয়েকটি শ্লোকের সংস্কৃতে টীকাও করিয়াছেন। সেই সকল শ্লোক পাঠ করিলে তাঁহার কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীনগ্রন্থ এবং তাৎকালিক মহাত্মগণের রচিত বিদগ্ধমাধব, হরিভক্তি-বিলাস, বিল্বমঙ্গল, লঘুভাগবতামৃত, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দানকেলি-কৌমুদী, স্তবমালা, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণস্থলে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং অনেকস্থলে ঐ সকল শ্লোকের বাঙ্গালাপদ্যে অর্থ করিয়া দিয়াছেন। চৈতন্যের অবতার বিষয়ে কোন পুরাণে বর্ণনা নাই, এজন্য অনেকে চৈতন্যের প্রতি শ্রদ্ধা করেন না; এই দেখিয়া তিনি ভাগবতের কৃষ্ণবিষয়ক কতিপয় শ্লোককে পরম কৌশলসহকারে চৈতন্যবিষয়ক করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

চরিতামৃত বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ ; অতএব ইহার বৃত্তান্তগুলি যাহাতে সাধারণের বোধগম্য হয়—সত্যবোধে যাহাতে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, গ্রন্থকার তজ্জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কবিত্বশক্তিপ্রকাশের জন্য সেরূপ চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার রচনা পদ্যময় এইমাত্র—বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারতাদির গ্রন্থ-কারেরা ধর্ম্মকথার সহিত যেরূপ চমৎকারজনক কবিত্ব প্রখ্যাপন করিয়াছিলেন, ইনি তাহার কিছুই করেন নাই। ইনি কথায় কথায় যদি অত অধিক সংস্কৃতবচন উদ্ধৃত না করিতেন, তাহা হইলে ইহার গ্রন্থ বোধ হয়, অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইত। অধিক বচন উদ্ধৃত করায়, পাঠমাত্র গ্রন্থের সমুদয় বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না। বোধ হয়, গ্রন্থের পারিপাট্যসম্পাদন করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল না—প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা চৈতন্যকে প্রামাণিক ও তাঁহার নিজগ্রন্থকে শ্রদ্ধা-স্পদ করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যাহা হউক, তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ

হইয়াছে। ভাগবতেরা এই গ্রন্থের প্রতি বিলক্ষণ শ্রদ্ধা করেন। অনেকে প্রতিদিন গন্ধপুষ্পদ্বারা ঐ পুস্তক পূজা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না।

চরিতামৃতের ভাষা বিশেষ সুশ্রাব্য বা সুন্দর নহে। চৈতন্যভাগবতের রচনাতে যেমন কতক শুদ্ধ সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত, কতক নিতান্ত অপভ্রংশ শব্দ ও কতক পুরাতন ক্রিয়ার মিশ্রণ লক্ষিত হয়, ইহাতেও তাহাই আছে। অস্ত্র, আরত্রিক, অর্থবাদ, মৃদ্‌ভাজন; বোল, তান, মহান্ত, দোহে; তিহোঁ, ঐছে, মুঞি, কথি; দঢ়াইল, মুছিল, জুয়ায়, করিমু ইত্যাদি উহার প্রমাণ। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির সময়ে সংযুক্তশব্দের বিপ্রকর্ষণ ক্রিয়ার যেরূপ প্রাচুর্য্য ছিল, চরিতামৃতের সময়ে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছিল।

চরিতামৃত প্রায় সমস্তই পয়ারে নিবদ্ধ, কেবল কয়েক স্থানে ত্রিপদী আছে। ছন্দে অক্ষরসাম্যের নিয়মের যতদূর ব্যতিক্রম হইয়াছে, মিত্রাক্ষরতার ততদূর ব্যতিক্রম করা হয় নাই। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ নিম্নভাগে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—

এইরূপ কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে। প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপসনাতনে॥
মহা প্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র। রূপসনাতন সবার কৃপা গৌরব পাত্র॥
কেহ যদি দেশ যায় দেখি বৃন্দাবন। তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ॥
কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপসনাতন। কৈছে করে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন॥
কৈছে অষ্ট প্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন। তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥
অনিকেতন দুহে রহে যত বৃক্ষগণ। একৈক বৃক্ষের তলে একৈক রাত্রিশয়ন॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস॥

(ম, খ, ১৯ অ)

চরিতামৃতের আদ্যন্তই এইরূপ বাঁকাভাষায় লিখিত নহে—অনেকস্থলে বেশ সরলভাষা আছে। অতএব অনুমান হয় গ্রন্থকার, স্বাধিষ্ঠানবৃন্দাবনের অনেক কথাও গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসরচিত 'অদ্বৈতসূত্র-করচা',

'স্বরূপবর্ণন' প্রভৃতি নামে আরও কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমরা দেখিয়াছি, তাহাতেও চৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায়——

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।—কহে কৃষ্ণদাস॥

এইরূপ ভণিতি আছে। সে সকল গ্রন্থও এইরূপ গৌরাঙ্গ-সংক্রান্ত, অতএব তাহাদের আর পৃথক্ সমালোচনার প্রয়োজন নাই।

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ—চণ্ডীকাব্য।

বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক বাঙ্গালা গ্রন্থসকলের অব্যবহিত পর হইতেই ক্রমে ক্রমে মুকুন্দরাম, ক্ষেমানন্দ, কাশীরাম, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণ চণ্ডী, মনসার ভাসান, মহাভারত, শিবসঙ্কীর্ত্তন, কবিরঞ্জন প্রভৃতি কাব্য সকলের প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের কথাই অগ্রে বলা যাইতেছে।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী সেলিমাবাদ থানার অন্তর্গত দামুন্যা * নামক গ্রামে চণ্ডীকাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর নিবাস ছিল। তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথমিশ্র, পিতার নাম হৃদয়মিশ্র এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম কবিচন্দ্র। চণ্ডীকাব্যের ভণিতিতে গ্রন্থকার নিজ-পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন :—

মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয়মিশ্রের তাত, কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

কবির প্রকৃত নাম 'মুকুন্দরাম'; 'মিশ্র' ও 'চক্রবর্ত্তী' তাঁহার বংশীয় উপাধি—অলৌকিক কবিত্বশক্তি দর্শনে তাৎকালিক জনগণের প্রদত্ত উপাধি—কবিকঙ্কণ। বোধ হয়, তাঁহার অগ্রজেরও কবিচন্দ্র প্রকৃত নাম নহে—উপাধিমাত্র। কবি-চন্দ্রের কবিত্ব প্রদর্শক আর কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল শিশু-বোধকের মধ্যগত দাতাকর্ণে—

---

* দামুন্যা গ্রাম বর্ত্তমান জাহানাবাদ হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত।

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের কৃপায়। ধনপুত্র হয় তার যে জন গাওয়ায়॥

এই ভণিতি দর্শনে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঐ প্রবন্ধ কবিকঙ্কণের ভ্রাতা কবিচন্দ্রের রচিত। কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে চণ্ডীর মধ্যেও কবিচন্দ্র-রচিত একটি সূর্য্যবন্দনা দেখিতে পাওয়া যায়।

মুকুন্দরাম যৌবনে বা প্রৌঢ়াবস্থার প্রথমে দুরাত্মা যবনদিগের অসহনীয় উপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া পিতৃপৈতামহ বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুত্রকলত্র সমভিব্যাহারে দেশান্তর যাত্রা করেন এবং নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া মেদিনীপুরের অন্তর্ব্বর্ত্তী ব্রাহ্মণভূমি পরগণার আঁড়্রা নামক গ্রামের ব্রাহ্মণজাতীয় রাজা বাঁকুড়াদেব (বা বাঁকুড়ারায়) মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত হন। বাঁকুড়াদেব তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সভাসদরূপে নিযুক্ত করেন, এবং আপন পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী করিয়া দেন। মুকুন্দরাম রাজদায় ও অন্নচিন্তার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তথায় সুখে অবস্থান করত এই কাব্যগ্রন্থের প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের প্রথম ভাগেই "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" শীর্ষে ঐ বৃত্তান্তের বর্ণন আছে—যথা——

শুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ,
এই গীত হইল যেই মতে।

উরিয়া (ক) মায়ের বেশে, কবির শিয়র দেশে,
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে॥

সহর সেলিমাবাজ (খ), তাহাতে সুজন রাজ,
নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।

তাহার তালুকে বসি, দামুন্যায় চাস চসি,
নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥

ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণু পদাম্বুজে (১) ভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধীপ (২),

(ক) উরিয়া—আবির্ভূত হইয়া।

(খ) সেলিমাবাজ—বর্দ্ধমান সহরের ছয় ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে দামোদর নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। আইন আকবরিতে দেখা যায় ইহা একটি 'সরকার'।

(১) 'বিষ্ণুপদে যেন ভৃঙ্গ' এবং 'সমীপে' পাঠান্তর।

সে মান-সিংহের কালে(২), প্রজারপাপের ফলে, খিলাৎ পায় মহম্মদ সরিফে (৩)॥
উজীর হ'লো রায়জাদা (গ), ব্যাপারিরে ভাবে সদা (৪),
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হ'ল অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাঠায় কুড়া (ঘ),
নাহি মানে প্রজার গোহারি (ঙ)।
সরকার হৈল কাল, খিলভূমি (চ) লিখে লাল (ছ),
বিনা উপকারে খায় ধুতি (জ)।
পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম,
পাই লভ্য (ঝ) লয় দিন প্রতি॥
ডিহিদার আরোজখোজ (৫), টাকা দিলে নাহি রোজ (ঞ),
ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে।

---

(২) বটতলা ধৃত পাঠ; 'আঁরডা পুথির পাঠ, 'অধর্ম্মী রাজার কালে' সমীচীন নহে।

(৩) 'ডিহিদার মামুদ সরিফ' অক্ষয় বাবুর ও বঙ্গবাসীর পুস্তক।

(গ) রায়জাদা—ব্যক্তি বিশেষের নাম, ইহার অর্থ রাজপুত্র।

(৪) 'ব্যাপারিরে দেয় খেদা'। খেদা=তাড়া

(ঘ) কুড়া=বিঘা; কুড়ি কাঠাতেই এক বিঘা জমি মাপিবার আবহমান প্রচলিত ব্যবস্থা, কিন্তু সেই উৎপীড়ক অত্যাচারীর শাসন সময়ে জমির কোণে কোণে দড়ি ফেলিয়া পনর কাঠায় বিঘা ধরা হইতে লাগিল।

(ঙ) গোহারি=কাতরোক্তি।

(চ), (ছ) খিল=অনুর্ব্বর, আচট; লাল—উৎকৃষ্ট।

(জ) ধুতি=উৎকোচ, ঘুস। 'ধুতি খেয়ে ছেড়ে দিল মালিনী পলায়', ভারতচন্দ্র, বিদ্যাসুন্দর।

(ঝ) লভ্য=সুদ।

(৫) 'ডিহিদার অবোধখোজ' ইতি পাঠ। আরোজ খোজ সৈনিক কর্ম্মচারিদিগের উপাধি বিশেষ। যিনি ডিহিদার তাঁহার আরোজখোজ এই সৈনিক উপাধি ছিল।

(ঞ) রোজ=পারস্যভাষার শব্দ, অর্থ, দৈনিক খাদ্য। টাকা দিলেও দৈনিক খাদ্য মিলিত না।

প্রভু গোপী নাথ নন্দী, বিপাকে হইল বন্দী,
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে ॥
কোতালিয়া বড়পাপ, সজ্জনের কাল সাপ,
কড়ির কারণে বহু মারে।
আথালি পাথালি কড়ি, লেখা জোখা নাহি দেড়ি,
যত দিয়া যেবা নিতে পারে ॥
জমাদার বসায় নাছে (ট), প্রজারা পলায় পাছে,
দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা (ঠ)।
প্রজার ব্যাকুল চিত্ত, বেচে ধান গরু নিত্য,
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা।
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ (ড), চণ্ডীবাটী (ঢ) যার গাঁ,
যুক্তি কৈল গম্ভীর খাঁর (৬) সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই,
পথে দেখা হইল তার সনে (৮) ॥
তেলি গাঁয়ে (৯) উপনীত, রূপরায় কৈল হিত (১০)
যদুকুণ্ডু (৭) তিলি কৈল রক্ষা।

(ট) নাছে=বাটীর দ্বারে।

(ঠ) থানা=আড্ডা।

(ড) শ্রীমন্ত খাঁ—চণ্ডীবাটীর তালুকদার।

(ঢ) চণ্ডীবাটী—গোতান নামক গ্রামের একটি পল্লী। চণ্ডীবাটীতে 'শ্রীমন্ত' নামক এক জলাশয়ের অস্তিত্ব রহিয়াছে।

(৬) 'যুক্তি কৈল গরিব খাঁর সনে' ইতি পাঠ।

(৭) 'সঙ্গে রমানাথ ভাই' অক্ষয় বাবু ধৃত পাঠ।

(৮) 'পথে চণ্ডী দিলা দরশনে'—বটতলার পুস্তক।

(৯) 'ভেটনায় উপনীত'—অক্ষয় বাবু ধৃত পাঠ।

(১০) 'রূপরায়' নিল বিত্ত' ইতি পাঠ—রূপরায়—জনৈক রাজপুত দস্যু।

(৭) যদু কুণ্ডুর বংশধরগণ অদ্যাপি তেলিয়ার সমীপবর্ত্তী নারায়ণপুর গ্রামে অবস্থিতি করিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম অক্ষয়কুমার কুণ্ডু।

দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর,
দিবস তিনের দিল ভিক্ষা ॥
বাহিনু গড়াই (ত) নদী, সর্ব্বদা স্মরিয়া বিধি,
তেউটায় হইনু উপনীত (১০)।
দারুকেশ্বর তরি, পাইনু মাতুলপুরী (১১),
গঙ্গাদাস (থ) বহু কৈল হিত ॥
নারায়ণ পরাশর (দ), ছাড়িলাম আমোদর (১২),
উপনীত গোথড়া নগরে (১৩)।
তৈল বিনা কৈনু স্নান, উদক করিনু পান,
শিশু (ধ) কাঁদে ওদনের তরে।
আশ্রয়ি পুখুরি আড়া (ন), নৈবেদ্য শালুকনাড়া (প),
পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে ॥

(ত) 'বাহিল গোড়াই নদী'—আঁরড়ার পুঁথি ও বটতলার পুস্তক। 'গোড়াই', 'গড়াই' ও 'ঘড়াই' তিনশব্দে প্রভেদ আছে।

(১০) 'কেঁউটায় হইল উপনীত' পাঠান্তর। তেউটিয়া বা তেউটা জাহানাবাদের পূর্ব্বোত্তরে ঈশানকোণে) অবস্থিত।

(১১) 'পাইল বাতনগিরি'—বটতলার পুস্তক। মাতুলপুরী—হুগলী জেলায় আরামবাগ মহকুমায় সদর ষ্টেসনের দারুকেশ্বর নদের পরপারবর্ত্তী কালীপুরের সংলগ্ন গ্রাম।

(থ) গঙ্গাদাস—কবির মাতুল পুত্র।

(দ) 'নারায়ণ' ও 'পরাশর' দুইটী ক্ষুদ্র নদী অধুনা বিলুপ্ত

(১২) 'ছাড়িলেন দামোদর'—বটতলার পুস্তক

(১৩) 'উপনীত কুচুটে নগরে'—বটতলার পুস্তক গোথড়া গড়মান্দারণ গ্রামের নৈঋৎ কোণে অবস্থিত।

(ধ) শিশু অর্থাৎ কবিকঙ্কণের দ্বিতীয় পুত্র 'পঞ্চানন'। কেহ কেহ বলেন শিশু শব্দের লক্ষ্য কবির পৌত্র, তাঁহাদের মতে কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠপুত্র শিবরামের পুত্র, ইহা সুসঙ্গত নহে।

(ন) পুখুরি আড়া—পুকুরের পাড়।

(প) শালুকনাড়া—কুমুদফুলের নাল।

ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেনু সেই ধামে,
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে ॥
হাতে লয়ে পত্রমসী (১৪), আপনি কলমে বসি,
নানা ছন্দে লিখন কবিত্ব (১৫)।
পড়েছি অনেক তন্ত্র, নাহি জানি কোন মন্ত্র,
আজ্ঞা দিল জপি নিত্য নিত্য ॥
দেবী চণ্ডী মহামায়া, দিলেন চরণ ছায়া,
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বাহিয়া যাই,
আঁরড়ায় (ফ) হইনু উপনীত ॥
আঁরড়া ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী,
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ববাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি,
দশ আড়া (ব) মাপি দিল ধান ॥
বীর মাধবের সুত, বাঁকুড়াদেব গুণ যুত,
শিশুপাঠে (১৬) কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত (শ),
গুরু করি করিল পূজিত।

---

(১৪) 'করে লয়ে পত্রমসী'—বটতলার পুস্তক।

(১৫) 'নানা ছন্দে লিখিলা কবিত্ব'—বটতলার পুস্তক।

(ফ) আঁরড়া ব্রাহ্মণ ভূমি মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা নামক তন্তুবায়-প্রধান গণ্ডগ্রামের দুই ক্রোশ দূরে। ব্রাহ্মণভূমি একটি পরগণার নাম।

(ব) আড়া=চারিমণ, দশ আড়া=চল্লিশ মণ।

(১৬) 'শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত'—ইতিপাঠ।

(শ) অবদাত=নির্ম্মল।

সঙ্গে ভাই রামানন্দী (১৭), সে জানে স্বপ্নের সন্ধি,
অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি,
গায়নেরে (ষ) দিলেন ভূষণ॥
ধন্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত,
প্রকাশিল নূতন মঙ্গল।
তাঁহার আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
মম ভাষা করিও কুশল॥

উপরিলিখিত সন্দর্ভটি মুদ্রিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে অবিকল উদ্ধৃত নহে। কবিকঙ্কণ, আঁরড়া গ্রামের যে ব্রাহ্মণ জাতীয় রাজা রঘুনাথ দেবের রাজসভায় চণ্ডীগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার বর্ত্তমান বংশধরগণ উক্ত আঁরড়া গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী 'সেনাপতে' নামক গ্রামে অদ্যাপি বাস করিতেছেন। তাঁহারা কহেন যে, তাঁহাদের বাটীতে যে চণ্ডীপুস্তক বর্ত্তমান আছে, তাহা কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত। এ কথা সত্য কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের এক আত্মীয় * অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই পুস্তক হইতে উপরিউক্ত সন্দর্ভটি সমুদয় লেখাইয়া আনিয়া দিয়াছেন। আমরা উপরিভাগে যাহা প্রকাশ করিলাম, তাহা উক্ত সেনাপতে গ্রামের দ্বিজরাজভবনস্থ পুস্তকের পাঠানুসারে অনেকাংশে বিশোধিত।

ঐ পুস্তকের পাঠ সকল দেখিতে পাইয়া আমাদের অনেকগুলি সংশয় অপনীত হইয়াছে। প্রথমতঃ—মুদ্রিত বটতলার পুস্তকে "উপনীত কুচুট নগরে" এইরূপ লিখিত থাকায় মুকুন্দরামের দামুন্যা হইতে আঁরড়া গমন সময়ে পথি মধ্যে কুচুটগ্রাম পাওয়ার কথা বর্ণিত আছে—কিন্তু তাহা কোনমতে সঙ্গত হয় না—কারণ কুচুট

(১৭) 'সঙ্গে দামোদর নন্দী'—বটতলার পুস্তক।

'সঙ্গেতে দামাল নন্দী'—দামুন্যার পাঠ।

(ষ) গায়নেরে দিলেন ইত্যাদি—গায়ন চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বয়ং, তাঁহাকে 'কবিকঙ্কণ' এই ভূষণ দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহার নাম শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল।

* শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

(কালেশ্বর) দামুন্তা হইতে অনেক উত্তরদিকে অবস্থিত—আঁরড়া সেদিকে নহে—দক্ষিণ দিকে। সুতরাং দ্বিজরাজভবনস্থ পুস্তকে যে, কুচুটের পরিবর্ত্তে গোখড়া গ্রাম লিখিত আছে, তাহাই সঙ্গত বোধ হয়।

দ্বিতীয়তঃ—মুদ্রিত পুস্তকে 'সুধন্য বাঁকুড়ারায়' এইরূপ একটি চরণ আছে, তৎপাঠে অনেকের ভ্রম হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণভূমি পরগণা ও তদন্তর্গত আঁরড়া গ্রাম, বাঁকুড়া জেলার মধ্যে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, উহা মেদিনীপুর জেলার মধ্যগত এবং বাঁকুড়াদেব বা বাঁকুড়ারায় রঘুনাথ দেবের পিতার নাম। উপরি-লিখিত পুস্তকের এবং আরও কয়েকখানি প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের পাঠে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে।

চণ্ডীকাব্য রচনার কালনির্ণয়—এক্ষণে চণ্ডীকাব্য কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় করা আবশ্যক। পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিজরাজ ভবনস্থ পুস্তকের শেষ অংশটি পাওয়া যায় নাই—সুতরাং তাহাতে সময়নির্দ্দেশক কোন কথা ছিল কি না, জানিবার উপায় নাই। আমরা আরও ৫।৬ খানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলাম; সে সকল পুস্তকের কোথাও সময়সূচক শ্লোক নাই। কিন্তু এক্ষণকার বটতলার মুদ্রিত পুস্তকের শেষভাগে একটি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়—যথা

শকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা। কতদিনে দিলা গীত হরের বণিতা॥

এই শ্লোকের অর্থ লোকে সচরাচর ১৪৬৬ শক [১৫৪৪ খৃঃ অব্দ] করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে কবির নিজ লিখিত মানসিংহের শাসনকালবর্ণন সঙ্গত হয় না। কারণ মানসিংহ ১৫১১ শকে [১৫৮৯ খৃঃ অব্দে] এদেশের সুবাদারিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ১৪৬৬ শকের ৪৫ বৎসর পরে যে মানসিংহ উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহার বর্ণন ১৪৬৬ শকে হওয়া সর্ব্বতোভাবেই অসঙ্গত। এই অসঙ্গতি নিবারণার্থ কেহ কেহ "শকে রস রস বেদ" এই পাঠকে ভ্রান্ত বলিয়া "শকে রস রস বাণ" এইরূপ পাঠান্তর কল্পনা করিয়াছেন—কিন্তু তাহাও সঙ্গত হয় না। যেহেতু ১৫৬৬ শকেও [১৬৪৪ খৃঃ অব্দে] মানসিংহ এদেশের সুবাদার ছিলেন না। তিনি ১৫২৬ শকেই [১৬০৪ খৃঃ অব্দেই] আপনার শাসনকর্ত্তৃপদ

ত্যাগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমাদের বোধ হয় "শকে রস রস" ইত্যাদি শ্লোক কবিকঙ্কণের স্বরচিত নহে—উহা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক হইবে। আঁরড়া ব্রাহ্মণভূমির রাজবংশ তালিকায় দেখা যায় যে,কবিকঙ্কণের প্রতিপালক রাজা রঘুনাথদেব রায় ১৪৯৫ শক [১৫৭৩ খৃঃ অঃ] হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫২৫ শক [১৬০৩ খৃঃ অঃ] পর্য্যন্ত ৩০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। কবিকঙ্কণ, রাজা রঘুনাথের রাজত্বকালে ও তাঁহারই উৎসাহে যে, কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ গ্রন্থমধ্যেই আছে। অতএব ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ১৪৯৫ শকের পর ১৫২৫ শকের মধ্যে কোন সময়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যের রচনা করিয়াছিলেন। উপরিভাগে যেরূপ লিখিত হইল, তাহাতে দেখা যাইবে যে, রাজা মানসিংহের শাসনও ঐ সময়েই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যদি কেহ "শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক" ইত্যাদি শ্লোককে সমূলক বলিতে নিতান্তই ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা ঐ শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিব—যথা, 'রস' শব্দে যেরূপ ৬ বুঝায়, সেইরূপ ৯ও বুঝাইতে পারে, অতএব 'শকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা' ইহার অর্থ ১৪৬৬ শক না হইয়া ১৪৯৯ শক (১৫৭৭ খৃঃ অঃ) হইবে। ১৪৯৯ শকে রঘুনাথ রায় রাজা ছিলেন—তৎকালে ঐ গ্রন্থ রচিত হওয়া অসম্ভব নহে। যদি কেহ বলেন ১৪৯৯ শকেও মানসিংহের অধিকার হয় নাই—তাহার ১২ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫১১ শকে হইয়াছিল, সুতরাং ১৪৯৯ শকে লিখিত গ্রন্থের সূচনায় মানসিংহের শাসনবর্ণন কিরূপে সঙ্গত হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই বলি যে, ঐ ১৪৯৯, গ্রন্থের আরম্ভকালের শক—সমাপ্তিকালের শক নহে। ঐ শকে তিনি আঁরড়ানগরে অবস্থানপূর্ব্বক চণ্ডীরচনার আরম্ভ করিয়া ১২।১৪ বৎসর পরে অর্থাৎ যখন মানসিংহের আধিপত্য দেশমধ্যে সুবিদিত হইয়াছিল, তৎকালে রচনার শেষ করিয়া থাকিবেন এবং এক্ষণকার গ্রন্থকারেরা যেরূপ রচনা সমাপ্তি করিয়া শেষে ভূমিকা লিখিয়া থাকেন, বোধ হয় তিনিও সেইরূপ গ্রন্থ রচনা সমাপনের পর পরিশেষে "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" শীর্ষক সূচনাভাগটি লিখিয়া গ্রন্থের প্রথমভাগে যোজনা করিয়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক, যখন ১৪৯৫ শকের পর ১৫২৫ শকের পূর্ব্বে ৩০

বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যরচনা করিয়াছিলেন, এরূপ স্থিরতর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তখন এ বিষয়ের জন্য আর তর্ক বিতর্ক করার কোন প্রয়োজন নাই।

কবিকঙ্কণের এক পুত্র ও এক কন্যা ছিলেন। পুত্রের নাম শিবরাম এবং কন্যার নাম যশোদা। যথাকালে তিনি তাঁহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন। বধূ চিত্রলেখা ও জামাতা মহেশ। মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যের অনেক স্থলে দেবী ভগবতীর নিকট তাঁহাদের কল্যাণকামনা করিয়াছেন, যথা—

'উঠিয়া কবির কামে, কৃপা কর শিবরামে,
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে'।

কবিকঙ্কণের বংশীয়েরা দামুন্যা গ্রামে কেহ নাই; তাহার নিকটবর্ত্তী বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত ছোটবৈনান গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের অনেকে অদ্যাপি সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যবসায় করিয়া থাকেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা কবিকঙ্কণ হইতে কয় পুরুষ অন্তর তাহা প্রায় কেহই বলিতে পারেন না! ইঁহাদের বাটীতেও আল্‌তায় লিখিত একখানি চণ্ডীকাব্য আছে—সে খানির পূজা হয়। ইঁহারা বলেন সে খানি কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত।

কবিকঙ্কণের উপজীব্য রাজা রঘুনাথ রায়ের বংশীয়েরাও পূর্ব্বোল্লিখিত সেনা-পতে গ্রামে অদ্যাপি বাস করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহাদের রাজ্য নাই—বর্দ্ধমান-রাজ সমুদয় কাড়িয়া লইয়াছেন। রঘুনাথ রায় হইতে ১০ম পুরুষ (বর্ত্তমান) শ্রীযুক্ত রামহরি দেব, সেনাপতে গ্রামের কলেক্টরীর খাজনা বাদ যৎকিঞ্চিৎ যাহা উপস্বত্ব থাকে, তদ্দারাই কথঞ্চিৎ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

গ্রন্থবর্ণিত বিষয়—মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্যের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণস্বরূপ গণেশ, লক্ষ্মী, চৈতন্য, রাম প্রভৃতির বন্দনা করিয়া সংস্কৃত পুরাণ রচনার অবলম্বিত রীতি অনুসারে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ, হৈমবতীর বিবাহ, গণপতি ও কার্ত্তিকেয়ের জন্মপ্রভৃতি বর্ণনপূর্ব্বক ভগবতীর পৃথিবীতে পূজা প্রচারোদ্দেশে কালকেতু ব্যাধের ও শ্রীমন্তসওদাগরের দুইটি বৃহৎ

উপাখ্যান সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা পাঠ করিলে তিনি যে, সংস্কৃতশাস্ত্রে একজন বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও বহুদর্শী লোক ছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। গৌরীর রূপবর্ণন, নারদকৃত সম্বন্ধ, তারকাসুরপীড়িত দেবগণের ব্রহ্মসমীপে গমন, শিবতপস্যা, মদনদহন, রতিবিলাপ, পার্ব্বতী-তপস্যা, হরানুগ্রহ ও হরগৌরীবিবাহ প্রভৃতি, কালিদাস রচিত কুমারসম্ভবের অনুকৃতি স্বরূপ হইলেও উহাতে তাঁহার বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। শিবের ভিক্ষা ও হরগৌরীর কন্দল প্রভৃতি তাঁহার নূতন রচনা। এই গ্রন্থস্থ কালকেতু ব্যাধ ও ধনপতি সওদাগর প্রভৃতির উপাখ্যান কবির স্বকপোলকল্পিত, কি ইহার কোন না কোনরূপ পৌরাণিক মূল আছে, তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। কিন্তু কবির লেখার ভঙ্গীতে বোধ হয় যে, কোন পুরাণ বা উপপুরাণে ইহার কিছু না কিছু মূল থাকিবে। যেহেতু তিনি মধ্যে মধ্যে "বিচারিয়া অনেক পুরাণ" এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম পদ্মপুরাণে কালকেতুর উপাখ্যান এবং কল্কিপুরাণে শ্রীপতি সওদাগরের উপাখ্যান বর্ণিত আছে, কিন্তু আমরা ঐ দুই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম, কোথাও তাহা দেখিতে পাইলাম না। যাহা হউক, চণ্ডীকাব্য এক্ষণে প্রায় রামায়ণ, মহাভারতাদির ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে গণ্য হইয়াছে; অনেক শাক্তে নিয়মিতরূপে এই গ্রন্থের পূজা করেন; ইহার উপাখ্যান ভাগ লইয়া কত কত যাত্রার পালা প্রস্তুত হইয়াছে; কত কত গায়কে চামর-মন্দিরা-সহযোগে চণ্ডীগান করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছে ও করিতেছে এবং কত লোকে ধর্ম্মবোধে সংকল্প করিয়া ঐ গীত বাটীতে গাওয়াইতেছে। সুতরাং কাল্পনিক উপন্যাস হইলে লোকের ইহাতে এত শ্রদ্ধা হওয়া তাদৃশ সঙ্গত হয় না। যাহা হউক, সচরাচর প্রচলিত পুরাণ ও উপপুরাণে ইহার কোনরূপ উল্লেখ দেখিতে না পাওয়ায় অনেকে ইহাকে স্বকপোলকল্পিত বলিয়াই বোধ করেন। আমরা বাল্যকালে পিতামহীদিগের মুখে মনসার কথা, ইতুর কথা, ষষ্ঠীর কথা, সুবচনীর কথা, লক্ষ্মীর কথা, মঙ্গলচণ্ডীর কথা প্রভৃতি অনেক কথা শুনিয়াছি; সেই কথায় এইরূপ অনেক উপাখ্যান আছে। অতএব আমাদের বোধ হয়, কবি স্বদেশপ্রচলিত তাদৃশ কোন

উপাখ্যানকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তদুপরি এই সুরম্য হর্ম্ম্যের নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন।

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র—কবিকঙ্কণ বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি।* ইতিপূর্ব্বে আমরা যে যে কবির নামোল্লেখ করিয়াছি—কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও কল্পনাগুণে তাঁহাদের কেহই কবিকঙ্কণের সমকক্ষ নহেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, কবিত্ব বিষয়ে ভারতচন্দ্রের যে এত গৌরব এবং আমাদেরও ভারতচন্দ্রের প্রতি যে এত শ্রদ্ধা আছে, চণ্ডীপাঠের পর অন্নদামঙ্গল পাঠ করিলে সে গৌরব ও সে শ্রদ্ধার অনেক হ্রাস হইয়া যায়। সংস্কৃতে যেমন মাঘকবি ভারবির কিরাতা-

---

*পরলোকগত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—কবিকঙ্কণ নিঃসংশয়রূপে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি। কি মানবস্বভাবপরিজ্ঞান, কি বাহ্য জগদ্বর্ণনা নৈপুণ্য, কি করুণরসের উদ্দীপনাশক্তি, কি সুকল্পনা সকল বিষয়েই তিনি অদ্বিতীয়। যদি তাঁহার মানবস্বভাবপরিজ্ঞানের বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখিতে চাও তবে যে স্থলে অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইবার জন্য বণিকের নিকট কালকেতুর গমন বর্ণিত আছে, সেই স্থান পাঠ কর। যদি তাঁহার বাহ্য জগদ্বর্ণনানৈপুণ্য বিশেষরূপে দেখিতে চাও, তবে তাঁহার বর্ণিত কলিঙ্গায় ঝড় বৃষ্টির বর্ণন ও মগরায়ও ঐ ঘটনার বর্ণন পাঠ কর। যদি তাঁহার করুণরস উদ্দীপনাশক্তির বিশেষ পরিচয় পাইতে চাও, তবে ধনপতির কারামোচনকালে আক্ষেপ উক্তি পাঠ কর, যদি এই তিন গুণের একত্র মিশ্রণ দেখিতে চাও, তবে কালীদহের কমলে-কামিনী কর্ত্তৃক করিগ্রাস ও উদ্গীরণ ব্যাপার বর্ণন এবং যে স্থানে পাত্রমিত্র সভাসদ্ লইয়া পশুরাজ সিংহের বার দিয়া বসা বর্ণিত আছে, সেই স্থান পাঠ কর। এই দুই স্থলে মুকুন্দরাম সুকল্পনা-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রতিভা বিষয়ে তিনি বাঙ্গালা ভাষার অদ্বিতীয় কবি। ভারতচন্দ্র তাঁহাকে অনেক স্থলে অনুকরণ করিয়াছেন। অনেক স্থানে ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের ছায়ামাত্র। উদ্ভাবনীশক্তিতে কবিকঙ্কণ ভারতচন্দ্র অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু রায়গুণাকর যে বঙ্গদেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তাহার সন্দেহ নাই। মানবস্বভাবপরিজ্ঞানে তিনি যে কবিকঙ্কণ অপেক্ষা নিতান্ত ন্যূন ইহা বলা যাইতে পারে না। ভারতচন্দ্রের রচনার তিনটি প্রধান লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ, তাঁহার ভাষা এরূপ চাঁচা ছোলা, মাজা ঘসা, যে বঙ্গদেশের অন্য কোন কবির ভাষা সেরূপ মসৃণ ও সুচিক্কণ নহে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি সংক্ষেপে এরূপ বর্ণনা করিতে পারেন যে অন্য কোন কবি সেরূপ করিতে পারেন না। 'পদ্মবন প্রমুদিত সমুদিতরবি, 'খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট' এবং তাঁহার কতকগুলি বাক্য সাধারণ জনমধ্যে এত প্রচলিত যে, তাহা গৃহ বাক্য হইয়া উঠিয়াছে। ভারতচন্দ্রের অনেক

র্জ্জুনীয়কে আদর্শ করিয়া শিশুপালবধের রচনা করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রও সেইরূপ কবিকঙ্কণের চণ্ডীকে আদর্শ করিয়া অন্নদামঙ্গলের রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভে উভয়েরই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ, পার্ব্বতীর জন্ম-তপস্যা-বিবাহ, হরগৌরীর কন্দল প্রভৃতি প্রায় একরূপ ধরণেই লিখিত। তদ্ভিন্ন শাপভ্রষ্ট নায়ক-নায়িকার জন্মপরিগ্রহ, ভগবতীর বৃদ্ধাবেশধারণ, মশানে পিশাচসেনার সহিত রাজসেনার যুদ্ধ, চৌত্রিশ অক্ষরে স্তব, ঝড় বৃষ্টিদ্বারা দেশবিপ্লাবন, শব্দশ্লেষসহকারে ভগবতীর আত্মপরিচয়দান, দেশগমনোৎসুক পতির নিকট পত্নীর বারমাস বর্ণন, সুপুরুষদর্শনে কামিনীদিগের নিজ নিজ পতিনিন্দা, দাসীর হাট করার পরিচয় দেওয়া ইত্যাদি ভূরি ভূরি বিষয় এবং ভঙ্গপয়ার, ঝাঁপতাল, একাবলী প্রভৃতি ছন্দ সকল ভারতচন্দ্র যে চণ্ডী হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ঐ দুই গ্রন্থের পাঠমাত্রেই বুঝিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন ভারতচন্দ্র মধ্যে মধ্যে আদিরসের যেরূপ নিরবগুণ্ঠন বর্ণনা করিয়াছেন, কবিকঙ্কণ সেরূপ করেন নাই। তিনি অসাধারণ পরিহাসরসিক হইয়াও তত্তৎস্থলে বিশেষ বিজ্ঞতার সহিত লেখনীচালনা করিয়াছেন। বর্দ্ধমানে সুন্দরকে দেখিয়া নাগরিক কামিনীরা নিজ নিজ পতির নিন্দাকরণাবসরে কি জঘন্য মনোবৃত্তিরই প্রকাশ করিয়াছিল! কিন্তু মনোহরবেশধারী শিবকে সন্দর্শন করিয়া ওষধিপ্রস্থবিলাসিনীরাও দুঃসহদুঃখাবেগে স্ব স্ব পতির নিন্দা করিয়াছিল সত্য, কিন্তু সেরূপ কুৎসিত আশয়ের কিছুমাত্র প্রখ্যাপন

স্থানের ভাব পারসী ও সংস্কৃত হইতে নীত। এসিয়া বা ইয়ুরোপ খণ্ডের এমন কোন কবি নাই যে তাঁহাকে মাইকেল মধুসূদন অনুকরণ করেন নাই। স্বকপোল রচনাশক্তি বিষয়ে মোটা ধুতি ও দোজা পরিধানকারী দামুন্যার দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শোভন ধুতি ও উড়ানি পরিধানকারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুসভ্য সভাসদ ভারতচন্দ্র এবং কোট পেণ্টালুন পরিধানকারী মাইকেল মধুসূদনকে জিতিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কবিকঙ্কণের দুইটি মনোহর লক্ষণ এই যে তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন, দরিদ্রজীবন যেমন তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, অন্য কোন কবি সেরূপ করিতে পারেন নাই। 'দরিদ্রের কবি' এই গৌরবাস্পদ উপাধি যেমন তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন, তেমন অন্য কোন কবি প্রাপ্ত হইতে পারেন না।"

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা, পৃ ১৩—১৫।

করে নাই—বরং অদৃষ্টের দোষ দিয়া পাতিব্রত্যপক্ষই সমর্থন করিয়াছিল—

"যে হোক সে হোক নারীর স্বামী ত ভূষণ।
পতিসেবা কর সবে যেন নারায়ণ॥"

ইহা কবির সামান্য বিমলরুচিতার কার্য্য নহে।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণ মহাভারত হরিবংশ প্রভৃতির ভূরি ভূরি উপাখ্যান, সুরলোক ও সুরগণের বিবরণ ভারতবর্ষস্থ নানা দেশের নদ নদী, গ্রাম নগর ও অরণ্য প্রভৃতির কতই বর্ণন করিয়াছেন এবং পশু পক্ষী ও নানা প্রাকৃতিক নানাধর্ম্মী নানাজাতীয় লোকের বিভিন্নপ্রকার স্বভাবগুলি কি সুন্দররূপেই পৃথক্‌ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন! ঐ সকল চিত্রে একের রঙ্‌ অপরের গাত্রে প্রায় কোথাও সংলগ্ন হয় নাই—সকলগুলিই পৃথক্ পৃথক্ রঙ্‌বিশিষ্ট। কালকেতু, ভাঁড়ুদত্ত, ধনপতি, শ্রীমন্ত, ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনা, দুর্ব্বলা প্রভৃতি সমুদয় চরিত্রগুলিই পৃথক্—স্বভাব। ফলতঃ বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে স্বভাববর্ণনে কবিকঙ্কণের ন্যায় নিপুণ আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি নিজে দরিদ্র ছিলেন, এজন্য ফুল্লরার দারিদ্র্যবর্ণন সময়ে তদ্বিষয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাঁড়ুদত্ত ও মুরারিশীল বণিকের বঞ্চকতাবর্ণনে তিনি সাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করেন নাই। বাঙ্গালদিগের বিলাপে প্রচুর পরিহাসরসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক জগজ্জননী ভগবতীর কঞ্চুলিকামধ্যে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড চিত্রিত হওয়ায় কবির কি অলৌকিক প্রগাঢ় ভাবুকতাই প্রকটিত হইয়াছে! তদ্ভিন্ন অন্তঃসত্ত্বার মানসিক অবস্থা, বৈবাহিক আচারপদ্ধতি, পতিবশ করিবার উদ্দেশে স্ত্রীর ঔষধকরণ, সপত্নীকলহ, রন্ধন, পাশক্রীড়া এবং অগ্রে সম্মান পাইবার জন্য বণিক্‌দিগের বাগ্‌বিতণ্ডা প্রভৃতির বর্ণনস্থলে কবির লোকব্যবহারাভিজ্ঞতার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

কবি যে দুইটি উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার একটির অধিষ্ঠানভূমি কলিঙ্গদেশ এবং দ্বিতীয়টির বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী মঙ্গলকোটের সন্নিহিত অজয়নদের তীরস্থ উজ্জয়িনীনগরী। কলিঙ্গদেশ কবির বাসভূমি হইতে বহুদূরবর্ত্তী; বোধ হয় তিনি সেই দেশে কখনই গমন করেন নাই এবং

তথায় গমন করিয়াছে, এরূপ কোন লোকের সহিতও বোধ হয় তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। সুতরাং ঐ স্থানের ভৌগোলিক বিবরণে তাঁহার অনেক ভ্রম হইয়াছে। তিনি গুজরাটনগরকে কলিঙ্গের অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন—কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। গুজরাট বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ও ভারতবর্ষের পশ্চিম-উপকূলে অবস্থিত; কিন্তু কলিঙ্গ মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সির মধ্যস্থ এবং পূর্ব্বোপকূলে স্থিত—উভয়দেশের অন্তর তিন শত ক্রোশের ন্যূন নহে। যাহাহউক দ্বিতীয় অধিষ্ঠানভূমির ভৌগোলিকবিবরণ অনেকদূর পর্য্যন্ত ঠিক হইয়াছে। মঙ্গলকোটের নিকটে 'উজনী' (উজ্জয়িনী) নামে অদ্যাপি একটি স্থান দেখা যায়। উহা পতিত ভূখণ্ড মাত্র—গ্রাম বা নগর উহার উপর কিছুই নাই। উহার সমীপে 'ভ্রমরা' নামেও একটি খাল আছে; উহা অজয়নদের সহিত সংযুক্ত। ধনপতি ও শ্রীমন্তসওদাগরের অজয় বহিয়া সিংহলযাত্রার সময়ে নদের উভয়কূলে হুসনপুর, গাঙ্গড়া, বাকুল্যা, চরকি, অঙ্গারপুর, নগাঁ, উদ্ধানপুর প্রভৃতি যে সকল গ্রামের নামোল্লেখ আছে, অদ্যাপি তাহার অনেক গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে নৌকা গঙ্গায় প্রবিষ্ট হইলে, সওদাগরেরা গঙ্গার উভয় কূলবর্ত্তী ইন্দ্রাণী পরগণা, ললিতপুর (নলেপুর) ভাণ্ডসিংহের (ভাওসিঙের) ঘাট, মেটেরি, বেলনপুর, নবদ্বীপ, মির্জাপুর, অম্বিকা (আম্বুয়া) শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, উলা, হালিসহর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, গরিফা, গোন্দলপাড়া, জগদ্দল, নিমাইতীর্থের ঘাট, মাহেশ, খড়দহ, কোণনগর, কোতরঙ্গ, চিৎপুর, শালিখা, কলিকাতা, বেলেঘাটা, কালীঘাট, মাইনগর, বারাশত (দক্ষিণ) খলিনা, ছত্রভোগ, হেতেগড়, মগরা প্রভৃতি যে সকল স্থান দর্শন করিয়াছিলেন, সে সকলও অদ্যাপি প্রত্যক্ষ হইতেছে। বোধ হয় কালসহকারে কোন কোন গ্রাম স্থানান্তরিত হইয়াছে—উলা, বেলেঘাটা প্রভৃতি গ্রাম সকল এক্ষণে কবির বর্ণিত স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। এস্থলে ইহাও বোধ হইতেছে যে, চুঁচুড়া, ফরাসডাঙ্গা, শ্রীরামপুর প্রভৃতি নগর সকল তৎকালে সমৃদ্ধ ছিল না। কলিকাতা নগরীকেও লোকে যেরূপ আধুনিক মনে করে এবং

ঐ আধুনিকত্বের প্রমাণস্বরূপ 'কালিকাটা' বৃক্ষের যে গল্প রচনা করে, তাহা বাস্তবিক বলিয়া বোধ হয় না; কারণ এক্ষণকার প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কবিকঙ্কণের সময়েও কলিকাতা বর্ত্তমান ছিল এবং সে সময়ে ইংরেজেরা বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে আইসেন নাই।

কবিকঙ্কণের সময়ে সপ্তগ্রামের নিম্নবর্ত্তিনী সরস্বতীর প্রবাহ মন্দ হইয়া হুগলীর সমীপবাহিনী গঙ্গার প্রবাহ প্রবল হইলেও সপ্তগ্রামের সম্যক্ ধ্বংস ও হুগলীর তাদৃশ উন্নতি হয় নাই—হইলে কবি সপ্তগ্রামের অত সমৃদ্ধি বর্ণন করিতেন না এবং হুগলীর কথাও কিছু না কিছু উল্লেখ করিতেন। কলিকাতার দক্ষিণ খিদিরপুর ও কালীঘাটের নিকট দিয়া গঙ্গার যে প্রবাহ গিয়াছে—লোকে যাহাকে এক্ষণে আদিগঙ্গা কহে—তৎকালে উহাই প্রবল ছিল। কারণ কবি, মুচিখোলার নিম্নস্থ কাটিগঙ্গাকে 'হিজলির পথ' বলিয়া পরিত্যাগ করত কালীঘাটের নিম্নস্থ গঙ্গা দিয়াই সওদাগরদিগের নৌকা-গুলি চালাইয়াছিলেন। তৎপরে মগরা হইতে সিংহল পর্য্যন্ত পথের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ঐ পথিমধ্যস্থ যে সকল স্থান হ্রদাদির বিবরণ লিখিয়া-ছেন, তাহার সমুদয় বাস্তবিক বলিয়া বোধ হয় না। বোধ হয় কবি—

ফিরিঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে। রাত্রিদিন বহেযায় হারামদের ডরে॥—

এই উক্তিদ্বারা পূর্ব্বদক্ষিণাঞ্চলস্থিত পোর্ত্তুগীজদিগকে ফিরিঙ্গীশব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং তাহারা তৎকালে অত্যন্ত উপদ্রব করিত বলিয়া তাহাদিগকে 'হারাম' অর্থাৎ (পারসিভাষায়) দুষ্ট লোক বলিয়াছিলেন।

ফিরিঙ্গীদেশ হইতে দক্ষিণাভিমুখে সমুদ্রে গমন সময়ে পথিমধ্যে পুরী অর্থাৎ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার কীর্ত্তিস্থান পাওয়া, কালিয়াদহ নামক হ্রদে উপস্থিত হওয়া ও তথায় কমলেকামিনী সন্দর্শন করা প্রভৃতি অনেক রমণীয় বিষয় বর্ণিত আছে। ঐ বর্ণনে ইহা প্রকাশ পাইতেছে যে, আমরা এক্ষণে একই দ্বীপকে সিংহল বা লঙ্কা বলিয়া থাকি, কিন্তু কবির সেরূপ বোধ ছিল না—তিনি উহাদিগকে পৃথক্ দ্বীপ বোধ করিতেন। যাহা হউক তত প্রাচীন সময়ে অত দূরবর্ত্তী দেশের ভৌগলিক বিবরণ বর্ণনে ভ্রম হইলেও কবির

কবিত্বের হানি হয় না। প্রাচীনকালের অনেক কবিরই ওরূপ ভ্রম হইয়াছে। বানরদিগকে সীতার অন্বেষণার্থ দিগ্‌দিগন্তে প্রেরণ করিবার সময় মহর্ষি বাল্মীকিও সেরূপ ভ্রমের হস্তহইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।

তখনকার সামাজিক রীতিনীতি—কবিকঙ্কণের চণ্ডী পাঠ করিলে তিনশত বৎসরের পূর্ব্বে আমাদের সামাজিক রীতিনীতি যাহা ছিল, তাহারও অনেক বিবরণ জানিতে পারা যায়। এক্ষণে রাঢ়ীয় কুলীন সন্তানদিগের যেরূপ বহু-বিবাহ আছে, এবং পুরাণের যেরূপ কথকতা করা আছে, কবিকঙ্কণের সময়েও এ সকলই প্রায় এইরূপই ছিল, অধিকন্তু পাশক্রীড়াটি সে সময়ে বোধ হয় কিছু অধিক ছিল। কবি অনেক স্থলেই, এমন কি, স্ত্রীজাতির মধ্যেও ঐ ক্রীড়ার অনেকবার বর্ণন করিয়াছেন। বোধহয় ঐ সময়ে কামিনীদিগের শাটী পরিধান করা, অথবা অধোংশুকও উত্তরীয় ব্যবহার করা দুই রীতিই কিছু কিছু ছিল। যেহেতু কবি ঐ দুই রীতিরই বর্ণন করিয়াছেন। কাঁচুলি ব্যবহার তৎকালে অনেকেই করিত।

এই গ্রন্থে ধর্ম্মকেতু, নীলাম্বর, কালকেতু, মুরারিশীল, ভাঁড়ুদত্ত, বিক্রম-কেশরী, লক্ষপতি, ধনপতি, মালাধর, শ্রীমন্ত, শালবাণ, অগ্নিশর্ম্মা; নিদয়া, ছায়াবতী, রম্ভাবতী, দুর্ব্বলা, লীলাবতী, সুশীলা, জয়াবতী, প্রভৃতি পুরুষ ও স্ত্রীগণের যে সকল কল্পিত নাম প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা তাহাদের জাতি ধর্ম্ম ও ব্যবসায়ের অনুরূপই হইয়াছে। ফুল্লরা, খুল্লনা, লহনা, এ সকল নামও যদৃচ্ছাপ্রযুক্ত বোধ হয় না। ইহাদেরও অনুরূপ অর্থ আছে—ফুল্লরা—ফুল্ল (=প্রফুল্ল=স্পষ্ট) রা (=রব) যাহার—মাংসবিক্রয়ার্থ পাড়ায় পাড়ায় দীর্ঘস্বরে চীৎকার করিবার জন্য ব্যাধকামিনীর উচ্চস্বর থাকা গুণাবহ ভিন্ন সদোষ বোধ হয় না, সুতরাং ফুল্লরা নাম নিরর্থক নহে। খুল্ল শব্দ নখীনামক এক উৎকৃষ্ট গন্ধ দ্রব্যবাচক; তদ্বিশিষ্টা স্ত্রী—খুল্লনা;—গন্ধবণিক্ জাতীয় বালিকার গন্ধদ্রব্যসম্বলিত নাম হওয়া অসঙ্গত নহে। লহনা শব্দে পারস্যভাষায় বিপদ্=দায়=ঝঞ্ঝাট্;—ঐ স্ত্রীর যেরূপ স্বভাবাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ধনপতি উহাকে লইয়া বিলক্ষণ দায়ে পড়িয়া

ছিলেন, বলিতে হইবে। সুতরাং উহার 'লহনা' নাম সার্থক হইয়াছে।

ছন্দ—ইতিপূর্ব্বে যে সকল কাব্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে পয়ার-ছন্দ ও ত্রিপদী ভিন্ন আর কোন ছন্দ, নাই বলিলেই হয়। কিন্তু চণ্ডীকাব্যে ঐ দুই ছন্দ ব্যতিরিক্ত ঝাঁপতাল, ভঙ্গপয়ার, ভঙ্গত্রিপদী, একাবলী এবং আরও ২। ১টি নূতন ছন্দ আছে। তদ্ভিন্ন জয়দেবের ন্যায়—

"দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু" ॥ "দিদি গো এবে বড় সঙ্কট পরাণ" ॥
"কোটাল! খানিক জীবন রাখ"

ইত্যাদিরূপ ধুয়া এবং ধানশী, কামোদ, পঠমঞ্জরী প্রভৃতি অনেক রাগরাগিণীরও উল্লেখ মধ্যে মধ্যে আছে। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি ছন্দই পয়ার বা ত্রিপদীর রূপান্তর মাত্র—কোনটিই উহা হইতে ভিন্নপ্রকৃতিক নহে। অতএব বোধ হয়, কবি পয়ার ও ত্রিপদী লিখিতে লিখিতেই যদৃচ্ছাক্রমে অক্ষর বাড়াইয়া বা কমাইয়াও কর্ণে মিষ্ট লাগাতে ঐ সকল নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, ইহার পূর্ব্বলিখিত কাব্য সকলের ছন্দে যতিভঙ্গ ও অক্ষরগণনার বৈষম্য প্রভৃতি যে সকল দোষ দৃষ্ট হয়, চণ্ডীকাব্যের ছন্দেও সে সকল দোষ নাই এমত নহে, তবে অপেক্ষাকৃত বিরল।

কবিকঙ্কণ, বর্ণিত নায়কনায়িকা প্রভৃতির চরিত্রগুলি প্রায় সকলস্থলেই যথাযথ-রূপে চিত্রিত করিয়াছেন, সত্য বটে; কিন্তু কয়েকটি স্থলে তাহাদের কার্য্য ও আচার ব্যবহার অত্যুক্তিদূষিত ও অনৈসর্গিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কালকেতু ব্যাধের ভোজন, পুরাণবর্ণিত রাক্ষসের ভোজনের ন্যায়—সুতরাং অসঙ্গত। খুল্লনা, অত বড় ধনবান্ লোকের পত্নী হইয়াও যে, গুণ চট পরিয়া একাকিনী বনে বনে ছাগল চরাইয়া বেড়াইল,—জ্ঞাতিবন্ধু কেহ আসিয়া নিবারণ করিল না, তাহার মাতা রম্ভাবতী কন্যার দুরবস্থার সংবাদ পাইয়াও তত্ত্ব লইল না!—ইহা বড় বিসদৃশ কার্য্য। যখন খুল্লনার বয়স ১২।১৩ বৎসর বই নহে, যখন সে পতি-সহবাস করেই নাই, তখনও তাহার বিদেশ-প্রত্যাগত পতির শয়নগৃহে যাইবার জন্য দিবাভাগ হইতে ব্যগ্রতাপ্রকাশ করা—যাইবার সময়ে সপত্নীর সহিত

নির্লজ্জতাসহকারে বাগ্বিতণ্ডা করা, নিদ্রিত পতিকে মৃতবোধ করিয়া ক্রন্দন করিতে বসা, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পতির সহিত পাশক্রীড়া করিতে চাহা—এ সকল-গুলিই অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। তদ্ভিন্ন দ্বাদশবর্ষমাত্র বয়স্ক শ্রীমন্তের সিংহলে গমন এবং তথায় বিবাহের পর শালী, শালাজ প্রভৃতির সহিত সেই সেই রূপ পরিহাস বাক্য সঙ্গত হয় না।

কবিকঙ্কণের রচনা প্রগাঢ় রসোদ্দীপক, ভাবপূর্ণ ও সুমধুর হইলেও কৃত্তি-বাসের রচনার ন্যায় আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য নহে। ইহার স্থানে স্থানে অনেক দুরূহ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে। তদ্ভিন্ন কবির স্বপ্রদেশপ্রচলিত ভূরি ভূরি এত অপভ্রংশ শব্দের ব্যবহার আছে, যাহাদের অর্থ—এবং যাহাদের সংযোগ থাকাতে, সেই সেই বাক্যের অর্থ—সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না, সুতরাং সেই সেই স্থানে রসভঙ্গ দোষ ঘটে। আমরা খুব রাঢ় অঞ্চলের লোকদিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়া বাকুড়ি, পাইকালা, কলন্তর, বুংতাল ইত্যাদি শব্দের কোনরূপ অর্থ বাহির করিতে পারি নাই। কিন্তু এস্থলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এ সকল দোষ—অতি সামান্য এবং অবশ্যই উপেক্ষিত হওয়া উচিত।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্য ভিন্ন আর কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কিনা, তাহা জানিবার উপায় নাই; কিন্তু শিশুবোধকের 'গঙ্গাবন্দনা'য় * কবিকঙ্কণের ভণিতি

---

* গঙ্গাবন্দনাটি এই :—

"বন্দমাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি।
পতিত পাবনী পুরাতনী।
বিষ্ণুপদে উপাদান, দ্রবময়ী তব নাম, সুরাসুর নরের জননী॥
ব্রহ্ম কমণ্ডলে বাস, আছিলা ব্রহ্মার পাশ, পবিত্র করিয়া ব্রহ্মপুরী॥
জীবে দেখি দুরাশয়, নাশিবারে ভবভয়, অবনী আইলা সুরেশ্বরী॥
সূর্য্যবংশে ভগীরথ, আগে দেখাইয়া পথ, তোমারে আনিল মহীতলে॥
মহাপাপী দুরাচারী, পরশে তোমার বারি, সকায় বৈকুণ্ঠপুরী চলে।
সগর রাজার বংশ, ব্রহ্মশাপে হৈল ধ্বংশ, অঙ্গার আছিল অবশেষ॥
পরশিয়া তব জলে, সকায় বৈকুণ্ঠে চলে, সবে হয়ে চতুর্ভুজ বেশ।

আছে; উহা চণ্ডীকাব্যস্থ গঙ্গাবর্ণন হইতে বিভিন্নরূপ। কবিকঙ্কণ ঐ প্রবন্ধটি পৃথক্ লিখিয়াছিলেন, কি উহা অন্য কোন গ্রন্থের অভ্যন্তরে ছিল, তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। যাহা হউক, আমরা এ বিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া এক্ষণে পাঠকগণের দর্শনার্থ চণ্ডীকাব্যের কয়েকটি অংশ নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইবার জন্য বণিকের নিকট কালকেতুর গমন।

নির্ম্মল তোমার জল, ভক্ষণে অশেষ ফল, বিধি বিষ্ণু চিনিতে না পারে।
শিরে ধরি শূলপাণি, আপনারে ধন্য মানি, এ মহিমা কে বর্ণিতে পারে।
তুয়া জলে করি পাক, অন্নআদি কিবা শাক, দেবতা দুর্লভ করি লয়।
সেই অন্ন সুধাময়, ব্যাস ভাষা বেদে কয়, ভুঞ্জিলে যমের নাহি ভয়॥
সাগরসঙ্গম স্থান, কেবল কৈবল্যধাম, দরশনে সর্ব্ব পাপ হরে।
নীচ শূদ্র কি সন্ন্যাসী, মরিলে বৈকুণ্ঠবাসী, মকরেতে যেবা স্নান করে॥
শতেক যোজনে থাকে, যদি গঙ্গা বলে ডাকে, পবিত্র তাহার কলেবর।
নাম উচ্চারণ ফলে, বিষ্ণুর সদনে চলে, নাহি দেখে শমন নগর॥
গতপ্রাণী মৃতকায়া, পিতামাতা সুতজায়া, শ্মশানে টানিয়া লয়ে ফেলে।
দারাসুত ঘৃণা করে, স্নান করি আসে ঘরে, সেকালে আপনি কর কোলে।
যাবৎ উপায় শক্ত, জ্ঞাতিবন্ধু অনুরক্ত, মৈলে করে দিন দুই শোক॥
সে সব সঙ্কট দিনে, তোমার চরণ বিনে, কেহ নাহি আপনার লোক॥
গতপ্রাণী মৃতকায়, কাকে বা শৃগালে খায়, ভেসে গিয়া লাগে তব তটে।
হাতেতে চামর ধরি, শত স্বর্গ বিদ্যাধরী, সেবে আসি তাহার নিকটে॥
তোমার নিকটে রই, শরট করট হই, কিবা কৃশ গুনীর তনয়।
গঙ্গাহীন দেশে রয়ে, কোটি হস্তীশ্বর হয়ে, যদি রহে সেহ কিছু নয়॥
কীটাদি পতঙ্গ পক্ষ, নৃপ আদি জীব লক্ষ, সকলি তোমার সমতুল।
মহাপাপী দুরাচারী, পরশে তোমার বারি, অন্তকালে তুমি অনুকূল॥
গঙ্গার মহিমা যত, আমি তাহা কব কত, বিস্তারিত অনেক পুরাণে।
গাইয়া তোমার আগে, গোবিন্দ-ভকতি মাগে, চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণে”

বেণে বড় দুষ্টশীল, নামেতে মুরারি শীল, লেখা জোখা করে টাকা কড়ি।
পাইয়া বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর পাড়া, মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি ॥—
খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।—
কোথা হে বণিকরাজ, বিশেষ আছয়ে কাজ, আমি আইলাম সেই হেতু ॥
বীরের বচন শুনি, আসিয়া বলে বেণ্যানী, আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার।
প্রভাতে তোমার খুড়া, গিয়াছে খাতকপাড়া কালি দিবে মাংসের উধার ॥—
আজি কালকেতু যাহ ঘর।—
কাষ্ঠ আন এক ভার, হাল বাকী দিব ধার, মিষ্ট কিছু আনিহ বদর ॥
শুন গো শুন গো খুড়ী, কিছু কার্য্য আছে দেড়ী, ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।
আমার জোহার খুড়ী, কালি দেহ বাকী কড়ী, যাই অন্য বণিকের বাড়ী ॥—
বাপা এক দণ্ড কর বিলম্বন।
সহাস্য বদনে বাণী, বলে বেণে নিতম্বিনী, দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন ॥
ধনের পাইয়া আশ, আসিতে বীরের পাশ, ধায় বেণে খিড়কীর পথে।
মনে বড় কুতূহলী, কান্ধেতে কড়ীর থলী, হড়পী তরাজু করি হাথে ॥—
করে বীর বেণেরে জোহার।
বেণে বলে ভাইপো, এবে নাহি দেখি তো, এ তোর কেমন ব্যবহার ॥
খুড়া! উঠিয়া প্রভাত কালে, কাননে এড়িয়া জালে, হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি॥
ফুল্লরা পসরা করে, সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে, এই হেতু নাহি দেখ তুমি ॥—
খুড়া ভাঙ্গাইব একটা অঙ্গুরী—
হয়ে মোরে অনুকূল, উচিত করিও মূল, তবে সে বিপদে আমি তরি ॥
বীর দেয় অঙ্গুরী, বেণিয়া প্রণাম করি, জোঁখে রত্ন চড়ায়্যে পড়্যান।
কুঁচ দিয়া করে মান, ষোল রতি দুই ধান, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

সোণা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল। ঘষিয়া মাজিয়া বাপু করেছ উজ্জ্বল ॥
রতি প্রতি হইল বীর দশগণ্ডা দর। দু ধানের কড়ি আর পাঁচগণ্ডা ধর ॥
অষ্টপণ পঞ্চগণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি। মাংসের পিছিলা বাকী ধারি দেড় বুড়ি ॥
একুনে হইল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি। কিছু চালু চালুখুদ কিছু লহ কড়ি ॥

কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি পাই। যে জন অঙ্গুরী দিল দিব তাঁর ঠাঁই।
বেণে বলে দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট। আমা সঙ্গে সওদা কর না পাবে কপট॥
ধর্ম্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল লেনা দেনা। তাহা হইতে দেখি বাপা বড়ই সেয়ানা॥
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া। অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই অন্য পাড়া॥
বেণে বলে দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি। চালু খুদ না লইও গণে লও কড়ি॥
হাত বদল করিতে বেণের হলো মনে। পদ্মাবতী সঙ্গে চণ্ডী হাসেন গগনে॥

ফুল্লরার বারমাস বর্ণন।

বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখ বাণী। ভাঙ্গা কুঁড়েঘর তালপাতের ছাউনি॥
ভেরেণ্ডার খুঁটী তার আছে মধ্য ঘরে। প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥
বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা। তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা।
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ। শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন॥
বৈশাখ হইল বিষ—বৈশাখ হইল বিষ। মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ॥
সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন। রবিকরে করে সর্ব্ব শরীর দাহন॥
পসরা এড়িয়ে জল খাইতে না পারি। দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাসারি॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস—পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস। বঁইচির ফল খেয়ে করি উপবাস॥
আষাঢ়ে পূরয়ে মহী নবমেঘজল। বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥
মাংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে। কিছু খুদ কুঁড়া মিলে উদর না পূরে॥
বড় অভাগ্য মনে গণি—বড় অভাগ্য মনে গণি। কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী॥
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী। সিতাসিত দুই পক্ষ কিছুই না জানি॥
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে। আচ্ছাদন নাহি গাত্রে স্নান বৃষ্টিনীরে॥
দুঃখে কর অবধান—দুঃখে কর অবধান। লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় আইসে বান॥
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল। নদ নদী একাকার আট দিকে জল॥
কত নিবেদিব দুখ—কত নিবেদিব দুখ। দরিদ্র হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজ্জনে। ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা। অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥

কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে। দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে ॥
কার্ত্তিক মাসেতে হয় হিমের জনম। করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ॥
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়। অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড় ॥
দুঃখে কর অবধান—দুঃখে কর অবধান। জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।
মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান। হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান ॥
উদর পূরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি। যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি ॥
অভাগ্য মনে গণি—অভাগ্য মনে গণি। পুরাণ দোপাটা গায় দিতে টানাটানি ॥
পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন। তুলা তনুনপাৎ তৈল তাম্বুল তপন ॥
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ। অভাগী ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন ॥
হরিণ বদলে পাই পুরাণ খোসলা। উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা ॥
বৃথা বনিতা জনম—বৃথা বনিতা জনম। ধূলি ভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন ॥
নিদারুণ মাঘমাস সদাই কুজ্‌ঝটী। আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আখেটী ॥
ফুল্লরার আছে কত কর্ম্মের বিপাক। মাঘমাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক ॥
নিদারুণ মাঘমাস—নিদারুণ মাঘমাস। সর্ব্বজন নিরামিষ কিম্বা উপবাস ॥
সহজে শীতল ঋতু এ ফাল্‌গুন মাসে। পীড়িত তপস্বিগণ বসন্ত বাতাসে ॥
শুন মোর বাণী রামা—শুন মোর বাণী। কোন্ সুখে আমোদিতা হইবে ব্যাধিনী ॥
ফাল্‌গুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা। ক্ষুদসেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা ॥
কত বা ভুগিব আমি নিজ কর্ম্মফল। মাটিয়া পাথর বিনা না ছিল সম্বল ॥
দুঃখে কর অবধান—দুঃখে কর অবধান। আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান ॥
মধুমাসে মলয় মারুত মন্দমন্দ। মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ ॥
বনিতা পুরুষ দোহে * *। ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর দহনে ॥
দারুণ দৈবদোষে—দারুণ দৈবদোষে। একত্র শয়নে স্বামী যেন যোলকোশে ॥

সিংহলে কোটালের নিকট শ্রীমন্তের স্তুতি।

কাঁকালে নাএর দড়া পিঠে মারে ঢেকা। দিবস দুপরে হৈল সাত নায়ে ডাকা ॥
সবিনয়ে বলে সাধু কোটালের পদে। খানিক সদয় হও বিষম বিপদে ॥

শ্রীমন্তের ছিল কিছু গুপ্তভাবে ধন। ঘুষ দিয়া কোটালের তুষিলেক মন ॥
ধন পেয়ে কালুদত্ত সরসবদন। শ্রীমন্ত তাহারে কিছু করে নিবেদন ॥
স্নান দান করি যদি দেহ অনুমতি। হাসিয়া ইঙ্গিত তারে কৈল নিশাপতি ॥
সরোবর বেড়ি রহে পাইকের ঘটা। স্নান করি করে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা ॥
যব তিল কুশ নিল করেতে তুলসী। তর্পণে সন্তোষ সাধু কৈল দেবঋষি ॥
তর্পণের জল লহ পিতা ধনপতি। মসানে রহিল প্রাণ বিড়ম্বে পার্ব্বতী ॥
তর্পণের জল লহ খুল্লনা জননি। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানি ॥
তর্পণের জল লহ খেলাবার ভাই। উজানি নগরে দেখা আর হবে নাই ॥
তর্পণের জল লহ দুর্ব্বলা পুষিনী। তব হস্তে সমর্পণ করিনু জননী ॥
তর্পণের জল লহ জননীর মা। উজানি নগরে আমি আর যাব না ॥
তর্পণের জল লহ লহনা বিমাতা। তব আশীর্ব্বাদে মোর কাটা যায় মাথা ॥
সবাকারে সমর্পণ করিনু জননী। এ জনমের মত ছিরা মাগিল মেলানী ॥

প্রহেলিকা।

বিধাতা নির্ম্মিত ঘর নাহিক দুয়ার। যোগীন্দ্র পুরুষ তাহে রহে নিরাহার ॥
যখন পুরুষ সেই হয় বলবান্। বিধাতার ঘর ভাঙ্গি করে খান খান ॥ ১ ॥ ডিম্ব।
বিষ্ণুপদ সেবা করে বৈষ্ণব সে নয়। গাছের পল্লব নয় অঙ্গে পত্র হয় ॥
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দুচারি দিবসে। মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে ॥২॥ পক্ষী
তরু নয় বনে রয় নাহি ধরে ফুল। ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল ॥
পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ। বনেতে থাকিয়া করে বনের ধ্বংসন ॥৩॥ পানা।

কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান।*

কবিকঙ্কণের চণ্ডী রচনার কিছুকাল পরেই বোধ হয় কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ দুই জনে মিলিয়া 'মনসার ভাসান' নামক পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। সম্ভবতঃ ইঁহারা দুইজনেই কায়স্থকুলোদ্ভব ছিলেন, কারণ একস্থলে কেতকাদাসের ভণিতায় সমস্ত কায়স্থকুলের প্রতি আশীর্ব্বাদ সূচক—'কেতকার বাণী, 'রক্ষ

---

* শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন লিখিয়াছেন:—"এ পর্য্যন্ত আমরা মনসার ভাসানরচক ৬২ জন কবির নাম জানিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদান করিতেছি:—

১। কাণাহরি দত্ত, ২। নারায়ণ দেব, ৩। বিজয় গুপ্ত, ৪। রঘুনাথ,
৫। যদুনাথ পণ্ডিত, ৬। বলরাম দাস, ৭। জগন্নাথ সেন, ৮। বংশীধন,
৯। দ্বিজবংশী দাস, ১০। বল্লভ ঘোষ, ১১। বিপ্রহৃদয়, ১২। গোবিন্দ দাস,
১৩। গোপীচন্দ্র, ১৪। বিপ্রজানকী নাথ, ১৫। দ্বিজবলরাম, ১৬। কেতকা দাস,
১৭। ক্ষেমানন্দ, ১৮। অনুপ চন্দ্র, ১৯। রাধাকৃষ্ণ, ২০। হরিদাস,
২১। কমলনয়ন, ২২। সীতাপতি, ২৩। রামনিধি, ২৪। কবিচন্দ্রপতি,
২৫। গোলকচন্দ্র, ২৬। কবিকর্ণপুর, ২৭। জানকীনাথদাস, ২৮। বৰ্দ্ধমান দাস,
২৯। ষষ্ঠীবর সেন, ৩০। গঙ্গাদাস সেন, ৩১। রামবিনোদ, ৩২। আদিত্য দাস,
৩৩। কমললোচন, ৩৪। কৃষ্ণানন্দ, ৩৫। পণ্ডিত গঙ্গাদাস, ৩৬। গুণানন্দ সেন,
৩৭। জগৎবল্লভ, ৩৮। বিপ্রজগন্নাথ, ৩৯। জগমোহন মিত্র, ৪০। জয়দেব দাস,
৪১। দ্বিজজয়রাম, ৪২। নন্দলাল, ৪৩। বাণেশ্বর, ৪৪। মধুসূদন দে,
৪৫। বিপ্র রতিদেব, ৪৬। রতিদেব সেন, ৪৭। রমাকান্ত, ৪৮। দ্বিজরসিক চন্দ্র,
৪৯। রাজা রাজসিংহ (সুসঙ্গ), ৫০। রামচন্দ্র, ৫১। রামজীবন বিদ্যাভূষণ,
৫২। বিপ্ররাম দাস, ৫৩। রামদাস সেন, ৫৪। দ্বিজ বনমালী, ৫৫। বনমালী দাস,
৫৬। বিপ্রদাস, ৫৭। বিশ্বেশ্বর, ৫৮। বিষ্ণুপাল, ৫৯। সুকবিদাস,
৬০। সুখদাস, ৬১। সুদাম দাস, ৬২। দ্বিজ হরিরাম।

এই মনসার ভাসান রচকদিগের মধ্যে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের ক্ষুদ্র পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। পুস্তকখানি ২,৬০০ শ্লোকে পূর্ণ, ও ইহার পদসংখ্যা ৬৬, তন্মধ্যে ২৬টি পদ কেতকাদাসের ভণিতাযুক্ত, অবশিষ্ট ৪০টি ক্ষেমানন্দ দাসের নামাঙ্কিত। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, পুস্তকের প্রথমার্দ্ধের অর্থাৎ লখিন্দরের বিবাহপালা পর্য্যন্ত অধিকাংশ স্থল

ঠাকুরাণী, 'কায়স্থ যতেক আছে' এইরূপ কবিতা পাওয়া যায়। অপরা একস্থলে 'ব্রাহ্মণ চরণে, ক্ষেমানন্দ ভণে, দেবী যারে কৃপা কৈল'—দেখা যায়; ইহাতে তাঁহারা কায়স্থ ছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়। কোথায় ইঁহাদের নিবাস ছিল, বা কোন সময়ে ইঁহারা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার স্থির নিশ্চয় নাই; কিন্তু ইঁহারা বেহুলাকে গাঙ্গুরের জলে ভাসাইয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত পাঠাইবার সময়ে গোবিন্দপুর, বর্দ্ধমান, গঙ্গাপুর, হাসনহাটী, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর, গহরপুর প্রভৃতি বর্দ্ধমান জেলাস্থ গ্রাম সকলের যেরূপ নামোল্লেখ করিয়াছেন, অন্য জেলাস্থ গ্রামের সেরূপ নাম করিতে পারেন নাই। ইহাতে বোধ হয় বর্দ্ধমান জেলার মধ্যস্থ কোন গ্রামেই ইঁহাদের বাস ছিল। যাহাহউক ইঁহাদের দুই জনের কেহই গণনীয় কবি ছিলেন না; তবে ইঁহাদের গ্রন্থ পুরাতন ও বহুজন প্রসিদ্ধ এবং সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া মনসার গান রচিত হইয়াছে এবং গায়কেরা নায়কের বাটীতে চামর-মন্দিরা-সহযোগে তাহা গান করিয়া থাকে, এই জন্যই ইহার বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

কেতকাদাসের ও শেষার্দ্ধের অধিকাংশ স্থল ক্ষেমানন্দের ভণিতাযুক্ত। ক্ষেমানন্দ করুণরসে ও কেতকাদাস হাস্যরসে পটু"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩ সং. ৪৬৬-৪৬৭।

শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' নামক প্রসিদ্ধ অভিধানের অষ্টাদশ ভাগ ৪৯ পৃষ্ঠায় "বাঙ্গালা সাহিত্য (শাক্ত প্রভাব)" প্রকরণে লিখিয়াছেন:—"ক্ষেমানন্দের গ্রন্থে কেতকাদাসের ভণিতা দৃষ্টে অনেকেই ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাসকে দুই জন এবং ইংরেজ কবিযুগল বোমেণ্ট ফ্লেচারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উভয় নামই অভিন্নব্যক্তির বলিয়াই জানিয়াছি। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের পুথিতে অনেক স্থলে 'কেতকাদাস' ভণিতা পাওয়া যায়। কেতকা মনসারই অন্য নাম—

"বনের ভিতর নাম মনসা কুমারী।
কেয়াপাতে জন্ম হইল কেতকা সুন্দরী" (ক্ষমানন্দ)।

ক্ষেমানন্দ কেতকার ভক্ত ছিলেন বলিয়া আপনাকে 'কেতকাদাস' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।"

আমরা সুবিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট দুই প্রকার মতই উপস্থাপিত করিলাম, তাঁহারা উভয় মতের বলাবল স্থির করিবেন।

গ্রন্থের সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয়—এই গ্রন্থের সঙ্ক্ষিপ্ত উপাখ্যান এই যে, চম্পাই নগর নিবাসী চাঁদসওদাগর নামক এক গন্ধ বণিক্ মনসাদেবীর প্রতি অত্যন্ত দ্বেষ করিতেন, এই জন্য মনসার কোপে তাঁহার ছয় পুত্র বিনষ্ট হয় এবং তিনিও নিজে বাণিজ্যে গমন করিয়া সমুদয় পণ্যদ্রব্য হারাইয়া বহুবিধ ক্লেশ পান, তথাপি মনসাদেবীকে গালি দিতে নিবৃত্ত হন না। পরিশেষে নখিন্দর নামে সওদাগরের এক পুত্র জন্মে এবং নিছনি নগরবাসী সায়বেণের কন্যা বেহুলার সহিত সেই পুত্রের বিবাহ হয়। মনসাদেবীর কোপে বিবাহ রাত্রিতেই সর্পাঘাতে নখিন্দরের মৃত্যু হইবে, ইহা পুর্ব্বে জানিতে পারিয়া চাঁদসওদাগর সাতাই পর্ব্বতের উপরিভাগে তাহার নিমিত্ত লৌহময় বাসঘর প্রস্তুত করিয়া রাখেন। মনসার সহিত বাদ সহজ কথা নহে! বরকন্যা রাত্রিতে তথায় যাইয়া শয়ন করিলেও সর্পাঘাতে নখিন্দরের মৃত্যু হয়। বেহুলা কলার মান্দাসের উপর সেই মৃতপতি ক্রোড়ে লইয়া ভাসিতে ভাসিতে ছয়মাসে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত গমন করেন এবং তথায় নেত ধোবানীর সাহায্যে সুরপুরে গমন করত নৃত্যদ্বারা দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া পতির জীবন লাভ করান। চাঁদসওদাগর মনসার পূজা করিতেন না, তাঁহাকে 'চেঙ্গমুড়ী কাণী' বলিয়া গালি দিতেন, হেঁতালের লাঠী লইয়া প্রহার করিতে যাইতেন, এই জন্যই তাঁহার উপর মনসার রাগ। এক্ষণে সওদাগর আর তাঁহার দ্বেষ করিবেন না—পূজা করিবেন, বেহুলার নিকট এইরূপ দৃঢ় আশ্বাস পাইয়া দেবী সওদাগরের পূর্ব্বনষ্ট ছয় পুত্রকেও বাঁচাইয়া দিয়া জলমগ্ন সমস্ত ধনও বহিত্রসমেত উদ্ধার করিয়া দেন। বেহুলা, বহিত্রসমেত সেই সমগ্র ধনসম্পত্তি, পুনর্জীবিত পতি ও ভাসুরদিগকে সঙ্গে লইয়া দেশে আগমন করিলে, মনসাদেবীর পূজা প্রচার হয়।

. এই উপাখ্যানের প্রকৃত মূল কি? তাহা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, অদ্যাপি ত্রিবেণীর বাঁধাঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে "নেত ধোবানীর পুকুর" নামে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে—পূর্ব্বোক্ত বৈদ্যপুর, হাসনহাটী, নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম গুলির নিম্ন দিয়া যে সামান্য নদীটী আছে, তাহাকে লোকে "বেহুলা নদী" বলে এবং বর্দ্ধমানের প্রায় ১৬ ক্রোশ

পশ্চিমে চম্পাই নগর নামক পরগণার মধ্যে চম্পাই নগর নামক একটি গ্রামও আছে। ঐ গ্রামে চাঁদসওদাগরের বাটী ছিল, একথা তত্রত্য লোকে বলিয়া থাকে। ঐ গ্রামের নিকটে তৃণগুল্মাচ্ছন্ন একটি উচ্চভূমি আছে; ঐ ভূমি নখিন্দরের লোহার বাসর বলিয়া প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি তত্রত্য লোকদিগের মনে এরূপ বিশ্বাস আছে যে, তথায় কোন গন্ধবণিক্ পাক করিয়া খাইতে পারে না। পাকের জন্য চুল্লী খনন করিলেই সর্প বহির্গত হইয়া তাহাকে দংশন করে! ফল কথা, ঐ স্থানে এক জাতীয় সর্প প্রচুর পরিমাণে আছে। তাহাদের চক্র নাই—বোধ হয় বিষও নাই। উননের ভিতর, জলের কলসীর তলায়, বিছানার মধ্যে, পাদুকার অভ্যন্তরে সর্ব্বদাই তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা পার্য্যমাণে কাহাকেও দংশন করে না,—করিলে দষ্টব্যক্তির হস্ত পদ বন্ধন করিয়া সমীপস্থ মনসার বাটীতে কিয়ৎক্ষণ ফেলিয়া রাখিলেই সে আরোগ্য লাভ করে—নচেৎ মরিয়া যায়, ইহাই তত্রত্য লোকের বিশ্বাস। বেহুলার উপাখ্যান কবিদিগের স্ব-কপোলকল্পিত বলিয়া বোধ হয় না। বোধ হয় প্রাচীন পরম্পরাগত কোন মূল ছিল, কবিরা তাহাই অবলম্বন করিয়া কবিকঙ্কণের চণ্ডীর অনুকরণে এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—কিন্তু প্রকৃত কবিত্বশক্তি, সহৃদয়তা ও বহুজ্ঞতার অভাবে তাদৃশ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

মনসার ভাসান, চণ্ডীকাব্যের অনুকৃতি—বাণিজ্যার্থ বহির্গত চাঁদ-সওদাগরের নৌকাতে ঝড় বৃষ্টি, বাঙ্গাল মাঝিদিগের খেদ, নখিন্দর বেহুলার বিবাহ, বিশ্বকর্ম্মাদ্বারা বাসগৃহ নির্ম্মাণ, কলার মান্দাসে বেহুলার ভাসিয়া যাইবার সময়ে নদীর উভয় তীরস্থ গ্রাম ও নগরের নামোল্লেখ, বেহুলার সুরপুরে নৃত্য ও জলমগ্ন ডিঙ্গার পুনরুদ্ধার প্রভৃতি বর্ণন সকল অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে এই গ্রন্থকে চণ্ডীর অনুকৃতি ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। কিন্তু চণ্ডীতে ধনপতি ও শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রা সময়ে নদীর উভয় তীরস্থ গ্রাম নগরাদি বর্ণনা যেরূপ মনোহর ও অনেক দূর পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে—বিচার্য্যমাণ গ্রন্থের বর্ণনা সেরূপ কিছুই হয় নাই—বিশেষতঃ গ্রাম নগরাদির স্থান সন্নিবেশগুলি নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল বোধ হয়। যাহা হউক চণ্ডীতে ধনপতি, লক্ষপতি, সাধুদত্ত, শঙ্খদত্ত

চাঁদসওদাগর প্রভৃতি যে সকল গন্ধবণিকের বিবরণ ও নামোল্লেখ আছে, মনসার ভাসানেও তাহাদেরই বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, চণ্ডীরচনার বড় অধিক পরে মনসার ভাসান রচিত হয় নাই।

বেহুলা চরিত্র—এই উপাখ্যান বর্ণন সর্ব্বাঙ্গসঙ্গত ও সহৃদয়তার প্রকাশক না হউক, কিন্তু ইহাতে বেহুলার চরিত্র যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পতির নিমিত্ত সতীর দুঃখভোগ বর্ণনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। স্ফীত, গলিত, কীটাকুলিত, পূতিগন্ধি, মৃতপতিকে ক্রোড়ে লইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে ও নির্ভয়মনে বেহুলার মান্দাসে যাত্রা ভাবিতে গেলে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সতীগণের পতি নিমিত্তক সেই সেই ক্লেশভোগও সামান্য বলিয়া বোধ হয়, এবং বেহুলাকে পতিব্রতার পতাকা বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়।

মনসার ভাসানের ভাষা তত সুললিত বা সুশ্রাব্য নহে। ইহাতে পয়ার, লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদী এবং গজপতি এই কয়েকটি মাত্র ছন্দ আছে। ছন্দের ও বর্ণ বৈষম্য যতিভঙ্গ প্রভৃতি দোষ অনেক স্থলেই লক্ষিত হয়। স্থানে স্থানে রচনা বিলক্ষণ মধুরও বোধ হয়। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ গ্রন্থরচয়িতা দুই কবির দুইটি রচনা উদ্ধৃত হইল।

চাঁদসওদাগরের নৌকায় ঝড় বৃষ্টি।

দেবীর আজ্ঞায় হনূমান ধায়, শীঘ্র লয়ে মেঘগণ।
পুষ্কর দুষ্কর, আইল সত্বর, করিতে ঝড় বর্ষণ॥
আসি কালীদয়ে, করিল উদয়ে, ডুবাতে সাধুর তরি।
বীর হনুমান, অতি বেগবান, করিবারে ঝড় বারি॥
অবনী আকাশে, প্রখর বাতাসে, হৈল মহা অন্ধকার।
গঠিয়া গাবর, নায়ের নফর, নাহিক দেখে নিস্তার॥
গজ শুণ্ডাকার, পড়ে জলধার, ঘন ঘোর তর্জ্জে গর্জ্জে।
মনে পাইয়া ডর, বলে সওদাগর, যাইতে নারিনু রাজ্যে॥

হুড় হুড় হুড়, পড়িছে, চিকুর, বেগে যেন ধায় গুলি।
বলে কর্ণধার, নাহিক নিস্তার, ভাঙ্গিল মাথার খুলি॥
দেখিতে অদ্ভুত, হইছে বিদ্যুৎ, ছাইল গগনের ভানু।
বিপদ গণিয়া, বলিছে বেণিয়া, কেন বা বাণিজ্যে আনু॥
তরী সাতখান, চাপি হনুমান, চক্রবৎ দেয় পাক।
ঘন ঘন ঝড়ে, ছৈ সব উড়ে, প্রলয় পবনের ডাক॥
কুম্ভীর, হাঙ্গর, আইল বিস্তর, তরীর আশে পাশে ভাসে।
চলে ডিঙ্গী লয়ে, রাখে পাক দিয়ে, অহি ধায় গিলিবার আশে॥
ডিঙ্গায় মকর, গ্রাসিল হাঙ্গর, কাছি গিলিল মাছে।
চাপিয়া তরণী, হনুমান আপনি, হেলায়ে দোলায়ে নাচে॥
ডুবাইয়া নায়, চান্দ জল খায়, জগাতীর খলখল হাস।
জয় জয় মনসা, মা তুমি ভরসা, রচিল কেতকা দাস॥

পতিশোকে বেহুলার রোদন।

কালিনী খাইল পতি। প্রাণনাথ কোলে সতী॥
কি হইল কি হইল মোরে। প্রভু কেন হেন করে॥
কনক চাঁদের দুর্গতি। মলিন হইল ভাতি॥
বদনে নাহিক বাণী। অভাগিনী কিবা জানি॥
নরলোকে করে বা কি। বেহুলা বেণ্যের ঝি॥
কপালে কি মোর ছিল। বিভা রাত্রে পতি মৈল॥
মঙ্গল বিভার নিশী। মুখ হার পূর্ণ শশী॥
খাইনু আপন পতি। কে মোরে বলিবে সতী॥
বদনে বদন দিয়া। নয়নে নয়ন দিয়া॥
চরণ যুগল ধরি। ক্ষণে ক্ষণে কান্দে ঝুরি॥
কখন শ্রবণ মূলে। মোরে সঙ্গে লহ বলে॥
তুমি আমার গুণমণি। তোমা বিনা কিবা জানি॥

কাতর হইয়া রামা। কান্দিলেন নাহি ক্ষমা॥
করুণা করিয়া কান্দে। কেশপাশ নাহি বান্দে॥
আমি হইনু পতিদণ্ডী। বাসরে হইনু রাণ্ডী॥
ক্ষেমানন্দ কহে কবি। বাজীবে রাখিবে দেবি॥

কাশীরাম দাসের মহাভারত।*

পূর্ব্ববর্ণিত কবিদিগের কয়েকখানি গ্রন্থ বচনার পরেই বোধ হয় কাশীরামদাস প্রাদুর্ভূত হইয়া বাঙ্গালা মহাভারত বচনা কবেন। কাশীরাম "দেব" উপাধি বিশিষ্ট কায়স্থ ছিলেন। নিজরচনার অনেকস্থানে তিনি এই উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন—

মহাভারতের কথা অমৃত অর্ণবে। পয়ার প্রবন্ধে রচে কাশীরামদেবে॥ ইত্যাদি।

---

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ' অভিধানের অষ্টাদশভাগ,৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

"বহুকবি যেমন রামায়ণ বা রামচরিত অবলম্বন করিয়া বৃহৎ বা খণ্ডকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ বহুকবি ভারত কথা বা মহাভারতের বর্ণনীয় বিষয় লইয়া বহু কাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তন্মধ্যে বিজয় পণ্ডিত, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কৃষ্ণানন্দ বসু, অনন্তমিশ্র, নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজরামচন্দ্র খান্, শঙ্কর কবিচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পণ্ডিত, দ্বিজনন্দরাম, ঘনশ্যাম দাস, ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন, উৎকল ব্রাহ্মণ সারণ, কাশীরাম দাস, নন্দরাম দাস, দ্বৈপায়ন দাস, রাজেন্দ্র দাস, গোপীনাথ দত্ত, রামেশ্বর নন্দী, ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী, নিমাই পণ্ডিত, বল্লভদেব, দ্বিজ কৃষ্ণরাম, দ্বিজ রঘুনাথ, লোকনাথ দত্ত, শিবচন্দ্র সেন, ভৈরবচন্দ্র দাস, মধুসূদন নাপিত, ভৃগুরামদাস, ভরত পণ্ডিত, মুকুন্দানন্দ, রামনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি ৩৫ জন কবির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ... ভাবে, ভাষায় ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত খানিই আপাততঃ সর্ব্ব প্রাচীন বলিয়া মনে করি। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন সাহের সময় কেবল গৌড়বঙ্গ বলিয়া নহে, বঙ্গভাষারও সুবর্ণযুগ। তাঁহারই সময়ে (সম্ভবতঃ তাঁহারই আদেশে) বিজয় পণ্ডিত 'বিজয় পাণ্ডব কথা' বা 'ভারত পাঁচালী'—প্রণয়ন করেন।

কিন্তু দ্বিজভক্ত প্রাচীন কায়স্থেরা আপনাদিগকে 'দাস' বলিয়াই পরিচয় দিতে অধিক ভাল বাসিতেন, তদনুসারে ইনিও আপনার নাম কাশীরামদাস বলিয়াই সর্ব্বদা উল্লেখ করিয়াছেন। কাশীরাম আদিপর্ব্ব ও স্বর্গপর্ব্বের শেষভাগে—অর্থাৎ মহাভারতের শেষে—

আলোচ্য মহাভারতে সভাপর্ব্বের ও অভিষেক পর্ব্বাধ্যায়ের শেষে বিজয় পণ্ডিতের ভণিতি আছে, ইহা ভিন্ন মূলগ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থকারের আর কোন পরিচয় দেখা যায় না। * ০

বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত খানি প্রায় ৮ হাজার শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে।

মহাভারতের আর একখানি অনুবাদ গ্রন্থ পাওয়া যায়, এই অনুবাদ রচয়িতার নাম সঞ্জয়। নানাকারণে সঞ্জয় মহাভারত খানিও অতি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়, তবে কতদিনের প্রাচীন অনুমান ভিন্ন সে তথ্য যথাযথ নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে ইঁহার গীতায় গৌরাঙ্গদেবের নামোল্লেখ থাকায়, ইঁহাকে গৌরাঙ্গের সমসাময়িক বা তৎপরবর্ত্তী লোক বলিয়া স্বীকার করা যায়।

০ * এই মহাভারত বিক্রমপুর, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর, রাজসাহী, প্রভৃতি সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গেই পাওয়া যাইতেছে। সঞ্জয়কৃত মহাভারত মধ্যে রাজেন্দ্রদাস, গঙ্গাদাস সেন ও গোপীনাথ প্রভৃতি অনেক কবিরই মহাভারতীয় নানা অংশানুবাদ প্রক্ষিপ্ত দেখা যায়। সঞ্জয়ের অনুবাদ রচনার কিঞ্চিৎ নমুনা এই স্থানে উদ্ধৃত হইল :—

"ফলিত পুষ্পিত বন বসন্ত সময়।
সদাএ সুগন্ধী বায়ু মন্দ মন্দ বয়॥
বিচিত্র যে অলঙ্কার বিচিত্র ভূষণে।
কন্যা সব নানা রঙ্গ করে সেই বনে॥
কেহ মিষ্ট ফল খাএ কেহ মধু পিএ।
শর্ম্মিষ্ঠা যে দেবযানি চরণ সেবএ॥"

কবিন্দ্রপরমেশ্বরও একজন মহাভারতের অনুবাদ রচক প্রাচীন কবি। ইঁহার পরিচয় সম্বন্ধে জানা যায়, ইনি সম্রাট হুসেন সাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর উৎসাহে মহাভারতের অনুবাদ প্রচার করেন। এই জন্য ইঁহার রচিত মহাভারত 'পরাগলী মহাভারত' নামে পরিচিত।

কবীন্দ্র তাঁহার রচিত মহাভারতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

নৃপতি হুসেনসাহ হও মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি॥

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপরস্থিত। দ্বাদশতীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিগ্রাম। প্রিয়ঙ্কর দাস-পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস-পিতা। কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরামদাস। অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥

এই কয়েকটি শ্লোকদ্বারা আপনার যৎকিঞ্চিৎ যাহা পরিচয় দিয়াছেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার জীবনবৃত্ত জানিবার বড় অধিক উপায় নাই। ঐ শ্লোকদ্বারা স্থির

অস্ত্রশস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে কৃষ্ণ হৈব কৃষ্ণ অবতার॥
নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলিগেল হরষিত হৈয়া॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নীতি হরষিত মতি॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন আইল বায়ুগতি॥

কবীন্দ্র স্বীয় অনুগ্রাহক খাঁ মহাশয়ের গুণ প্রত্যেক পত্রে বর্ণন করিয়াছেন। কখন কখন উচ্ছলিত কৃতজ্ঞতা রসে ছন্দোবন্ধ শিথিল হইয়া গিয়াছে। যথা—

"ক্ষৌণী কল্পতরু শ্রীমান্ দীন দুর্গতিকারণ।
পুণ্যকীর্ত্তি গুণান্বাদী পরাগল খান॥"

পরাগলী মহাভারত প্রায় ১৭,০০০ শ্লোকে পূর্ণ। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের অধিকাংশই পরাগলী ভারতে উদ্ধৃত দেখা যায়।

শ্রীকর নন্দী, পরাগল খাঁর পুত্র সেনাপতি ছুটি খাঁর আদেশে মহাভারত অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ রচনা করেন। ইঁহার ইতিহাস মূলক কিঞ্চিৎ রচনার নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

নসরত সাহ তাত অতি মহারাজা।
রামবৎ নিত্যপালে সব প্রজা॥
নৃপতি হুসেন সাহ হও ক্ষিতিপতি।
সাম দান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী॥

হইতেছে যে, বৰ্দ্ধমান জেলার উত্তরভাগে ইন্দ্রাণীনামে এক পরগণা আছে; কাটোয়া নগর ঐ পরগণার অন্তর্গত। ঐ পরগণার মধ্যে ব্রহ্মাণী নদীর তীরসন্নিহিত সিঙ্গিনামক প্রসিদ্ধগ্রাম কাশীরামের বাসস্থান ছিল। তাঁহার প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর ও পিতার নাম

তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটিখান।
ত্রিপুরার উপরে করিলা সন্নিধান॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্র শেখর পর্ব্বত কন্দরে॥
চার লোল গিরি তার পৈত্রিক বসতি।
বিধি এ নির্ম্মল তাঁক কি কহিব অতি॥
চারি বর্ণ বসে লোক সেনা সন্নিহিত।
নানা গুণে প্রজাসব বসয়ে তথাত॥
ফেণী নামে নদী ও বেষ্টিত চারি ধার।
পূর্ব্বদিকে মহানদী পার নাহি তার॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভএ ছুটি খান মহাশয়॥ •
আজানুলম্বিত বাহু কমল-লোচন।" ইত্যাদি—

... ... নিত্যানন্দ ঘোষ একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি সমগ্র মহাভারতেরই অনুবাদ করেন। ইঁহার অনূদিত মহাভারতই পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। তাঁহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল, সুললিত ও কবিত্বপূর্ণ। তাঁহার সম্পূর্ণ মহাভারত কাশীদাস মহাভারতের ন্যায় অতি বৃহৎ। পশ্চিম বাঙ্গালায় কাশীরামদাস যেরূপ প্রসিদ্ধ পূর্ব্ববঙ্গে নিত্যানন্দ ঘোষও সেইরূপ। রামায়ণ রচকদিগের মধ্যে কবিচন্দ্রের নাম একবার উল্লেখ করিয়াছি। মহাভারত রচকদিগের মধ্যেও ইঁহার নাম পাওয়া যায়। ভাগবতেরও তিনি অন্যতম অনুবাদক।

কবি কাশীরামদাস সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মহাভারত অনুবাদকগণ অপেক্ষা কাশীদাস কিঞ্চিৎ আধুনিক হইলেও আজ বাঙ্গালী হিন্দু নরনারীর গৃহে গৃহে কাশীদাস কৃত মহাভারতই ভক্তিপূজ্য নিত্যপাঠ্য আদরের সামগ্রী।"

কমলাকান্ত ছিল। কমলাকান্তের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস, মধ্যম কাশীরাম ও কনিষ্ঠ গদাধর। কাশীদাসেরা তিন ভ্রাতাই বৈষ্ণব ও কাব্যামোদী ছিলেন। কৃষ্ণদাস 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামক ভাগবতের একখানি অনুবাদ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থে প্রাঞ্জল ভাষায় হরিলীলা বর্ণিত হইয়াছে। গদাধরদাস ১৫৬৪ শকে (খৃঃ অঃ ১৬৪২) 'জগন্নাথ মঙ্গল' নামক গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। এই গ্রন্থে কাশীরামের মহাভারত প্রণয়নের কথা উল্লিখিত আছে। গদাধর লিখিয়াছেন—

দ্বিতীয় শ্রীকাশীরাম ভক্ত ভগবান।
রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণ॥
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস।
জগৎ মঙ্গল কথা করিলা প্রকাশ॥

সুতরাং জগৎ মঙ্গলের পূর্ব্বে মহাভারত রচনার কাল নির্দ্দিষ্ট হওয়াই উচিত। কেহ কেহ লিখিয়াছেন, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ইন্দ্রাণীনামক স্থানে কাশীরামের বাসস্থান ছিল। ইহার প্রমাণ জন্য তাঁহারা কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও যে, ইন্দ্রাণীর কথা আছে, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"মণ্ডনহাট ডাহিনে আছে, থাকিব হাটের কাছে, আনন্দিত সাধুর নন্দন।
সম্মুখে ইন্দ্রাণী, ভুবনে দুর্ল্লভ জানি, দেব আইসে যাহার সদন॥ কবিকঙ্কণ (১)
"ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিয়া ফুলপাণি॥ ঐ(২)
"লহনা খুল্লনা কাছে মাগিল মেলানি। বাহিয়া অজয় নদী পাইল ইন্দ্রাণী॥ ঐ (৩)

ইহার প্রথম শ্লোকে 'মণ্ডনহাট' নামক স্থানের যে উল্লেখ আছে,—মুদ্রিতপুস্তকে ঐ শব্দ "মণ্ডলঘাট" করিয়া ফেলিয়াছে। মণ্ডলঘাট হুগলী জেলার মধ্যে, সুতরাং তৎসন্নিহিত ইন্দ্রাণী অবশ্যই হুগলীজেলার মধ্যগত হইবে—এই বোধেই কয়েক মহাশয়, কাশীরামের বাটী হুগলীজেলায় ছিল, ইহা লিখিয়াছেন; কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা নহে—যে হেতু কবিকঙ্কণের লিখিত চণ্ডীর পাঠ 'মণ্ডলঘাট' নহে 'মণ্ডনহাট'। ঐ মণ্ডনহাট ইন্দ্রাণীপরগণার মধ্যেই কাটোয়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থানের সন্নিধানে ঘোষহাট, একাইহাট,

বিকিহাট, পেৎনীহাট, ডাঁইহাট, আতুহাট, পাতাইহাট, নাদনহাট, নূতনহাট পালোহাট, পারাহাট প্রভৃতি হাটশব্দান্ত ১৩টি গ্রাম আছে। অতএব কবিকঙ্কণের কয়েকস্থানে উল্লিখিত 'ইন্দ্রাণী' বর্দ্ধমানজেলাস্থ ঐ ইন্দ্রাণীকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত, তাহাতে সংশয় নাই। কাশীরাম পরিচয়দানস্থলে "ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ" বলিয়াছেন, ইন্দ্রাণী গ্রাম বলেন নাই; সুতরাং তদ্দ্বারা ইন্দ্রাণী পরগণাই বুঝাইতেছে। তদ্ভিন্ন ঐ স্থানে বারদুয়ারির ঘাট, গণেশমহাতার ঘাট, পীরের ঘাট প্রভৃতি গঙ্গার ধারে ধারে বারটি বাঁধাঘাট এবং ইন্দ্রেশ্বরনামক শিবস্থানের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই বিষয়ে তত্রত্য লোকদিগের মধ্যে একটি কথাও আছে, যথা—

তের হাট, বার ঘাট, তিন চণ্ডী, তিন শ্বর।
এই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর ॥

কবি এই বারঘাটকেই লক্ষ্য করিয়া যে, "দ্বাদশতীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী" এই কথা লিখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মুদ্রিতপুস্তকের দোষে কাশীরামের বাসগ্রাম বিষয়েও লোকের ভ্রম জন্মিয়াগিয়াছে। ঐ সকল পুস্তকে 'সিদ্ধি' গ্রাম লিখিত আছে, কিন্তু ইন্দ্রাণীর মধ্যে সিদ্ধিগ্রাম কুত্রাপি নাই—সিঙ্গিগ্রাম আছে, এবং ঐ গ্রামেই কাশীরামের বাস ছিল। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, তত্রত্য লোকে বলিয়া থাকেন, ঐ সিঙ্গিগ্রামের দক্ষিণাংশে কাশীরামের বাসভবন ছিল—এক্ষণে সেই ভিটায় এক গন্ধবণিক্ বাস করে। তদ্ভিন্ন ঐ গ্রামে 'কেশে পুকুর' নামে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে, তাহাও কাশীরামের নিখাত বলিয়া প্রাচীন পরম্পরায় প্রসিদ্ধ। অতএব ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জেলা বর্দ্ধমানের ইন্দ্রাণীপরগণার অন্তর্বর্ত্তী সিঙ্গিগ্রামেই কাশীরামের নিবাস ছিল। কাশীরাম সংক্রান্ত কয়েকটি অলৌকিক উপাখ্যান তত্রত্য প্রাচীনলোকে অদ্যাপি বলিয়া থাকেন, বাহুল্যভয়ে ও অনাবশ্যক বোধে তাহা আর লিখিত হইল না।

একটি প্রবাদ আছে—

"আদি সভা বন বিরাটের * কত দূর। ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥"

মহাভারতের আদি, সভা, বন ও বিরাটপর্ব্বের কতক অংশ রচনা করিয়াই কাশীরামের মৃত্যু হয়। কথিত আছে যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রারব্ধ গ্রন্থের পরিসমাপনের নিমিত্ত নিজ জামাতার উপর ভার দিয়া যান। জামাতাও শ্বশুরের আদেশানুসারে সমস্ত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করেন, কিন্তু স্বকীয় কবিকীর্ত্তিলাভের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া গ্রন্থের সর্ব্বত্রই শ্বশুরের নামসমেতই ভণিতি দিয়া যান। সুতরাং সমগ্র মহাভারতই কাশীরামদাস-বিরচিত বলিয়া সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ হয়।"—কিন্তু এই প্রবাদ কতদূর সত্য, তাহা স্থির বলা যায় না। ইহার বিশ্বাসযোগ্য কোন মূল নাই—রচনাগত কিছু বৈলক্ষণ্য আছে বটে, কিন্তু এরূপ কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না—যদ্দ্বারা ইহাকে প্রামাণিক বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ সিঙ্গির নিকটবর্ত্তী কোন আত্মীয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এ বিষয়ে আমাদিগকে অনেকগুলি সংবাদ আনিয়া দিয়াছেন। তিনি সিঙ্গিগ্রামের অনেকের মুখে শুনিয়াছেন যে, "কাশীরাম আদি সভা বন ও বিরাটের কিয়দ্দূর লিখিয়া ৺ কাশীধাম যাত্রা করেন, সেই জন্যই তিনি উক্ত স্থানের স্বর্গোপমতা প্রকাশার্থ 'ইহা রচি কাশীরাম যান স্বর্গপুর' এইরূপ লিখিয়াছেন। ঐ পর্য্যন্ত রচনা করিয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়, ও কবিতার অর্থ এরূপ নহে"। যাহাহউক, আমরা কাশীরাম-দাসের কবিকীর্ত্তির অংশ অপরকে দিতে সম্মত নহি।

কাশীরামদাসের কাল নির্ণয়—কাশীরামদাস কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ বা কোন্ সময়ে গ্রন্থরচনা করেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তিনি গ্রন্থমধ্যে কোন স্থানে সময়নির্দ্দেশক কোন কথা লেখেন নাই। তবে একমাত্র রচনাদর্শন করিয়া সময়ের অনুমান করিতে হইবে—তাহা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, কাশীরামদাসের রচনা কৃত্তিবাস ও মুকুন্দরামের রচনা

* কাশীরামদাসের মহাভারতের অষ্টাদশ সর্গ :—

আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা, সৌপ্তিক, ঐষীক, নারী, শান্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমিক, মুষল এবং স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

অপেক্ষা অবশ্যই আধুনিক হইবে। কারণ উক্ত কবিদ্বয়ের রচনায় অপ্রচলিত প্রাচীন শব্দের ব্যবহার, ভাষার অসুকুমারতা ও ছন্দোবিষয়ে বর্ণগত বৈলক্ষণ্য যত দেখিতে পাওয়া যায়, কাশীরামের রচনায় তত দেখিতে পাওয়া যায় না। তদ্ভিন্ন রামায়ণ ও চণ্ডীর হস্তলিখিত ও মুদ্রিত পুস্তকের পাঠসকল যেরূপ নিতান্ত বিভিন্ন, মহাভারতের উক্তবিধ পুস্তকদ্বয়ের পাঠ সেরূপ বিভিন্ন নহে। অতএব ইহাও মহাভারতকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বোধ করিবার এক কারণ বটে—যেহেতু অত্যন্ত প্রাচীনপুস্তকে যত পাঠান্তর হইয়া পড়ে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুস্তকে তত পাঠান্তর হয় না। যাহা হউক, পূর্ব্বে আমরা একপ্রকার সপ্রমাণ করিয়াছি যে, কবিকঙ্কণের চণ্ডী ১৪৯৯ শকে অর্থাৎ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত; কাশীরামদাসের মহাভারত উহা অপেক্ষা আধুনিক হইলে অবশ্যই উক্ত সময়ের পরবর্ত্তী সময়ে লিখিত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু ঐ পরবর্ত্তী সময় নিরূপণ করিবার উপায় কি? একখানি হস্ত লিখিত বিরাট পর্ব্বের * পুঁথিতে—

'চন্দ্রবাণ পক্ষ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥'

এইরূপ ভণিতা পাওয়া গিয়াছে; উহা হইতে ১৫২৬ শক বা ১০১১ সন পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে কাশীদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস ১৫৬৪ শকে 'জগন্নাথ মঙ্গল' সম্পূর্ণ করেন। তাঁহার ঐ গ্রন্থে মহাভারত প্রণয়নের কথা লিখিত আছে। গদাধর লিখিয়াছেন:—

'দ্বিতীয় শ্রীকাশীরাম ভক্ত ভগবান।
রচিল পাঁচালি ছন্দে ভারতপুরাণ॥'

সুতরাং জগন্নাথ মঙ্গলের পূর্ব্বে মহাভারত রচনার কাল নির্দ্দিষ্ট হওয়াই উচিত। পূর্ব্বোক্ত হেতুবাদে কাশীরাম দাস যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অর্থাৎ

* ১৩০৭ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় উক্ত পুঁথির বিবরণ দিয়াছেন।

এখন হইতে ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সংশয় থাকিতেছে না।

কাশীরাম দাসের পুত্র* স্বীয় পুরোহিতদিগকে যে বাস্তুভিটা দান করেন, সেই দানপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহা সন ১০৮৫ সালের আষাঢ় মাসে লিখিত; যদি এ দানপত্র প্রকৃত হয়, তাহা হইলে কাশীরামের প্রাদুর্ভাবকাল যাহা অনুমান করা হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার অনৈক্য হইতেছে না।

কাশীরাম দাস অতি বিনীত, কবিত্ব-গর্ব্বশূন্য, পরমভাগবত লোক ছিলেন। মহাভারতের ন্যায় ছন্দোবদ্ধ বৃহৎ গ্রন্থ তাঁহার পূর্ব্বে—অথবা পূর্ব্বেই কেন, এ পর্য্যন্ত কেহ রচনা করিতে পারেন নাই। তিনি এতাদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াও আপনাকে 'কবি' ও আপনার 'রচনা মধুর' এরূপ কোথাও কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। কেবল ব্যাসদেবের ও মহাভারত-কথার ভূরি ভূরি প্রশংসাতেই তাঁহার সকল ভণিতি পর্য্যবসিত হইয়াছে।

"ব্যাসের রচিত চিত্র অপূর্ব্ব ভারত। কাশীরামদাস কহে পাঁচালির মত ॥"
"ভারত পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস। পাঁচালী প্রবন্ধে রচে কাশীরামদাস ॥"
"মহাভারতের কথা অমৃত লহরী। কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভব বারি ॥"

ইত্যাদি যে কোন ভণিতিই পাঠ করা যাউক, তদ্দ্বারাই তাঁহার বিনয় নম্রতার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কাশীরামদাস মূলসংস্কৃত মহাভারতের অবিকল অনুবাদ করেন নাই, আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ভাবানুবাদ করিয়াছেন মাত্র; এইজন্য কবি সংস্কৃত জানিতেন না এই মত প্রচারিত হইয়াছে। তিনি গ্রন্থের অনেক স্থলে ভূরি ভূরি বিষয়ের নূতনরূপ যোজনা করিয়াছেন।

তদ্ভিন্ন কোন কোন উপাখ্যান একবারে নূতন সঙ্কলিতও হইয়াছে। বনপর্ব্বের মধ্যে শ্রীবৎসোপাখ্যান নামে যে একটি বৃহৎ উপাখ্যান আছে, তাহা মূল সংস্কৃতে

* পুত্রের নাম এক্ষণে জানা গিয়াছে, তাঁহার নাম নন্দরাম দাস; তাঁহার কবিত্ব শক্তি ছিল। তিনি মহাভারতান্তর্গত দ্রোণ পর্ব্বের পদ্যানুবাদ করেন।

একবারে নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, উহা কাশীরামের স্বকপোলকল্পিত। কিন্তু যখন কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও খুল্লনার পরীক্ষাদানাবসরে—

"কাঠুরে সহিত ছিল সতী চিন্তা নারী"

এই কথার উল্লেখ আছে, তখন আমাদের অনুমান হয় যে, ঐ উপাখ্যান কোন পৌরাণিক মূল হইতেই হউক বা অন্যরূপেই হউক, দেশমধ্যে প্রচলিত ছিল; কবি তাহাকেই হৃষ্টপুষ্ট করিয়া নিজ গ্রন্থমধ্যে নিবেশিত করিয়াছেন।

কাশীরাম দাস যে সংস্কৃত জানিতেন, তাহার প্রমাণ আমরা ভূরি ভূরি সংগ্রহ করিয়া দেখাইব। তাঁহার মহাভারতের কোন কোন স্থল মূলসংস্কৃত মহাভারতের প্রাঞ্জল অনুবাদ। যথা—মূল মহাভারতের সম্ভবপর্ব্বে বিদুর বাক্য—

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥
স তথা বিদুরেণোক্তস্তৈশ্চ সর্ব্বৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ।
ন চকার তথা রাজা পুত্রস্নেহসমন্বিতঃ॥

কাশীরামের অনুবাদ—

'কুলের কারণ রাজা ত্যজি একজন।
কুল ত্যাগ করি রাজা গ্রামের কারণ॥
গ্রাম ত্যজি শুন রাজা জন-পদ হিতে।
পৃথিবীকে ত্যজি রাজা আপনা রাখিতে॥
হেন নীতি আছে রাজা কহে পূর্ব্বাপর।
জ্যেষ্ঠ পুত্র মারি বংশ রাখ নৃপবর॥
এতেক বচন যদি বিদুর বলিল।
পুত্র স্নেহে ধৃতরাষ্ট্র শুনি না শুনিল॥

জতুগৃহ পর্ব্বের এক স্থানে আছে—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
দুর্য্যোধন মমাপ্যেতৎ হৃদি সংপরিবর্ত্ততে।
অভিপ্রায়স্য পাপত্বান্নৈবং তু বিবৃণোম্যহম্॥

কাশীরামের অনুবাদ—

'ধৃতরাষ্ট্র বৈল তুমি কৈলে যে বিচার।
নিরবধি এই চিত্তে জাগয়ে আমার॥
পাপ কর্ম্ম বলি ইহা প্রকাশ না করি।
গুপ্তে রাখিয়াছি আমি লোকাচারে ডরি॥'

মূল মহাভারতে বিদুর কর্ত্তৃক প্রেরিত খনক বলিলেন—

প্রহিতো বিদুরেণাস্মি খনকঃ কুশলোহ্যহং।

কাশীরামদাসের অনুবাদ—

"বিদুর পাঠাল্য আমা তোমার সদনে।
ভূমি খনিবারে আমি বড় বিচক্ষণে॥"

মূল মহাভারত—

ত উচুর্ব্রাহ্মণা রাজন্ পাণ্ডবান্ ব্রহ্মচারিণঃ।
ক ভবন্তো গমিষ্যন্তি কুতোবাভ্যাগতা ইহ।

কাশীরামের অনুবাদ—

'দ্বিজগণ বলে কে তোমরা পঞ্চজন।
কোথা হৈতে আইসহ কোথায় গমন॥

এইরূপ বহু উদাহরণ তাঁহার গ্রন্থ হইতে দেখান যাইতে পরে।

তর্কচ্ছলে কাশীরাম সংস্কৃত জানিতেন না স্বীকার করিলেও তাঁহার রচনা অসংস্কৃতজ্ঞের রচনার ন্যায় বোধ হয় না।

"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥"

"নিষ্কলঙ্ক ইন্দুজ্যোতিঃ পীনঘনস্তনী" প্রভৃতি রচনা সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের লেখনী হইতে নির্গত হওয়া সম্ভবপর নহে।

কবিকঙ্কণ ও কাশীরাম দাস—কবিত্ব বিষয়ে কাশীরাম দাস কবিকঙ্কণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তি কম ছিল, একথা বলা যায় না। মহাভারতে আদি, করুণ, রৌদ্র, বীর ও শান্ত

রসের ভূরি ভূরি স্থল আছে, কাশীরাম সেই সকল স্থলেই কবিত্ব ও কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। ঐ পরিচয় মহাভারতের সর্ব্বত্রই প্রচুর আছে; উদাহরণস্বরূপ কয়েকটিমাত্র আমরা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম।

দ্রৌপদীর রূপবর্ণনা।

পূর্ণ সুধাকর, হইতে প্রবর, কে বলে কমল মুখ।
গজমতি ভূষা, তিলফুল নাসা, দেখি মুনি মন সুখ॥
নেত্রযুগ মীন, দেখিয়া হরিণ, লাজে দোঁহে গেল বন।
চারু ভুরুলতা, দেখিয়া মন্মথা, নিন্দে নিজ শরাসন॥
প্রবাল শ্রীধর, বিরাজে অধর, পূর্ব্বীয় অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী, সিন্দূর চাঁচর জালে॥
তড়িত মণ্ডল, গণ্ডেতে কুণ্ডল, হিমাংশু মণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচকুম্ভ, লজ্জায় দাড়িম্ব, হৃদয় ফাটিয়া পড়ে॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু, প্রবেশিল অম্বু, অগাধ অম্বুধি মাঝে।
নিন্দিত মৃণাল, দেখি ভুজ ব্যাল, প্রবেশিল বিলে লাজে॥
মাজা দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন, কেশরী পড়িল লাজে।
করে কোকনদ, পাইল বিপদ, নখতেজে দ্বিজরাজে॥
কনক কঙ্কণ, করে ঝন ঝন, চরণে নূপুর হংস।
জঘন সুন্দর, বিহার কন্দর, স্বর্ণকাঞ্চী অবতংস॥
রামরম্ভা তরু, চারু যুগ উরু, দেখি নিন্দে হাত হাতি।
উদর সুকৃশ, মাজা মৃগ-ঈশ, নিতম্বযুগল ক্ষিতি॥
নীল সুকোমল, শরীর অমল, কমলে গঠিত অঙ্গ।
ভারের কারণ, হীন আভরণ, সহজে মোহে অনঙ্গ॥
কমল বদন, কমল নয়ন, কমল গঞ্জিত গণ্ড।
দ্বিকর কমল, কমলাঙ্ঘ্রি তল, ভুজ কমলের দণ্ড॥
মন্দ মন্দ বায়, যোজনেক যায়, অঙ্গের কমলগন্ধ।
হইয়া উন্মত্ত, ধায় চতুর্ভিত, কমল-মধুপ-বৃন্দ॥

কুরুকুল ধ্বংসে, কমলার অংশে, সৃজিল কমলজাত।
কমলাবিলাসী, ধন্দি কহে কাশী, কমলাকান্তের সুত॥

আদিপর্ব্ব।

লক্ষ্যভেদোদ্যত ব্রাহ্মণরূপী অর্জ্জুনকে দেখিয়া সভাসদ-দিগের উক্তি—

কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন। সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এজন॥
দেখ দ্বিজ, মনসিজ, জিনিয়া মূরতি। পদ্মপত্র, যুগ্মনেত্র, পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম, তনুশ্যাম, নীলোৎপল আভা। মুখরুচি, কত শুচি, করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব, অধরের তুল। খগরাজ, পায় লাজ, নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু, যুগ্মভুরু, ললাট প্রসর। কি সানন্দ, গতি মন্দ, মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে, নিন্দে নাগে, আজানুলম্বিত। করিকর, যুগ্মবর, জানু সুবলিত॥
বুকপাটা, দন্তছটা, জিনিয়া দামিনী। দেখি এরে, ধৈর্য্য ধরে, কোথা কে কামিনী॥
মহাবীর্য্য, যেন সূর্য্য, ঢাকিয়াছে মেঘে। অগ্নি অংশু, যেন পাংশু, আচ্ছাদিল নাগে॥
এই ক্ষণে, লয় মনে, বিন্ধিবেক লক্ষ্য। কাশী ভণে, কৃষ্ণজনে, কি কর্ম্ম অশক্য॥

আদিপর্ব্ব।

কুরুসৈন্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধারম্ভ।

আকাশ হইতে শীঘ্র তারা যেন ছুটে। চালাইয়া দিল রথ কর্ণের নিকটে॥
কর্ণের সম্মুখে ছিল যত রথিগণ। অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
শেল শূল শক্তি জাঠী মুষল মুদ্গর। ঝাঁকে ঝাঁকে চতুর্দ্দিকে বরিষে তোমর॥
পর্ব্বত আকার হস্তী ভীষণদশন। চরণে কম্পিত ক্ষিতি জলদগর্জ্জন॥
দেখিয়া হাসিয়া বীর কুন্তীর নন্দন। দিব্য অস্ত্র গাণ্ডীবে যোড়েন সেই ক্ষণ॥
না হতে নিমেষ পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস। শর জাল করিয়া পূরিল দিক্‌পাশ॥
বরিষা-কালেতে যেন বরিষয়ে মেঘে। দিনকর তেজ যেন সর্ব্বঠাঁই লাগে॥
যত রথী পদাতি কুঞ্জর হয়গণ। করেন জর্জ্জর বিন্ধি ইন্দ্রের নন্দন॥
বেগে রথ চালায় সারথি বিচক্ষণ। বাতাধিক মনোজব জিনিয়া খঞ্জন॥

ক্ষণে বামে ক্ষণে দক্ষে আগে পিছে ছুটে। ভূমিতে ক্ষণেক পড়ে ক্ষণে শূন্যে উঠে॥
ক্ষণেক ভিতরে যায় ক্ষণেক বাহির। রথ বেগে পড়িল অনেক মহাবীর॥
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে। নাগে নাগান্তক যেন মারে কুতূহলে॥
কাটিল রথের ধ্বজ সারথি সহিত। খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল চতুর্ভিত॥
ধনুকসহিত বামহাত ফেলে কাটি। বুকে বাজি পড়ে কেহ কামড়ায় মাটী॥
অস্ত্রানলে দগ্ধ কেহ করে ছট ফটী। কাটিয়া ফেলিল কারু দন্ত দুই পাটী॥
শ্রবণ নাসিকা গেল দেখি বিপরীত। কাটিয়া পড়িল মুণ্ড কুণ্ডলসহিত॥
কাটিলেন রথধ্বজ করি খণ্ড খণ্ড। মধ্যচক্রে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥
তীক্ষ্ণবাণাঘাতে মত্ত কুঞ্জর সকল। আর্ত্তনাদ করি পড়ে মহি বহুদল॥
চক্রাকারে ভ্রমি ভূমে দিয়া পড়ে দন্ত। পেটেতে বাজিয়া কারু বাহিরায় অন্ত্র॥
এই মত মহামার করিল ফাল্‌গুনি। সকল সৈন্যেরে বিন্ধি করিল চালনী॥
বিরাটপর্ব্ব।

রণভূমিতে দুর্য্যোধনকে পতিত দেখিয়া গান্ধারীর বিলাপ।

পুত্রদরশনে দেবী অজ্ঞানা হইল। গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল॥
পঞ্চপাণ্ডবেতে তাঁরে তুলিয়া ধরিল। শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি আদি বহু প্রবোধিল॥
সম্বিৎ পাইয়া তবে গান্ধারতনয়া। চাহিয়া কৃষ্ণেরে বলে শোকাকুল হৈয়া॥
দেখ কৃষ্ণ পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যোধন। সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ দুঃশাসন॥
শকুনি সঙ্গেতে কেন না দেখি রাজার। কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনুকুমার॥
কোথা দ্রোণাচার্য্য কোথা কৃপ মহাশয়। একলা পড়িয়া কেন আমার তনয়॥
কোথা সে কুণ্ডল কোথা মণি মুক্তাস্রজ। কোথা গেল হস্তী ঘোড়া কোথা রথধ্বজ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে ধায়। হেন দুর্য্যোধন রাজা ধূলায় লোটায়॥
সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন। হেম তনু ধূলার উপরে নারায়ণ॥
জাতি যূথী পুষ্প আর চাঁপা নাগেশ্বর। রঙ্গণ মালতী আর মল্লিকা সুন্দর॥
এ সকল পুষ্পে পুত্র থাকিত শুইয়া। হেম তনু লোটে ধূলা দেখনা চাহিয়া॥
অগুরু চন্দন গন্ধ কুঙ্কুম কস্তূরী। লেপন করিত সদা অঙ্গের উপরি॥
শোণিতে সে তনু আজি হইল শোভন। আহা মরি কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন॥

ত্যজহ আলস্য কেন না দেহ উত্তর। যুদ্ধহেতু তোমারে ডাকয়ে বৃকোদর॥
উঠ পুত্র ত্যজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে। গদাযুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে॥
কৃষ্ণার্জ্জুন ডাকে তোমা যুদ্ধের কারণ। প্রত্যুত্তর কেন নাহি দেহ দুর্য্যোধন॥
এত বলি গান্ধারী হইল অচেতনা। প্রিয়ভাষে কৃষ্ণচন্দ্র করেন সান্ত্বনা॥ নারীপর্ব্ব।

ছন্দ—কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে যে প্রকার নূতন নূতন ছন্দের অনুসরণ আছে, মহাভারতে তাহা অধিক নাই। ইহাতে আদ্যোপান্ত সমুদয়ই পয়ার; মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ ও লঘু ত্রিপদী এবং ২।১টি তরল পয়ার প্রভৃতি আছে। ইহাতে বোধ হয় কবি, সাগরস্বরূপ ভারতরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কিরূপে প্রারব্ধের পরিসমাপন করি-বেন, তজ্জন্য সতত চিন্তিত ছিলেন, এবং রচনার শীঘ্রতাসম্পাদন নিমিত্ত সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন, সুতরাং ছন্দের পারিপাট্যের প্রতি তত মনোযোগ দিতে পারেন নাই। কিন্তু এস্থলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব্ববর্ণিত গ্রন্থ সকলে যেমত যে সে বর্ণ লইয়া অন্ত্যবর্ণের মিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে সেরূপ করা হয় নাই। মিত্রাক্ষরতার বিশুদ্ধ নিয়ম ইহাতে অনেকদূর অনুসৃত হইয়াছে।

রামায়ণ ও মহাভারতপাঠের উপকারিতা—যাহা হউক, কৃত্তিবাস রামায়ণকে ও কাশীরাম দাস মহাভারতকে ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিয়া সাধারণ লোকের যে, কিরূপ উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অধিক কি বাঙ্গালাদেশ মধ্যে ইঁহারাই বাল্মীকি ও ব্যাসকে উজ্জীবিত রাখিয়াছেন, বলিতে হইবে। ঐ দুই গ্রন্থ ভাষায় না থাকিয়া কেবল সংস্কৃতে বদ্ধ থাকিলে, রামচন্দ্রের অকপট পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণ ও ভরতের অবিচলিত জ্যেষ্ঠানুরাগ, সীতার অনুপম পাতিব্রত্য, পাণ্ডবদিগের অলৌকিক সৌভ্রাত্র, যুধিষ্ঠিরের অপরিসীম ধর্ম্মনিষ্ঠা, পঞ্চপতিত্বেও পাঞ্চালীর আশ্চর্য্যরূপ সতীধর্ম্মরক্ষা, ধার্ম্মিকদিগের বিপদ্বিনাশার্থ কৃষ্ণরূপী ভগবানের তাদৃশ চতুরতা, এ সকল কথা দেশের কয়জন লোকের মুখে শুনা যাইত? এখন—বিশেষতঃ আবার ছাপার পুঁথি হওয়াতে—মুদীরা পর্য্যন্ত রামায়ণ মহাভারতের বিষয় লইয়া কথায় কথায় দৃষ্টান্ত দিয়া থাকে। ইহা মহাত্মা কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের অনুগ্রহের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। পশ্চিমদেশে তুলসীদাসের রামায়ণ থাকাতে তদ্বর্ণিত

উপাখ্যান সাধারণে বলিতে পারে, কিন্তু ভারতের সেরূপ কোন ভাষাগ্রন্থ না থাকায় তদুপাখ্যান সকল সংস্কৃতানভিজ্ঞ সাধারণ লোকের পক্ষে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়, অথবা কাশীদাসের পরম শ্লাঘার বিষয়, বলিতে হইবে যে, মহাসমৃদ্ধ ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় বহুল ধনব্যয়ে ১০।১২ জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্য লইয়া অবিশ্রান্ত ৮ বৎসরকাল পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক যে মহাভারতের বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ সমাপন করিতে পারিয়াছেন, এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি বৰ্দ্ধমানাধিপ ৺মহাতাপচন্দ্র বাহাদুর ঐরূপ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য লইয়া প্রায় বিংশতি বৎসরের পূর্ব্বে যে মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ শেষ করিতে পারেন নাই, নিঃস্ব কাশীরাম দাস, বোধ হয়, খড়োঘরের পিড়ায় ছেঁড়া মাদুরে বসিয়া সেই প্রকাণ্ড মহাভারতের ছন্দোবন্ধে বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।

মহাভারতের ভাষা রামায়ণ ও চণ্ডীর ভাষা অপেক্ষা অনেক মার্জ্জিত ও স্পষ্ট; ইহাতে বোধ হয় ঐ সময়ে বাঙ্গালার অনুশীলন কিছু অধিক হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে গণনা করিয়াও দেখা যাইতেছে যে, ঐ সময়ে বাঙ্গালা পুস্তকের সংখ্যা অনেকগুলি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলতঃ রামায়ণ ও চণ্ডীর সময় অপেক্ষা মহাভারতের সময়ে বাঙ্গালা ভাষার কিঞ্চিৎ শ্রীসৌষ্ঠব হইয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ অনুভব হয়।

কাশীরামের অপর গ্রন্থ—এতদ্ব্যতীত কাশীদাস তিনখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন:—১। স্বপ্নপর্ব্ব। ২। জলপর্ব্ব। ৩। নলোপাখ্যান। এই গুলি তাঁহার কিশোর বয়সের রচনা বলিয়াই অনুমান হয়।

ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।*

বর্দ্ধমান জেলার কইগড় পরগণায় কৃষ্ণপুর গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে সম্ভবতঃ ১৫৯১

* এই প্রবন্ধটি নূতন সংযোজিত হইল। সম্পাদক।

এতদ্ভিন্ন রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি, হাকন্দপুরাণ, ময়ূরভট্ট, রামচন্দ্র, মাণিক গাঙ্গুলী,

শকে (১৬৬৯ খৃঃ অব্দে) ঘনরাম জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতার নাম সীতা দেবী, যথা—

মাতা মোর মহাদেবী সতীসাধ্বী সীতা।
কবিবন্ত দান্ত শান্ত গৌরীকান্ত পিতা।
প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান।
তাঁর সুত ঘনরাম মধুরস গান॥

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, প্রথমপালা।

কথিত আছে, কবি বাল্যকাল হইতেই শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন; তাঁহার সমবয়স্ক কেহই সামর্থ্যে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁহার কাব্যে মল্লদিগের লড়াই ও অশ্বাদি চালনার যেরূপ সজীব বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে ব্যায়াম ক্রীড়ায় তিনি খুব অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার অনুরাগ থাকিলেও তিনি বাল্যে বড়ই কলহপ্রিয় ছিলেন, এজন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে রায়ণার সন্নিকট রামবাটী গ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের চতুষ্পাঠীতে প্রেরণ করেন। ঘনরাম এই স্থানে নির্ব্বিবাদে যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিতে থাকেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কাব্যে অনুরাগ থাকায় তিনি সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন; কখন কখন ঐ সকল পুস্তক হইতে কোন বিষয় পদ্যে লিখিয়া সকলকে চমৎকৃত করিতেন। তাঁহার অধ্যাপক উহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিরত্ন উপাধি প্রদান করেন।

ভাবি গুরু পদ দ্বন্দ্ব, দুই একভাষা ছন্দ,
কবিতা করিতাম পূর্ব্ব কালে।
শুনে হয়ে কৃপান্বিত, বর্ণিতে বলিলা গীত,
গুরুব্রহ্ম বদন কমলে।

খেলারাম, রূপরাম, সীতারাম, দ্বিজরামচন্দ্র সেন পণ্ডিত, রামদাস আদক, সহদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির ধর্ম্মমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কবিগণের কাব্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ১৬৩৩ শকে ঘনরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্য সমাপন করেন।

নিজ গুণে করি যত্ন, নাম দিলা কবিরত্ন
কৃপাময় করুণা আধান।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের আদেশে কবি শ্রীধর্ম্মমঙ্গল নামক মহাকাব্যের রচনায় প্রবৃত্ত হন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের স্থানে স্থানে ইহার নাম সংযোজিত আছে, যথা—

অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী,
কীর্ত্তিচন্দ্র নরের প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি,
দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, প্রথম পালা।

সংস্কৃত কবিগণের অনুকরণে ঘনরাম তাঁহার শ্রীধর্ম্মমঙ্গল কাব্য চতুর্বিংশতি পালায় বা সর্গে বিভক্ত করিয়াছেন, এই চতুর্বিংশতি পালার নাম যথাক্রমে—

১ম সর্গ	স্থাপন পালা,	শ্লোক সংখ্যা ২৬৭,	
২য় ,,	ঢেকুর পালা,	২৩৮ শ্লোক	
৩য় ,,	রঞ্জাবতীর বিবাহপালা,	২৫৬ শ্লোক	
৪র্থ ,,	হরিশ্চন্দ্র পালা,	২৬০ শ্লোক	
৫ম ,,	শালেভর পালা,	২৯৭	,,
৬ষ্ঠ ,,	লাউসেনের জন্মপালা,	৩১৫	,,
৭ম ,,	আখড়া পালা,	৩৫৫	,,
৮ম ,,	ফলা নির্ম্মাণ পালা,	৩১৭	,,
৯ম ,,	গৌড় যাত্রার পালা,	৪০৭	,,
১০ম ,,	কামদল বধ,	৩৫০	,,
১১শ ,,	জামতি পালা,	৩২৭	,,
১২ ,,	গোলাহাট পালা,	৪৯৪	,,
১৩ ,,	হস্তিবধ পালা,	৫১৮	,,
১৪ ,,	কাঙরযাত্রা পালা,	৩৫৯	,,

১৫	"	কামরূপ যুদ্ধ পালা,	৪১৪	"
১৬	"	কানড়ার স্বয়ম্বর,	৩০৭	"
১৭	"	কানড়ার বিবাহ,	৪৮৫	"
১৮	"	মায়ামুণ্ড পালা,	৫৬৫	"
১৯	"	ইছাই বধ পালা,	৪৩৫	"
২০	"	বাদল পালা,	২৮১	"
২১	"	পশ্চিমউদয় আরম্ভ,	১৭৬	"
২২	"	জাগরণ পালা,	১০৩১	"
২৩	"	পশ্চিম উদয় পালা,	৩৩০	"
২৪	"	স্বর্গারোহণ পালা,	৩৬৪	" *

১৬৩৩ শকের (১৭১১ খৃষ্টাব্দে) অগ্রহায়ণ মাসে ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা শেষ করেন, ইহা তাঁহার গ্রন্থ পাঠে জানা যায় :—

সঙ্গীত আরম্ভকাল নাহিক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপন॥
শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর।
মার্গকাব্য অংশে হংস ভার্গব বাসর॥

ধর্ম্মমঙ্গল, ২৪ সর্গ।

১২৮৭ সালের ‘বান্ধব’ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

“শ্রীধর্ম্মমঙ্গল বীররসপ্রধান মহাকাব্য ; লাউসেন, কর্পূর সেন ইহার নায়ক, তন্মধ্যে লাউসেনই প্রধান এবং উঁহাকেই কাব্যের নায়ক বলিতে হইবে। অমলা, বিমলা, কালঙ্গা, কানড়া, লাউসেনের এই চারি স্ত্রীর চরিত্রগত বিবরণ ; লক্ষী ডোমনীর চরিত্র, ধূমসীর চরিত্র প্রভৃতি স্ত্রী চরিত্র পাঠ করিয়া অনেক স্ত্রীলোক সদুপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেন ; সুরিক্ষা, গুরিক্ষা প্রভৃতি দুষ্টা স্ত্রীর চরিত্র ও শাস্তি দেখিয়া অনেক নীতিশিক্ষা হইতে পারে।”

* ‘শ্রীধর্ম্মমঙ্গল’, বঙ্গবাসী সংস্করণ (১২৯০ সাল)

আমরা এই গ্রন্থের বাহুল্যপূর্ণ বর্ণনা না করিয়া 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদক পরলোকগত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু তাঁহার সম্পাদিত 'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যের ভূমিকায় যে সমালোচনা প্রকাশ করেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের ন্যায় মৌলিক মহাকাব্য বঙ্গের ভাষাভাণ্ডারে আর কি আছে? কাব্যের গল্প উপকথা নহে, আকাশকুসুম নহে, মস্তিষ্কের বিকৃতি নহে—বাস্তব ঘটনা এ কাব্যের একাংশীভূত। ** বঙ্গদেশ যখন স্বাধীন ছিল, পালবংশীয় রাজগণ যখন গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, যখন বাঙ্গালী বীরের পদভরে বঙ্গভূমি কাঁপিত—সেই সময়—বঙ্গের সেই শুভ সময়—এ কাব্যের উৎপত্তিকাল। দোর্দ্দণ্ডপ্রভাবে গৌড়েশ্বর বঙ্গভূমি শাসন করিতেছেন; যমদূত সদৃশ নয় লক্ষ সেনা বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া বীরদর্পে হুঙ্কার রবে পৃথিবী কম্পিত করিতেছে, এমন সময়ে অজয়নদ তীরবর্ত্তী ঢেকুর রাজ্যের অধীশ্বর ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইল—গৌড়ের ভূপতিকে আর কর দেয় না, তাঁহার হুকুম মানে না। গৌড়েশ্বরের সহিত ইছাই ঘোষের যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু বঙ্গের ভূপতি এ মহাযুদ্ধে পরাজিত হইয়া গৌড়ে পলায়ন করিলেন, ইছাই ঘোষের জয় জয়কার হইল। কাব্যের প্রারম্ভেই এই দৃশ্য, এ ঘটনাই এ কাব্যের মূলসূত্র। গৌড়নগরের ভূপতির মরমে শেল বিঁধিয়া রহিল—একজন সামান্য রাজার নিকট গৌড়েশ্বরের পরাজয়, এ অপমান তাঁহার সহ্য হইল না—কিরূপে ইছাই রাজ্য উচ্ছিন্ন যায়, ইহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

"ইছাই ঘোষ মহাশক্তি ভগবতীর সেবক—প্রচণ্ড গোঁয়ার, দুর্দ্ধর্ষ। এমন সময়ে ধরাধামে ধর্ম্মের অবতার, শান্তমূর্ত্তি, রণনিপুণ, অমিত সাহস লাউসেন জন্ম গ্রহণ করিলেন। লাউসেন গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা পুত্র। সেনের ভুজবীর্য্য বুদ্ধি বিদ্যা দেখিয়া ভূপতি ভাবিলেন, এই বীরবরের দ্বারাই আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে, ইহারই হস্তে ইছাই ঘোষের বধসাধন হইবে। লাউসেন রাজার বড় প্রিয়পাত্র হইলেন। রাজমন্ত্রী মহামদ সেনের উপর রাজার ভালবাসা দেখিয়া ভাবিল, এই লাউসেনই আমার সর্ব্বনাশ করিবে—সম্ভবতঃ শেষে মন্ত্রিত্ব কাড়িয়া লইবে,

অতএব কলে, কৌশলে, উপায়ে, মন্ত্রণায়—লাউসেনের বধসাধন করিতে হইবে। একদিকে ভূপতির ভালবাসা, অপরদিকে মন্ত্রী মহামদের বধ চেষ্টা ; একদিকে অমৃতকুম্ভ, অপরদিকে বিষভাণ্ড, এই সুখ দুঃখের চক্র মধ্যে পড়িয়া কাব্যের নায়ক বীরবর লাউসেনের চরিত্র সংগঠিত হইতে লাগিল—বীর্য্যবহ্নি স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। এইরূপ নায়ক উপনায়কের ঘাতপ্রতিঘাতে, ললিতগতিতে অথচ ঘোর রবে—কুসুমবর্ষণে—অথচ তরবারির ঝঞ্ঝাঘাতে এ মহাকাব্য চলিয়াছে—হাস্যরসের তরঙ্গ কতবার খেলিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? বঙ্গের অপর কোন কাব্যে যে দৃশ্য কেহ কখন দেখে নাই, তাহা ঘনরামে আছে। অশ্বে আরোহণ করিয়া কোমলাঙ্গে কঠিন বর্ম্ম পরিয়া বাঙ্গালী বীর রমণীর ধনুর্ব্বাণ হস্তে যুদ্ধে গমন কোন্ কাব্যে এ নয়নমনোহর দৃশ্য আছে? কুলটা কিরূপে পরপুরুষের মন ভুলায়, সাধুপুরুষ কিরূপে কুলটার মায়াফাঁদ অতিক্রম করে, অবিবাহিত নবযুবতী মনে মনে আজন্মপূজিত মনোমত বর বিনা কেমনে অন্যের গলায় বর-মাল্য অর্পণ করে না,—অশেষ যন্ত্রণাপ্রাপ্ত সাধ্বী স্ত্রীর পতিপদ বিনা কিরূপে পর পুরুষের পানে মন টলে না, এ সকলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঘনরামে আছে।

"...... ঘনরাম তাঁহার কাব্যমধ্যে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কপোল-কল্পিত নহে। মেদিনীপুরের অন্তর্গত ময়না নগরে নায়কের জন্ম ; রাজবাটীর ভগ্ন প্রাসাদ এখন স্তূপীকৃত, জঙ্গলময় ; ময়নাগড়ের এখনও অস্তিত্ব রহিয়াছে। ইছাই ঘোষের রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও সেই অজয় নদীর অনতিদূরে অবস্থিত—আরাধ্যাদেবী মহামায়ার মন্দিরচূড়া খসিয়া পড়িয়াছে, প্রস্তরময়ী কালিকা দেবীর লোলরসনা এখনও লহ লহ করিতেছে—তবে এখন আর সে স্থলে মানুষ নাই—শৃগাল, বরাহ, ভল্লূক বিচরণ করিতেছে।

পণ্ডিতপ্রবর হাণ্টার সাহেব তাঁহার 'Annals of Rural Bengal' নামক পুস্তকে ইছাই ঘোষের কথা সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। আর সেই পাল-বংশীয় মহারাজের রত্নসিংহাসন গৌড়নগরের জঙ্গলমধ্যে লুক্কায়িত—ব্যাঘ্র তাহার রাজা, ভল্লুক মন্ত্রী, শৃগাল নকীব। আধুনিক মালদহের নিকট এই গৌড় মহা-রণ্য অবস্থিত।"

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গীত হইয়া থাকে, এইজন্য পালার ও পরিচ্ছেদের উপরে একটি করিয়া ধুয়া আছে, সেগুলি ঘনরামের রচিত নহে। গীত গাহিবার সুবিধার নিমিত্ত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণ সেগুলি সংযোজনা করিয়া দেন।

'শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ব্যতীত ঘনরাম রচিত সত্যনারায়ণের একখানি পাঁচালি দৃষ্ট হয়, তাহাতে তাঁহার চারি পুত্র—রামপ্রিয়, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। কয়েক বৎসর হইল, কবির বৃদ্ধ প্রপৌত্র মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার একমাত্র পুত্র বর্ত্তমান আছেন।"

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবসঙ্কীর্ত্তন (বা শিবায়ন)।

শিবসঙ্কীর্ত্তন রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কর্ণগড় নামক স্থানের পূর্ব্বাধিকারী রাজা যশোবন্তসিংহের সভাসদ ছিলেন এবং সেই সভায় ঐ সঙ্গীতের প্রকাশ করেন। বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামে রামেশ্বরের পূর্ব্বনিবাস ছিল। পরে তিনি যশোবন্তসিংহের সভাসদ হইয়া মেদিনীপুর পরগণার অন্তঃপাতী অযোধ্যাবাড়গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থমধ্যেই উক্ত রাজপরিবারের ও নিজপরিবারের যে সকল বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহার কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া দিলেই এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন হইবে না। সে সকল এই—

"মহারাজ রঘুবীর, রঘুনাথসম ধীর, ধার্ম্মিক রসিক রসময়।
যাঁহার পুণ্যের বলে, অবতীর্ণ মহীতলে, রাজা রামসিংহ মহাশয়॥
তস্য সুত যশোবন্ত, সিংহ সর্ব্ব গুণবন্ত, শ্রীযুত অজিতসিংহ তাত।
মেদিনীপুরাধিপতি, কর্ণগড়ে অবস্থিতি, ভগবতী যাঁহার সাক্ষাৎ॥"—
"তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়ে করে ঘর, বিরচিল শিবসঙ্কীর্ত্তন॥"—
"ভট্ট নারায়ণ মুনি, সন্তান কেসরকুনি, যতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত মহাজন, চক্রবর্ত্তী গোবর্দ্ধন, তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ॥

দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ৩য় সং, ৪৭৮।

তস্য সুত রামেশ্বর, শম্ভুরাম সহোদর, সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী, পতিব্রতা সে সুন্দরী, অযোধ্যানগর নিকেতন॥
যদুপুরে পূর্ব্ববাস, হেমৎসিংহ পরকাশ, রাজা রামসিংহ কৈল স্থিত।
স্থাপিয়া কৌশিকীতটে, রচিয়া পুরাণপটে, রচাইল মধুরসঙ্গীত॥"—

"যশোবন্ত সিংহ সিংহবাহিনীর দাস। সে রাজসভায় হলো সঙ্গীত প্রকাশ॥
জগতে ভরিল যার যশকীর্ত্তি গানে। কর্ণপুরে কলিয়ামে কেবা নাই জানে॥
ভঞ্জভূমীশ্বর ভূপ ভুবনবিদিত"—

"ভগিনী পার্ব্বতী গৌরী সরস্বতী ত্রয়। দুর্গাচরণাদি করে ভাগিনেয় ছয়॥
ভাগিনেয়ীপুত্র রামকৃষ্ণ বন্দ্যঘটী। এ সকলে সুকুশলে রাখিবে ধূর্জটি॥
সুমিত্রার শুভোদয় পরেশীর প্রিয়। পরকালে প্রভু পদতলে স্থল দিও॥"

এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলেই কবি আপনাকে রামসিংহ-প্রতিষ্ঠিত ও যশোবন্তসিংহের সভাসদ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। যাহা হউক কবির ভ্রাতা, ভগিনী, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়পুত্র প্রভৃতির নামোল্লেখ আছে, কিন্তু কোন স্থলে সন্তানের নামোল্লেখ নাই, অতএব বোধ হইতেছে, তাঁহার সন্তান হয় নাই। সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী দুই স্ত্রীর নামোল্লেখ থাকায় ইহাও অনুমান হয় যে, একের বন্ধ্যাত্ববোধ হইলে অপর বিবাহ হইয়াছিল।

পূর্ব্বলিখিত কর্ণগড় মেদিনীপুরের তিন ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী। তথায় যশোবন্ত-সিংহের বংশীয় কেহই নাই, কিন্তু ভগবতী মহামায়ার ভগ্নপ্রায় মন্দিরাদি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থানে পঞ্চমুণ্ডী (যোগাসনবিশেষ) প্রস্তুত করিয়া রামেশ্বর কবি জপ করিতেন, তাহাতে মহামায়া প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন, এবং সেই বরপ্রভাবেই তিনি শিবসঙ্কীর্ত্তন রচনা করেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। শিবসঙ্কীর্ত্তনকে ঐ দেশে 'শিবায়ন' কহে।

শিবায়ন-রচনার কাল নির্ণয়—কবি কোন্ শকে এই শিবায়ন রচনা করিয়াছিলেন, নিজ রচনা মধ্যেই তাহা উল্লিখিত আছে। যথা—

"শাকে হ'লে চন্দ্রকলা রাম করতলে। বাম হৈল বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হ'লো সারা।"

আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও এই শ্লোক হইতে স্পষ্টরূপে কোন শক বাহির করিতে পারিলাম না। বোধ হয় উক্ত রচনায় লিপিকর প্রমাদবশতঃ পাঠ-ব্যতিক্রম হইয়া থাকিবে। মুদ্রিত পুস্তকে ঐ শাকের স্থলে অঙ্ক দ্বারা ১৬৩৪ শক নিবেশিত আছে। উহা অতিকষ্টকল্পনায় সঙ্গত করা যাইতে পারে। যাহাহউক অগত্যা উহাই স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু এ বিষয়ে আর একটি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে—নবাব সুজাউদ্দীনের সময়ে ১৬৫৬ শকে [১৭৩৪ খৃঃ অব্দে] এই যশোবন্তসিংহ ঢাকার নায়েব নবাব সরফরাজ খাঁর প্রতিনিধি ঘালিবআলীর সহিত দেওয়ান হইয়া ঢাকায় গিয়াছিলেন। ইঁহারই যত্নে পুনর্ব্বার টাকায় ৮ মণ চাউল হওয়ায় নবাব সায়েস্তাখাঁর সময় হইতে আবদ্ধ ঢাকানগরের পশ্চিমদ্বারের কবাট উন্মুক্ত হইয়াছিল। যশোবন্ত ১৬৫৬ শকে দেওয়ান হইয়াছিলেন, এবং মুদ্রিত পুস্তকের গণনানুসারে শিবসঙ্কীর্ত্তন ১৬৩৪ শকে সমাপ্ত হয়—এই ২২ বৎসরের অন্তর ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। যেহেতু যশোবন্তের দেওয়ান হইবার ২২ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬৩৪ শকে (১৭১২ খৃঃ অব্দে) শিবসঙ্কীর্ত্তন রচনা শেষ হওয়া অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ ইতিহাসে ইহাও দেখা যাইতেছে যে, দেওয়ানীলাভের পূর্ব্বেও যশোবন্ত প্রসিদ্ধ মুর্শীদকুলীখাঁর অধীনে বিলক্ষণ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ 'শিবসঙ্কীর্ত্তন' মহাভারতের পরে এবং কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বে যে রচিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থবর্ণিত বিষয়—কবিকঙ্কণ—দেবদেবীর বন্দনা, গ্রন্থসূচনা, সৃষ্টি প্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ, হরপার্ব্বতীর বিবাহ, শিবের ভিক্ষা, কন্দল প্রভৃতিক্রমে—যেরূপে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইনিও অবিকল সেইরূপে গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপরে ইহাতে ধর্ম্মকথা প্রসঙ্গে শিবের উক্তিতে রুক্মিণীব্রত,রামনামমাহাত্ম্য, বাণ-রাজার উপাখ্যান প্রভৃতি অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান এবং সতীমাহাত্ম্য, ব্রতাদির অনেক কথা বর্ণিত আছে। ঐ সকল কথার পর শিবের কৃষিকর্ম্মারম্ভ, তাঁহাকে ছলিবার উদ্দেশে ভগবতীর বাগ্দিনীবেশে তথায় গমন, শিবকে ঠকান, শিবের শাঁখারীবেশে হিমালয়ে গমন এবং ভগবতীকে শাঁখা পরাইবার প্রসঙ্গে

বাগ্দিনীরূপে প্রতারণার প্রত্যুত্তরদান, হরগৌরীর মিলন প্রভৃতি যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমরা অন্য কোথাও দেখি নাই—বোধ হয় উহা কবির স্বকপোলকল্পিত হইবে। এইসকল স্থলে কবি বিলক্ষণ চতুরতা, বিলক্ষণ পরিহাসরসিকতা ও বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বাগ্দিনীর পালা ও শাঁখা পরাইবার বৃত্তান্তটি আমাদের এতই মিষ্ট লাগিল যে ২। ৩ বার পাঠ করিয়াও তৃপ্তিবোধ হইল না। কেবল ঐ স্থলই কেন? কার্ত্তিক গণেশের কন্দল, পিতাপুত্রের ভোজন, হরগৌরীর কন্দল প্রভৃতি স্থানগুলিও বিশেষ প্রীতিকর। ফলতঃ শিবসঙ্কীর্ত্তন গ্রন্থখানি প্রভৃতি অবশ্যই উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে গণ্য হইতে পারে। তবে করুণ রস না থাকিলে কোন কাব্যই মনকে আর্দ্র করিতে পারে না—কবি এগ্রন্থের কোন স্থলেই করুণ রসের উদ্দীপ্তি করিতে পারেন নাই।

শিবসঙ্কীর্ত্তনের নায়কনায়িকা দেবদেবী; সুতরাং তাঁহাদের আচার ব্যবহারের যুক্তাযুক্ততা বিচার অকর্ত্তব্য। কবির রচনা বেশ কোমল ও বিশদ নহে। ইনি বড়ই অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন—স্থানে স্থানে অনুপ্রাস সকল বেশ মিষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু স্থলবিশেষে বিলক্ষণ কর্কশও বোধ হয়। নিম্নভাগে তাঁহার রচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল, পাঠকগণ দেখিয়া দোষগুণ বিচার করিতে পারিবেন।

পিতাপুত্রের ভোজন।

যোগ করে দুটী পুত্র লয়ে তার পর। পাতিত পুরটপীঠে বসে পুরহর॥
তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী। দুটী সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিনজনে একুনে বদন হলো বার। গুটি গুটি দুটী হাতে যত দিতে পার॥
তিনজনে বার মুখে পাঁচ হাতে খায়। এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়।
দেখে দেখে পদ্মাবতী বসে এক পাশে। বদনে বসন দিয়া মন্দ মন্দ হাসে॥
শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া নাকে। অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে॥
গুহ গণপতি ডাকে অন্ন আন মা। হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য হৈয়ে খা॥
মূষিকী মায়ের বাক্যে মৌনী হয়ে রয়। শঙ্কর শিখারে দেন শিখিধ্বজ কয়॥

রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে। যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে ?
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে। ঈষদুষ্ণ সুপ দিল বেসারির পরে ॥
লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝী। সুপ হলো সাঙ্গ আন আর আছে কি ?
দড়বড় দেবী এনে দিলা ভাজা দশ। খেতে খেতে গিরীশ গৌরীর গান যশ ॥
সিদ্ধিদল কোমল ধুতুরা ফল ভাজা। মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা ॥
উঘণ চর্ব্বণে ফিরে ফুরাল ব্যঞ্জন। এককালে শূন্য থালে ডাকে তিনজন ॥
চটপট পিশিত মিশ্রিত করে যুষে। বায়ুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়ে আইসে ॥
চঞ্চল চরণে বাজে নূপুর চমৎকার। রণরণ কিঙ্কিণী কঙ্কণ ঝনৎকার ॥
দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর। শ্রমে হলো সজল কোমল কলেবর ॥
ইন্দুমুখে মন্দ মন্দ ঘর্ম্মবিন্দু সাজে। মৌক্তিকের শ্রেণী যেন বিদ্যুতের মাজে ॥
খরবাস্তে সুপস্থে নর্ত্তকী যেন ফিরে। সুরস পায়স দিল পিষ্টকের পরে ॥
হরবধূ অম্লমধু দিতে আরবার। খসিল কাঁচলী হলো পয়োধর ভার ॥
নাটাপাটা হাতে বাটা আলুইল কেশ। গব্য বিতরণ কৈল দ্রব্য হৈল শেষ ॥
ভোক্তার শরীরে মূর্ত্তি ফিরে ভগবতী। ক্ষুধারূপ অন্তে কৈল শান্তিরূপে স্থিতি ॥
উদর হইল পূর্ণ উঠিল উদ্গার। অতঃপর গণ্ডূষ করিতে নারে আর ॥
হট্ করে হৈমবতী দিতে আইল ভাত। শার্দ্দূল ঝম্পনে সবে আগুলিল পাত ॥

হরপার্ব্বতীর কন্দল।

আত্মারাম আজি রামরসে হৈয়া ভোর। ভোলা ভুলে গেল ভিক্ষা দুঃখে নাহি ওর
ভাত নাই ভবনে ভবানীবাণী বাণ। চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডীপানে চান ॥
কিঞ্চিৎ করিয়া কোপ কহিলেন ভব। কালিকার কিছু নাই উড়াইলে সব ? ॥
বাড়া ব্যয় কর বুড়া বৈসে পাছে রয়। বৃদ্ধকালে ঘুরাইয়া বধিবে নিশ্চয় ॥
দুঃখীর দুহিতা নহ দোষ দিব কি। ভিক্ষুকের ভার্য্যা হৈলে ভূপতির ঝী ॥
দেবী বলে দেবদেব দোষ কেন দেও। দিয়াছিলে যত দ্রব্য লেখা করে নেও ॥
বিশ্বনাথ বলে এই বয়সে আমার। বসুমতী পাতাল গিয়াছে কতবার ॥
লেখা জোখা জানি নাহি রামরস পেয়ে। হয়েছি অজরামর হরিগুণ গেয়ে ॥

মিছা লেখা জোখা একা মনে মনে কর। ঠেকিছি তোমার ঠাঁই ঠেঙ্গাইয়া মার॥
ভ্রূভঙ্গেতে, ভবানি! ভুবন ভুলে যায়। ভোলানাথে ভুলাইবে কত বড় দায়॥
ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করি! খাব নাহি ভাত। যাব নাই ভিক্ষায় যাকরে জগন্নাথ॥
পার্ব্বতী বলেন প্রভু তুমি কেন যাবে। চাক্ করিলে ভাঙ্ এখন পাক করিতে কবে॥
এখন বাপের কাছে বসে আছে পো। ক্ষুধা পেলে ক্ষেমঙ্করি! খেতে দেনা গো॥
বাপের বিভব নাহি কি করিবে মায়। স্বামীর সম্পদ বিনা শিশু পোষা দায়॥

শঙ্খ পরিধানের উপাখ্যান।

হৈমবতী হরপাশে হাসে মন্দ মন্দ। কান্ত সঙ্গে করিয়া কথার অনুবন্ধ॥
প্রণমিয়া পার্ব্বতী প্রভুর পদতলে। রঙ্গিণী সে রঙ্গনাথে শঙ্খ দিতে বলে॥
গদগদ স্বরে হরে করে কাকুবাদ। পূর্ণ কর পশুপতি পার্ব্বতীর সাদ॥
দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেও দুটী বাই। কৃপা কর কান্ত আর কিছু নাহি চাই॥
লজ্জায় লোকের কাছে লুকাইয়া রই। হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাহি কই॥
তুলডাঁটী পারা দুটী হস্ত দেখ মোর। শঙ্খ দিলে প্রভুর পুণ্যের নাহি ওর॥
পতিব্রতা পড়িল প্রভুর পদতলে। তখন তুলিয়া তাঁরে ত্রিলোচন বলে॥
শঙ্খের সংবাদ বলি শুন শৈলসুতা। অভাগার ঘরে ইহা অসম্ভব কথা॥
গৃহস্থ গরীব যায় সাতগেঁটে ট্যানা। সোহাগে মাগীর কানে কাঁটি কড়ি সোণা॥
ভাত নাই ভবনে ভর্ত্তার ভাগ্য বাঁকা। মিন্‌সে মরে অন্ন খেটে মাগী মাপে শাঁখা॥
তেমনি তোমার দেখি বিপরীত ধারা। রহিতে আমারে ঘরে নাহি দিবে পারা॥
অর্থ আছে আমার আপনি যদি জান। স্বতন্তরা বট শঙ্খ পর নাই কেন॥
নিবারিতে নাহি কেহ নহ পরাধীন। ত্যক্ত কর কেন মিছা কহ সারাদিন॥
মহেশের মন জান মহতের ঝী। আপনি অন্তরযামী আমি কব কি॥
বুড়াবৃষ বেচিলে বিপত্তি হবে ঘোর। সেই বিনা সম্ভাবনা কিবা আছে মোর॥
জানে নাই যে জন জানাতে হয় তাকে। ভামিনী ভূষণ পায় ভাগ্যে যদি থাকে॥
ভিখারীর ভার্য্যা হয়ে ভূষণের সাধ। কেন অকিঞ্চন সঙ্গে কর বিসম্বাদ?॥
বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে। জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে॥

সেইখানে শঙ্খ পরি সুখ পাবে মনে। জানিয়া জনক ঘরে যাও এইক্ষণে ॥
একথা ঈশ্বরী শুনে ঈশ্বরের মুখে। শূন্য হলো সব যেন শেল পড়ে বুকে ॥
দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটী পায়। কান্তসনে ক্রোধ করে কাত্যায়নী যায় ॥
কোলে করি কার্ত্তিকের হস্তে গজানন। চঞ্চল চরণে হৈল চণ্ডীর চলন ॥
গোড়াইল গিরীশ গৌরীর পিছু পিছু। শিব ডাকে শশিমুখী শুনে নাই কিছু ॥
নিদান দারুণ দিব্য দিলে দেবরাও। আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খাও ॥
করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী। ভাবিল ভাইএর কিরা ভবানীর প্রতি ॥
ধাইয়া ধূর্জ্জটি গিয়া ধরে দুটী হাতে। আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে ॥
"যাও যাও যত ভাব জানা গেল" বলি। ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেলা চলি ॥
চমৎকার চন্দ্রচূড় চারিদিকে চায়। নিবারিতে নারিয়া নারদ পাশে ধায় ॥
রামেশ্বর ভাবে ঋষি দেখ বসে কি। পাথারে ফেলিয়া গেলা পর্ব্বতের ঝী ॥

হিমালয় হইতে হরগৌরীর প্রত্যাগমন।

ঘর যেতে হর চায়, গৌরী গিয়া কহে মায়, শুনি রাণী শোকে অচেতন।
রাম-বনবাস জানি, যেমন কৌশল্যা রাণী, কাকুস্বরে করেন রোদন ॥
সুখময়ী রাজকন্যা, ভিক্ষুগৃহে দুঃখগণ্যা, কেমনে বঞ্চিবে তুমি তায়।
এই দুঃখে আমি সারা, পরাণ পুতলী তারা, কেমনে ছাড়িয়া যাবে মায় ॥
পাইনু পরম সুখ, পাসরিছি সব দুখ, নিরখিয়া তুয়া মুখ চাঁদে।
তোমারে বিদায় দিয়া, কেমনে ধরিব হিয়া, মনের সহিত প্রাণ কাঁদে ॥
বসাইয়া বরাসনে, পালিব পরাণ পণে, মোর ঘরে থাক চিরকাল।
আমি যত দিন জীব, আর না পাঠায়ে দিব, ফলভরে ভাঙ্গে নাহি ডাল ॥
ননীর পুতলী ছিল, জ্বলন্ত অনলে দিল, বাপ দিল কি করিবে মায়।
আমি অভাগিনী নারী, সকল খণ্ডাতে পারি, কপাল খণ্ডন নাহি যায় ॥
গৌরীর গলায় ধরে, বিস্তর বিলাপ করে, জননী কাঁদিয়া মোহ যায়।
মুছিয়া বদনখানি, বলিয়া মধুর বাণী, পার্ব্বতী প্রবোধ করে মায় ॥

অদ্যাপি অনেক ভিক্ষুকে যে ডম্বরুবাদনপূর্ব্বক ভগবতীর শঙ্খপরিধানের

বৃত্তান্ত গান করিয়া ভিক্ষা করে, এই শিবসঙ্কীর্ত্তনই সেই সকল গানের মূল। অনেক স্থলে অবিকল এই গ্রন্থের পদ্যই আবৃত্তি করিতে শোনা যায়। শিবসঙ্কীর্ত্তনের ভাষা যেরূপ প্রদর্শিত হইল, তদ্দৃষ্টে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, গ্রন্থকার বিলক্ষণ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞান না থাকিলে ওরূপ শব্দাড়ম্বরে গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হইত না। তদ্ভিন্ন তাঁহার গ্রন্থমধ্যে স্থানে স্থানে কুমারসম্ভবাদি সংস্কৃত গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক প্রাচীন অধ্যাপকে কবিকঙ্কণের শ্লোকের ন্যায় শিবসঙ্কীর্ত্তনেরও অনেক শ্লোক আদরপূর্ব্বক আবৃত্তি করিয়া থাকেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থ অপেক্ষা কাশীরামদাসের মহাভারতে ছন্দের বর্ণবৈষম্যাদি দোষ যেরূপ অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতেও সেইরূপ। ইহাতেও নূতনরূপ ছন্দের রচনা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। পয়ার, দীর্ঘত্রিপদী ও লঘুত্রিপদী ইহাই প্রায় সমুদয়—কেবল ২।১টি স্থলে 'একাবলী' ও 'ভঙ্গত্রিপদী' আছে। ফলতঃ মহাভারত অপেক্ষা শিবসঙ্কীর্ত্তনে ছন্দোবিষয়ে কিছু পারিপাট্য হয় নাই।

রামেশ্বরেব শিবসঙ্কীর্ত্তন ভিন্ন 'সত্যনারায়ণের কথা' অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা। ইহা যদুপুরে রচিত এবং ইহাতে যদুপুরেব ভণিতা দৃষ্ট হয়। যথা—

পরে সত্যপীর বন্দী কহে কবি রাম।
সাকীন ববদাবাটী যদুপুব গ্রাম॥

ইহায় প্রচলন শিবসঙ্কীর্ত্তন অপেক্ষাও অধিক। ইহাতেও অনুপ্রাসচ্ছটা অল্প নহে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দরাদি।

শিবসঙ্কীর্ত্তনের রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও রামপ্রসাদ সেন বোধ হয় এক সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন। রামপ্রসাদের জীবনীসংক্রান্ত যে কয়েকখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে, সে সমস্তেরই মূল কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশিত মাসিক

'প্রভাকর'। প্রাচীন কবিদিগের জীবনী সংগ্রহের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ই অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। অতএব তিনিই এই কার্য্যের জন্য সাধু-বাদের প্রথম পাত্র। যাহা হউক আমরা এস্থলে তাঁহার ও অপরাপর মহাশয়-দিগের রচিত পুস্তক হইতেই রামপ্রসাদের জীবনবৃত্তসংক্রান্ত কয়েকটি সংবাদ সংগ্রহ করিলাম।

অনুমান ১৬৪০-১৬৪৫ শকের (খৃঃ ১৭১৮-১৭২৩) মধ্যে হালীসহর পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রাম রামপ্রসাদের জন্ম স্থান। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তাঁহার পিতামহের নাম রামেশ্বর সেন ও পিতার নাম রামরাম সেন। গ্রন্থকার স্বরচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যে বংশপরিচয় দিয়াছেন, নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত হইল—

"ধনহেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল, কৃত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট, শান্ত, গুণানন্ত, প্রসন্না, কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশসমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্বগুণযুত, ছিল কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর, দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম, সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তাঁর, কহে পদে কালিকার, কৃপাময়ি! ময়ি কুরু দয়া॥" অন্যত্র—

"জ্যেষ্ঠাভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী। যাঁর পাদপদ্ম আমি রাত্রিদিবা সেবি॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥
ভাগিনেয় যুগ্ম জগন্নাথ, কৃপারাম। আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম॥
সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা। তাঁর দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া। মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মা গো দেহ পদধূলি॥"

আর এক স্থলে—

শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা সুতা।
শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা॥

উপরিলিখিত উক্তি দ্বারা ইহাও ব্যক্ত হইতেছে যে, কবির রামদুলাল নামে

এক পুত্র এবং পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে দুই কন্যা ছিলেন। কবিরঞ্জন স্বয়ং বিদ্যাসুন্দরে তাঁহার বাসস্থানের পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

"ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম, তার মধ্যে সিদ্ধপীট রামকৃষ্ণধাম ইত্যাদি।"

বোধ হয় রামপ্রসাদসেন বাল্যকালে সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। তিনি জাতীয় চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন নাই। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে কলিকাতার কোন ধনিকের * সংসারে মুহুরিগিরিকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই পরমার্থচিন্তাতেই রত থাকিত, বিষয়কার্য্যে বড় ব্যাপৃত হইত না। বাল্যাবধিই তাঁহার কবিত্বশক্তি সমুদ্ভূত হইয়াছিল। ঐ শক্তি সহকারে তিনি কালীবিষয়কগীতি রচনাকরিতেন। সেই সকল গীতি এবং কালী নাম আপনার নিকটস্থ হিসাবের খাতার প্রান্তভাগেই লিখিয়া রাখিতেন। একদিন উক্ত ধনিকের প্রধান কর্ম্মচারী তাহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং প্রভুকে প্রদর্শন করেন। প্রভু পরমশাক্ত ও গুণজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের লেখা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন এবং তন্মধ্যে এই গানটি—

আমায় দেও মা তবিলদারি। আমি নিমক্ হারাম নই শঙ্করী॥
পদরত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি॥
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর তবু শিবের মাইনা ভারি॥
আমি বিনা মাইনার চাকর, কেবল চরণধূলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে ত মা পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইতো সে পদ লয়ে বিপদ সারি॥

---

* কাহারও মতে দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের, কাহারও মতে দুর্গাচরণ মিত্রের।

পাঠ করিয়া একবারে মুগ্ধ হইলেন, রামপ্রসাদকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহাকে অনর্থক সংসারচিন্তা হইতে বিরত হইয়া কেবল উক্তরূপকার্য্যেই সময়াতিপাত করিতে উপদেশ দিলেন এবং যাবজ্জীবন মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া বাটী পাঠাইয়া দিলেন।

তদনুসারে রামপ্রসাদ বাটী আসিয়া নিশ্চিন্তমনে পরমার্থচিন্তা ও নানাবিধ গীতরচনা করিয়া সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রামপ্রসাদের গানের সুর নূতনরূপ, উহা যারপর নাই মধুর এবং সহজ—অর্থাৎ যাহাদের তাল মান কিছুই বোধ নাই, তাহারাও অনায়াসে রামপ্রসাদের গান গাইতে পারে। কৃষ্ণনগরের অধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ঐ সময়ে স্বাধিকারভুক্তকুমারহট্টে মধ্যে মধ্যে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় গুণজ্ঞ ও বিদ্যার উৎসাহদাতা লোক এদেশে কেহ ছিল কি না সন্দেহ। তিনি রামপ্রসাদের গুণগান শুনিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিতেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার গান শুনিয়া ও তাঁহার সহিত সদালাপ করিয়া পরমানন্দে থাকিতেন। রামপ্রসাদের সঙ্গীতবিদ্যা অধিক ছিলনা এবং স্বরও মধুর ছিল না—কিন্তু স্বরচিত-পদের গানে তাঁহার এরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল যে, তদ্দ্বারা তিনি লোককে আর্দ্র করিয়া দিতেন। কথিত আছে, রামপ্রসাদ একবার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মুর্শীদাবাদে গিয়াছিলেন, এবং তথায় গঙ্গার উপর নৌকার মধ্যে গান করিতেছিলেন। দৈবযোগে নবাব সিরাজউদ্দৌলাও নৌকা করিয়া নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, এমত সময়ে রামপ্রসাদের গান শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে নিজনৌকায় আনাইলেন, এবং গান করিতে আজ্ঞা করিলেন। রামপ্রসাদ নবাবের নিকটে বসিয়া হিন্দী গান আরম্ভ করিলেন, নবাব তাহাতে বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "না না ও গান নয়—ও নৌকায় যে গান গাইতেছিলে, সেই গান গাও"। অনন্তর রামপ্রসাদ এরূপ নৈপুণ্যসহকারে স্বরচিত গানসকল গাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে নবাবের পাষাণহৃদয়ও দ্রব হইয়া গেল।

কৃষ্ণচন্দ্র, রামপ্রসাদকে ক্রমে ক্রমে অধিক ভাল বাসিতে লাগিলেন। তিনি উহাঁকে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু রামপ্রসাদ

তাহাতে সম্মত হন নাই। রাজা কুমারহট্টে আসিলেই তাঁহার গীতশ্রবণ করিতেন এবং তাঁহাকে ও তত্রত্য আজুগোসাঁইকে একত্র করিয়া তাঁহাদের বিবাদ লাগাইয়া দিয়া কৌতুক দেখিতেন। আজুগোসাঁইকে অনেকে পাগল মনে করিত; কিন্তু তাঁহার অভ্যন্তরে কিছু কবিত্ব ও ভাবুকতা ছিল। রামপ্রসাদ কোন গান রচনা করিলেই আজুগোসাঁই তাহার একটি উত্তর দিতেন। নিম্নভাগে রামপ্রসাদ ও আজুগোসাঁই এর দুইটি গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। রামপ্রসাদের গান—

এই সংসার ধোঁকার টাটী। ও ভাই আনন্দবাজারে লুটী॥
ওরে ক্ষিতি বহ্নি বায়ু জল শূন্য অতি পরিপাটী।
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা অহঙ্কারে লক্ষকোটি॥ ইত্যাদি।

আজু গোসাঁইয়ের উত্তর—

এই সংসার রসের কুটী। (ওরে) খাই দাই রাজত্বে বসে মজা লুটী॥
ওহে সেন নাহি জ্ঞান, বুঝ তুমি মোটামুটী।
ওরে ভাই বন্ধু দারা সুত, পিঁড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী॥

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের কবিত্বশক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১০০ বিঘা নিষ্করভূমি এবং 'কবিরঞ্জন' এই উপাধি দিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ রাজদত্ত সম্মানের প্রতিদানস্বরূপ বিদ্যাসুন্দর নামে এক পদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ঐ গ্রন্থের 'কবিরঞ্জন' নাম দিয়া রাজাকে অর্পণ করেন। তদ্ভিন্ন তিনি কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে আর দুইখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের একটি গানে "লাখ উকীল করেছি খাড়া" এই কথার উল্লেখ থাকায় কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তিনি লক্ষ গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাহা সম্ভব না হউক, তিনি যে, বহু সঙ্খ্যক সংগীত রচনা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কয়েক বৎসর হইল 'শ্রীঘোষ' নামাঙ্কিত 'প্রসাদ প্রসঙ্গ' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। সংগ্রহকার তাহাতে দুইশতের অধিক রামপ্রসাদী গীত মুদ্রিত করিয়াছেন। অনেক ভিক্ষুকে রামপ্রসাদী পদ গান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

রামপ্রসাদ তান্ত্রিক-মতাবলম্বী ছিলেন এবং উপাসনার অঙ্গবোধে কিঞ্চিৎ সুরাপান করিতেন। ইহাতে অনেকে তাঁহাকে মাতাল বলিয়া ঘৃণা করিত—কিন্তু তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইতেন না। একদা কুমারহট্টের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বলরাম তর্কভূষণ তাঁহাকে মাতাল বলিয়া অবজ্ঞা করায় তিনি নিম্নলিখিত গানটীদ্বারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিলেন, যথা—

"সুরাপান করিনে আমি সুধা খাইরে কুতূহলে।
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ, মদমাতালে মাতাল বলে॥"

এইরূপ সাংসারিক সকল বিষয়েই সামান্য সামান্য কথায় মুখে মুখে গান-রচনা করিবার শক্তি দেখিয়া রামপ্রসাদকে অনেকে 'কালীর বরপুত্র' বা 'সিদ্ধপুরুষ' বলিয়া বিশ্বাস করিত। রামপ্রসাদেরও মনেমনে বোধছিল যে, তিনি পূর্ব্বজন্মেও কালীভক্ত ছিলেন, কিন্তু এ জন্মে তিনি আপন স্ত্রীকে আপনার অপেক্ষা সৌভাগ্যবতী মনে করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ভগবতী কালী স্বপ্নযোগে তাঁহার পত্নীকে প্রত্যাদেশ দিয়াছেন; বিদ্যা-সুন্দরের মধ্যে অনেক স্থলে এই কথার উল্লেখ আছে, যথা—

"ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার কথা নহে সে কথা কি কব॥"

এস্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, নীলুঠাকুর নামক কবিওয়ালার দলেও রামপ্রসাদঠাকুর নামে একজন কবি ছিলেন। নিম্নলিখিত গীতাংশে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—

"যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে বাজেনাকো একটী দিন।
তেম্‌নি নীলুর দলে রামপ্রসাদ একৃটিন॥"

কেহ কেহ অনুমান করেন প্রসিদ্ধ রামপ্রসাদী পদসকল উল্লিখিত কবিওয়ালা রামপ্রসাদের রচিত—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের নহে। কিন্তু গীত ও বিদ্যাসুন্দরাদি গ্রন্থের ভাষাদির সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া অপরে এ কথায় কোনরূপে বিশ্বাস করেন না।

সাধক রামপ্রসাদের জীবনবৃত্তবিষয়ে কতকগুলি অলৌকিক উপাখ্যান

আছে। অদ্যাপি অনেকে তাহা বিশ্বাস করেন, এই হেতু নিম্নভাগে কয়েকটি লিখিত হইল—১। একদা রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছিলেন; তিনি বেড়ার যে পার্শ্বে বসিয়া দড়িতে গাঁইট দিতেছিলেন, তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরী তাহার অপরপার্শ্বে বসিয়া আবশ্যকমতে দড়ী ফিরাইয়া দিতেছিলেন; হঠাৎ কার্য্যান্তর উপস্থিত হওয়ায় জগদীশ্বরী তথা হইতে চলিয়া যান—রামপ্রসাদ তাহা দেখিতে পান নাই, কিন্তু দড়ী পূর্ব্ববৎ সময়মত ফিরিয়া আসিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কন্যা তথায় আসিয়া বেড়া অনেকদূর বাঁধা হইয়াছে দেখিয়া, কে দড়ী ফিরাইয়া দিল জিজ্ঞাসাকরায় রামপ্রসাদ কহিলেন 'কেন মা! তুমিই ত বরাবর দড়ী ফিরাইয়া দিতেছ'! তখন কন্যা আপনার কার্য্যান্তর-গমনের কথা প্রকাশ করিলে রামপ্রসাদের বোধ হইল যে, সাক্ষাৎ জগদীশ্বরী আসিয়া দড়ী ফিরাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

২। আর একদিন রামপ্রসাদ গঙ্গাস্নান করিয়া বাটী আসিলে তাঁহার মাতা কহিলেন রামপ্রসাদ! 'কে একটী স্ত্রীলোক তোমার গান শুনিতে আসিয়াছিল, তোমার দেখা না পাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালে কি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে, পড়িয়া দেখ'। রামপ্রসাদ পড়িয়া দেখিলেন, কাশী হইতে স্বয়ং অন্নপূর্ণা গান শুনিতে আসিয়াছিলেন—দেখা না পাইয়া লিখিয়া-গিয়াছেন যে, 'তুমি কাশীতে গিয়া আমাকে গান শুনাইয়া আইস'। রাম-প্রসাদ তখনই আর্দ্রবস্ত্রে মাতাকে সঙ্গে লইয়া 'মন্ চল্‌রে বারাণসী' ইত্যাদি গান করিতে করিতে কাশীযাত্রা করিলেন এবং ত্রিবেণীর নিকটস্থ কোন গ্রামে গিয়া সে রাত্রি অবস্থান করিলেন; নিশাযোগে অন্নপূর্ণা স্বপ্নে জানাই-লেন যে, আর তোমায় কাশী যাইতে হইবে না—এই খানেই আমাকে গান শুনাও। রামপ্রসাদ তথায় অনেক গান গাইলেন, তন্মধ্যে একটি গান এই—

আর্ কাজ্ কি আমার কাশী।
ঘরে বসে পাব গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
কেলে মার চরণ কাশী, সেই কালচরণ ভালবাসি,

কাশী মলে হয় মুক্তি, বটে সেই শিবের উক্তি,
(ওরে) সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী ॥ ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের মৃত্যু বিষয়েও এরূপ জনশ্রুতি যে, কালীপূজার পর দিন রামপ্রসাদ আপন পরিবারদিগকে আপনার আসন্নকাল উপস্থিত জানাইয়া প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময়ে প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাতীরে গমন করেন এবং একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত ৪টি গীত গান করেন—

"কালী গুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে,
এ তনুতরণী ত্বরা করি চল বেয়ে।
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে ॥
দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল,
অনায়াসে পাবে কূল, কাল রবে চেয়ে।
শিব নহে মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী, পলাইবে ধেয়ে" ॥ ১ ॥

"বল্ দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে ॥
কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মিলে ॥
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে;
ওরে শূন্যেতে পাপপুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে ॥

* * * *

প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদানকালে;
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হয়ে সে মিশায় জলে" ॥ ২ ।

"নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারা নামে অসঙ্খ্য কলঙ্ক হবে গো ॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো।

দশের ভরা ভবে নায়, দুঃখীজনে ফেলে যায়,
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো।
প্রসাদ বলে পাষাণমেয়ে, আসান দেমা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো" ॥ ৩ ॥

"তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা এখন্ যেমন রাখ্‌লে সুখে, তেমনি সুখ কি পাছে ॥
শিব যদি হন সত্যবাদী, তবে কি মা তোমায় সাধি,
মাগো ওমা—ফাঁকীর উপরে ফাঁকী, ডানচক্ষু নাচে।
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমাবে সাধিতাম নাই,
মাগো ওমা—দিয়ে আশা, কাট্‌লে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে।
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণার জোর বড়,
মাগো ওমা—আমার দফা, হলো রফা, দক্ষিণা হয়েছে" ॥ ৪

প্রবাদ এইরূপ যে, এই শেষোক্তগানের "দক্ষিণা হয়েছে" এই অংশটুকু গাইবামাত্র ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া রামপ্রসাদের মৃত্যু হয়। এই সকল উপাখ্যান কতদূর সত্য বা সম্ভব, তাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই, বিজ্ঞপাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। যাহাহউক রামপ্রসাদের বংশীয়েরা কলিকাতায় বাস করিয়াছেন। ইহাঁদের কুমারহট্টস্থ বাসস্থান পড়াটিবি * হইয়া রহিয়াছে।

রামপ্রসাদের জীবনবৃত্ত লইয়া অনেকক্ষণ গেল; এক্ষণে তদীয়গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে বৃহৎ ও প্রধান কবিরঞ্জন বা বিদ্যাসুন্দর। 'কালীকীর্ত্তন' ও 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' নামে তাঁহার যে অপর দুইগ্রন্থ আছে, তাহা ক্ষুদ্র ও কেবল গীতিময়। তাঁহার কোনগ্রন্থেই সময় নির্দ্দেশক কোন কথা নাই। সুতরাং তাঁহার 'কবিরঞ্জন' কোন্ শকে

* বহুকাল এই স্থান জঙ্গলপূর্ণ ছিল। গত সন ১২৯১ হইতে মহাত্মা রামপ্রসাদের জন্ম তিথিতে এইখানে একটি মেলা হইতেছে। ইহার নাম 'প্রসাদমেলা' রাখা হইয়াছে। প্রতি বৎসর কালী পূজার সময় ইহার অনুষ্ঠান এবং তদুপলক্ষে ৺কালীপূজা হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বহুজনের ঐ সময়ে সমাগম হইয়া থাকে।

রচিত হইয়াছে, তাহা স্থির বলাযায়না; কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই বোধহয় যে, কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলরচনার ২।১ বৎসর পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। অন্নদামঙ্গল ১৬৭৪শকে সমাপ্ত হইয়াছে, একথা তদ্-গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে; সুতরাং কবিরঞ্জন ১৬৭০।৭২শকে রচিত হই-য়াছে, অনুমান করাযাইতেপারে। এস্থলে কেহ কেহ বিপরীত অনুমানও করিয়াথাকেন—তাঁহাদের বোধে কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলের পর। কিন্তু একথা কোনরূপেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু অন্নদা-মঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দরের রচনা, কবিরঞ্জনবিদ্যাসুন্দরের রচনা অপেক্ষা অনেক মধুর, অনেক চাতুর্য্যসম্পন্ন ও অনেক উৎকৃষ্ট। অতএব তাহা বিদ্যমান দেখিয়াও কবিরঞ্জন রচনা করা প্রবাহিণী নদীসন্নিধানে সরোবরখননের ন্যায় নিতান্ত অবিজ্ঞের কার্য্য হয়। কবিবর রামপ্রসাদ তত অবিবেচক ও অসহৃদয় ছিলেন, ইহা সম্ভব হয় না। বরং এইরূপ সম্ভব যে, রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রদান করিলে তিনি উহা পাঠকরিয়া পরমপরিতুষ্ট হন। উহাকে আরও বিশোধিত ও সুমধুর করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় সভাসদ ভারতচন্দ্ররায়গুণাকরের হস্তে সমর্পণ করেন। রায়গুণাকর উহা বিশোধিত না করিয়া ঐ মনোরম উপাখ্যানকে অস্থিস্বরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক মাংসাদি যোজনা করিয়া নিজে এক বিদ্যাসুন্দর লেখেন এবং তাহা কৌশলক্রমে অন্নদামঙ্গলের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেন এবং রচনামুখে উপাখ্যানাংশেও যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করেন। সে পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ এই—কবিরঞ্জনের হীরামালিনী, বিদ্যা ও সুন্দরের পরস্পর সন্দর্শনাদির পর তাঁহারা যেরূপে গোপনে মিলিত হইয়াছিলেন, তৎসমস্ত অবগত ছিল—রায়-গুণাকরের মালিনী সমাগমের বিষয় কিছুই জানিত না এবং কবিরঞ্জন বিদ্যার গৃহে ও শয্যায় সিন্দুর মাখাইয়া চোর ধরিবার উপায় করিয়াছিলেন; রায়গুণা-কর বিদ্যাকে বাসগৃহ হইতে স্থানান্তরে পাঠাইয়া কোটাল ও তাহার ভ্রাতাদিগকে স্ত্রীবেশে সেই গৃহে রাখিয়া মহা রসিকতা সহকারে চোরকে গ্রেফ্তার করিয়াছিলেন। তাদৃশ সুন্দরের পরিচয় দিবার জন্য শারীশুক দুইটি

গুণাকরের নিজের পক্ষী। এ ছাড়া আর আর যে বিভিন্নতা আছে তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে।

এস্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানটি রামপ্রসাদেরও স্বকপোলকল্পিত নহে। অনেকের বিশ্বাস এই যে, বররুচিকৃত একখানি প্রাচীন পুস্তক আছে। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান তাহাতে বর্ণিত আছে। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কোথাও সে পুস্তক পাইলাম না। "সুন্দরকাব্য" নামে দ্বাদশসর্গে বিভক্ত একখানি সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা বররুচিকৃত প্রাচীন গ্রন্থ নহে—একজন আধুনিক বঙ্গদেশীয় কবির বিরচিত। ঐ গ্রন্থে কবিত্বশক্তির পরিচয় বিলক্ষণ আছে, কিন্তু উপাখ্যানাংশে তত বৈচিত্র্য নাই—তজ্জন্য উহা রামপ্রসাদ বা ভারত-চন্দ্রের গ্রন্থ দেখিয়া রচিত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা যায় না। যেহেতু তাহা হইলে উঁহাদের গ্রন্থে উপাখ্যানাংশে যে সকল বৈচিত্র্য আছে, তাহা তিনি কখনই ছাড়িতেন না। বরং এরূপও কতক বোধ হয় যে, রামপ্রসাদ ঐ গ্রন্থ বা ঐরূপ কোন গ্রন্থ দেখিয়াই কবিরঞ্জন রচনা-করিয়াছিলেন; কারণ ঐ উভয় পুস্তকের অনেক অংশে ঐক্য আছে। স্থূলকথা এই যে, উক্ত গ্রন্থবর্ণিত উপাখ্যানের সহিত বিদ্যাসুন্দরের চলিত উভয়বিধ উপাখ্যানেরই বৈলক্ষণ্য নাই। তবে হীরার স্থলে বিমলা, গঙ্গা-রামের স্থলে মাধব, বাঘাইএর স্থলে বাঘব ইত্যাদি কয়েকটি নামঘটিত যাহা বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু চোরধরা প্রকরণে কবিরঞ্জন ও গুণাকরের যে দুইরূপ কৌশল আছে, ঐ সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরে তাহার কোনরূপই নাই। সুন্দর ও বিদ্যার পরিচয়দানস্থলে ও বিচার-সময়ে উক্ত বাঙ্গালা দুই বিদ্যাসুন্দরেই যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হই-য়াছে—উহাতে সে শ্লোকগুলি নাই, কিন্তু সে স্থলে অপরবিধ শ্লোক রচিত হইয়াছে। 'চোরপঞ্চাশৎ' নামক শ্লোকের একটিও উহাতে নাই—তবে ২।৪টি কবিতায় চোরপঞ্চাশদ্বর্ণিত কোন কোন শ্লোকের ভাব লক্ষিত হয় এই মাত্র।

সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের আরও একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক আমরা

পাইয়াছি—এ খানি অতি ক্ষুদ্র, ইহাতে কোন পর্ব্বতে অবস্থিত রাজকন্যা বিদ্যার সহিত সুন্দরের উক্তি প্রত্যুক্তি, উভয়ের গোপনে সমাগম, বিহার ও রাজসমীপে তাহা প্রকাশিত হওয়ায় সুন্দরের প্রতি দণ্ডদানোদ্যম পর্য্যন্ত ৭৬টি শ্লোকে বর্ণিত আছে। বর্দ্ধমান, বীরসিংহ, সুড়ঙ্গ প্রভৃতির কোন কথা নাই। এ পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই, কিন্তু ইহা বররুচিপ্রণীত সেই পুস্তক কি না তদ্বিষয়ে আমাদের সংশয় আছে। যাহাহউক, রচনা-দৃষ্টে এখানিকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় না। সুন্দরের পরিচয় ও বিচার স্থলে পূর্ব্বোক্ত দুই ভাষাপুস্তকেই যে সংস্কৃত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহাতেও সেগুলি এবং সেইরূপ আরও কতকগুলি আছে—সুতরাং ঐ শ্লোকগুলি ভাষাপুস্তকরচয়িতার যে, কাহারও নিজের রচিত নহে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলকথা সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে—যে, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র কাহারও স্বকপোলকল্পিত নহে। অবশ্যই উহার কোন প্রাচীন মূল ছিল। কিন্তু সেই মূল গ্রন্থখানি কি তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। "বররুচি-বিরচিতং সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরম্" নামে যে একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, উহা আমাদিগের উল্লিখ্যমান এই গ্রন্থই প্রায় অবিকল। কেবল উহাতে চোরপঞ্চাশৎটি অধিক আছে। আমাদের নিকটস্থিত হস্তলিখিত পুস্তকে চোরপঞ্চাশতের শ্লোকগুলি একবারে নাই।

অনেকে কহিয়া থাকেন যে, রামপ্রসাদের পূর্ব্বেও প্রাণরামচক্রবর্ত্তী নামে এক কবি বররুচিপ্রণীত প্রাচীনগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া 'কালিকামঙ্গল' নামে এক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন;* তাহাতেও বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান

---

* শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু কিন্তু অন্যরূপ লিখিয়াছেন :—

"ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী আর দুইখানি বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ভারতের পদলালিত্য ও অপূর্ব্ব শব্দমন্ত্র নাই, কিন্তু দোষগুলি সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান। এই দুইখানি বিদ্যাসুন্দর প্রণেতা—কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ। প্রাণরাম নামক এক কবি ভারত-চন্দ্রের পর আর একখানি বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়েকটি কথা আছে :—

বর্ণিত আছে। রামপ্রসাদ সেই উপাখ্যানকে আদর্শ করিয়া কবিরঞ্জন রচনা করেন—কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, আমরা বিবিধ চেষ্টা করিয়াও কোথাও 'কালিকামঙ্গলের' একখণ্ড পাইলাম না—সুতরাং সে বিষয়ে কোন কথা বলিতে পারা গেলনা। কিন্তু এস্থলে একথা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, কবিরঞ্জন নিজগ্রন্থমধ্যে রাজসমক্ষে বিস্তার রূপাদি বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে পাঁচটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, এবং ভারতচন্দ্র ঐ স্থলে যে ৫০টি শ্লোক 'চোরপঞ্চাশৎ' নামে তুলিয়া তাহার দুই পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঐ শ্লোকগুলি বর্দ্ধমানস্থিত সুন্দরচোরের রচিত নহে। ঐ সকল শ্লোক 'চোর' নামক একজন কবির রচিত। জয়দেব স্বরচিত 'প্রসন্নরাঘব' নাটকের প্রথমে ঐ চোরের নামোল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

যস্যাশ্চোরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো হাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃকালিদাসো বিলাসঃ
হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কৌতুকায় ॥

"যার শিরে শোভে 'চোর' চিকণ চিকুর। 'ময়ূর' যাহার কর্ণে মণিকর্ণপূর ॥
"হাস' যার হাস, 'হর্ষ' হর্ষের প্রকাশ। কবীন্দ্র শ্রীকালিদাস যাহার বিলাস ॥
পঞ্চবাণ 'বাণ' যার হৃদয়মাঝারে। কবিতাকামিনী হেন না ভুলায় কারে ॥"

(রহস্য সন্দর্ভ)

এ ভিন্ন আরও প্রাচীন শ্লোক আছে—যথা—

"কবি রময়ঃকবি রমরুঃ কবী চোরময়ূরকৌ"। ইত্যাদি।

"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।
বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস ॥
তাঁহার রচিত পুঁথি আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই।
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদা মঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে ॥"

(প্রাণরামের বিদ্যাসুন্দর)

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, ৫৮৫।

যাহাহউক, ঐ চোরকবির প্রকৃতনাম 'বিহ্লণ'; তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের সমীপস্থ কোন দেশে ৮০০ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেম। ঐ দেশের কোন রাজকন্যার অধ্যাপনাকার্য্যে তিনি ব্রতী ছিলেন। ক্রমে উভয়ের প্রণয়বন্ধ হওয়ায় গোপনে গান্ধর্ব্ববিবাহ হয়—রাজা তাহা জানিতে পারিয়া বিহ্লণকে বধকরিবার জন্য শ্মশানে পাঠাইলে তিনি তথায় বসিয়া ঐ সকল শ্লোক রচনা করেন।* এক্ষণে কালিকামঙ্গলকারই হউন, বা রাম-প্রসাদই হউন প্রথমে ঐ শ্লোক তাঁহাদের বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগী দেখিয়া নিজগ্রন্থমধ্যে নামান্তরে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন।

কবিরঞ্জন কাব্যে বর্ণিত বিষয়—কবিরঞ্জন গ্রন্থমধ্যে পুষ্পচয়নানন্তর সুন্দরসমীপাগতা হীবামালিনীর চরিত্র, চোরান্বেষণসময়ে বিদু ব্রাহ্মণীর বিদ্যাসন্নিধানে যাইয়া কথারম্ভ, কোটালচরগণের বৈষ্ণব ফকির উদাসীন প্রভৃতির বেশধারণ প্রসঙ্গে উহাদিগের আভ্যন্তরিক অবস্থা, চৌরদর্শনে নাগরিকদিগের মনের ভাব প্রভৃতি অতি প্রকৃষ্টরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন—

"কাল কব পৃথক্ চিন্ত হে মনে এই। লকারে ঈকার দীর্ঘ অসি বটে সেই॥"
"যৌবনজলধিমধ্যে মগ্ন মত্তগজ। উরে দৃষ্ট কুম্ভস্থল নহে সে উরজ॥"
"ভূতলে আছাড়ে গা, কপালে কঙ্কণ ঘা, বিন্দু বিন্দু বহে পড়ে রক্ত।
তাহে শোভা চমৎকার, অশোক কিংশুক হার, গাঁথা চান্দে দিল যেন ভক্ত॥"
"কোন্ ধর্ম্ম, হেন কর্ম্ম, পোড়ে মর্ম্ম, গাত্রচর্ম্ম, দিয়া দিব পাদুকা চরণে।
হৃদয়েশ, এই বেশ, পায় ক্লেশ, কৃপা লেশ, কর ভাই অকাল মরণে।"

এইরূপ ভূরি ভূরি স্থলে তিনি যে, কতই ভাবুকতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্থানেস্থানে তাঁহার স্বভাবোক্তিবর্ণন যে কিরূপ সুমধুর হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বিদ্যাপতির রচনার ন্যায় 'কৈসন' 'যৈসন' ইত্যাদি হিন্দি-শব্দমিশ্রিত এবং মাধবভাট প্রভৃতির উক্তিতে শুদ্ধ হিন্দি গ্রথিত বর্ণনাও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে রামেশ্বরের যে শিবসঙ্কীর্ত্তনের বিষয় উল্লিখিত

---

* রহস্যসন্দর্ভের ১ম পর্ব্বের ১১শ খণ্ডে এবিষয় সবিস্তর বর্ণিত আছে।

হইয়াছে, তাঁহার রচনায় যেরূপ অনুপ্রাসচ্ছটা লক্ষিত হয়, ইহার রচনায়ও প্রায় সেইরূপ। উদাহরণস্বরূপ নিম্নভাগে কয়েকটি উদ্ধৃত হইল—

"ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দুশোভায়। লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দৃশ্য হয়॥"

"সিংহাসনে নরসিংহ বীরসিংহ রায়। তপ্ত-তপনীয়-তনু তারাপতি প্রায়॥"

"নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে। অসম্বর অম্বর, অম্বর পড়ে শিরে॥"

"শিরে হানি পাণি রাণী বলে কব কি। শুন পর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব গর্ভবতী ঝী।' ইত্যাদি।

এইরূপ অনুপ্রাসানুসন্ধানের জন্যই হউক বা যে কারণেই হউক রামপ্রসাদের রচনা সকলস্থলেই ললিত কোমল ও সুমধুর হয় নাই। অনেকস্থলে অসুন্দর ও কর্কশ লাগে এবং কয়েকস্থলে নিতান্ত গ্রাম্য ও অশ্লীল বর্ণনাও আছে। তিনি নিজেই একস্থলে প্রকারান্তরে গর্ব্ব করিয়াছেন—

"কালীকিঙ্করের কাব্যকথা বোঝা ভার। সে বোঝে অক্ষরকালী হৃদে আছে যার॥"

একথাও যথার্থ বটে; তাঁহার কাব্যের অনেক স্থান সকলের বোধগম্য হয় না। কিন্তু সেরূপ অবিশদ রচনা কবির প্রশংসা বা অপ্রশংসার বিষয়, তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন। তিনি কয়েকস্থলে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু অনুবাদগুলি এতই অস্পষ্ট যে, যাঁহারা সেই মূল শ্লোক না জানেন, তাঁহাদের উহা বোধগম্য হয় না।

ছন্দ—পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থের সমালোচনা হইয়াছে, তৎসর্ব্বাপেক্ষা কবিরঞ্জনে অধিক প্রকার নূতন ছন্দ আছে। পয়ার, মালঝাঁপ, দীর্ঘ ও ভঙ্গত্রিপদী, চতুষ্পদী, তোটক, একাবলী, দিগক্ষরা এবং আরও দুই একটি নূতনরূপ ছন্দ ইহাতে লক্ষিত হয়। তন্মধ্যেও অক্ষর, মাত্রা ও মিলের বৈষম্যাদি দোষও দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের আদেশে কবি 'কালীকীর্ত্তন' রচনা আরম্ভ করেন। ইহা তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

'শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন
রচে গান মোহান্ধের ঔষধ অঞ্জন॥"

কালীকীর্ত্তনের রচনা মহাকাব্যের মত সুশৃঙ্খলরূপে নিবদ্ধ নহে—উহার

অধিকাংশই কেবল গানময়। অন্য ছন্দোরচিতও যাহা আছে, তাহাতে অক্ষর-বৈষম্য অত্যন্ত অধিক। কিন্তু ঐ সকল গীতে যে অতি উৎকৃষ্ট ভাব আছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। গান স্বরসংযোগে গাইলে যেরূপ মিষ্ট লাগে, কথায় বলিলে সেরূপ লাগে না; অতএব সঙ্গীতশক্তিসম্পন্ন পাঠক মহাশয়দিগের নিকট আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা গাইয়া দেখিবেন যে, রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন কিরূপ মধুর পদার্থ। উহার একটি গীত এই—

গিরিবর! আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তনপান, নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, বলে উমা, ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অঙ্গুলি, যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কিরে ধরা যায়, ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে॥
উঠে বোসে গিরিবর, করি বহু সমাদর, গৌরীরে লইয়া কোলে করে।
সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী, মুকুর লইয়া দিল করে॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ, বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥

রামপ্রসাদের তৃতীয় কাব্য কৃষ্ণকীর্ত্তন; দুঃখের বিষয় এই যে ইহার সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় না। কতিপয় পংক্তিমাত্র পাওয়া গিয়াছে, তৎপাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে উহা কালীকীর্ত্তন অপেক্ষা নিকৃষ্ট কাব্য নহে। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বহু অনুসন্ধানেও উহার কয়েকটি শ্লোক বই বাহির করিতে পারেন নাই। অতএব তাহার সমালোচনা করার আর প্রয়োজন হইতেছে না। যাহা হউক, এবিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া নিম্নভাগে কয়েকটি রামপ্রসাদী সঙ্গীত লিখিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম—

"মন কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব জমিন্ রইল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌তো সোণা।
কালীনামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া তার কাছেতে যম ঘেঁসেনা।

আদ্য অষ্টশতান্তেবা বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন ভেবে (মন রে আমার) যতন করে, চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তিবারি তায় সেঁচ না।
ওরে একলা যদি না পারিস মন্, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা" ॥১॥

"মা আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত॥
বেঁধে দিয়ে মা ভবের গাছে, পাক দিতেছ অবিরত——

* * * *

একবার খুলে দেমা চোখের ঠুলি, হেরি তোর ঐ অভয়পদ" ॥২॥
"এবার কালি তোমায় খাব। (খাবগো ও দীনদয়াময়ি।)

এবার তুমি খাও কি আমি খাইমা, দুটার একটা করে যাবো।
হাতে কালী মুখে কালী, সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব,
যখন আস্‌বে শমন বাঁধবে কসে, সেই কালী তার মুখে দিব" ॥৩॥
"এবার আমি বুঝ্‌বো হরে।
মায়ের ধর্‌বো চরণ, লব জোরে।
ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বল্‌বো এবার যারে তারে।
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ হৃদে ধরে কোন্ বিচারে ?
মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন্ বিচারে ?
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দিক্ আমারে" ॥৪॥

ঠুংরি।

"এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে, দুনয়নে পড়্‌বে ধারা॥
হৃদিপদ্ম উঠ্‌বে ফুটে, মনের আঁধার যাবে টুটে।
তখন ধরাতলে পড়্‌বো লুটে, তারা ব'লে হবো সারা॥

ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওবে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা॥
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজেন সর্ব্ব ঘটে।
ওবে অন্ধ আঁখি দেখ মাকে তিমিরে তিমির হরা” ॥৫॥

মধ্যকালেব বিববণে আমবা বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত হইতে আরম্ভ কবিয়া কবিবঞ্জনেব বিদ্যাসুন্দব পর্য্যন্ত এক প্রকার সমালোচনা করিলাম। ঐ কালেব মধ্যে আমাদিগেব সমালোচিত কয়েকখানি ভিন্ন যে আর কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই, একথা কে বলিতে পাবে? আমবাই কয়েকখানি গ্রন্থেব সন্ধান পাইয়াও অনাবশ্যকবোধে সমালোচনা কবি নাই। তদ্ভিন্ন হয়ত অনেক মহাশয়-বচিত অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিযাছে, অথবা বিদ্যমান থাকিতেও আমবা অনেক গ্রন্থেব সন্ধান পাই নাই। যাহা হউক, মধ্যকালে ভাষাব অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা যথাক্রমে সমালোচিত তত্তদ্‌গ্রন্থেব বিবরণেই একপ্রকাব ব্যক্ত হইয়াছে। চৈতন্যভাগবত—কবিকঙ্কণ—মহাভাবত ও কবিবঞ্জনবিদ্যাসুন্দবেব ভাষা একরূপ নহে। উহা যে ক্রমে ক্রমে মার্জ্জিত, বিশদ ও অধিক সংস্কৃতশব্দগর্ভক হইয়া আসিতেছে, তাহা স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পাবা যায। কিন্তু এস্থলে ইহাও বিবেচনা কবিতে হইবে যে, ঐ সময়েব যে ভাষা আমাদেব দৃষ্টিগোচব হইতেছে, তৎসমুদয়ই পদ্যময়। পদ্য দেখিয়া ভাষাব অবস্থা সম্যক্‌রূপে বোঝা যায় না; কাবণ যে সকল কথা লোকে কথোপকথনে ব্যবহাব কবে না, পদ্যমধ্যে তাদৃশ অনেক কথাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব ভাষাব বিষয়ে বিবেচনা কবিতে হইলে শুদ্ধ পদ্য গ্রন্থেব উপব নির্ভব না কবিয়া গদ্যগ্রন্থেব প্রতিও দৃষ্টিপাত কবা কর্ত্তব্য। কিন্তু মধ্যকালেব গদ্যগ্রন্থ আমবা একখানিও দেখিতে পাই নাই। ‘ত্রিপুবাব রাজমালা’ ঐ কালেব মধ্যে বচিত হয়—কিন্তু উহাও বঙ্গীয় পদ্যে লিখিত হইয়াছিল। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মধ্যকালেও গদ্যগ্রন্থ প্রায় হয় নাই। ভাষার প্রতি দেশবাসী লোকদিগেব যেরূপ আস্থা জন্মিলে এবং ভাষার যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইলে গদ্যগ্রন্থে লোকের অনুরাগ জন্মে, মধ্যকালে তাহার কিছুই হয় নাই—হইলে ঐ কালেব মধ্যে কেহ না কেহ অবশ্য বাঙ্গালা ভাষাব কোন ব্যাকরণ রচনা

করিতেন—কিন্তু তাহা কেহই করেন নাই। কোন বাঙ্গালা অভিধানও এ কালের মধ্যে রচিত হয় নাই; সুতরাং এ অংশে আদ্যকাল ও মধ্যকালের কিছু-মাত্র বৈলক্ষণ্য নাই।

তবে এই কালের মধ্যে ছন্দের অনেক পারিপাট্য হইয়াছে—কিন্তু সে পারিপাট্যও প্রথমে হয় নাই। কবিকঙ্কণের সময়ে কিছু হইয়াছিল বটে, কিন্তু মধ্যকাল ও ইদানীন্তন কালের যে সন্ধিস্থল—রামপ্রসাদের কাল—তাহাতেই উহার প্রচুরপরিমাণ লক্ষিত হইতেছে। রামপ্রসাদের রচনাতেও প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় মিলের দোষ দেখিতে পাওয়া যায়—যথা মগ্নি—হই; কি—ঝী; থো—পো ইত্যাদি। এই মিলদোষজন্যই রামপ্রসাদ ভারত-চন্দ্রের সমসাময়িক হইলেও ইঁহাকে আমরা মধ্যকালের শেষে এবং ভারতচন্দ্রকে ইদানীন্তন কালের প্রথমে স্থান দিলাম—নচেৎ ইঁহাদিগকে একস্থানে বসাইলেই চলিত। যাহা হউক এই কালে যে সকল নূতন ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবিরঞ্জনের তোটকটি কেবল সংস্কৃতের অনুকৃতি —উহার প্রতি চরণ দ্বাদশঅক্ষর ঘটিত এবং প্রতি তৃতীয় অক্ষর গুরু। তদ্ভিন্ন আর সকল ছন্দই পয়ার ও ত্রিপদীর রূপান্তর মাত্র। পয়ারেরই প্রতি চতুর্থ বর্ণে মিল ও যতি থাকিলে মালঝাঁপ, কয়েকটি বর্ণ কমাইয়া দিলে একাবলী; ত্রিপদীরই পূর্ব্বার্দ্ধের প্রথম দুই চরণ না থাকিলে ভঙ্গ-ত্রিপদী প্রভৃতি হইয়া থাকে। ঐ মালঝাঁপপ্রভৃতি নাম সকল প্রাচীন নহে; বোধ হয় প্রথম কবিরা রচনাসময়ে ওরূপ নাম করেন নাই—অক্ষর, যতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তনাদি করিলে আর এক প্রকার নূতন মিষ্ট ছন্দ হয়, দেখিয়া তাঁহারা ঐ সকল ছন্দের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী লোকেরা ঐ সকলের অর্থানুরূপ নামকরণ ও লক্ষণ স্থির করিয়া তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ইদানীন্তনকাল।

আদ্য ও মধ্যকালের গ্রন্থ সমূহের সমালোচনা কালে তত্তদ্‌গ্রন্থের রচয়িতা-দিগের জীবনী সংগ্রহে আমরা কিছু বিশেষ যত্ন করিয়াছি; কারণ ঐ সকল গ্রন্থকারের জীবনবৃত্ত সাধারণতঃ দুর্জ্ঞেয়; অথচ তাহা জানিতে সকলেরই কৌতূহল জন্মে। কিন্তু ইদানীন্তনকালের গ্রন্থকারদিগের জীবনবৃত্ত লোকের তত দুর্জ্ঞেয় নহে; বিশেষতঃ তাঁহাদের সংখ্যাও অধিক—অতএব এ পরিচ্ছেদ-মধ্যে গ্রন্থকারমাত্রেরই সবিস্তর জীবনবৃত্ত দিতে আমরা সমর্থ হইব না—গ্রন্থকারগণ তজ্জন্য আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালাগ্রন্থের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। সেই সকলগুলিই যদি গ্রন্থের মত গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে এই অবস্থাকে ভাষার যারপর নাই সৌভাগ্যের অবস্থা মনে করা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহা নহে—তাদৃশ গুণজ্ঞান থাকুক না থাকুক, যাহা কিছু একটা লিখিয়া ও ছাপাইয়া প্রকাশকরা এক্ষণকার অনেকের রোগ দাঁড়াইয়াছে। স্কুলের অনেক দুগ্ধপোষ্য বালকেও গ্রন্থকার হইবার অভিমানে মত্ত হইয়াছে—যে কোনরূপে হউক কোন পুস্তকের টাইটেল্‌পেজের উপর মুদ্রিতনাম বাহির করিতে পারিলেই অনেকে জীবন সার্থক মনে করিতেছে। এইরূপে যে সকল গ্রন্থ বহির্গত হইতেছে, সে সকল গ্রন্থ কিছু সাধারণের পাঠ্য হইবে না এবং অধিককাল স্থায়ীও হইবে না—দিনকত পরেই কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে; বিশেষতঃ তন্মধ্যে এমত সকল গ্রন্থও আছে, যাহা একবারে নিতান্ত পূতিগন্ধি গলদেগামায়। পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা সে সকলে হস্তক্ষেপ করিব।

৺ভারতচন্দ্ররায়ের অন্নদামঙ্গল আদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত রামপ্রসাদ সেনের সমকালেই এই মহাকবি প্রাদুর্ভূত হন। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী ভূরশুট পরগণাস্থ 'পেঁড়ো বসন্তপুর' নামক গ্রামে অনুমান ১৬৩৪ শকে (১৭১২ খৃঃ অব্দে) ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে ভারতচন্দ্র সর্ব্বকনিষ্ঠ। নরেন্দ্রনারায়ণ একজন বিখ্যাত জমীদার ছিলেন, কিন্তু বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জননীর সহিত কোনরূপ বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি উক্ত রাণীকর্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হন। ভারতচন্দ্র এই সময়ে বাটী হইতে পলায়ন করিয়া মাতুলালয় 'নওয়াপাড়া' গ্রামে গমনপূর্ব্বক তথায় সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধানাদি অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাঁহার বিবাহক্রিয়াও সম্পন্ন হয়। তৎকালে পারসী অর্থকরী বিদ্যা ছিল; তাহা না পড়িয়া অকেজো সংস্কৃত অধ্যয়ন করায় তাঁহার জ্যেষ্ঠেরা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন; এজন্য তিনি অভিমানবশতঃ পুনর্ব্বার বাটী হইতে পলাইয়া হুগলীর সমীপস্থ দেবানন্দপুরগ্রামে মুন্সী-বাবুদিগের বাটীতে অবস্থিতিপূর্ব্বক পারস্যভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

ভারত যে, নিগূঢ় কবিত্বরত্নের আকর, ইহার পূর্ব্বে তাহা কেহই জানিত না। তিনিও এপর্য্যন্ত রীতিমত কোনরূপ রচনাই করেন নাই। একদা ঐ বাবুদিগের বাটীতে সত্যনারায়ণের সির্ণি উপস্থিত হওয়ায় ভারতচন্দ্রই পাঁচালী পড়িবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি পররচিত পাঁচালী পাঠ না করিয়া নিজেই ত্রিপদীচ্ছন্দে এক পাঁচালী রচনা করিয়া সভামধ্যে পাঠ করিলেন। তাহা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই চমৎকৃত হইলেন এবং ভারতের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে আর একবার তথায় সির্ণি দেওয়ার ব্যাপার উপস্থিত হইলে ভারত পূর্ব্বরচিত পাঁচালী পাঠ না করিয়া চৌপদীচ্ছন্দে হিন্দিমিশ্রিত অপর এক পাঁচালী

রচনা করিয়া পাঠ করেন। এই উভয় পাঁচালীরই শেষভাগে ভারতের পরিচয়াদি প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

—"দেবানন্দপুর গ্রাম, দেবের আনন্দ ধাম, হীরারাম রায়ের বাসনা॥

ভারত ব্রাহ্মণ কয়, দয়া কর মহাশয়, নায়েকেরে গোষ্ঠীর সহিত।

ব্রতকথা সাঙ্গ হল, সবে হরি হরি বল, দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত" ॥—তথা

"ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ, সদাভাবে হতকংস, ভূরশূটে বসতি।
নরেন্দ্ররায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত, ফুলের মুখুটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি॥
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম, তাহে অধিকারী রাম-রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্ররায়, দেশে যার যশ গায়, হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী॥
সবে কৈল অনুমতি, সঙ্ক্ষেপে করিতে পুঁতি, তেমতি করিয়া গতি, না করি ও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয়, হরি হোন্ বরদায়, ব্রত কথা সাঙ্গপায়, সনে রুদ্র চৌগুণা"॥ (১১৩৪)

যৎকালে এই পাঁচালী রচিত হয়, তৎকালে ভারতের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসরের অধিক নহে *। এরূপ অল্প বয়সে এতাদৃশ মনোহর রচনা করিতে দেখিয়া "উঠন্তি মুলো পত্তনে চেনা যায়" ন্যায়ে সকলেই অনুমান করিয়াছিলেন যে, ভারতচন্দ্র ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ কবি হইবেন।

পারস্যভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া বাটী গমন করিলে পর ভারতচন্দ্রের জ্যেষ্ঠেরা তাঁহাকে সর্ব্বকর্ম্মে সুনিপুণ বোধ করিয়া আপনাদিগের ইজারা লওয়া বিষয়ের খাজনাদাখিলাদি কার্য্যের তত্ত্বাবধানকরণার্থ মোক্তারস্বরূপ করিয়া বর্দ্ধমান রাজ-ভবনে প্রেরণ করেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহাদের সেই ইজারাসংক্রান্ত বিষয়ের খাজনা দাখিল না হওয়ায় গোলযোগ উঠে এবং সেই গোলযোগে ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানরাজকর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হন। ভদ্রলোকের পক্ষে কারাবাস যে কিরূপ ক্লেশ-কর, তাহা বর্ণন করা বাহুল্য। ভারতচন্দ্র কিছুদিন সেই ক্লেশ সহ্য করিয়া কারাধ্যক্ষের অনুকূলতায় তথা হইতে পলায়ন করেন—এবং রাজার অধিকার

* ঈশ্বর গুপ্ত ১২৬১ সালে লিখিয়াছেন:—"আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা কতিপয় প্রামাণ্য লোকের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলাম, যৎকালে ঐ পুস্তক (সত্যপীরের কথা) প্রচারিত হয়, তৎকালে পুস্তককারকের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই"।

যত দূর ছিল, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক একজন নাপিত ভৃত্য সমভিব্যাহারে একবারে কটকে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য মহারাষ্ট্র সুবাদার শিবভট্টের আশ্রয় লন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া কিয়ৎকাল পুরুষোত্তমে যাইয়া বাস করেন। তথায় তিনি শ্মশ্রুধারণ, গেরুয়াবস্ত্র-পরিধানপ্রভৃতি উদাসীনের বেশ পরিগ্রহ করিয়া বৈষ্ণবদিগের দলে মিশিয়াছিলেন। কিয়দ্দিনান্তর তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের সহিত বৃন্দাবনযাত্রা করিয়া পথিমধ্যে একদিন খানাকুল কৃষ্ণনগরগ্রামে উপস্থিত হইলেন। ঐ গ্রামে তাঁহার শালীপতিভ্রাতার বাটী, ইহা ঐ ভৃত্য অবগত ছিল। সে গোপনে তাঁহাকে সংবাদ দেওয়ায় তাঁহারা অনেকে আসিয়া ভারতকে ধরিলেন এবং নানারূপ বুঝাইয়া উদাসীনবেশ অপনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে সংসারধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিলেন। অনন্তর ভারত শ্বশুরালয়ে গমনপূর্ব্বক পরমানন্দসহকারে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলেন এবং পত্নীকে সেই স্থানেই রাখিয়া পুনর্ব্বার বহির্গত হইয়া ফরাসডাঙ্গার ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট আসিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিলেন।

দেওয়ানজী ভারতের বিদ্যাবুদ্ধি ও কবিত্বদর্শনে সাতিশয় প্রীত হইলেন, কিন্তু ফরাসীদের গৃহে কর্ম্মকাজ করিয়া দিলে তাঁহার প্রকৃত গুণের প্রকাশ হইবে না, এইজন্য তাহা না দিয়া কৃষ্ণনগরের রাজা পরমগুণজ্ঞ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। এতদিনের পর ভারতচন্দ্রের অন্তরায়মেঘ অপগত হইল—এখন তাঁহার সুবিমল প্রভা দিন দিন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। গুণজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার গুণের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে 'গুণাকর' এই উপাধি দিলেন এবং মাসিক ৪০৲ টাকা বেতন নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সভাসদরূপে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। এক্ষণে গুণাকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন এবং রাজার অনুমতি অনুসারে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর অনুকৃতিরূপে অন্নদামঙ্গলের রচনা করিলেন এবং তাহারই মধ্যে পরমকৌশলসহকারে বিদ্যাসুন্দরের ও মানসিংহের উপাখ্যান যোজনা করিয়া দিলেন। এই গ্রন্থ ১৬৭৪ * শকে (১৭৫২ খৃঃ অব্দে) সমাপ্ত হয়। তৎপরে তিনি

* বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা। সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

'রসমঞ্জরী' নামে আর একখানি কাব্যরচনা করেন, এবং "আ আরে বসন্ত" "আ আরে বর্ষা" "আ আরে বাসনা" "আ আরে মামী" "আ আরে ভাগিনা" "বাহ-বারে হাওয়া" "পায় পায় পায়না" "পায় পায় পায়" "ধেড়ে" প্রভৃতি সমস্যা সকল পূরণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনা যে কতই করেন, তাহার সংখ্যা নাই। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালা হিন্দি ও সংস্কৃতমিশ্রিত "চণ্ডী নাটক" নামক এক-খানি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় যে, উহা সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ নিযুক্ত হন এবং ৪৮ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৬৮২ শকে ১৭৬০ খৃঃ অব্দে বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালেই তিনি আপন ইচ্ছা ও রাজার অনুমতি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর বাটীর সমীপে ফরাসডাঙ্গার পরপারবর্ত্তী মূলা-জোড় নামক গ্রামে বাটী নিৰ্ম্মাণ করিয়া সেইখানেই পরিবারাদি আনয়নপূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন। রাজা ঐ গ্রামখানি প্রথমে তাঁহাকে ইজারা দেন; পরে কোন কারণবশতঃ বর্দ্ধমানরাজের একজন কর্ম্মচারী রামদেব নাগকে উহা পুন-র্ব্বার ইজারা দিতে হইয়াছিল। উক্ত নাগ ভারতচন্দ্র ও অপরাপর লোকের প্রতি অত্যাচার করায় গুণাকর নাগাষ্টক নামে ৮টী সংস্কৃত শ্লোকদ্বারা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট নিজ দুঃখ নিবেদন করিয়াছিলেন। এই সকল শ্লোকে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এভিন্ন তাঁহার রচিত আরও অনেক-গুলি সংস্কৃত শ্লোক আছে, তন্মধ্যে পঞ্চচামর ছন্দে একটি গঙ্গাষ্টক আছে। উহা রহস্যসন্দর্ভের প্রথম পর্ব্বস্থ নবম খণ্ডের ১৩৯ পত্রে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ছাড়া পারসী হিন্দি শ্লোকও তিনি রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার গ্রন্থমধ্যেও স্থানে স্থানে ইহার নিদর্শন আছে। পূর্ব্বোক্ত মূলাজোড় গ্রামেই ভারতচন্দ্রের বংশীয়েরা বাস করিতেছেন।

অন্নদামঙ্গল—রায়গুণাকরের গ্রন্থের মধ্যে অন্নদামঙ্গল বৃহৎ ও প্রধান। এই গ্রন্থের তিনটি ভাগ আছে। তন্মধ্যে প্রথমভাগে দেবদেবীর বন্দনা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিপ্রকরণ, দক্ষযজ্ঞ, হরপার্ব্বতীর বিবাহ, শিবের ভিক্ষা পর্য্যন্ত

যাহা যাহা বর্ণিত আছে, তাহা কবিকঙ্কণ চণ্ডীর অনুকৃতি। তৎপরে—অন্নপূর্ণা-মাহাত্ম্য, কাশীনির্ম্মাণ, ব্যাসদেবের আচরণ, তাঁহার অপর কাশীনির্ম্মাণচেষ্টা, ব্যাসের প্রতি অন্নপূর্ণার ছলনা প্রভৃতি বর্ণন সকল কিয়ৎপরিমাণে কাশীখণ্ডমূলক। অনন্তর বসুন্ধরে অন্নদার শাপ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, নলকূবরে দেবীর শাপ, ভবানন্দ মজুন্দারের জন্মবিবরণ, হরিহোড়কে ত্যাগ করিয়া অন্নপূর্ণার ভবানন্দ-ভবনে গমন ইত্যাদি বিবরণ সকল কবির স্বকপোলকল্পিত। এই ভবানন্দ মজুন্দারকে দেবাংশ বলিয়া বর্ণন করা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল; কারণ তাঁহার দেবাংশতা প্রথিত হইলে মহারাজের বংশের গৌরব হয়—যেহেতু মহারাজ উক্ত ভবানন্দ মজুন্দারেরই বংশীয় এবং উঁহার অত্যতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র।

যাহা হউক, যদিও এই প্রথম ভাগ্যের অনেক স্থলেই ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের চণ্ডী এবং বোধ হয় কোন কোন স্থলে রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্ত্তন হইতেও অস্থি সঙ্কলন করিয়া তদুপরি মাংসযোজনা করিয়াছেন—তথাপি ইহাতেও তাঁহার সামান্য কবিত্ব ও সামান্য পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় নাই। উভয় গ্রন্থের সেই সেই স্থল পাঠ করিয়া দেখিলেই বিলক্ষণ অনুভব হইবে। এই গ্রন্থস্থ দক্ষকৃত শিবনিন্দা শিবের দক্ষালয়ে গমন, দক্ষযজ্ঞনাশ, শিববিবাহের সম্বন্ধ, রতিবিলাপ, নারীগণের কন্দল, শিবনিন্দা, হরগৌরীর কন্দল, শিবের ভিক্ষা প্রভৃতি বর্ণনগুলি যে কিরূপ সুন্দর ও কিরূপ মধুর হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ঐ সকল স্থান যখন পাঠ করা যায়, তখনই নূতন বোধ হয়। বিশেষতঃ দক্ষযজ্ঞপ্রসঙ্গে ভুজঙ্গ-প্রয়াত ও তূণক ছন্দটী যে, কিরূপ উপযুক্তস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ঐ স্থলের কিরূপ চমৎকারিতা জন্মিয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নহে। আমরা কালিদাসকৃত রতিবিলাপ পাঠ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতেও—

"শিবের কপালে রয়ে, প্রভুবে আহুতি লয়ে, না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে, আগুনের কপালে আগুন॥"
"অরে নিদারুণ প্রাণ, কোন্ পথে পতি যান, আগে যা রে পথ দেখাইয়া।
চরণরাজীবরাজে, মনঃশিলা পাছে বাজে, হৃদে ধরি লহরে বহিয়া॥"

এরূপ মনোহর ভাব দেখিতে পাই নাই। নারদ হিমালয়ে গমন করিয়া সখীগণের

সহিত রমমাণা পার্ব্বতীকে প্রণাম করিলে, পার্ব্বতী রোষভরে যেরূপে মাতার নিকটে গিয়া যেরূপ যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা কি সাধারণলেখনী হইতে বাহির হইবার বিষয়? শিবনামাবলী ও হরিনামাবলীর রচনা দুইটি পাঠকের রসনায় যেন নৃত্য করিতে থাকে। গঙ্গা ও ব্যাসের কথোপকথন এবং পরস্পরকৃত পরস্পর নিন্দার প্রসঙ্গে কতই পাণ্ডিত্য, কতই পরিহাসরসিকতা ও সংক্ষেপের মধ্যে মহাভারতের কতই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। হরিহোড়ের বৃত্তান্তে দুঃখিনী পদ্মিনী বর্ণন ও হরিহোড়ের কাষ্ঠাহরণ বিবরণ দ্বারা দারিদ্র্যবর্ণনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও কালকেতু-ব্যাধের নিকটে ভগবতীর ছলে পরিচয় প্রদান আছে সত্য বটে, কিন্তু ইহাতে ভবানন্দ মজুন্দারের গৃহে যাইবার সময়ে ঈশ্বরীপাটুনীর সমীপে অন্নপূর্ণার পরিচয়-দান তদপেক্ষা অনেক বিশদ ও অনেক মনোরম হইয়াছে। ফলতঃ রায়গুণাকরের রচনার এমনই মোহিনীশক্তি যে, উহার কোন অংশের কোন দোষ নেত্রগোচর হয় না। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ উহার কোন সন্দর্ভ যে আমরা উদ্ধৃত করিব, তাহা স্থির করিতে পারি না। যাহা হউক, নিম্নভাগে দুই তিনটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

অন্নদার মোহিনীরূপ।

মায়া করি জয়া বিজয়ারে লুকাইয়া। দেখা দিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া॥
কোটি শশী জিনি মুখ কমলের গন্ধ। ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥
ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া। লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥
উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদি-মূলে। ধরেছে কামের কেশ রোমাবলী ছলে॥
অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা লয়ে। পদনখে রহিয়াছে দশরূপ হয়ে॥
মুকুতা যতনে তনু সিন্দুরে মাজিয়া। হার হয়ে হারিলেক বুক বিন্ধাইয়া॥
বিননিয়া চিকণিয়া বিনোদ কবরী। ধরাতলে ধায় ধরিধারে বিষধরী॥
চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদবিন্দু। মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হইল ইন্দু॥
অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধর রঙ্গিমা। চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা॥

নূতন কাঁচুলী শাড়ী বিজুলী চমকে। মণিময় আভরণ চমকে চমকে॥
কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবারে আশে। ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে॥
করুণঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার। ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখে শিখিতে চলনি। ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥
নিরুপম সেরূপ কিরূপ কব আমি। যেরূপ হেরিয়া কামরিপু হন কামী॥

অন্নদার জরতীবেশে ছলনা।

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী। ডানি করে ভাঙ্গা লড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ী॥
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি গাঁদি। হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেঁয়া আঁদি॥
ডেঙ্গর উকুন নীকি করে ইলি বিলি। কোটি কোটি কাণকোটারীর কিলি কিলি॥
কোটরে নয়ন দুটী মিটি মিটি করে। চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে। শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে॥
ঘাড়ে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার। অন্ন বিনা অন্নদার অস্থিচর্ম্মসার॥
শত গাঁটি ছেঁড়া টেনা করি পরিধান। ব্যাসের নিকটে গিয়া হৈল অধিষ্ঠান॥
ফেলিয়া চুপড়ী লড়ী আহা উহু কয়ে। জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে।
ভূমে ঠেকে থুতি হাঁটু কাণ ঢেকে যায়। কুঁজভরে পিঠ দাঁড়া ভূমিতে লোটায়॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল। চক্ষু মুদি দুই হাতে চুল্‌কান চুল॥
মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া। অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া॥

ঈশ্বরীপাটুনীকে ভগবতীর ছলে পরিচয় দান।

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী। বুঝহ ঈশ্বরি! আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি। জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত। পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশখ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম। সকলের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কু কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ। কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥

গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি। জীবনস্বরূপা সে স্বামী শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে। না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই। যে মোরে আপনা ভাবে তার ঘরে যাই॥

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয়ভাগের নাম 'মানসিংহ'। বিদ্যাসুন্দর ইহারই অন্তর্গত বৃহৎউপাখ্যান—সুতরাং উহাকেই দ্বিতীয়ভাগরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জাহাঙ্গীর বাদসাহের সেনাপতি রাজা মানসিংহ, যশোহরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিবার বাসনায় সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে যশোহর যাত্রাকালে প্রথমে বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হন। তৎকালে পূর্ব্বোক্ত ভবানন্দ মজুমদার কাননগোঁইপদাধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি মানসিংহের বর্দ্ধমান গমনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অভ্যর্থনার্থ নানা উপহারসমেত উক্ত নগরে গমন করেন। মানসিংহ তথায় কয়েক দিন অবস্থান করিয়া প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যা-সুন্দরের কথা শুনিতে পাইলেন এবং ভবানন্দ মজুমদারকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক সুড়ঙ্গদর্শন করিতে যাইয়া তথায় মজুন্দারের মুখেই বিদ্যা-সুন্দরের আদ্যোপান্ত উপাখ্যান শ্রবণ করিলেন। ফলতঃ গুণাকর ভবানন্দ মজুম্‌দারকেই উক্ত উপাখ্যানের বক্তা করিয়াছেন।

এস্থলে বোধ হয় অনেকেরই জানিবার ইচ্ছা হয় যে, বিদ্যাসুন্দরের কাণ্ড বর্দ্ধমানে ঘটিয়াছিল কি না? এবং তথায় যে সুড়ঙ্গের কথা শোনা যায়, তাহা কিরূপ?—ইহার প্রথম প্রশ্নের উত্তর লেখা অনাবশ্যক। কারণ বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় অলৌকিক কাণ্ড কোথাও কখন বাস্তবিক ঘটে? কি কেবল কবিদিগের কল্পনাবলেই সঙ্ঘটিত হয়? তাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই—বিজ্ঞ পাঠকগণ বুঝিয়া লইবেন। কিন্তু যেরূপ শোনা যায়, তাহাতে বোধ হয়, বিদ্যাসুন্দরের কাণ্ড উজ্জয়িনীনগরে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বররুচিকর্ত্তৃক বর্ণিত আছে। রামপ্রসাদসেনের জীবনবৃত্তে উল্লিখিত সংস্কৃত 'সুন্দরকাব্য' রচয়িতাই হউন বা যে কেহই হউন, বোধ হয় প্রথমে উহাকে দূরদেশ হইতে আপনদেশ বর্দ্ধমানে আনিয়া স্থাপিত করেন; তৎপরে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রও দেশের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহার অন্যথা করিতে

পারেন নাই। যাহা হউক, উক্ত কয়েকখানি গ্রন্থরচনাব পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও সুড়ঙ্গের কথা প্রচারিত ছিল, তাহা আমাদের বোধ হয় না। এমন কি বোধ হয়, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনার পর হইতেই লোকে ঐ কল্পিতকাণ্ডের ক্রমে ক্রমে স্থানসমাবেশ করিয়া দিয়াছে। যাহা হউক তত্রত্য সুড়ঙ্গের অবস্থা—যাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা —নিম্নভাগে লিখিত হইল।

আমরা যৎকালে বর্দ্ধমানে ছিলাম, তখন একদিন—১৮৬৬ খৃঃ অব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি—কয়েকজন বন্ধুসহ সুড়ঙ্গদর্শনার্থ কৌতুকাকুলিতচিত্তে বাসা হইতে নির্গত হইলাম এবং ইহাকে উহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক অনুসন্ধানেব পর নগরের প্রান্তবর্ত্তী পীরবর্হাম্ নামক একটি স্থানে উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থানে বাঁকা নদীর নিজ উত্তবতীরেই একটি প্রাচীন ইষ্টকময় বাটীর ভগ্নাবশেষ স্তূপাকারে রহিয়াছে ও তদুপরি বন, জঙ্গল অনেক হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া গেল। ঐ স্থানেই সুড়ঙ্গ আছে, এই কথা তত্রত্য কয়েকজন লোক বলিয়া দিলে আমরা বহুকষ্টে তথায় উঠিলাম, কিন্তু দেখিলাম কোন ভগ্নাবশিষ্ট গৃহের মধ্যভাগে একটি 'পীবের আস্তানা' আছে। একজন ফকিরের মত লোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সির্ণির জন্য পয়সা চাহিল। তাহাকেই সুড়ঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে ঐ আস্তানাবই পার্শ্ববর্ত্তী ভগ্নপ্রাচীবস্থ কুলুঙ্গির মত একটি গর্ত্ত দেখাইয়া দিল—কিন্তু তাহা দেখিয়া আমাদের পরিশ্রম পোষাইল না। পার্শ্ববর্ত্তী লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ কহিল যে, এই স্থানকেই 'বিদ্যাপোঁতা' কহে; ইহার একক্রোশ পূর্ব্বে 'বীরহাটা' যে স্থান আছে, ঐ খানেই রাজা বীরসিংহের রাজভবন ছিল—এবং ইহাব একক্রোশ দক্ষিণে দামোদবের সমীপে মালিনীপোঁতা আছে, ঐ স্থানে হীরামালিনীর বাটী ছিল; সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তের চিহ্নও তথায় আছে ইত্যাদি। আমরা পূর্ব্বে একথাও কাহার কাহার মুখে শুনিয়াছি যে, মালিনী সুন্দবের নিকট হইতে হাটে যাইবার সময়ে—

"নাগর হে চলিলাম নাগরীর হাটে।"[১]

এই যে, নাগরীহাট বা নাগরীহট্টের উল্লেখ করিয়াছে, উহা এক্ষণকার নাকুড়িড; এবং ঐ নাকুড়িডর উত্তর মাঠের মধ্যে যে স্থানে 'দুর্লভা' নামে কালী আছেন, ঐ স্থানই উত্তরমশান—অর্থাৎ যেখানে সুন্দরকে কাটিতে লইয়া গিয়াছিল সেই স্থান—বলিয়া প্রথিত। যাহা হউক আমরা বিদ্যা-পোতাদর্শনের পর মালিনীপোঁতা দর্শনার্থ বাঁকানদী উত্তরণপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলাম, কিন্তু অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সন্ধান পাইলাম না। পরে একজন ইতরজাতীয় প্রাচীন লোক একটি উচ্চ মৃন্ময় ঢিবি দেখাইয়া তাহাকেই মালিনীপোঁতা কহিল। সুড়ঙ্গের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে একটি পুষ্করিণী দেখাইয়া কহিল যে, "ইহারই ভিতরে সুড়ঙ্গ আছে; গ্রীষ্মকালে পুকুরের জল শুকাইলেও তাহা বাহির হয় না—ঢাকা থাকে। একবার একজন ঐ স্থান খুঁড়িতে গিয়া মুখে রক্ত উঠিয়া মারা পড়িয়াছিল; তদবধি আর কেহ উহা খুঁড়িতে সাহসী হয় নাই"—ইত্যাদি—

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ—উহা অবলম্বন করিয়া অনেকানেক যাত্রা হইয়াছে, সুতরাং আপামরসাধারণ কেহই প্রায় উহার বিষয়ে অনবগত নহে। বিশেষতঃ গুণাকর উহাকে এমনই মধুর করিয়া গিয়াছেন যে, একবার পড়িলে কেহই আর ভুলিতে পারে না। ভারতচন্দ্রের ভিন্ন অন্যের রচিত যে, বিদ্যাসুন্দর আছে, তাহা অনেকে অবগতই নহেন; সুতরাং ঐ উপাখ্যানের এতাদৃশ সর্ব্বজনীনতা হওয়া বিষয়ে ভারতের লিপি-নৈপুণ্য ভিন্ন আর কিছুই কারণ নহে। আমরাও পূর্ব্বে রামপ্রসাদাদির বিদ্যাসুন্দরের কথা জানিতাম না—ভারতের বিদ্যাসুন্দরই প্রথমে পড়িয়াছিলাম এবং তাহার অনেক ভাব আমাদের হৃদয়ে পাষাণরেখার ন্যায় একবারে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। বর্দ্ধমান নগরের বর্ণনা পাঠ করিয়া উহার একখানি মানচিত্র আমাদের চিত্তপটে আবির্ভূত হইয়াছিল, এবং যত দিন আমরা বর্দ্ধমান না দেখিয়াছিলাম, তত দিন উহা অবিকৃত ছিল। ঐ মানচিত্রে বর্দ্ধমানকে কি সুখের, কি ঐশ্বর্য্যের, কি বিলাসের

ও কি রমণীয়তার আধারই দেখিতে পাইতাম, বলিতে পারি না। রাজপুরীর সৌন্দর্য্য, পরিখার অলঙ্ঘ্যতা, সরোবরের চতুষ্পার্শ্বে জটাভস্মধারী অবধূত সন্ন্যাসীদের আখড়া, সরোবরের রমণীয়তা, বকুলতলার বাঁধাঘাট, তথায় বিদ্যাধরীসদৃশী বর্দ্ধমানাঙ্গনাদিগের জলানয়নার্থ সবিলাসভাবে আগমন, ঐ সকলকাণ্ড বর্দ্ধমানে যাইলেই দেখিতে পাওয়া যায়, বলিয়া মনোমধ্যে একপ্রকার সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বর্দ্ধমানদর্শন করিবার পর তথাকার রাজপথের ধূলা লাগিয়া আমাদের সে মানচিত্রখানি মলিন হইয়াগিয়াছে, সুতরাং এখন তাহাতে সকলবস্তুর তাদৃশ সৌন্দর্য্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

অনেকে কহিয়া থাকেন যে, বর্দ্ধমানাধিপের প্রতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ঈর্ষ্যাভাব ছিল। সেই হেতু তিনি উক্ত রাজকুলে কলঙ্কারোপ করিবার অভিপ্রায়ে আপন সভাসদ ভারতচন্দ্রের দ্বারা বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান মনোমতরূপে বর্ণনা করান এবং বর্দ্ধমান রাজবংশীয়েরাও ঐ উপাখ্যানকে আপনাদের বংশের কলঙ্ককর বোধ করিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান নগরের মধ্যে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা করিতে দেন নাই। কিন্তু এ কথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বীরসিংহ নামে বর্দ্ধমানে কোন রাজা ছিলেন কি না তাহাই সন্দেহস্থল; থাকিলেও তাঁহার সহিত বর্ত্তমান রাজপরিবারের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল, এমত বোধ হয় না; সুতরাং বীরসিংহের পরিবারে কলঙ্কারোপ হইলে তাহা বর্ত্তমান রাজপরিবারে সংলগ্ন হওয়ার কোন কারণ নাই। তদ্ভিন্ন কলঙ্কেরই বা কথা কি? যেরূপ বর্ণনা আছে, যদি তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার কর, তবে কালীর কিঙ্করী ও কিঙ্কর শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বিদ্যাসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; মানবাবস্থাতেও ভগবতী সর্ব্বদা তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, এবং তাঁহারই উপদেশমতে সুন্দর অলৌকিক সন্ধিখনন করিয়া বিদ্যার মন্দিরে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন; সুন্দরের বিপৎপাত হইলে কালী স্বয়ং বিদ্যাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক শ্মশানস্থলে গমন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং শাপাবসানে দুইজনকে সঙ্গে করিয়া স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন। অতএব

বিবেচনা করিতে হইবে যে, এরূপ কন্যা যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং এরূপ বর যে কুলে বিবাহ করেন, সে কুল কলঙ্কিত হয়? না পবিত্র, মহোজ্জ্বল, পরম গৌরবান্বিত ও চিরস্মরণীয় হয়?—ফলকথা, বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান প্রচারের দ্বারা বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান রাজপরিবারের প্রতি কলঙ্কারোপ চেষ্টার কথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তবে একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমান রাজভবনে কর্ম্মচারীদিগের চক্রান্তে পড়িয়া বহুল ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন—সেই ক্রোধে সুন্দরকে দেখিয়া নাগরীগণের স্ব স্ব পতিনিন্দাকরণাবসরে মুন্সী, বক্সী, পোদ্দার, দপ্তরী পর্য্যন্ত সকল রাজকর্ম্মচারীর স্ত্রীগণের চরিত্রের প্রতি গুণাকর কটু কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

'বিদ্যাসুন্দর' আদিরস প্রধান। ইহার কয়েকস্থলে কতকগুলি অশ্লীল বর্ণনা আছে, তাহা অবশ্য বিজ্ঞদিগের রুচিতে নিন্দনীয় হইবে সন্দেহ নাই—কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিয়া ধরিলে ইহার অপর সমুদয় অংশ আগাগোড়া মধুর ও মনোহর। সুন্দর, মালিনী, বিদ্যা, রাণী, রাজা ও কোটাল প্রভৃতি গ্রন্থবর্ণিত পাত্রগণের চরিতগুলি যে, কিরূপ যথোচিতরূপে চিত্রিত হইয়াছে, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা যায় না। যদিও এই সকল চরিত পূর্ব্বে অপর চিত্রকরেরাও চিত্রিত করিয়াছিলেন, তথাপি ভারতের ন্যায় কেহই রঙ্ ফলাইতে পারেন নাই। ইহার রচনার আদ্যোপান্তই যেন মাজাঘষা ও পরিষ্কার করা। যে অংশ পাঠ করিবে, সেই অংশেই মধুবৃষ্টি অনুভব করিবে। পঙ্‌ক্তিগুলি যেন সমস্থূল মুক্তামালা। বিশেষতঃ—

"দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক।" "বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী ॥"
"বাপ্‌ধন বাছারে বালাই যাক্ দূর। দাসীরে বলিলে মাসী ও মোর ঠাকুর ॥"
"বড়র পিরীতি বালির বাঁধ। ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ॥"
"এস বৈস এয়ো, হোক মেনে যেও, বল সে কেমন জন।"
"আখিবীথি সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায়। অঙ্গুলি হেলায়ে হীরা দু'হাথে দেখায় ॥"
"একি লো একি লো, একি কি দেখিলো, এ চাহে উঁহার পানে ॥"
"হাসি ঢলেপড়ে ধনী, কি বলিলা গুণমণি—" "সে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয় ॥"

"হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।" "ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভৃঙ্গ মধু খায়॥" "মিছা কথা সেঁচাজল কতক্ষণ রয়॥" 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' 'যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন'। 'নীচ যদি উচ্চ ভাবে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিগুলি পাঠমাত্র বোধ হয়, নিতান্ত অসামাজিকের হৃদয়েও একবারে অঙ্কিত না হইয়া থাকে না। যাহা হউক, আমরা বিদ্যাসুন্দরের অধিক অংশ উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থবাহুল্য করিব না; কেবল প্রদর্শনার্থ একটি স্থলের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

গর্ভের সংবাদশ্রবণে বিদ্যার নিকটে রাণীর গমন॥

——"শুনি চমকিয়া, চলে শিহরিয়া, মহিষী যেন তড়িত॥
আকুল কুন্তলে, বিদ্যার মহলে, উত্তরিলা পাটরাণী।
উদর ডাগর, দেখি হৈল ডর, রাণীর না সরে বাণী॥
প্রণমিতে মা রে, বিদ্যা নাহি পারে, লজ্জায় পেটের দায়।
কাপড়ে ঢাকিয়া, প্রণমে বসিয়া, বৈস বৈস বলে মায়॥
গালে হাত দিয়া, মাটীতে বসিয়া, অধোমুখে ভাবে রাণী।
গর্ভের লক্ষণ, করি নিরীক্ষণ, কহে ভালে কর হানি॥
ওলো নিঃশঙ্কিনী, কুলকলঙ্কিনী, সাপিনী পাপকারিণী।
শাঁখিনীর প্রায়, আনিলি কাহায়, ডাকিয়া ডাক ডাকিনী॥
ডরে মোর ঘরে, বায়ু না সঞ্চরে, ইহার ঘটক কে বা।
সাপের বাসায়, ভেকেরে নাচায়, কেমন কুটিনী সে বা॥
না মিলিল দড়ী, না মিলিল কড়ী, কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ, কেমনে একাজ, করিলি খাইয়া মোরে॥
রাজা মহারাজ, তাঁরে দিলি লাজ, কলঙ্ক দেশে বিদেশে।
কি ছাই পড়িলি, কি পণ করিলি, প্রমাদ পাড়িলি শেষে॥
এল কতজন, রাজার নন্দন, বিবাহ করিতে তোরে।
জিনিয়া বিচারে, না বরিলি কারে, শেষে মিটে গেলি চোরে॥

শুনি তোর পণ, রাজপুত্রগণ, অদ্যাপি আইসে যায়।
শুনিলে এমন, হইবে কেমন, বল কি তার উপায়॥
সন্ন্যাসীটা আছে, ভূপতির কাছে, নিত্য আসে তোর পাকে।
কি কব রাজায়, না দিল তাহায়, তবে কি এ পাপ থাকে॥
আমি জানি ধন্যা, বিদ্যা মোর কন্যা, ধন্য ধন্য সর্ব্ব ঠাঁই।
রূপগুণযুত, যোগ্য রাজসুত, হইবে মোর জামাই॥
রাজার ঘরণী, রাজার জননী, রাজার শাশুড়ী হব।
যত কৈনু সাদ, সব হৈল বাদ, অপবাদ কত সব॥
বিদ্যার মা ছলে, যদি কেহ বলে, তখনি খাইব বিষ।
প্রবেশিব জলে, কাতি দিব গলে, পৃথিবী বিদায় দিস্॥
আলো সখীগণ, তোরা বা কেমন, রক্ষক আছিলি ভালে।
সকলে মিলিয়া, কুটিনী হইয়া, চূণকালী দিলি গালে॥
তোরা ত সঙ্গিনী, এরঙ্গে রঙ্গিণী, এই রসে ছিলি সবে।
ভুলালি আমায়, দানীভাঁড়া যায়, সঙ্গীভাঁড়া যায় কবে॥
থাক্ থাক্ থাক্, কাটাইব নাক, আগেতে রাজাকে কহি।
মাথা মুড়াইব, শালে চড়াইব, ভারত কহিছে সহি॥

রাজার নিকটে রাণীর গমন।

"ক্রোধে রাণী ধায় বড়ে, অঞ্চল ধরায় পড়ে, আলুথালু কবরীবন্ধন।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক, হাতনাড়া ঘনডাক, চমকে সকল পুরজন॥
শয়ন গৃহেতে রায়, বৈকালিক নিদ্রা যায়, সহচরী চামর ঢুলায়।
রাণী আইল ক্রোধমনে, নূপুরের ঝন্‌ঝনে, উঠে বৈসে বীরসিংহরায়॥
রাণীর দেখিয়া হাল, জিজ্ঞাসয়ে মহীপাল, কেন কেন কহ সবিশেষ।
রাণী বলে মহারাজ, কি কব কহিতে লাজ, কলঙ্কে পূরিল সবদেশ॥
ঘরে আইবড় মেয়ে, কখন না দেখ চেয়ে, বিবাহের না ভাব উপায়।
অনায়াসে পাবে সুখ, দেখিবে নাতির মুখ, এড়াইলে ঝীর বিয়া দায়॥

কি কহিব হায় হায়, জলন্ত আগুনপ্রায়, আইবড় এত বড় মেয়ে।
কেমনে বিবাহ হবে, লোকধর্ম্ম কিসে রবে, দিনেক দেখিতে হয় চেয়ে॥
উচ্চ মাথা হৈল হেট, বিস্তার হয়েছে পেট, কালামুখ দেখাইবে কারে।
যেমন আছিল গর্ব্ব, তেমনি হইল খর্ব্ব, অহঙ্কারে গেলে ছারেখারে॥
বিদ্যার কি দিব দোষ, তারে বৃথা করি রোষ, বিয়া হৈলে হৈত কতছেলে।
যৌবনে কামের জ্বালা, কদিন সহিবে বালা, কথায় রাখিব কত টেলে॥
সদামত্ত থাক রাগে, কোন ভার নাহি লাগে, উপযুক্ত প্রহরী কোটাল।
এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার, আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল॥"

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, উল্লিখিতরূপ রচনা কি সরল, কি মধুর এবং কি স্বভাবসঙ্গত ও সময়সমুচিত! ভারতচন্দ্রের যদি আর কোন রচনাই না থাকিত, তথাপি সকল দিক্ বজায় রাখিয়া রাণীর এই একমাত্র পাকা গৃহিণীপনার বর্ণন দৃষ্টেই তাঁহাকে মহাকবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইত। এমন স্বভাবসঙ্গত হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় কোন কবির লেখনী হইতে নির্গত হয় নাই। ইংরেজিতে পোপের ও সংস্কৃতে বাল্মীকির রচনা যেরূপ মধুর, আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালাতে ভারতচন্দ্রের রচনাও সেইরূপ। এক্ষণকার কৃতবিদ্যদিগের অনেকে ভারতের কবিত্বের প্রতি নানারূপ উক্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা কাব্যসভায় যে সিংহাসন লাভ করিয়াছেন, তাহার নিকট ঘেঁসিতে পারে, এরূপ লোক এ পর্য্যন্ত জন্মে নাই—পরেও জন্মিবে কি না সন্দেহ স্থল।

অন্নদামঙ্গলের তৃতীয়ভাগ প্রকৃত মানসিংহ। ইহার স্থূল বিবরণ এই যে, মানসিংহ বর্দ্ধমান হইতে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিয়া ভবানন্দ মজুন্দারের বাসস্থল বাগোয়ানে উপস্থিত হইলে অন্নপূর্ণার মায়ায় সৈন্যের উপর তুমুল ঝড় বৃষ্টি হইল। তাহাতে অনেক সৈন্য মারা যায় এবং কয়েকদিন খাদ্যসামগ্রী কিছুই পাওয়া গেল না। মজুন্দার ইহা শুনিতে পাইয়া অন্নপূর্ণার কৃপায় সপ্তাহকাল সমুদয় সেনার আহারের সমবধান করিলেন এবং অন্নপূর্ণার পূজার ক্রম তাঁহাকেও

জানাইলে তিনিও পূজা করিয়া সমুদয় বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। পরে উভয়েই যশোহরযাত্রা করিয়া তুমুলসংগ্রামে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিলেন এবং বাদসাহের নিকট উপহার দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে পিঞ্জরমধ্যে পূরিয়া লইলেন। অনন্তর মানসিংহ রাজ্যপ্রদান করাইবার আশা দিয়া ভবানন্দকে দিল্লীর রাজসভায় লইয়া গেলেন। বাদসাহ প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ে হৃষ্ট হইয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিবার আদেশ করিলে মানসিংহ অন্নপূর্ণার কৃপায় ও ভবানন্দের অনুগ্রহে বিপদ্ হইতে রক্ষা হইয়াছে, এইজন্য তাঁহাকে স্বদেশমধ্যে রাজত্ব প্রদান করিবার নিমিত্ত বাদসাহের নিকট অনুরোধ জানাইলেন। জাহাঙ্গীর হিন্দু দেবতার ক্ষমতাবর্ণনশ্রবণে রুষ্ট হইয়া ভূত বলিয়া তাঁহাদের যথোচিত নিন্দা করিলেন। ভবানন্দ দেবনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া সমুচিত উত্তর প্রদান করিলে বাদসাহ কুপিত হইয়া "তোদের ভূত কোথা দেখা" বলিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন—দিল্লীতে ভয়ঙ্কর ভূতের উপদ্রব হইল। জাহাঙ্গীর তাহাতে ভীত হইয়া অন্নপূর্ণা দেবীর স্তবাদি করিলে দেবী প্রসন্না হইলেন, ভূতের উপদ্রব নিবৃত্ত হইল এবং ভবানন্দ মজুন্দার রাজত্বের ফরমান পাইয়া (হিজরি ১০১৬, খৃঃ ১৬০৬) স্বদেশে আগমনপূর্ব্বক পূজাদি করিয়া কিছুদিন সুখে রাজত্ব করিলেন। অনন্তর দেবী তাঁহাকে পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া এবং ভবিষ্যতে তাঁহার বংশে যেরূপ হইবে, তাহা কহিয়া চন্দ্রমুখী, পদ্মমুখী নাম্নী দুই পত্নীর সহিত স্বর্গধামে লইয়া গেলেন।

এই উপাখ্যানের মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে জগন্নাথপুরী, বারাণসী, অযোধ্যা ও রামচন্দ্র প্রভৃতির বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং সমুদয় অন্নদামঙ্গলকে অষ্টমঙ্গলানামে আটভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুনরুল্লিখিত হইয়াছে। এই ভাগের উপাখ্যানাংশে বিশেষ কিছু বৈচিত্র নাই। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজবংশের গৌরব প্রকাশার্থই স্বকীয় পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুন্দারকে অন্নপূর্ণার বরপুত্ররূপে বর্ণিত করিবার অভিলাষেই এই ভাগ রচনা করান। কিন্তু কবি ইহাতেও আপনার কবিত্ব যতদূর প্রকাশ করিতে হয়, তাহার ত্রুটি করেন নাই। সৈন্যমধ্যে ঝড় বৃষ্টি,

প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ, মানসিংহ, জাহাঙ্গীর ও ভবানন্দের কথোপকথন, দাসু বাসুর খেদ, ভূতের উপদ্রব, বাটী আসিয়া দুই নারী লইয়া ভবানন্দের কৌতুক, সাধী মাধীর ঝগড়া, ইত্যাদি বিবরণ সামান্যকৌশলে, সামান্য-পাণ্ডিত্যে ও সামান্য রসিকতা সহকারে বর্ণিত হয় নাই। যাহা হউক উহার মধ্যে অন্নদার মায়াপ্রপঞ্চে যে সকল অদ্ভুতকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কি কোন পুরাণ বা তন্ত্র মূলক কি কেবল ভয় ও বিস্ময়ের প্রাদুর্ভাব করণার্থ অদ্ভুতবর্ণনমাত্র তাহা স্থির করিতে পারা গেল না। দ্বিতীয়পক্ষই আমাদের মনে লাগিতেছে।

সমুদয় অন্নদামঙ্গলের মধ্যে মিত্রাক্ষরতার দোষ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। তবে যতিভঙ্গের দোষ স্থানে স্থানে আছে বটে, কিন্তু তাহা সামান্য। কেহ কেহ কহেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিজ সভাসদগণদ্বারা অন্নদামঙ্গলকে বিলক্ষণরূপে বিশোধিত করাইয়াছিলেন, সেই জন্যই উহাতে দোষের ভাগ প্রায় লক্ষিত হয় না। সে কথাও সঙ্গত বোধ হয়,—কিন্তু হউক তাহাতেও কবির কবিত্বের অল্পতা হয় না।

অন্নদামঙ্গলের মধ্যে ভঙ্গত্রিপদী, লঘুভঙ্গত্রিপদী, হীনপদত্রিপদী, দীর্ঘ ও লঘু চৌপদী, মালঝাঁপ, একাবলী, ললিত, ভঙ্গপয়ার, দিগক্ষরা তুণক ভুজঙ্গপ্রয়াত, পঞ্চচামর প্রভৃতি অনেকগুলি নূতন নূতন ছন্দ আছে, তন্মধ্যে শেষোক্ত তিনটি সংস্কৃতমূলক। এই সংস্কৃতমূলক ছন্দে কয়েক স্থলে গুরু-লঘু ব্যত্যয়ও ঘটিয়াছে।

রায়গুণাকরের অপরগ্রন্থের নাম 'রসমঞ্জরী'। এখানি সংস্কৃতের অনুবাদ। সংস্কৃত সাহিত্যদর্পণাদি অলঙ্কারগ্রন্থে নায়িকা ও নায়কদিগের যে সকল লক্ষণ, ভেদ ও উদাহরণাদি প্রদর্শিত হইয়াছে এবং নায়কসহায় পীঠমর্দ্দ, বিট, চেট ও বিদূষকের যে সকল স্বরূপনিরূপণাদি বর্ণিত আছে—শৃঙ্গার রসের যেরূপ লক্ষণ ও প্রকারভেদ কথিত হইয়াছে—আলম্বন, উদ্দীপন ও সাত্ত্বিক-ভাবের যেপ্রকার লক্ষণাদি নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমুদয় বাঙ্গালাছন্দোবন্ধে

ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন জয়দেবের রতিমঞ্জরীতে পদ্মিনীপ্রভৃতি চারিজাতীয় স্ত্রীর ও শশকাদি চারিজাতীয় পুরুষের যেরূপ স্বরূপাদি নিরূপিত আছে, তাহাও ইহাতে অবিকল অনুবাদিত হইয়াছে। এ গ্রন্থ যে, অবশ্যই অশ্লীল হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু গ্রন্থের ভাষামাধুর্য্য ও ছন্দের লালিত্য বিষয়ে ভারতের নিকট হইতে যেরূপ আশা করিতে পারা যায়, তাহার অন্যথা হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটিমাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

স্বীয়া নায়িকা।

নয়ন অমৃত নদী, সর্ব্বদা চঞ্চল যদি, নিজপতি বিনা কভু, অন্যজনে চায় না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু, কদাচ অধর বিনা, অন্যদিকে ধায় না॥
অমৃতের ধারা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা, প্রিয়সখী বিনা কভু, অন্য কাণে যায় না।
মতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি, ক্রোধ হলে মৌনভাব, কেহ টের পায় না॥

আমাদের এ প্রস্তাব অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিল, অতএব ইহার আর বাহুল্য না করিয়া ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও হিন্দিতে অপর যে সকল রচনা আছে, দিঙ্মাত্র উদাহরণস্বরূপ তাহাদের এক একটি উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিলাম।

সমস্যা—“বাহবারে হাওয়া”

পূরণ—চন্দনের দণ্ডধোরে, ফণি ফণা ছত্র কোরে, মলয় রাজত্ব হোরে, আরো রাজ্য চাওয়া
বসন্ত সামন্ত সঙ্গে, শৈত্য গন্ধ মান্দ্য অঙ্গে, কাবেরী ভরিয়া রঙ্গে, হিমালয়ে ধাওয়া॥
বিয়োগীরে কাঁদাইয়ে, সংযোগীরে ফাঁদাইয়ে, যোগী-যোগ ভাঙ্গাইয়ে, কামগুণ গাওয়া।
মর্ম্মীরে প্রকাশিয়ে, গর্ব্বীরে বিনাশিয়ে, শীতল করিলি হিয়ে, বাহবারে হাওয়া॥

নাগাষ্টকের একটি।

অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালিয়হ্রদং পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদং।
যদীদানীং তৎত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি॥

চণ্ডীনাটক।

খট্ মট্ খট্ মট্ খুরোত্থধ্বনিকৃতজগতীকর্ণপূরাবরোধঃ
ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফেঁতি নাসানিলচলদচলপ্রান্তবিভ্রান্তলোকঃ।
সপ্ সপ্ সপ্ পুচ্ছবাতোচ্ছলহ্রদপিজলপ্লাবিতস্বর্গমর্ত্ত্যো।
ঘর্ ঘর্ ঘর ঘোরনাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ॥

ঐ

শোন্‌রে গোঁয়ার লোগ, ছোড় দে উপাস রোগ;
মানহোঁ আনন্দভোগ, ভৈঁষরাজ যোগমে।
আগ্‌নে লাগাও ঘীউ, কাহেকো জলাও জীউ,
এক রোজ প্যার পীউ, ভোগ এহি লোগ মে।
আপ্‌কো লাগাও ভোগ, কাম্‌কো জাগাও যোগ,
ছোড় দেও যোগ ভোগ, মোক্ষ এহি লোগ্‌মে।
ক্যা এগান ক্যা বেগান, অর্থ নার আব জান,
এহি ধ্যান এহি জ্ঞান, আর সর্ব্ব রোগ মে॥

দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী।

অন্নদামঙ্গলের অব্যবহিত পরেই কোন ভাল বাঙ্গালাগ্রন্থ রচিত হইতে দেখা যাইতেছে না। উপরি উল্লিখিত পুস্তক অর্থাৎ গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীই বোধ হয়, অন্নদামঙ্গলের ঠিক্ পরেই রচিত। এই গ্রন্থ তত উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন নহে—কিন্তু ইহা প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত, ও অনেকের শ্রদ্ধাস্পদ, এবং মনসার ভাসান, চণ্ডী ও রামায়ণের ন্যায় ইহাও চামর-মন্দিরাসহযোগে সঙ্গীত হইয়া থাকে, এই জন্য ইহার বিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখা আবশ্যক হইতেছে। নদীয়াজেলার অন্তর্গত উলাগ্রামনিবাসী ৺দুর্গা-

প্রসাদমুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপে নিজপরিচয় দিয়াছেন—

নবদ্বীপ নিবসতি, নরেন্দ্র ভূপতিপতি, গোষ্ঠীপতি-পতি যারে বলে।
তাঁর অধিকারে ধাম, দেবীপুত্র আত্মারাম, মুখুটী বিখ্যাত মহীতলে॥
খড়দহ ফুলে সার, বশিষ্ঠ তুলনা যাঁর, জায়া অরুন্ধতী ঠাকুরাণী।
কি দিব উপমা তাঁর, শিব শিবা অবতার, ব্যবহারে হেন অনুমানি॥
তাঁহার তনয় দীন, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ক্ষীণ, যার দারা হরিপ্রিয়া সতী।
প্রত্যাদেশ হয় তারে, ভাষাগান রচিবারে, স্বপনে কহিলা ভগবতী॥
কোটি চন্দ্র আভা যেন, জাহ্নবীর রূপ হেন, ব্রাহ্মণ-বালিকা বেশ ধরি।
নানা আভরণ গায়, রতন নূপুর পায়, বিচিত্র বসনখানি পরি॥
কহেন করুণাময়ী, শুন হরিপ্রিয়া কই, ভাষায় আমার গান নাই।
তোমার পতিরে কবে, প্রকাশ হইবে তবে, বাঞ্ছা যা করিবে দিব তাই॥
সুস্বপ্ন দেখিয়া সতী, প্রভাতে উঠিয়া অতি, ভক্তিভাবে পতিরে কহিলা।
নিবাস উলায় যার, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ তার, কথা শুনি ভাবিতে লাগিলা॥"

দুর্গাপ্রসাদমুখোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র বা বৃদ্ধপ্রপৌত্র অদ্যাপি উলায় বাস করেন। প্রচলিত হিসাব ধরিয়া তাঁহাদের ৪।৫ পুরুষের সময় মোটামোটি গণনা করিলে উক্ত পুস্তকের বয়ঃক্রম প্রায় ১০০ বৎসর হয়।

সূর্য্যবংশীয় রাজা ভগীরথ, তপস্যাদ্বারা প্রসাদিত করিয়া স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়নপূর্ব্বক কপিলশাপদগ্ধ পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধারসাধন করেন, ইহাই গ্রন্থের মূল বিবরণ। তবে অনুষঙ্গক্রমে অন্যান্য অনেক বিষয়েরও বর্ণন আছে। গ্রন্থকার কবিকঙ্কণচণ্ডীর অনুকরণে গঙ্গার উভয়পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রাম নগরাদির বর্ণন করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে চাকদহের বর্ণন প্রসঙ্গে বঙ্গদেশ-বাসীদিগের প্রতি অনেক বিদ্রূপ করিয়াছেন। যাহা হউক এই গ্রন্থের ভাষা তত সুশ্রাব্য এবং ছন্দও তত পরিশুদ্ধ হয় নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। প্রদর্শনার্থ একটি স্থল উদ্ধৃত হইল—

গঙ্গার ষষ্ঠীপূজায় নারীগণের আগমন।

"প্রেমরসে অবশেষে রামাগণ যত। রাণীপুরে বসি বেশ করে নানা মত॥
চাঁচর চিকুরজাল চিরুণে আঁচড়ি। বিনাইয়া বান্ধে খোঁপা দিয়া কেশদড়ি॥
খোঁপায় সোণার ঝাঁপা বেণী কারো দোলে। কেহ বা পরিল সিঁথি মতি তার কোলে॥
কিবা শোভা সিন্দূর চন্দনে অতিশয়। মণিময় টীকা যেন ভানুর উদয়॥
কারো কারো ভুরু যেন কামধনু জিনি। কামের সর্ব্বস্ব ধন লয়েছে কামিনী॥
চক্ষু কারো বুঝি যেন খঞ্জনিয়া পাখী। দ্বন্দ্ব করে নাসা তিলফুল মধ্যে রাখি॥
ঢেঁড়ি চাঁপি মাকুড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল। কেহ পরে হীরার কমল নাহি তুল॥
নাসিকাতে নথ কারো মুক্তা চুনী ভালো। লবঙ্গবেসরে কারো মুখ করে আলো॥
কিবা গজমুক্তা কারো নাসিকার কোলে। দোলে সে অপূর্ব্ব ভাব হাসির হিল্লোলে॥
কুন্দকলিকার মত কারো দন্তপাঁতি। দাড়িম্বের বীজ মুক্তা কারো দন্ত ভাতি॥
মার্জ্জিত মঞ্জনে দন্ত মধ্যে কালরেখা। মনে লয় মদনের পরিচয় লেখা॥
মুখশোভা করে কারো মন্দ মন্দ হাসি। সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি॥
পরিল গলায় কেহ তেনরী সোণার। মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার॥
ধুকধুকি জড়াও পদক পরে সুখে। সোণার কঙ্কণ কারো শঙ্খের সম্মুখে॥
পতির আয়তি চিহ্ন সোহাগ যাহাতে। পরণে বান্ধান লোহা সকলের হাতে॥
পাতামল পাশুলি আনট্ বিছা পায়। গুজরি পঞ্চম আর শোভা কিবা তায়॥
আনন্দে বসিয়া যত রসিকা কামিনী। সুখের বাজারে যেন করে বিকি কিনি॥

উপরি উদ্ধৃত সন্দর্ভটি দর্শন করিয়া বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব্বে ঝাঁপা, চাঁপি, লবঙ্গবেসর, পাতামল, পাশুলি, আনট্, কঙ্কণ প্রভৃতি যে সকল অলঙ্কার আমাদের কামিনীগণ পরিধান করিতেন, এক্ষণে আর তাহাদের প্রায় প্রচলন নাই—তবে নিতান্ত মফস্বল স্থানে কখনও ২।১টা ঐরূপ অলঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে আর একটি বিষয়ে দৃষ্টিপাতকরা আবশ্যক হইতেছে—কবি লিখিয়াছেন, "মার্জ্জিত মঞ্জনে দন্তমধ্যে কাল রেখা।" এতদ্দর্শনে স্থির হইতেছে যে, ঐ সময়েও স্ত্রীলোকদিগের দাঁতে মিশি দিবার রীতি ছিল। তৎপূর্ব্বে

রামপ্রসাদও বিদ্যার রূপবর্ণনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "দন্তাবলী শিশুঅলি কুন্দকলি মাঝে।" এতাবতা রামপ্রসাদের সময়েও মিশির ব্যবহার অনুমিত হইতেছে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে কোন কবি ওরূপ বর্ণন করেন নাই। এমন কি, ভারতচন্দ্রও দন্ত বর্ণন স্থলে "কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার" এইরূপ লিখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন কোন সংস্কৃত কবি দন্তকে কুন্দকুসুমসদৃশ ভিন্ন পক্বজম্বুফলতুল্য বলিয়া বর্ণন করেন নাই। অতএব ইহা স্থির বুঝা যাইতেছে যে, মিশি দিয়া দাঁত কাল করা আমাদের এতদ্দেশীয় প্রাচীন রীতি নহে। চীনবাসিনীরা দন্ত কৃষ্ণবর্ণ করিয়া থাকেন, বোধ হয় তাঁহাদের নিকট হইতে মুসলমানীরা এবং মুসলমানীদিগের নিকট হইতে আমাদের কামিনীরা ঐ ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এই ব্যবহার এক্ষণে উঠিয়া যাইতেছে—কলিকাতার তন্তুবায় ও সুবর্ণবণিক্ সুন্দরীরা উহা একবারে ত্যাগ করিয়াছেন—অন্যান্য মহলেও উহার প্রচলন অতি অল্পই আছে এবং পল্লীগ্রামেও ক্রমে ক্রমে কলিকাতার তরঙ্গ প্রবেশ করিতেছে।

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে পয়ার ও ত্রিপদীচ্ছন্দই প্রায় সমুদয়, তোটক বা অন্যবিধ ছন্দ দুই একটি যাহা আছে, তাহা তত বিশুদ্ধ নহে।

গীত ও কবিতা।

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রীতিমত ভাল বাঙ্গালা গ্রন্থ অধিক হইয়াছিল কি না, তাহা বলা যায় না; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ১৭০০ শকের কিছু পূর্ব্ব হইতে ১৭৫০—৫৫ শক [১৮২৮—১৮৩৩ খৃঃ অঃ] পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে অনেকানেক মহাত্মা নানাবিষয়ের নানাবিধ গীত রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং ঐ সময়কে "গানের যুগ" বলা যাইতে পারে। সেই সকল বিচিত্রপদাবলী-সমন্বিত চমৎকার জনক ভাবসম্পন্ন গীতদ্বারাও বাঙ্গালা ভাষার কম পুষ্টিসাধন হয় নাই। ঐ সকল গীত এক্ষণে সমগ্ররূপে কোথাও পাওয়া যায় না, কিন্তু সম্প্রতি

কয়েক মহাশয় * বহু পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক ঐ লুপ্তপ্রায় গীতের অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতেই সেগুলি আবার জীবনলাভ করিয়াছে।

ঐ সকল গীতরচকদিগের মধ্যে প্রাচীনতা ও গুণগৌরব উভয়েই ৺ রামনিধি গুপ্ত সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৬৬৩শকে (১৭৪১ খৃঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়া

---

* সন ১৩০৩ সালের 'জন্মভূমি' পত্রিকায় কোন বিজ্ঞ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"কবির গান এখন সম্পূর্ণরূপে সংগৃহীত হয় নাই। ১৮৮৪ সালে শ্রীযুত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রাচীন কবি সংগ্রহ' গ্রন্থে কবির গান কতকগুলি সংগ্রহ করেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ভবানীপুরে এই গ্রন্থ ছাপা হয়। 'প্রাচীন কবি সংগ্রহ' গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার 'বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে কবির গান সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া. রামবসু ও হরুঠাকুরের দুই একটী গান উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'রামবসুর বিরহ' নামক এক প্রস্তাব, 'সারস্বত কুঞ্জ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৩০১ সালে দক্ষিণেশ্বর নিবাসী শ্রীযুত কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় তিন শত কবির গান সংগ্রহ পূর্ব্বক এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। সে পুস্তকের নাম 'গুপ্ত রত্নোদ্ধার'। (আঠার আনা মূল্যের এই গ্রন্থখানি ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে পাওয়া যায়)। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ভূতপূর্ব্ব 'সাধনা' পত্রে, ১৩০২ সালে কবির গানের এক সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ঐ সময়ে 'বঙ্গবাসী' ও অন্যান্য সংবাদ পত্রেও কবির গানের কিঞ্চিত আলোচনা হইয়াছিল। কবির গান যাহা কিছু ছাপা হইয়াছে তাহা সামান্য, এখনও অনেক গান ছাপিতে বাকী আছে। ছাপা হয় নাই, এমন অনেক গান এখনও লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হয়। ৺ঈশ্বর গুপ্ত বহু যত্নে বহু চেষ্টা করিয়া কতকগুলি কবির গান সংগ্রহ করিয়াছিলেন; প্রসিদ্ধ কবিগণের জীবনীও যৎকিঞ্চিত লিখিয়া যান। তাঁহার আমলে কবির গানের আদর ছিল। তিনি স্বয়ং কয়েকটি কবির গান রচনা করেন।"

অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ উপরি উদ্ধৃত জন্মভূমিতে প্রকাশিত 'কবির গান', ১৩০২ সালে 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়' প্রকাশিত 'প্রাচীন কবি সঙ্গীত', ১৩১১ সালের 'নব্য ভারতে' শ্রীযুত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় লিখিত 'কবিওয়ালা' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। শ্রীযুত ব্রজবাবু কবিওয়ালাগণের জীবন বৃত্তান্ত ও গীতাবলী সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহার সদিচ্ছা ফলবতী হউক।

১৭৫৬ শক [১৮৩৪ খৃঃ অঃ] পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ৯৩ বৎসর জীবিত ছিলেন— সুতরাং ভারতচন্দ্রের মৃত্যুসময়ে ইঁহার বয়স ১৯ বৎসর ছিল। আমাদের নিজ বাসগ্রাম ইলছোবার নিকটবর্ত্তী 'চাঁপতা' নামক গ্রামই ইঁহার প্রকৃত বাসস্থান; পরে ইনি কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী 'কুমারটুলী' নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে ইনি কার্য্য করিতেন। আদি রসঘটিত গীতরচনায় ইঁহার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। ইঁহার গীতসকল সাধারণতঃ 'নিধুর টপ্পা' নামে প্রসিদ্ধ। আদিরস ভিন্ন নিধুবাবুর রচিত অন্যরূপ গীত অল্প আছে।

নিধুবাবু ভিন্ন অপর গীতরচকদিগের মধ্যে গোজলাগুঁই, রাম বসু, হরুঠাকুর রাসু ও নৃসিংহ, * নিত্যানন্দবৈরাগী (নিতেবৈষ্ণব), কৃষ্ণচন্দ্র চর্ম্মকার (কেষ্টা

---

* কবিবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় রাসু ও নৃসিংহের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"ইহাদের রচিত সুর ও গীত শ্রবণে প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও বিশিষ্ট সন্তান মাত্রেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও সুখী হইতেন। উক্ত উভয় সহোদরের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি গীত ও সুর রচনায় নিপুণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, দুই জনের ভিতর এক ব্যক্তি সুকবি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইঁহারা সখী সংবাদ ও বিরহ গান যাহা যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই অতি উৎকৃষ্ট, অতিশয় শ্রুতি সুখকর ও সর্ব্ববিষয়েই যশোযোগ্য।"

রাসু ও নৃসিংহ দুই সহোদর। ইঁহারা কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ফরাসডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী গ্রামে ইঁহাদের বাস ছিল।

সখীসংবাদ।

মহড়া।

ইহাই ভাবি হে! গোবিন্দ! সঘনে
আঁখি হাসে, পরাণো পোড়ে আগুনে।
কি দোষ বুঝিলে, রাধারে ত্যজিলে
কুঁজীরে পূজিলে কি গুণে?

চিতেন।

জগৎ সংসার, ভুলাইতে পার
তোমার বঙ্কিম নয়নে।
ওহে!—কুঁজী অবহেলে, বসিয়ে বিরলে
তোমারে ভুলালে কি গুণে? ইত্যাদি।

মুচি,) মহেশকাণা প্রভৃতি কয়েকজন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইঁহারা 'কবিওয়ালা' * নামে বিখ্যাত। বোধহয় 'কবি' নামক গীতপ্রণালী ইঁহাদিগের হইতেই প্রথম সৃষ্ট না হউক গৌরবাস্পদ হইয়াছিল। কবিওয়ালাদিগের মধ্যে শাস্ত্রে বুৎপন্ন কেহই ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত কবিত্ব শক্তি ছিল। কবির গানে দুই দল থাকে -এক দল গান গাহিয়া নিবৃত্ত হইলেই অপর দল তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তরস্বরূপ গান বাঁধিয়া গাহিতে আরম্ভ করে এবং সেই সকল উত্তর প্রত্যুত্তর গীত শ্রবণ করিয়া সভসদেরা কাহার জয়—কাহার পরাজয়—হইল, তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। ইঁহাদের প্রতিদলেই এক জন বা দুই জন করিয়া গীতরচক (বাঁধনদার) থাকেন; রামবসু, হরুঠাকুর প্রভৃতি ঐরূপ গীতরচক ছিলেন। গীতরচকেরা কেহই বিদ্যাবিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন না; কিন্তু আসরে বসিয়াই তৎক্ষণাৎ যথোপযুক্তরূপ প্রত্যুত্তরগীতরচনা করিবার

বিরহ।

মহড়া।

কহ সখি ! কিছু প্রেমেরি কথা—
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা।
করিলে শ্রবণো, হয় দিব্য জ্ঞানো
হেন প্রেমধনো, উপজে কোথা।
আমি—এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে
প্রীতি প্রয়াগে মুড়াব মাথা।

চিতেন।

আমি রসিকেরো স্থানো, পেয়েছি সন্ধানো
তুমি নাকি জানো, প্রেমবারতা।
কাপট্য ত্যজিয়ে, কহ বিবরিয়ে
ইহার লাগিয়ে, এসেছি হেথা।

ইত্যাদি।

* কবিওয়ালা দিগের কাহারও সম্পূর্ণ গীতগুলি পাওয়া যায় নাই বা সংগৃহীত হয় নাই। কবিবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বহু চেষ্টাতেও সকলের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

অলৌকিক শক্তি থাকায় ইঁহাদিগকে সকলেই যথেষ্ট সমাদর করিত। বিশেষতঃ তাদৃশ স্বল্পসময়ের মধ্যে রচিত গীতেও অসাধারণ কৌশল ও পাণ্ডিত্যপ্রকাশ থাকিত, এজন্য তাৎকালিক বিজ্ঞলোকেরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়েরা কবির গান শুনিতে বড়ই অনুরক্ত ছিলেন। যাত্রার গানপ্রণালীও তৎকালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভদ্রলোকেরা কবি শুনিতে পাইলে কেহ যাত্রার নিকট ঘেঁসিতেন না। কবিতে লোকের ঐরূপ অনুরাগ হওয়ায়, উহার পরবর্ত্তী সময়েও পরাণদাস, উদয়দাস, নীলমণি পাটনি (নীলুপাটুনি), নীলুঠাকুর, রামপ্রসাদ ঠাকুর, ভোলা ময়রা, চিন্তা ময়রা, ভবানী বেণে, আণ্টুনী সাহেব *

---

* শ্রীযুত দীনেশ বাবু লিখিয়াছেনঃ—"ফরাসী অধিকারভুক্ত গরিটীর নিকট এণ্টুনি কবিওয়ালার বাগানবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। এণ্টুনী পর্ত্তুগীজ ছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা কেলিসাহেব সেই কালের একজন ক্ষমতাপন্ন ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। এণ্টুনী একটি ব্রাহ্মণ রমণীর প্রেমে পড়িয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়েন; তিনি দোল দুর্গোৎসবে সাগ্রহে যোগ দিতেন এবং অবশেষে কবির দল বাঁধিয়া নিজে আসরে নামিয়াছিলেন। তখন ইংরেজ ও বাঙ্গালীতে সমাজগত পার্থক্য এত বেশী ছিল না; মনে করুন, মাথার টুপি ও গায়ের কুর্ত্তি ছাড়িয়া ভদ্র ও ইতর শত শত শ্রোতার গুঞ্জরণে মুখরিত বিস্তীর্ণ আসরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ফিরিঙ্গি কবি গানে তান ধরিয়াছেন। প্রতিপক্ষদলের নেতা ঠাকুর সিংহ সাহেবকে আক্রমণ করিয়া বলিতেছে—

"বলহে এণ্টুনি আমি একটি কথা জান্‌তে চাই।
এসে এদেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই॥"

এণ্টুনী ইহার কি জবাব দিবেন, মনে করিতেছেন। তিনি ঠাকুর সিংহকে 'শ্যালক' সম্বোধনে অভিহিত করিয়া এই আক্রমণের প্রতিশোধ লইলেন—

"এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হ'য়ে ঠাক্‌রে সিংহের বাপের জামাই, কুর্ত্তি টুপী ছেড়েছি॥"

রামবসু আসরে দাঁড়াইয়া সাহেবকে গালি দিয়া পূর্ব্বপক্ষ করিলেন—

"সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদরী সাহেব শুন্‌তে পেলে, গালে দেবে চূণকালী"॥

প্রভৃতি কয়েকজন কবিওয়ালা বিশেষ গৌরব সহকারেই কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। এখনও কবির গানের প্রথা বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাহাতে লোকের সেরূপ অনুরাগও নাই সুতরাং সেরূপ ভাল গীতরচকও আর জন্মেনা। মধ্যে কবির গানের অনুকরণেই কলিকাতার ধনিসন্তানেরা 'হাফ্ আক্‌ড়াই' নামক গানপ্রণালীর আরম্ভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারও অপ্রচলন হইয়াছে।

রামবসু—কলিকাতার পরপারবর্ত্তী শালিখাগ্রামে ভদ্রবংশোদ্ভব কুলীন কায়স্থকুলে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ১৭০৮ শকে (১৭৮৬ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করিয়া ১৭৫০ শকে [১৮২৮ খৃঃ অঃ] পরলোক গমন করেন। কবিওয়ালাদিগের মধ্যে রাম বসু নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার সপ্তমী, সখীসংবাদ, বিরহ প্রভৃতি গানগুলি অতি মনোহর। বিশেষতঃ তাঁহার বিরহবর্ণনার তুলনা নাই। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যথার্থ ই লিখিয়াছেন :—

'যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গালা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু। যেমন ভৃঙ্গের মধ্যে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর-

---

সাহেবের উত্তর,—

"খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে, এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,
ঐ দ্যাখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে,
আমার মানব জনম সফল হবে যদি রাঙ্গা চরণ পাই॥"

এণ্টুনী যে নিজের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন এরূপ বোধহয়না ;—আমোদের জন্য এই মুক্তপ্রাণ সামাজিক বৈষম্যগর্ব্ব বর্জ্জিত, একান্ত অনাড়ম্বর বিদেশী ভদ্রলোকটি দেশীয় সাজে সজ্জিত হইয়া গাহিতেন,—

"আমি ভজন সাধন জানি না মা নিজেত ফিরিঙ্গী।
যদি দয়া ক'রে কৃপাকর হে শিবে মাতঙ্গী॥"

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সং—৬২৭—৬২৮।

প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বসুর গীত।' *
আমরা শুনিয়াছি, একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ব্যক্তি রামবসুর 'বিরহ' শুনিয়া বলিয়াছিলেন "যদি আমার টাকা থাকিত, রামবসুকে লাখ্ টাকা দিতাম!"

হরুঠাকুর—ইনি ১৬৬১ শকে (১৭৩৯ খৃঃ) কলিকাতার অন্তর্বর্ত্তী সিমুলিয়া নামক স্থানে জন্মলাভ করিয়া ১৭৩৬ শকে [১৮১৪খৃঃ অঃ] দেহত্যাগ করেন। ইঁহার প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ী। ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া ইনি সর্ব্বত্র 'ঠাকুর' উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি রামবসু অপেক্ষা বয়সে প্রাচীন ছিলেন। প্রথমে ইঁহার পেসাদারী দল ছিলনা—সক্ করিয়া কবির দলে মিশিয়া গান গাহিতেন। কথিত আছে, একদিন মহারাজ নবকৃষ্ণ তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়া পারিতোষিক স্বরূপ একজোড়া শাল দেন। হরুঠাকুর শাল পুরস্কারে অপমান বোধ করিয়া ঢুলির মাথায় তাহা নিক্ষেপ করেন। ইহাতে রাজা প্রথমে কুপিত হন, পরে তাঁহার পরিচয় পাইয়া পরম সমাদর করেন। অনন্তর রাজা নবকৃষ্ণের প্ররোচনাতেই হরুঠাকুর পেসাদারীদল করিয়াছিলেন, এবং নবকৃষ্ণের মৃত্যুর পর প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সমস্যা পূরণে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, এজন্য গুণগ্রাহী মহারাজ নবকৃষ্ণ তাঁহাকে বড়ই সমাদর করিতেন। একবার মহারাজের বাটীতে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ হয়। মহারাজ পণ্ডিত মণ্ডলীকে বলিলেন—"আপনারা আমার এই সমস্যাটীর পূরণ করিয়া দিউন—'বঁড়শী বিঁধিছে যেন চাঁদে'। পণ্ডিতগণ ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই উত্তর করিতে পারিলেন না। বিলম্ব দেখিয়া মহারাজ হরুঠাকুরকে ডাকিতে পাঠাইলেন। হরুঠাকুর তখন গামোছা কাঁধে ফেলিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। সেই অবস্থাতেই তিনি রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে সমস্যা পূরণ করিয়া দিতে বলিলেন। হরুঠাকুর কাগজ কলম লইয়া সমস্যা পূরণ করিতে বসিলেন; তাঁহাকে অধিকক্ষণ চিন্তা করিতে হইল না, তিনি সমস্যাপূরণ করিয়া দিলেন—

---

* সংবাদ প্রভাকর।

"একদিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভোজন করি, ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।

রাণী অঙ্গুলি হেলায় ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে, বঁড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে॥

উত্তর শুনিয়া মহারাজ অতীব প্রসন্ন হন এবং হরুঠাকুরকে যথেষ্টরূপ পুরস্কৃত করেন। হরুঠাকুর স্বভাবকবি ছিলেন। তাঁহার 'সখীসংবাদ' সঙ্গীত অতীব মনোহর।

কবিওয়ালা দলের মধ্যে হরুঠাকুর ও রামবসুর মত অপর কেহই তাদৃশ প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের বিষয় লিখিয়া গ্রন্থবাহুল্য না করিয়া পাঠকদিগের প্রদর্শনার্থ উহাঁদের কয়েক জনের রচিত কয়েকটি গীত নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধ সমাপন করা গেল।

"নয়ন নীরে কি নিবে মনের অনল। সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল॥
তৃষায় চাতকী মরে, অন্যবারি নাহি হেরে, ধারাজল বিনা তার সকলই বিফল॥
যবে তারে হেরি সখি, হরিষে বরিষে আঁখি, সেই নীরে নিবে জানি অনল প্রবল॥

(নিধুবাবু)।

সখীসংবাদ।—মহড়া।

"ইহাই কি তোমারি, মনে ছিল হরি, ব্রজকুলনারী, বধিলে। বলনা কি বাদ সাধিলে॥
নবীনো পিরীতো, না হইতে নাথো, অঙ্কুরে আঘাতো, করিলে॥

চিতেন।

একি অকস্মাতো, ব্রজে বজ্রাঘাতো, কে আনিল রথো গোকুলে।
অক্রূরো সহিতে, তুমি কেন রথে, বুঝি মথুরাতে, চলিলে॥

অন্তরা।

শ্যাম ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে, ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাবো, শুন হে মাধবো, তোমারি প্রেমেরো প্রয়াসী॥ (হরুঠাকুর)।

বিরহ।—মহড়া।

"মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে, যখন যায়গো সে, তারে বলি, বলি, আর বলা হলো না।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।

যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে, নিলজ্জা রমণী বোলে হাসিতো লোকে।
সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে, নারীজনম্ যেন করেনা ॥

চিতেন।

একে আমার এ যৌবনকাল, তাহে কাল বসন্ত এলো।
এ সময় প্রাণনাথো প্রবাসে গেলো।
যখন্ হাসি হাসি, সে আসি বলে,—সে হাসি, দেখে ভাসি নয়নের জলে ॥
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন্ চায় ধরিতে, লজ্জা বলে ছি ছি ধরোনা॥"(রামবসু)।

এই গানটির সম্বন্ধে 'সেকাল আর একাল' প্রণেতা পরলোকগত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—'কি বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম! সাধ্বী কুলকামিনীদিগের লজ্জার কি মোহন চিত্র!' এইরূপ মনোহর চিত্রে রামবসুর গীতাবলি সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

—:*:—:*:—

ইংরেজদিগের কৃত বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি।

পূর্ব্বোল্লিখিত কবিওয়ালাদিগের সমকালে অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতেও ভারতবর্ষাগত কয়েকজন ইংরেজ মহোদয়দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। ইংরেজেরা যদিও ১৬৮৭ শকে [১৭৬৫ খৃঃ অঃ] বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি ১৬৯৪ শকের [১৭৭২ খৃঃ অঃ] পূর্ব্বে তাঁহারা রাজকার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ-করেন নাই। উক্ত অব্দে তাঁহারা ঐ ভার গ্রহণ করিলে এতদ্দেশীয় ভাষা প্রভৃতি শিক্ষা করা ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের আবশ্যক হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড্ সাহেব সিবিলিয়ানপদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আইসেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম সহকার বাঙ্গালা ভাষা পাঠ করেন, এবং বোধ হয় ইংরেজদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে এই ভাষায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১৭০০ শকে [১৭৭৮ খৃঃ অঃ] তিনি ইংরেজি ভাষায় একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করেন। ইহাই সর্ব্ব-প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ। তৎকালে কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্র ছিল না; বিশেষতঃ

বাঙ্গালার ছাপা অক্ষর তৎপূর্ব্বে সৃষ্ট হয় নাই। চিরস্মরণীয় চার্লস্, পরে (সার চার্লস্) উইল্কিন্স্ নামা এক সাহেব ঐ সময়ে এদেশে অবস্থিত ছিলেন। তিনি প্রগাঢ়পরিশ্রমসহকারে সংস্কৃত প্রভৃতি এদেশের নানাভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি অতিশয় শিল্পদক্ষ ও উৎসাহশীল ছিলেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে স্বহস্তে ক্ষুদিয়া ও ঢালিয়া একপ্রস্থ বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। ঐ অক্ষরে তাঁহার বন্ধু হালহেড্ সাহেবের ব্যাকরণ হুগলীতে মুদ্রিত হইয়াছিল। অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, মুদ্রাযন্ত্রদ্বারা এদেশে ভাষার যে, এতদূর উন্নতি হইয়াছে, উল্লিখিত মহাত্মা উইল্কিন্স্ * সাহেবই তাহার আদিকারণ।

---

* "The advice and even solicitation of the Governor-general prevailed upon Mr. Wilkins, a gentleman who has been some years in the India company's Civil Service in Bengal, to undertake a set of Bengal types. He did and his success has exceeded every expectation.

"In a country so remote from European artists, he has been obliged to charge himself with all the various occupations of the Metallurgist, the Engraver, the Founder and the Printer. To the merit of invention he was compelled to add the application of personal labour. With a rapidity unknown in Europe, he surmounted all obstacles which necessarily clog the first rudiments of a difficult art, as well as the disadvantages of solitary experiment; and has thus singly on the first effort exhibited his work in a state of perfection which in every part of the world has appeared to recognise the united improvements of different projectors, and the gradual polish of successive ages." 'A Grammar of the Bengal Language By Nathaniel Brassey Halhed. Printed at Hooghly in Bengal MDCCLXXVIII (1778). Preface (XXIII—XXIV).

গ্রন্থের উপরিভাগে প্রবচন (motto) স্বরূপ লেখা আছে—

'বোধ প্রকাশং শব্দশাস্ত্রং
ফিরিঙ্গীনামুপকারার্থং.
ক্রিয়তে হালেদঙ্গ্রেজী ॥'

১৭১৫ শকে [১৭৯৩ খৃঃ অঃ] লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বাহাদুর যে সকল আইন সংগৃহীত করেন, ফরষ্টর্ সাহেব সেই সকল আইন বাঙ্গালাতে অনুবাদ-করিয়াছিলেন। এই সাহেব তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষায় উত্তম বাঙ্গালা জানিতেন। ইহার কিয়ৎকালপরে অর্থাৎ ১৮০১ সালে ইনিই বাঙ্গালাভাষায় সর্ব্ব-প্রথম অভিধান প্রস্তুত করেন। সে অভিধান এখন আর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৭২১ শকে [১৭৯৯ খৃঃ অঃ] মার্সমান, ওয়ার্ড প্রভৃতি একদল পাদ্রী সাহেব শ্রীরামপুরে আসিয়া অবস্থান করেন। পরে পাদ্রী উইলিয়াম কেরি সাহেব ঐ স্থানে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার-করা যদিও ঐ সাহেবদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি তৎপ্রসঙ্গে তাঁহা-দিগের দ্বারা বাঙ্গালাভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যেরূপ চৈতন্যসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গালা পদ্য রচনার উন্নতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পাদ্রী সাহেবদিগের দ্বারাই বাঙ্গালা গদ্য রচনা সমধিক অনুশীলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত সাহেবেরা শ্রীরামপুরে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া দেবনাগর, বাঙ্গালা প্রভৃতি এতদ্দেশীয় নানাবিধ অক্ষর প্রস্তুত করাইলেন, এবং সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি, উড়িয়া প্রভৃতি নানাভাষায় বাইবেল অনুবাদিত করিয়া ঐ যন্ত্রে মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রাচীন প্রাচীন গ্রন্থ সকলও উহাতে মুদ্রিত হইতে লাগিল। ঐ সকল পাদ্রীমহোদয়েরা ঐ সময়ে কয়েকটি বাঙ্গালা স্কুলের স্থাপন করিয়া-ছিলেন। তাহারও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠ্যপুস্তকসকল ঐ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য সর্ব্বপ্রথমে আরম্ভ হওয়ায়, ঐ নগর অদ্যাপি ছাপা-অক্ষর নির্ম্মাণবিষয়ে প্রাধান্যলাভ করিতেছে।

আমরা যে সময়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, ঐ সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত হালহেড, উইল্কিন্স, ফরষ্টার, কেরি, মার্সমান এবং কোলব্রুক, স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতি অনেকগুলি ইংরেজ মহোদয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ভাষা-

সকলের অনুশীলনে ও উন্নতিবিধানে সাতিশয় যত্নবান্ হইয়াছিলেন। সুতরাং দেশীয়ভাষার উন্নতিপ্রার্থীদিগের পক্ষে উক্ত মহোদয়দিগের প্রতি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের এদেশীয়ভাষাশিক্ষার জন্য ১৭২২ শকে [১৮০০ খৃঃ অঃ] কলিকাতায় 'ফোর্ট্ উইলিয়মকলেজ' নামক যে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, উক্ত সাহেবদিগের কেহ কেহ তাহাতে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ বিদ্যালয়ের ব্যবহারের জন্য অনেকগুলি বাঙ্গালাপুস্তক রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত কেরি সাহেব ঐ স্থানে থাকিয়াই বাঙ্গালা ও ইংরেজিতে ব্যাকরণ ও অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে ব্যাকরণ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, কিন্তু অভিধান এখন অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ অভিধান রচনায় উক্ত সাহেবের অসামান্য বিদ্যা, অসামান্য যত্ন ও অসাধারণ অধ্যবসায় প্রদর্শিত হইয়াছে। মার্সমান সাহেব উহাকেই সঙ্ক্ষিপ্ত করিয়া অভিধান প্রস্তুত করিয়াছেন। সাহেবভিন্ন কয়েকজন বাঙ্গালীও ঐ কলেজের অধ্যাপক হইয়া কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রামরাম বসু ১৮০১ খৃষ্টাব্দে 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও ১৮০২ অব্দে 'লিপিমালা' নামক দুইখানি গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। রামরাম বসু সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন কি না বলা যায় না, কিন্তু তিনি গ্রন্থ রচনায় সংস্কৃতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গালাভাষার চিরন্তন রীতিও তাঁহার অবলম্বনীয় হয় নাই। কথিত আছে তিনি পারসীতে পারদর্শী ছিলেন, এজন্য স্বকীয় গ্রন্থে পারস্য ভাষার প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছেন।

প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভাষা এইরূপ ঃ—

"ইহা ছাড়াইলে পূরির আরম্ভ। পূবে সিংহদ্বার পূরির তিন ভিতে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সরাসরি লম্বা—তিন দালান তাহাতে পশুগণের রহিবার স্থল। উত্তর দালানে সমস্ত দুগ্ধবতী গাভীগণ থাকে দক্ষিণভাগে ঘোড়া ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও উট তাহাদের সাতে সাতে আর আর অনেক অনেক পশুগণ।

"এক পোয়া দীর্ঘপ্রস্থ নিজপূরি। তার চারি দিকে প্রস্তরে রচিত দেয়াল,

পুবের দিকে সিংহদ্বার তাহার বাহিরভাগে পেটকাটা দরজা। শোভাকর দ্বার অতি উচ্চ—আমারি সহিৎ হস্তি বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর এক স্থান তাহার নাম নওবৎখানা—তাহাতে অনেক অনেক প্রকার জন্ত্রে দিবা রাত্রি সময়ানুক্রমে জন্ত্রিরা বাদ্যধ্বনি করে।

"নওবৎখানার উপরে ঘড়িঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহারদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া থাকে দণ্ড পূর্ণ হবামাত্রেই তারা তাহাদের ঝাঁজের উপর মুদ্গর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।

লিপিমালায় পত্রস্থলে নানাবিষয়ের প্রসঙ্গ আছে। গদ্যরচনায় রামরাম বসুর ক্ষমতা ছিল না।

ইহার পর রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় 'কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র' ১৮০১ (লং সাহেবের তালিকায় ১৮০৫ অব্দে প্রথমবার মুদ্রিত বলিয়া লিখিত) নামক যে গদ্য গ্রন্থ প্রচারিত করেন, তাহাতে প্রাঞ্জলতা ও রচনারীতির উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়।

'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র' উভয় গ্রন্থই কেরি সাহেবের প্রস্তাবানুসারে প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্রের রচনাপ্রণালী এইরূপ :—

"পরে কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রমত প্রজা পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ্যের লোকের দিগের কোন ব্যামোহ নাই ভৃত্যবর্গেরা নিজ নিজ কার্য্যে প্রাধান্য করিয়া কাল ক্ষেপণ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুখ্যাতির সীমা নাই। তখন রাজধানী মুরসিদাবাদে নবাব সাহেবের নিকট মহারাজের অত্যন্ত সংভ্রম সর্ব্বপ্রকারে মহারাজ চক্রবর্ত্তির ন্যায় ব্যবহার। একদিবস মহারাজ পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পূর্ব্বে এ বংশে যে সকল রাজগণ হইয়াছিলেন তাঁহারা কেহ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে পাত্র নিবেদন করিল মহারাজ আমরা পুরুষানুক্রমে এ রাজ্যের পাত্র কিন্তু যে সকল মহারাজারা গিয়াছেন, আর আর প্রকার সুখ্যাতি করিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞ কেহ করেন নাই। মহারাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্রকে

কহিলেন, আমি অতি বৃহদ্ যজ্ঞ করিব তুমি আয়োজন কর। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া কি যজ্ঞ করিবেন, তাহা স্থির করুন পশ্চাৎ যেমন যেমন আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব। পাত্রের বাক্যে রাজা সর্ব্বত্র লিপি প্রেরিত করিলেন।” ... ...

‘প্রতাপাদিত্য চরিত্রের’ সাত বৎসর পরে ১৮০৮ খৃঃ অব্দে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত পণ্ডিতপ্রবর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ‘রাজাবলী’ এবং ১৮১৩ অব্দে ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’ প্রকাশ করেন। ‘রাজাবলী’ গ্রন্থে কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরেজের অধিকার পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাট্‌দিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। প্রবোধচন্দ্রিকার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

——০——
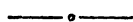
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের ‘প্রবোধচন্দ্রিকা’।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জন্মভূমি উৎকলদেশ। ইনি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতায় ইনি প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন; তৎপরে কিয়ৎকালের জন্য তত্রত্য সদরদেওয়ানি আদালতের জজপণ্ডিতও হইয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্রিকা উক্ত কলেজের ছাত্র-দিগের নিমিত্তই রচিত হয়। উহা ১৭৩৫ শকে [১৮১৩ খৃঃ অঃ] প্রথম মুদ্রিত হয়।

প্রবোধচন্দ্রিকা আদ্যোপান্ত সমুদয়ই গদ্যে লিখিত। ইহা নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থ নহে। ‘স্তবক’ নামে ইহার ৪টি ভাগ আছে—প্রতিভাগের আবার ‘কুসুম’ নামে অনেকগুলি অবান্তর অংশ আছে। গ্রন্থের প্রথমেই ভাষার প্রশংসা। পরে বিক্রমাদিত্য তনয় বৈজপাল রাজা শ্রীধরাধর নামক স্বীয় পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার অভিলাষে তৎসমক্ষে বিদ্যার অনেকরূপ গুণানুবাদ করিয়াছেন; তৎপরে আচার্য্যপ্রভাকরের নিকটে বিদ্যাশিক্ষার্থ পুত্রকে সমর্পণ

করিয়াছেন। প্রভাকর রাজপুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বর্ণবিচার হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রীয় অনেক বিষয়ের উপদেশ দিয়াছেন এবং তৎপরে হিতোপদেশদানচ্ছলে লৌকিক শাস্ত্রীয় নানারূপ বিষয়ের নানাবিধ উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে, "এই উপস্থিত গ্রন্থ যে ব্যক্তি বুঝিতে পারেন এবং ইহার লিপিনৈপুণ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন বলা যাইতে পারে।' একথা অযথার্থ নহে। সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ব্যতিরেকে এ গ্রন্থের সমুদয়ভাগ কেহই, বোধ হয়, বুঝিতে পারেন না। এখানি সম্যক্ বুঝিতে পারিলে যে, অনেক বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার ইহাতে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, ছন্দ, স্মৃতি, ন্যায়, সাংখ্য, জ্যোতিষ, রাজনীতি প্রভৃতি শাস্ত্রের কত কথাই যে, মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সঙ্খ্যা নাই। তদ্ভিন্ন উপাখ্যান কথনাবসরে বণিক্, কৃষক, গোপ, সূত্রধর, রজক, চর্ম্মকার প্রভৃতি নানা ব্যবসায়িক স্ত্রী পুরুষ সাধারণের তত্তদ্ব্যবসায়সম্পৃক্ত চলিত ভাষা সকল এত প্রয়োগ করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে এত প্রহেলিকা ও জনপ্রবাদের অবতারণা করিয়াছেন যে, তৎপাঠে ভিন্নজাতীয় লোকদিগের বাঙ্গালার অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইতে পারে।

এ সকল গুণ থাকিলেও প্রবোধচন্দ্রিকা কোনরূপে উৎকৃষ্ট গ্রন্থমধ্যে গণ্য হইতে পারে না। এই গ্রন্থে উপদেশজনক ভূরি ভূরি কথার সমাবেশ আছে সত্য বটে, কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তার সম্যক্ সহৃদয়তার অভাবে সে সকল সুশৃঙ্খলরূপে সম্বদ্ধ হয় নাই। কোন গৃহে প্রবেশ করিয়া থালা, ঘটী, বাটী, বস্ত্র, পুস্তক, পেড়া, বাক্স, স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি, মুক্তা, প্রবাল, লেপ, কাঁথা, ছেঁড়ামাদুর প্রভৃতি বস্তু সকল একত্র বিশৃঙ্খল ও উপর্য্যুপরিভাবে অবস্থাপিত দেখিলে নয়নের যেরূপ অপ্রীতি জন্মে, প্রবোধচন্দ্রিকা পাঠেও সেইরূপ অপ্রীতি উপস্থিত হয়;—ঐ সকল বস্তু সুশৃঙ্খলভাবে যথাযথস্থানে সজ্জীকৃত দেখিলে যেরূপ আহ্লাদ জন্মে, ইহাতে সে আহ্লাদ জন্মে না। তদ্ভিন্ন ইহার ভাষাও নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও অত্যন্ত নীরস। কোন স্থল দীর্ঘসমাসসমন্বিত এবং নিতান্ত অপ্রচলিত শব্দদ্বারা গ্রথিত, কোন স্থল

মহাত্মা রামমোহন রায়।

বা একান্ত অপভ্রংশপদদ্বারা বিরচিত। কোন কোন স্থানের বাক্যের দীর্ঘতা ও বিশৃঙ্খলতা জন্য অর্থবোধই হইয়া উঠে না। যাহা হউক ভাষার এরূপ অপ্রাঞ্জলতা জন্য গ্রন্থকার অধিক দোষভাগী হইতে পারেন না, কারণ তিনি যে সময়ের লোক এবং যেরূপে শিক্ষিত লোক, তাহাতে তাঁহার লেখনী হইতে উহা অপেক্ষা প্রাঞ্জলতর ভাষা বহির্গত হইবে, এরূপ আশা করা একপ্রকার অসঙ্গত। প্রবোধচন্দ্রিকার অনেকস্থল যে উৎকট সাধুভাষায় লিখিত—তাহার একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে:—'কোকিল কলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল, সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।'

আজিও সংস্কৃতশাস্ত্রে পরমপ্রবীণ মহামহোপাধ্যায় চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়-দিগকে একপাত বাঙ্গালা লিখিতে দিলে তাহারা প্রায় ঐরূপ বাঙ্গালাই লিখিয়া বসিবেন। অদ্যাপি তাহাদের অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, কঠিন, জটিল ও দুর্ব্বোধ রচনাতেই পাণ্ডিত্যপ্রকাশ হয়। আমাদের শুনা আছে যে, এক সময়ে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ের বিচার হয়। সিদ্ধান্ত স্থির হইলে একজন স্কুলের পণ্ডিত তাহা বাঙ্গালায় লেখেন। সেই রচনা শ্রবণ করিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন—"এ কি হয়েছে!—এ যে বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা হয়েছে!—এ যে অনায়াসে বোঝা যায়!!"

রামমোহন রায় কৃত পুস্তকাদি।

বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিচিকীর্ষু উল্লিখিত ইংরেজমহোদয়গণের সমকালেই মহাত্মা রামমোহন রায় প্রাদুর্ভূত হন। ইনি বাঙ্গালা ভাষার অনেক উন্নতি সাধন করেন। ১৬৯৬ শকে [১৭৭৪ খৃঃ অব্দে] হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণ-নগরের সন্নিহিত রাধানগর নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। রামমোহন শৈশবকালে গ্রাম্য গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পাটনা নগরীতে গমনপূর্ব্বক পারসী ও আরবী অধ্যয়ন করেন। এই ভিন্ন-

দেশীয় ভাষার অনুশীলন কালেই হিন্দুদিগের দেবদেবী প্রভৃতি সমস্তই কাল্পনিক বলিয়া তাঁহার প্রথম উদ্বোধ হয়। তৎপরে তিনি বারাণসীগমনপূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সংস্কৃতশাস্ত্রের প্রগাঢ় অনুশীলন দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার প্রথমোদ্বুদ্ধ বিদ্বেষভাব বিচ্ছিন্ন না হইয়া বরং দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিল। তদনুসারে তিনি পুরাণপ্রতিপাদ্য হিন্দুধর্ম্ম যাহাতে সকলের মন হইতে অপনীত হয়, এবং "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বচনানুসারে অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা দেশমধ্যে প্রচারিত হয়, তদর্থ যত্নবান্ হইলেন এবং তদুপায়স্বরূপ ১৬ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়েই "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিলেন। এই গ্রন্থ দর্শনে তাঁহার পিতা বড়ই বিরক্ত ও কুপিত হইলেন; তাহাতে রামমোহন দুঃখিত হইয়া পিতৃভবন পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতবর্ষের নানাস্থানের প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালীর অবগতির জন্য অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে বৌদ্ধধর্ম্ম উত্তমরূপে শিক্ষা করিবার অভিলাষে তিব্বৎদেশে গিয়া তিন বৎসরকাল বাস করিলেন এবং তথা হইতে পুনর্ব্বার বাটী আসিয়া শাস্ত্রানুশীলনও "ব্রাহ্মধর্ম্ম" প্রচারের চেষ্টাতেই সতত উদ্যত রহিলেন।

২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমাগত ৬।৭ বৎসর পরিশ্রম করিয়া ইহাতেও বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছিলেন—এরূপ পারদর্শী যে, ইংরেজিভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দৃঢ়তর অধ্যবসায়সহকারে অনুশীলন করিয়া ক্রমে ক্রমে হিব্রু, লাটিন, গ্রীক, ফরাসী প্রভৃতি সমুদয়ে ১০টি প্রধান প্রধান ভাষায় লব্ধাধিকার হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে (১৮০৩), তিনি রঙ্গপুরের কলেক্টরের নিকট প্রথমে কেরাণীগিরি এবং পরে দেওয়ানিপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জনশ্রুতি এই যে, ঐ স্থানে কর্ম্ম করিয়া তিনি বার্ষিক ১০,০০০৲ টাকা আয়ের এক জমীদারী ক্রয় করিতে পারিয়াছিলেন। অনন্তর ১৭৩৬ শকে [১৮১৪ খৃঃ অঃ] কলিকাতায় আসিয়া স্থায়ীরূপে বাস করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর হইয়াছিল। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি কেবল শাস্ত্রালোচনা এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারদ্বারা কুসংস্কারাবিষ্ট অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকদিগকে উৎকৃষ্ট পথে আনয়ন এই দুই

কার্য্যের চেষ্টাতেই সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। এই প্রসঙ্গে দেশীয় বিদেশীয় অনেকানেক পণ্ডিতদের সহিত তাঁহাকে সর্ব্বদাই বিচার করিতে হইত। সেই সকল বিচার প্রায় বাচনিক হইত না—লিখিত হইত। এইজন্য তাঁহাকে ইংরেজি ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই বেদান্ত, উপনিষদ্ প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রের অনুবাদ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গ্রন্থ রচনা করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বিপক্ষেরাও 'পাষণ্ড-পীড়ন' ও অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করিয়া তাঁহার মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল তাহা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, এমত নহে—রামমোহন রায়কে ধর্ম্মনাশকারী বলিয়া পথিমধ্যে প্রহার করিবার চেষ্টা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ঐ প্রহারের ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষিবেষ্টিত হইয়া গমনাগমন করিতে হইত। কিন্তু তিনি এ সমস্ত অক্ষুব্ধচিত্তে সহ্য করিয়া নিজ উদ্দেশ্য-সাধনবিষয়ে ক্ষণমাত্র ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন নাই। যে সকল লোক তাঁহার ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন। তিনি "ধর্ম্মতলা ইউনিটেরিয়ান যন্ত্রালয়" নামক একটি মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে নিজ মতানুসারী গ্রন্থ এবং বিপক্ষদিগের প্রদত্ত দূষণার উত্তর সকল মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতার বর্ত্তমান 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রধানতঃ তাঁহা কর্ত্তৃকই ১৭৫০ শকে [১৮২৮ খৃঃ অঃ] প্রথম সংস্থাপিত হয়। ১৭৫১ শকে [১৮২৯ খৃঃ অঃ] রাজবিধি দ্বারা যে, হিন্দুজাতীয় সতীদিগের মৃতপতির সহিত সহমরণ প্রথা নিবারিত হয়, রামমোহন রায় তদ্বিষয়েও একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। প্রাচীন হিন্দুসম্প্রদায় রামমোহনরায়ের এই সকল কার্য্যকলাপসন্দর্শনে মহা-দুঃখিত, ভীত ও কুপিত হইলেন এবং হিন্দুধর্ম্মের সংরক্ষণার্থ 'ধর্ম্মসভা' নামে এক সভা সংস্থাপন করিলেন। কিছুকালপর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্মসভায় নানারূপ তর্ক বিতর্ক হইয়াছিল। এক্ষণে সে ধর্ম্মসভা আর জীবিত নাই।

রামমোহন রায় বহুদিন হইতে বিলাত যাইবার জন্য বড়ই অভিলাষী ছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। এক্ষণে দিল্লীর বাদসাহ তাঁহার নিজের কোন কার্য্যসাধনের উদ্দেশে তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি

প্রদানপূর্ব্বক বিলাত পাঠাইতে প্রস্তুত হইলে, তিনি ১৮৩০ খৃঃ অব্দের ১৫ই নবেম্বরে অপর তিনজন দেশীয় লোক সমভিব্যাহারে বিলাত যাত্রা করেন। তাঁহার পূর্ব্বে বোধ হয় কোন হিন্দু বিলাত গমন করেন নাই। বিলাতে যাইবার সময়ে জাহাজে তিনি কেবল শাস্ত্রানুশীলন, ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়াই পরমানন্দে কালযাপন করিতেন। ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে তত্রত্য প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মানুরাগ ও বাক্‌পটুতা প্রভৃতির আধিক্য দেখিয়া তাঁহার পরম সমাদর ও মহাসম্ভ্রম করিয়াছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াই ফ্রান্সে গমন করেন এবং তথা হইতেই রুগ্ন হইয়া পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে যান এবং সেই স্থানেই ১৮৩৩ খৃঃ অব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর হইয়াছিল। ব্রিষ্টল্ নগরের সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার শব সমাহিত হইয়াছে।

'পৌত্তলিকদিগের ধর্ম্মপ্রণালী', 'বেদান্তের অনুবাদ' 'কঠোপনিষদ্', 'বাজসনেয়সংহিতোপনিষদ্', 'মাণ্ডুক্যোপনিষদ্' 'পথ্যপ্রদান' প্রভৃতি রামমোহন রায়-রচিত যে কয়েকখানি বাঙ্গালাপুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই শাস্ত্রীয়-গ্রন্থের অনুবাদ এবং পৌত্তলিকমতাবলম্বী প্রাচীন ভট্টাচার্য্যমহাশয়দিগের সহিত বিচার। ঐ সকল বিচারে তিনি নিজের নানাশাস্ত্রবিষয়ক প্রগাঢ় বিদ্যা, বুদ্ধি, তর্কশক্তি, শাস্ত্রের সারগ্রাহিতা, বিনয়, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি ভূরি ভূরি সদ্‌গুণের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিবিষ্টচিত্তে সে সকল অধ্যয়ন-করিলে চমৎকৃত ও তাঁহার প্রতি ভক্তিরসে আপ্লুত হইতে হয়। সে সকল ধর্ম্মসম্পৃক্তবিষয় এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে প্রদর্শনকরা আমাদিগের অভিমত নহে, ইচ্ছা হইলে তাঁহারা সেই সকল গ্রন্থ পাঠকরিয়া দেখিতে পারিবেন। যাহাহউক ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, রামমোহন রায়ের সময়েই তাঁহার রচিত উল্লিখিত গ্রন্থসকল এবং তদুত্তরে পৌত্তলিকমতাবলম্বী ভট্টাচার্য্যমহাশয়দিগের রচিত গ্রন্থ ও পত্রিকা সকলের দ্বারাই বিশুদ্ধভাবে বাঙ্গালা গদ্যরচনার রীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

রামমোহন রায় রচিত ধর্ম্মসম্পর্কশূন্য অপর কোন গ্রন্থ আছে কি না, তাহার

সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কেবল 'গৌড়ীয়ভাষার ব্যাকরণ' নামে একখানি ব্যাকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা তিনি মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত বিলাত-গমনের পূর্ব্বে 'কলিকাতাস্কুলবুকসোসাইটী'কে প্রদান করিয়া যান। অল্পমূল্যে উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রচার করিবার উদ্দেশে কতিপয় ইউরোপীয় ও দেশীয় মহাশয়-দিগের যত্নে ১৭৩৯ শকে [১৮১৭ খৃঃ অঃ] এই সোসাইটী সংস্থাপিত হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের ঐ ব্যাকরণ উক্ত সোসাইটীদ্বারা অদ্যাপি প্রকাশিত হইতেছে। বোধ হয় ঐ ব্যাকরণখানি বাঙ্গালাভাষার পঞ্চম ব্যাকরণ। উহা ইংরেজী ব্যাকরণের রীতি অবলম্বনে লিখিত—উহাতে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষার্থীদিগের অনেকগুলি জ্ঞাতব্যবিষয় নিবেশিত আছে। ইংরেজিতেও তাঁহার ঐরূপ একখানি ব্যাকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা-খানি ঐ ইংরেজিরই অনুবাদ।

রামমোহন রায়ের যে আর একটি মহতী শক্তি ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার উল্লেখ করা যায় নাই। তিনি অত্যুৎকৃষ্ট গান রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার ব্রহ্মসঙ্গীত বোধ হয় পাষাণকেও আর্দ্র, পাষণ্ডকেও ঈশ্বরানুরক্ত ও বিষয়নিমগ্ন মনকেও উদাসীন করিয়া তুলিতে পারে। ঐ সকল গীত যেরূপ প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ, সেইরূপ বিশুদ্ধ-রাগ-রাগিণী-সমন্বিত; অনেক কলাবতে সমাদর-পূর্ব্বক উহা গাইয়া থাকেন। তাঁহার রচিত প্রায় দেড় শত গান আমরা দেখিতে পাইয়াছি, তন্মধ্যে নিম্নভাগে দুইটীমাত্র উদ্ধৃত করিলাম—

"মনে স্থির করিয়াছ চিরদিন কি সুখে যাবে।
জীবন যৌবন ধন মান রবে সমভাবে॥
এই আশা তরুতলে, বসিয়াছ কুতূহলে,
বিষয় করিয়া কোলে, জাননা ত্যজিতে হবে।
অরে মন শুন সার, দিবা অন্তে অন্ধকার,
সুখান্তে দুঃখেরি ভার, বহিতে হবে—
অতএব অবধান, যে অবধি থাকে প্রাণ,
ব্রহ্মে কর সমাধান, নির্ম্মল আনন্দ পাবে॥ ১॥

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর !
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু, তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত, হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর ॥ ২ ॥

মদনমোহনতর্কালঙ্কার প্রণীত রসতরঙ্গিণী প্রভৃতি।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুসময়ে মদনমোহনতর্কালঙ্কার যুবা পুরুষ ছিলেন। ইঁহার জীবনবৃত্তসংক্রান্ত ২।৩ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে—তন্মধ্যে এক-খানি "কবিবর ৺মদনমোহনতর্কালঙ্কারের জীবনচরিত ও তদ্‌গ্রন্থসমালোচনা" নামে তাঁহার নিজ জামাতার রচিত। ইহাতে সমুদয় বিষয়ের বিস্তৃত ও সটীক সংবাদ আছে। অতএব আমরা এ বিষয়ে কিছু বাহুল্য না করিয়া সঙ্ক্ষেপেই তাঁহার জীবনবৃত্ত প্রকটিত করিলাম।

এই মহোদয় ১৭৩৭ শকে [১৮১৫ খৃঃ অঃ] নদীয়া জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী বিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺রামধন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের একজন পুস্তক লেখক ছিলেন। তাঁহার পর তদীয় ভ্রাতা ৺রামরত্ন চট্টোপাধ্যায় ঐ কার্য্য প্রাপ্ত হয়েন। ইনিই প্রথমে মদনমোহনকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া সংস্কৃতকলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিয়দ্দিবস তথায় থাকিয়াই মদনমোহন রোগাক্রান্ত হইয়া দেশে আইসেন এবং সেই স্থানেই কিয়ৎকাল চতুষ্পাঠিতে ব্যাকরণ ও

সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। পুনর্ব্বার তিনি কলিকাতা সংস্কৃতকলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৭৬৪ শক [১৮৪২ খৃঃ অঃ] পর্য্যন্ত তথায় অবস্থানপূর্ব্বক ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র সকল ক্রমে ক্রমে অধ্যয়ন করেন। এই সঙ্গে কিঞ্চিৎ ইংরেজীও শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই পঠদ্দশাতেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার অকপট প্রণয় জন্মে। তৎকালে তাঁহারাই দুইজনে যে, সংস্কৃত কলেজের সমুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। পঠদ্দশাতেই মদনমোহন 'রসতরঙ্গিণী' ও 'বাসবদত্তা' নামে দুইখানি পদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তিসন্দর্শনে সুকবি ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও সহৃদয়াগ্রগণ্য গুণনিকষ পূজ্য পাদ ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় প্রভৃতি কলেজের তাৎকালিক অধ্যাপক মহাশয়েরা তাঁহার প্রতি যারপরনাই প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কবিত্বের অনুরূপ 'কাব্যরত্নাকর' উপাধি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা জানি না, কি জন্য তাহার বন্ধুগণ কর্ত্তৃক 'তর্কালঙ্কার' উপাধিদ্বারা সেই উপাধি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

পাঠ সমাপ্ত করিয়া তর্কালঙ্কার কলিকাতার বাঙ্গালা পাঠশালা, বারাসত বিদ্যালয়, কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়মকলেজ ও কৃষ্ণনগরকলেজ, এই কয়েক বিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করিয়া পরিশেষে ১৭৬৯ শকে [১৮৪৭ খৃঃ অঃ] কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদে উন্নীত হন। তাঁহার সেই সহাস্য-বদনবিনির্গত রসপূর্ণ মধুর অধ্যাপনা যেখানকার যে ছাত্র একবার শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাহা আর এজন্মে ভুলিতে পারিবেন না। তর্কালঙ্কার কেবল নামেই মদন ছিলেন না—কমনীয় রূপ ও সর্ব্বজন-রমণীয় রসিকতাতেও মদন ছিলেন। তিনি তিন বৎসরমাত্র সংস্কৃত কলেজে ছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তাঁহা দ্বারা তথায় অনেকগুলি দেশহিতকর কার্য্য সংসাধিত হইয়াছিল। কলিকাতার 'সংস্কৃতযন্ত্র' নামক মুদ্রাযন্ত্র তাঁহারই যত্নে স্থাপিত এবং তাহাতে বাঙ্গালা সংস্কৃত অনেকগুলি প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এই সময়েই শিক্ষাসমাজের সর্ব্বাধ্যক্ষ জে, ই, ডি, বেথুন সাহেব তর্কলঙ্কারের গুণগান শুনিয়া তাঁহার সহিত

আলাপ করেন। নিঃস্বার্থ পরহিতৈষী সাহেব মহোদয় অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন এতদ্দেশীয় কামিনীদিগের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত কলিকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলে তর্কালঙ্কারই প্রধান উদ্যোগী হইয়া হেদুয়ার তীরস্থ বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপনে তাঁহার সহায়তা করেন এবং "কন্যাপেব্যং পালনীয়া শিক্ষণীয়া-ইতিযত্নতঃ" মহানির্ব্বাণতন্ত্রের * এই বচন উদ্ধৃত করিয়া সাধারণের যাহাতে স্ব স্ব বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষাপ্রদানে অনুরাগ জন্মে, তদর্থ বিবিধরূপে উৎসাহ দেন এবং দেশে সমাজচ্যুত হইবার ভয়েও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দৃষ্টান্ত দর্শাইবার জন্য আপনার দুই কন্যাকে ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন। তিনি ইহা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এমত নহে—কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্বয়ং ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করিতেন। এই সময়ে 'শিশুবোধক' ও 'নীতিকথা' প্রভৃতি ভিন্ন বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগী কোন ভাল পুস্তক ছিল না ; তর্কালঙ্কারই সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাবের পূরণার্থ ৩ ভাগ শিশুশিক্ষা প্রণয়ন করেন। এই সময়েই 'সর্ব্বশুভকরী' নাম্নী একখানি মাসিকপত্রিকা তাঁহারই যত্নে প্রচারিত হইয়াছিল। ঐ পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে তাঁহার রচিত এমত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, যাহা দেখিয়া অনেকে বলিয়াছেন যে, সেরূপ ওজস্বিনী বাঙ্গালা রচনা তৎপূর্ব্বে আর কখনই প্রকাশিত হয় নাই। এই সকল কার্য্যের নিমিত্ত বেথুন সাহেব তর্কালঙ্কারের প্রতি যারপরনাই পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন ; এবং তর্কালঙ্কারের কোনরূপ উপকার করিবার জন্য সতত সচেষ্ট ছিলেন, কিন্তু তর্কালঙ্কার তেজস্বিতাবশতঃ এই কার্য্যের জন্য কোনরূপ উপকারপ্রাপ্তির প্রত্যাশা করেন নাই।

১৭৭২ শকে [১৮৫০ খৃঃ অঃ] তর্কালঙ্কার মুর্শীদাবাদের জজ পণ্ডিত হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং ক্রমাগত ছয় বৎসর কাল ঐ কার্য্য করিয়া ঐ স্থানেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়েন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, মুর্শীদাবাদ আগমনের পর তিনি গ্রন্থরচনা একবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার যে সকল মনোবৃত্তি যেরূপ প্রবল ছিল, মুর্শীদাবাদে

---

* অষ্টম উল্লাস, ৪৭ শ্লোক।

তাহা সেরূপ ছিলনা, এই জন্যই সুধীরঞ্জন * রচয়িতা বঙ্গভাষা ও ইংরেজি-ভাষার পরস্পর বিবাদোপলক্ষে কহিয়াছেন—

"কবির অভাব কিসে দেখিলে আমার। দুইজন আছে দেশ বিখ্যাত কুমার॥
সুকবি সুন্দর মম মদনমোহন। পড়িলে কবিতা তার মুগ্ধ হয় মন॥
প্রাণের ঈশ্বরগুপ্ত প্রভাকরকর। ধরিয়াছে কিবা দৈবশক্তি মনোহর॥
চাহিলে তপনপানে দুনয়ন খরে। জুড়ায় যুগল আঁখি তার প্রভাকরে॥"(বঙ্গভাষা)
"ভাল আশা সুবদনি! করিয়াছ মনে। বাড়াবে তোমার মান এরা দুইজনে॥
এতদিন তুমি কি গো করোনি শ্রবণ। মদন কবিতা আর করে না রচন॥
ক্রমে ক্রমে তার যত বাড়িতেছে পদ। তোমায় ভাবিছে মনে বালাই আপদ॥
তোমার ঈশ্বরগুপ্ত কবিতারচক। লোকের হিতের হেতু লেখেনা পুস্তক॥"
(ইংরেজিভাষা)

মুর্শীদাবাদ (বহরম্পুর) ত্যাগ করিয়া তিনি ঐ জেলারই অন্তর্ব্বর্ত্তী কান্দী নামক স্থানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গমন করেন এবং ঐ স্থানেই ১৭৭৯ শকে [১৮৫৮ খৃঃ অঃ] ওলাউঠারোগে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার অনেকগুলি পুত্র ও কন্যা জন্মিয়াছিল। তর্কালঙ্কার দেশীয় কামিনীদিগের উন্নতিবিধানার্থ বিস্তর ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন। বালিকাবিদ্যালয়ে কন্যাপ্রেরণ ও বিধবা বিবাহের সহায়তাকরণ অপরাধে তাঁহাকে নিজ বাসগ্রামে ৮।৯ বৎসর সমাজবহিষ্কৃত হইয়া থাকতে হইয়াছিল!

রসতরঙ্গিনী।—এই গ্রন্থখানি তর্কালঙ্কারের প্রথম রচনা। ইহা আদি-

---

* কৃষ্ণনগরকলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র গোস্বামী দুর্গাপুরনিবাসী ৺দ্বারকানাথ অধিকারী এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে গদ্য ও পদ্যে অনেকগুলি নীতিগর্ভপ্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। রচনা বিশুদ্ধ বটে—সকল রূপকগুলিই ভাল না লাগুক, অনেকগুলি বিলক্ষণ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। ১৭৭৭ শকে [১৮৫৫ খৃঃ অঃ] এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয় গ্রন্থকার কিছু অধিকদিন জীবিত থাকিয়া আর কোন রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই, অকালেই কালকবলে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু যাহা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে অনেকদিন পর্য্যন্ত সজীব করিয়া রাখিবে।

রসসংক্রান্ত কতকগুলি সংস্কৃত (অধিকাংশ উদ্ভট) শ্লোকের পদ্যে অনুবাদ। অনুবাদকর্ত্তা ঐ অনুবাদকালেই আপন কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃতকবিতার ওরূপ সরল ও মধুর অনুবাদ, বোধ হয় ভারতচন্দ্র ভিন্ন আর কেহই করিতে পারেন নাই। তর্কালঙ্কারের রচিত সকল কবিতা অপেক্ষা ইহাই সমধিক মধুর বোধ হয়। কিন্তু ইহার আদ্যোপান্ত নিরবগুণ্ঠন আদিরসাশ্রিত হওয়ায় সর্ব্ববিধ পাঠকের তৃপ্তিকর হয় না। যাহা হউক, আমরা পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ উহার দুইটি সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার অনুবাদ নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম—

"কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধি বিদধে রমণীমুখং ভবতি বিস্তৃতমঃ ক্রমশো জনঃ॥"

"নলিনী মলিনী হয় যামিনীর যোগে। দ্বিজরাজ হীনসাজ দিবসের ভাগে॥
ইহা দেখি বিধি কৈল রমণীর মুখ। দিবারাতি সমভাতি দৃষ্টিমাত্রে সুখ॥
অতএব একবারে বিস্তু হওয়া ভার। দেখিয়া শুনিয়া হয় নৈপুণ্য সবার॥"

"ইন্দীবরেণ নয়নং মুখ মম্বুজেন কুন্দেন দন্ত মধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ সবিধায় ধাতা কান্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ॥"

"নয়নে কেবল, নীল উত্‌পল, মুখে শতদল, দিয়ে গড়িল।
কুন্দে দন্তপাতি, রাখিয়াছে গাঁথি, অধরে নবীন, পল্লব দিল॥
শরীর সকল, চম্পকের দল, দিয়ে অবিকল, বিধি রচিল।
তাই ভাবি মনে, ওলো কি কারণে, পাষাণে তব, মন গড়িল॥"

বাসবদত্তা—তর্কালঙ্কারের দ্বিতীয়গ্রন্থ বাসবদত্তা। ১৭৫৮ শকে [১৮৩৬ খৃঃ অঃ] যশোহর জেলার অন্তঃপাতী নওয়াপাড়া নামক স্থানের জমীদার ৺কালীকান্ত রায়ের প্রবর্ত্তনায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। সুবন্ধুনামা প্রাচীন কবি সংস্কৃত গদ্যে বাসবদত্তা নামে যে এক আখ্যায়িকা রচনা করেন, এই গ্রন্থ তাহারই স্থূল উপাখ্যানমাত্র লইয়া পয়ারাদি নানাবিধ ছন্দে বিরচিত। অনেকের বোধ আছে যে, তর্কালঙ্কার মূলগ্রন্থের সমস্ত ভাব লইয়াই এই কাব্য রচনা করিয়াছেন—ইহাতে তাঁহার নিজের কবিত্ব কিছুমাত্র নাই। কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভ্রম।

মূল বাসবদত্তার রচনা আদ্যোপান্ত অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক, উপমা, রূপক, অসঙ্গতি প্রভৃতি শব্দ ও অর্থালঙ্কারে একবারে পরিপূর্ণ। সংস্কৃতে সে সকল অলঙ্কারে যেরূপ বৈচিত্র হয়, বাঙ্গালায় সে বৈচিত্র কোন মতেই আনিবার যো নাই। সুতরাং তর্কালঙ্কার সে দিকে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি ইহাতে যে সকল রসভাবের যোজনা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই তাঁহার নিজের; তবে স্থানে স্থানে মূলগ্রন্থ হইতেও কোন কোন ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে এই মাত্র। তদ্ভিন্ন তর্কালঙ্কার উপাখ্যানাংশেও মূলগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় নূতন যোজনা করিয়াছেন।

মূলগ্রন্থের স্থূল বিবরণ এই—মহেন্দ্র নগরে চিন্তামণিনামক রাজার কন্দর্পকেতু নামে এক পুত্র ছিলেন। তিনি একদা স্বপ্নে অপরূপরূপা এক কামিনীকে দর্শন করিয়া উন্মত্তবৎ হইয়া প্রিয়বন্ধু মকরন্দকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক ভবন হইতে নির্গত হন, এবং বিন্ধ্যাটবীতে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য এক জম্বুবৃক্ষের তলভাগে রাত্রিযাপন করেন। সেই বৃক্ষের শাখারূঢ় শুক ও শারিকার কথোপকথনশ্রবণে জানিতে পারেন যে, তিনি যে কামিনীকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, তিনি কুসুমপুরের রাজা অনঙ্গশেখরের কন্যা—নাম বাসবদত্তা। বাসবদত্তা স্বয়ম্বরসভায় কাহারও গলে বরমাল্য না দিয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক স্বপ্নে কন্দর্পকেতুকে দেখিয়া অধীরা হইয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ তমালিকানাম্নী শারিকা দ্বারা পত্রপ্রেরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে কন্দর্পকেতু ঐ শারিকার নিকট হইতে পত্রগ্রহণ করিয়া উহারই সহিত কুসুমপুরে গমনপূর্ব্বক গোপনে একাকী বাসবদত্তার সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং শ্রবণ করেন যে, বাসবদত্তার পিতা পরদিনই অন্য বরে তাঁহার বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন; এইজন্য উভয়ে পরামর্শ করিয়া রজনীতেই পলায়নপূর্ব্বক সেই বিন্ধ্যাটবীতে উপস্থিত হইয়া রাজকুমার নিদ্রিত হন। কিন্তু নিদ্রোত্থিত হইয়া বাসবদত্তাকে না দেখিতে পাইয়া প্রায় এক বৎসরকাল বনে বনে কাঁদিয়া বেড়ান। পরিশেষে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়া আকাশবাণীশ্রবণে পুনর্ব্বার বিন্ধ্যাটবীতে আগমনপূর্ব্বক প্রস্তরময়ী বাসব-

দত্তার গাত্রে করস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিতা করেন। অনন্তর, 'বাসবদত্তাকে লইবার জন্য দুই রাজার যুদ্ধ হয়, তাহাতে মুনির আশ্রম ধ্বংস হয়, মুনি আসিয়া সেই ক্রোধে তাঁহাকে পাষাণময়ী হইতে শাপ দেন, এবং প্রিয়করস্পর্শপর্য্যন্ত সেই শাপের অবধি করেন' ইত্যাদি পূর্ব্ব বিবরণ বাসবদত্তার মুখেই শ্রবণ করিয়া রাজকুমার সহসা-সমাগত মকরন্দ সমভিব্যাহারে পরমানন্দে গৃহে গমন করেন।

বাঙ্গালা বাসবদত্তায় বিন্ধ্যবাসিনীদর্শন, যোগমায়ার পূজা, ককারাদিক্রমে স্তব, হিরণ্যনগর ও হরিহরদর্শন, কুসুমপুরে সরোবরতীরে রাজকুমারের বিশ্রাম, তথায় ষষ্ঠীপূজোপলক্ষে নাগরিকাদিগের আগমন, বাসবদত্তা বা কামিনীর সহিত কন্দর্পকেতুর বিবাহ প্রভৃতি যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তর্কালঙ্কারের স্বকপোলকল্পিত। ঐ উপাখ্যান বর্ণনাবসরে তর্কালঙ্কার অনেকস্থলে ভারতচন্দ্রের অনুকরণ ও তাঁহার উদ্ভাবিত ভাবাদি গ্রহণ করিয়াছেন, সত্য বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইঁহাকে সামান্য কবিমধ্যে গণনা করা যায় না। ইঁহার রচনা ভারতচন্দ্রের ন্যায় আদ্যোপান্ত তত সরল ও সুমার্জ্জিত না হউক, পয়ারাদি ছন্দের বিশুদ্ধপ্রণালী সম্পূর্ণরূপ অনুসৃত না হউক, কিন্তু ঐ রচনা যে, অনেকস্থলেই পরম রমণীয় ও অসাধারণ বৈচিত্র্যসংযুক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ভারত, বয়সের যেরূপ পরিপক্কাবস্থায় গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, তর্কালঙ্কার সেরূপ অবস্থায় গ্রন্থরচনা করিলে, বোধ হয়, বাসবদত্তা অন্নদামঙ্গলের সমান মধুর হইতে পারিত। 'বাসবদত্তা' রচনাসময়ে তর্কালঙ্কারের বয়ঃক্রম ২১।২২ বৎসরমাত্র ছিল!

পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি চলিত ছন্দ ছাড়া তর্কালঙ্কার ইহাতে অনুষ্টুপ্, তোটক, পজ্ঝটিকা, একাবলী, দ্রুতগতি, গজগতি, কুসুম মালিকা, দিগক্ষরা প্রভৃতি অনেক নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই সকল ছন্দ সংস্কৃতমূলক, কিন্তু তর্কালঙ্কারই তাহার অনেকগুলিকে বাঙ্গালায় প্রথম অবতারিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি গ্রন্থমধ্যে ভৈরবী, সিন্ধু, ভয়রোঁ, বেহাগ, মল্লার

প্রভৃতি অনেকগুলি রাগরাগিণী এবং ঠেকা, যৎ, ছেপ্‌কা, তিওট, পোস্তা প্রভৃতি নানাবিধ তাল ব্যবহার করিয়াছেন।

গ্রন্থবাহুল্যভয়ে আমরা পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ বাসবদত্তার অধিক অংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। অল্পমাত্র যাহা উদ্ধৃত হইল, ইহাতেই তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যইবে—

কামিনীর সজ্জা।

"হৃদি বিলসে পটুবসনা। কুচকলসে কৃতকসনা॥
স্মর অলসে মৃদুহসনা। তনু উলসে মদলসনা॥
জঘনতটে ধৃতরসনা। অধরপুটে স্মিতদশনা॥
জিতবরটা গজগমনা। অরুণঘটা সমচরণা॥
কনকছটা জিনি বরণা। চমরসটা কচরচনা॥
ভণতি যথাগতমতিনা। কবি মদন দ্রুতগতিনা॥"

কামিনীর রূপবর্ণন।

"কুটিল কুন্তলে কিবা বান্ধিয়াছে বেণী। কুণ্ডলী করিয়া যেন কালকুণ্ডলিনী॥
রমণীস্বরূপ মণি সদা রক্ষা করে। তার চোরে অপাঙ্গভঙ্গীর বিষে জারে॥
ভালে ভাল বিলসিত অলকা বিলাসে। মুখপদ্ম মধু আশে অলি আসে পাশে॥
শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখসুষমা। ভাবি দিন দিন ক্ষীণ অন্তরে কালিমা॥
ফুলধনু ছাড়ি ধনু দেখিয়া ভ্রূধনু। অভিমানে হরহুতাশনে ত্যজে তনু॥
নাসাবংশ নয়নযুগল মাঝে শোভে। যেন বৈসে শুকপক্ষী ওষ্ঠবিম্ব লোভে॥
কিম্বা নেত্র সুধাসিন্ধু বিভাগের হেতু। তার মধ্যে বুঝি বিধি বান্ধিয়াছে সেতু॥
সুদীর্ঘ নয়ন তাতে রঞ্জিত অঞ্জন। সে চাঞ্চল্য শিখিবারে চঞ্চল খঞ্জন॥
একেত অসহ্য শর কটাক্ষ বিষম। তাহাতে অঞ্জন কটু কালকূটসম॥
কি কহিব অধর অধর করে বিম্ব। অনুমানি ত্রিভুবনে নাহি প্রতিবিম্ব॥
সে বদন বিধু অতি পরমবিভব। অধর-রাগেতে যেন সন্ধ্যা অনুভব॥

কুন্দ সুকুসুমসম দশনের শোভা। ঈর্ষায় দাড়িম্ববীজ বুঝি শোণ আভা॥
হাস্যমুখী সে যখন মৃদু মৃদু হাসে। পদ্মরাগোপরি কত মুক্তা পরকাশে॥
শোভে ভুজমৃণাল লাবণ্য-সরোবরে। পাণিপদ্ম প্রকাশে নখর-রবিকরে॥

* * * * *

সুবলনী মধ্যখানি কি বাখানি তার। আছে কি না আছে অনুমান করা ভার॥

* * * * *

নিজ নিপুণতা ধাতা জ্ঞাপন করিতে। অপরূপ রূপ তার সৃজিল জগতে॥
তার নিদর্শন দেখ এই বিপরীত। নখচন্দ্রে করে পাদপদ্ম বিকসিত॥
বুঝি মণিনূপুরের করি কলধ্বনি। পঞ্চস্বরে পঞ্চশরে জাগায় সে ধনী॥
সপ্তস্বরাস্বরসম শুনি তার স্বর। বুঝি পিক উহু উহু করে নিরন্তর॥
হেরি হরে হেন মন পুনঃ পাওয়া ভার। মদনের মোহ হয় ভাবি রূপ তার॥"

স্বয়ম্বরাগত রাজগণের পূর্ব্বরজনীতে উৎকণ্ঠা।

"সন্ধ্যাসহ বন্ধ্যা আশা হইয়া সত্বরা। নৃপগণে করিতে আইল স্বয়ম্বরা॥
প্রতি নৃপতির প্রতি করিয়া সম্প্রীতি। নিশাযোগে শুভযোগে চলিল সম্প্রতি॥
বাসায় আশায় পেয়ে যতেক ভূপতি। নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষুধা প্রতি হইল বিমতি॥
কেবল অসার আশা মনে করি সার। কাটায় সুদীর্ঘ নিশা ভাবিয়া অসার॥
আশা সঙ্গে যত সঙ্গ হয় সঙ্গোপনে। ততই আশার প্রীতি বাড়ে মনে মনে॥
আশার মহিমা সীমা কি কব কথায়। একা সবাকার মন সমান যোগায়!॥"

১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষা—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কলিকাতার বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ এই তিন পুস্তক রচিত হয়। ইহার পূর্ব্বে শিশুদিগের বর্ণশিক্ষা প্রভৃতি প্রথম হইতেই পুস্তক দ্বারা হইত না—গুরু মহাশয়েরা শিশুদিগের হস্তে প্রথমে খড়ি দিয়া ক খ প্রভৃতি কয়েকটী হল্‌বর্ণ শিখাইতেন। পরে তালপত্রে লেখাইয়া সমুদয় হল্‌বর্ণ এবং ক্য ক্ক স্ক প্রভৃতি সমুদয় সংযুক্ত বর্ণ শিখাইয়া, তৎপরে "সিদ্ধি রস্তু" বলিয়া অ আ প্রভৃতি সমুদয় স্বরবর্ণ ও তদনন্তর হল্‌বর্ণের সহিত

তাহাদের যোগ হইলে কিরূপ আকারপরিবর্ত্তন হয়, সে সকল (বানান নামে) শিখাইতেন। এ স্থলে ইহাও উল্লেখকরা আবশ্যক যে, স্বরবর্ণের পূর্ব্বে "সিদ্ধি রস্তু" এই মঙ্গলাচরণসূচক প্রার্থনাবাক্য থাকায় বোধহয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা শিশুদিগকে প্রথমে স্বরবর্ণেরই শিক্ষা দিতেন, কিন্তু শুদ্ধ স্বরবর্ণে অধিক কথা লিখিতে পারা যায় না, অথচ শুদ্ধ হল্‌বর্ণ শিক্ষিত হইলেই তদ্দ্বারা জল, ঘর, পথ, লবণ প্রভৃতি অনেক কথা লিখিতে পারা যায়, এই সুবিধা দর্শনেই, বোধ হয়, পরবর্ত্তী শিক্ষকেরা পূর্ব্বরীতির পরিবর্ত্তন করিয়া প্রথমেই ক খ প্রভৃতি হল্‌বর্ণের শিক্ষাপ্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। স্কুল ভিন্ন পল্লীগ্রামের সমুদয় গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতে অদ্যাপি এই প্রথা প্রবল আছে। কলিকাতাতেও এই প্রথাই পূর্ব্বে ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। এখন সকল স্কুলেই ইংরেজি শিক্ষার অনুকরণে বহি দেখিয়াই শিশুদিগের বর্ণমালা শিক্ষা হয়। তর্কালঙ্কারের পূর্ব্বোক্ত শিশু-শিক্ষারচনাই পূর্ব্বপ্রথাবিলোপের মূল বলিতে হইবে। যাহাহউক তৎকালে বালকদিগের পাঠোপযোগী প্রণালীবদ্ধ কোন ভাল পুস্তক ছিল না। তর্কা-লঙ্কার সেই অভাব মোচন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

১ম ভাগ শিশুশিক্ষায় অ আ প্রভৃতি স্বরবর্ণ, ক খ প্রভৃতি হল্‌বর্ণ, অসংযুক্ত হল্‌বর্ণে স্বরের যোগে যে সকল ক্ষুদ্রক্ষুদ্র পদ ও বাক্য হইতে পারে তাহার উদাহরণ, এবং ২য় ভাগে সংযুক্ত হল্‌বর্ণের ঐরূপ উদাহরণ পরমপাণ্ডিত্য ও কবিত্ব সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম ভাগের শেষে অসংযুক্ত হল্‌বর্ণে সরল ও মধুর যে একটি কবিতা রচিত হইয়াছে, সেরূপ কবিতা সামান্য কবির লেখনী হইতে নির্গত হইবার নহে। নিম্নভাগে তাহাও উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে ১ম ও ২য় ভাগ শিশুশিক্ষার স্থলে অনেকগুলি ঐরূপ পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহার কোনখানিই শিশু-শিক্ষার ন্যায় কোমল, মধুর ও শিশুদিগের চিত্তাকর্ষক হয় নাই।

৩য় ভাগ শিশুশিক্ষার ন্যায় শিশুদিগের পাঠোপযোগী উৎকৃষ্ট পুস্তক বোধহয় এপর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। উহার বিষয়গুলিও যেমন সুন্দর, রচনাও তেমনই

মধুর। তর্কালঙ্কারের আর কোন গ্রন্থ না থাকিলেও তিনি এই এক শিশু-শিক্ষাদ্বারাই এদেশে চিরস্মরণীয় হইতে পারিতেন। এতদ্দেশীয় সমস্ত বিদ্যালয়েই ঐ পুস্তক ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বোল্লিখিত কবিতাটি এই—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল। কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে। শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল। পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ। আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর। পাতায় পাতায় পড়ে নিশীর শিশির॥
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ। আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রবোধ প্রভাকারাদি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন। তিনি ১৭৩৩ শকে [১৮১১ খৃঃ অঃ] ত্রিবেণীর পরপারস্থ কাঁচরাপাড়া নামক গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। বাল্যকালে কোন প্রধান বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন বা বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া বিশেষ খ্যাতিপ্রতিপত্তিলাভ তিনি করিতে পারেন নাই। কিন্তু শাস্ত্রে বলে—

"কবিত্বং দুর্ল্লভং তত্র শক্তি স্তত্র সুদুর্ল্লভা"

এই কবিত্ব ও শক্তি উভয়ই তাঁহার ছিল, এবং তজ্জন্যই তিনি জনসমাজে তত আদৃত ও তত সম্মানিত হইয়াছিলেন। *

---

* "কলিকাতা যোড়াসাঁকোতে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহের আলয়। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চাকুরী করিতেন। তাঁহারও অবস্থা তাদৃশ ভাল ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন দশ বৎসর তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। মাতৃবিয়োগের পর তিনি মাতামহের আলয়ে আসিয়া অধিকাংশ সময় থাকিতেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি তৎকালে পড়াশুনাতে বড় অনাবিষ্ট ছিলেন। পাঠশালে যাইতেন বটে, কিন্তু পড়াশুনা অপেক্ষা খেলা দুষ্টামিতে বেশী মনোযোগী ছিলেন। বলিতে গেলে শিক্ষা যাহাকে বলে

বাল্যাবস্থা হইতেই তিনি কবিতারচনার আরম্ভ করিয়াছিলেন। বয়োবৃদ্ধি-সহকারে ঐ রচনাশক্তি প্রবল হইয়া দাঁড়াইলে তিনি উহা প্রকাশের স্থল পাইবার মানসে কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার ৺নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের সাহায্যে ও উৎযোগে ১৭৫২ শকের [১৮৩০ খৃঃ অঃ] ১৬ই মাঘ হইতে "সংবাদ প্রভাকর" নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ পত্র প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে দ্ব্যাহিক ও তৎপরে ১৭৬১ শকের ১লা আষাঢ় হইতে প্রাত্যহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে; ঐ পত্রে গদ্য ও পদ্য দুইই থাকিত, তন্মধ্যে গদ্যের ভাগ অপেক্ষা নানাবিষয়ক মনোহর পদ্যময় প্রবন্ধই অধিক। ১৭৫৪ শকে যোগেন্দ্র মোহনের মৃত্যু হইলে এই পত্রিকাখানি লোপ পায়। প্রভাকর ভিন্ন 'সাধুরঞ্জন' ও 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে আরও দুইখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা তাঁহাকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইত। এই শেষোক্ত পত্রখানির সহিত কিয়দ্দিবসের জন্য ৺গৌরীশঙ্কর (গুড়্গুড়ে) ভট্টাচার্য্যের 'রসরাজ' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার বিবাদ হওয়ায় উভয় পত্রই পরস্পরের নিতান্ত অশ্লীল কুৎসাবাদে পূর্ণ হইয়া একান্ত অপবিত্র হইয়াছিল! এক্ষণে 'পাষণ্ডপীড়ন', 'সাধুরঞ্জন' ও 'রসরাজ' এ তিন পত্রিকাই জীবিত নাই।

এই সকল পত্রিকার আয়তন ক্ষুদ্র; ইহাতে তাঁহার মনোমত বিস্তৃত কাব্যপ্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইতে স্থান পাইত না, এজন্য তিনি কয়েক বৎসর পরে বিস্তৃত আকারের একখানি মাসিক 'প্রভাকর' প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহা নানাবিধ কবিতাবলীতেই প্রায় সমুদয় পরিপূরিত হইত। এই সময়ে

ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কিছুই পান নাই; ইংরাজি শিক্ষা ত হইলই না; বাঙ্গালাও নিজে পড়িয়া যাহা শিখিলেন তাহাই একমাত্র সম্বল হইল। কিন্তু এই সম্বল লইয়াই তিনি অচির-কালের মধ্যে বাঙ্গালার সুকবি ও সুলেখকরূপে পরিচিত হইলেন। যৌবনের প্রারম্ভে পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা জন্মে। তাঁহাদেরই ভবনে তিনি অবসরকাল যাপন করিতেন। তাঁহাদেরই আশ্রয়ে, তাঁহাদেরই উৎসাহে, তাঁহার কবিত্ব শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়।" শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ", ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২২৯।

তিনি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের জীবনচরিত অনুসন্ধান করিতে বিস্তর যত্ন করিয়াছিলেন এবং যাহা পাইয়াছিলেন, তাহা উক্ত মাসিক 'প্রভাকরে' ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কেবল ভারতচন্দ্ররায়ের জীবনচরিত পৃথক্ গ্রন্থরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল।* এই সময়ে কলিকাতার ধনিসন্তানেরা 'পাঁচালী', 'হাফ্আকড়াই' প্রভৃতির আমোদে বড় অনুরক্ত হইয়াছিলেন। গুপ্তকবি তাহার কোন না কোন দলে—হয় ছড়া বাঁধিয়া, নয় গীত রচনা করিয়া দিতেন। সুতরাং সকল সমাজেই তাঁহার যথেষ্ট সমাদর হইয়াছিল।

ঈশ্বর গুপ্ত আপনার কবিত্বশক্তি কেবল সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন—অনেক দিন পর্য্যন্ত কোন পুস্তক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই জন্যই সুধীরঞ্জনের ইংরেজী ভাষা আক্ষেপ করিয়াছেন, "তোমার ঈশ্বরগুপ্ত কবিতা রচক। লোকের হিতের হেতু লেখেনা পুস্তক।" সুধীরঞ্জনের এই উত্তেজনাতেই হউক, বা যে কারণেই হউক, তিনি শেষাবস্থায় 'প্রবোধ-প্রভাকর',

---

* এ সম্বন্ধে শ্রীযুত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী প্রথমখণ্ডে লিখিয়াছেন:—প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাঁহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র, ক্রমাগত দশবর্ষকাল নানাস্থানে পর্য্যটন এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া শেষ সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন। বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ে প্রথম উৎযোগী। সর্ব্বাদৌ ১২৬১ সালের ১লা পৌষের মাসিক 'প্রভাকরে' ঈশ্বরচন্দ্র বহুকষ্টে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তৎপ্রণীত 'কালী-কীর্ত্তন' ও 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে পর্য্যায় ক্রমে প্রতি মাসের 'প্রভাকরে' রামনিধি সেন (নিধুবাবু), হরু ঠাকুর, রামবসু, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাসু ও নৃসিংহ এবং আরও কয়েক-জন খ্যাতনামা কবির জীবনচরিত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। সেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

"মৃতকবি ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী ও তৎপ্রণীত অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা এবং পদাবলী বহুপরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া সন ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠের 'প্রভাকরে' প্রকাশ করেন. ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তকপ্রকাশ"

'হিতপ্রভাকর', 'বোধেন্দুবিকাশ' ও 'কলিনাটক' নামে চারিখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুঃখের বিষয় 'কলিনাটক' সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। ১৭৮০ শকে [১৮৫৮ খৃঃ অঃ] তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৯ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার সন্তান সন্ততি কিছুই হয় নাই। তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রগুপ্ত অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার পত্রিকাখানি চালাইয়া ছিলেন। তাঁহারও মৃত্যু হওয়ায় সম্প্রতি উহা অপর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক চালিত হইতেছে! কিন্তু এক্ষণে প্রভাকরের আর সে প্রভা নাই—

"সূর্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বা মভিখ্যাম্।"

দুঃখের বিষয় কিছুদিন হইল 'প্রভাকর' উঠিয়া গিয়াছে।

প্রবোধপ্রভাকর—এই গ্রন্থে পিতাপুত্রের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে "প্রাণিতত্ত্ব-নিরূপণ" প্রসঙ্গে—দুঃখের ক্লেশানুভবেই লোকের সুখান্বেষণে প্রবৃত্তি হয়, লৌকিক উপায়ে দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয়না, স্বর্গীয় সুখ চিরস্থায়ী নহে, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অবিনশ্বর সুখলাভ হয়, নিজ নিজ কর্ম্মানুসারেই জীবের উৎপত্ত্যাদি হয়, সৃষ্টি অনাদি, ঈশ্বর নিত্য ইত্যাদি অনেকগুলি শাস্ত্রীয় মীমাংসা বিনিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নিজে শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না; একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তায় গ্রন্থ রচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থে গদ্য পদ্য দুইই আছে—গদ্যে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, পদ্যে তাহাই আবার পুনরুক্ত হইয়াছে; সুতরাং গ্রন্থখানি অনর্থক কিছু বড় হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা সহজ, পদ্যগুলিও বেশ সরল। এই গ্রন্থ প্রথমখণ্ড মাত্র। ইহা ১৭৭৯ শকে [১৮৫৭ খৃঃ অঃ] মুদ্রিত হয়। গ্রন্থকার আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে ইহার অপরাপর খণ্ডও বহির্গত হইত।

হিতপ্রভাকর—এই গ্রন্থও গদ্যপদ্যময়। ইহাতে গদ্য অপেক্ষা পদ্যের ভাগ অধিক। ১৭৮২ শকে [১৮৬০ খৃঃ অঃ] ইহা প্রথম মুদ্রিত হয়; তৎকালে গ্রন্থকার জীবিত ছিলেন না। ইহাতে লিখিত 'ভূমিকার' ভাবে বোধ হয়, বেথুনসাহেব কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী বাঙ্গালা গদ্যগন্থের অভাব দেখিয়া কবিবর ঈশ্বরগুপ্তকে সরল ও নির্ম্মল ভাষায় তদুপযোগী কয়েক-খানি পদ্য পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; তাহাতেই তিনি বিষ্ণুশর্ম্মার

কৃত সংস্কৃত হিতোপদেশকে অবলম্বন করিয়া গদ্য ও পদ্যে এই পুস্তক প্রণয়ন করেন। গদ্যের ভাগ তাদৃশ প্রীতিকর না হউক, কিন্তু পদ্যগুলি অতীব রমণীয় হইয়াছে। মিত্রাক্ষরতার বিশুদ্ধ প্রণালী ইহাতে যতদূর অনুসৃত হইয়াছে, এক অন্নদামঙ্গল ভিন্ন ইহার পূর্ব্ব রচিত প্রায় কোন পুস্তকেই ততদূর হয় নাই। গ্রন্থখানি সংস্কৃতের অনুবাদ হউক, কিন্তু কবি তাহাতেও নিজের সামান্য কবিত্ব প্রকাশ করেন নাই। উভয় গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। চতুর্থভাগস্থ সুন্দ ও উপসুন্দ সংক্রান্ত রচনাটী সাধারণ কবিত্ব প্রকাশক নহে। ফলতঃ হাস্যরসোদ্দীপক সরল কবিতা রচনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ন্যায় সৌভাগ্যশালী কবি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, পূর্ব্বোক্ত বেথুনসাহেবের অনুরোধ ক্রমেই যদি কবি এই গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। বেথুন-সাহেব বোধ হয় তাঁহাকে এরূপ গ্রন্থ রচনার জন্য অনুরোধ করেন নাই—ইংরেজিতে যেরূপ ফার্ষ্ট নম্বর, সেকণ্ড নম্বর পোয়েট্রী প্রভৃতি পুস্তক আছে এবং যাহার অনুকরণে এক্ষণে 'পদ্যপাঠ', 'কবিতাকুসুমাঞ্জলি' প্রভৃতি পদ্যপুস্তক রচিত হইয়াছে, বোধ হয়, তিনি সেইরূপ পুস্তক রচনার নিমিত্তই অনুরোধ করিয়াছিলেন। ফলতঃ হিতপ্রভাকর কোনরূপে বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগী পুস্তক হয় নাই। ইহার প্রথমে পরমেশ্বরের মহিমবর্ণন প্রসঙ্গে—

"রে মন! পরম পুরুষের পবিত্র প্রেমপুষ্পের আমোদের আঘ্রাণ একবার নেরে—একবার নে—রে; ওরে মন! ভূতনাথকে একবার দেখ্‌রে—একবার দেখ্‌—রে; মন-রে—মন-রে—শোন্‌-রে শোন্‌-রে; ও মন! ব্রহ্মরসে গল্‌-রে—গল্‌—রে—গল্‌-রে; ও চিত্ত! এই লৌকিক সামান্য রস রাখ্‌-রে—রাখ্‌-রে; তাঁর প্রেমরস চাক্‌-রে—চাক্‌-রে—চাক্‌-রে; তাঁর ভক্তিরস মাখ্‌-রে—মাখ্‌-রে—মাখ্‌-রে; ও মন! তাঁরে ডাক-রে—ডাক্‌-রে—ডাক্‌-রে"—ইত্যাদি যে সকল বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন, তাহা বালকবালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তকের কথা দূরে থাকুক, এক্ষণকার সংবাদপত্রেও শোভা পায়না। এখন ওরূপ রচনাকে লোকে 'জেঠামি' বলে। তা ছাড়া প্রবোধপ্রভাকরের ন্যায়

ইহারও স্থানে স্থানে একই কথা গদ্য ও পদ্যে দুইবার করিয়া বলা হইয়াছে, সে সকল স্থান পাঠকদিগের বিলক্ষণ বিরক্তিকর হয়। তদ্ভিন্ন হিতোপদেশে যে সকল অশ্লীল উপাখ্যান আছে, তাহারও কয়েকটি ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

বোধেন্দুবিকাশ—সংস্কৃতপ্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ নাটকাকারেই বিরচিত হইয়াছে। ইহা প্রথমে মাসিক 'প্রভাকরে' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে উহাকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া পৃথক্ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিবার পরেই গ্রন্থকারের মৃত্যু হয়। তদীয় ভ্রাতা উহার তিন অঙ্কমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন; সমুচিত উৎসাহপ্রাপ্তির অভাবে বোধহয় অপরাংশ মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। ইহার অধিকস্থলেই মূলপুস্তকের অপেক্ষা অনেক বাহুল্যবর্ণন আছে এবং সেই সেই স্থলে প্রচুর কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কাম, রতি, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, তৃষ্ণা, কলি, দম্ভ, দিগম্বরসিদ্ধান্ত, সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতির চরিত্রগুলি যে কত অধিক রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে; তরঙ্গলহরী, রণরঙ্গিণী, শেফালিকা, উন্মাদিনী, পঞ্চাল প্রভৃতি কবির স্বোদ্ভাবিত নূতন ছন্দগুলি যে কিরূপ রমণীয় হইয়াছে; হিন্দিমিশ্রিত ভজন ও দোহাগুলি যে কি মধুর হইয়াছে; শ্যামাবিষয়ক গীতগুলি যে কিরূপ সুধাবর্ষী হইয়াছে—তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ফলতঃ এই পুস্তক খানি পাঠ করিবার সময়ে আমরা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছি। স্থলবিশেষে দীর্ঘ দীর্ঘ যে পদ্যগুলি আছে এবং ক্ষপণকাদির সহিত যে অতিরিক্ত মাতলামীটা করা হইয়াছে, তাহা অবশ্যই অপ্রীতিকর বটে, কিন্তু তদতিরিক্ত প্রায় সমুদয় স্থলই পরমপ্রীতিজনক হইয়াছে। ঈশ্বরগুপ্তের গদ্যরচনায়, চেষ্টাকরিয়া অতিরিক্ত অনুপ্রাসযোজনা করিবার যে দোষ সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়, এগ্রন্থে সে দোষের ভাগও অতি কম দেখা যায়। ফলতঃ ঈশ্বরগুপ্তের মহাকবিত্ব সপ্রমাণ করিবার সময়ে এই গ্রন্থখানিকে সাক্ষিস্বরূপ দণ্ডায়মান করাইলেই মোকদ্দমার জয় হইবে সন্দেহনাই। ইহা অতি দুঃখের বিষয় এবং দেশীয় লোকদিগের কলঙ্কের বিষয় যে, উৎসাহপ্রাপ্তির অভাবে এতাদৃশ কবিত্বপূর্ণ উৎকৃষ্ট নাটকও

সমগ্ররূপে প্রকাশিত হইতে পায় নাই। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ ইহার অতি অল্পমাত্র অংশই নিম্নভাগে উদ্ধৃত হইল—

হিংসার উক্তি।—গৌরবিণীচ্ছন্দ।

হ্যাদে দেখি ঘরেঘরে,সকলেই খায় পরে,সুখে আছে পরস্পরে—আজো এরা মরেনি?
কত সাজে সাজ্ করে, গরবেতে ফেটেমরে, এখনো এদের ঘরে—যম এসে ধরেনি?
এই সব্ জামা জোড়া,এই সব্ গাড়ী ঘোড়া, এসব্ টাকার তোড়া—চোরে কেন হরেনি?
আরে,ওরা ভাগ্যবান্,বাড়িয়াছে বড় মান,গোলাভরা আছে ধান-লক্ষ্মী আজো সরেনি?
মর্ এটা যেন হাতি, দশহাত বুকে ছাতি, করিতেছে মাতামাতি—জ্বরে কেন জ্বরেনি?
হ্যাদে মাগী কালামুখী; ঠিক্‌যেন কচিখুকী, পতিসুখে বড় সুখী—ঠেঁটী কেন পরেনি?
মর্ মর্ ওই ছুঁড়ী, পরেছে সোণার চুড়ী, বেঁকে চলে মেরে তুড়ি—ফুল তবু ঝরেনি!
দেখ্ দেখ্ নিয়ে মিঠে, খেতেছে কি পুলিপিঠে,এখনো এদের ভিটে—ঘুঘু কেন চরেনি!"

দিগম্বরসিদ্ধান্ত*—ভজন।

"অর্‌হৎ অর্‌হৎ, শির্‌কো অরহৎ, মেরা গুরুজী অর্‌হৎ;
তোম্ সব্ লোগ্ নিস্তার হোয়েগা, লেহ এহীকা মৎ—
বাবা লেহ এহীকা মৎ।
কোহি জাৎকো না মানো বাবা, না মানো দেবী দেবা;
এক মন্‌সে অর্হৎজীঁকো পাঁওমে কর সেবা—
বাবা পাঁওমে কর সেবা।
যব্‌হি যেসা আয়ে মন্‌মে, তেস্‌সে কর ভোগ;
ছোড়্ দেও সব্ ধূর্ত্তকো বাৎ, ভুক্কা যাগ যোগ—
বাবা ভুক্কা যাগ যোগ।
আব্‌কি নারী, পর্‌কি নারী, যেস্কে মেলে সঙ্গ;
নাহি ছোড় দেও, ক্যা খুসী হায়, কামদেও কি রঙ্গ—
বাবা কামদেও কি রঙ্গ।

* অর্হৎ নামা গুরুর শিষ্য—এক প্রকার বৌদ্ধ।

এসে পাপ এসে পুণ্য এহো ধূর্ত্তকী বাৎ,
মরণসে সব্ মুক্ত হয় তব্, পাপ যায় কোন্ সাৎ—
বাবা পাপ যায় কোন্ সাৎ।।
দিন্ দিন্ দিন্ গাওমে ঢালো, সব হুঁ গঙ্গাজল ;
তবু তেরে কি শোধন হবে, জঠরভরা সব্ মল—
বাবা জঠরভরা সব্ মল।
অর্হৎ মেরা প্রাণ পেয়ারো, অর্হৎ মেরা জান্,
অর্হৎ পাঁওমে প্রণৎ করো সব্, আওর না জানো আন্—
বাবা আওর না জান আন্।"

রাজসী শ্রদ্ধা—গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

"কেরে বামা—বারিদবরণী ; তরুণী ভালে ধরেছে তরণি ; কাহারে ঘরণী আসিয়ে ধরণী
করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূপ! কি অপরূপ, অনুপরূপ নাহি সরূপ, মদননিধনকরণকারণ চরণশরণ লয়।।
বামা—হাসিছে ভাসিছে লাজ না বাসিছে, হুহুঙ্কার রবে সকলে শাসিছে, নিকটে আসিছে
রিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ হয়।।
বামা—টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে, সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে, কোপেতে জ্বলিছে,
দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবন ময়।।
কেরে—লোহিতরসনা, বিকটদশনা করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা, হোয়ে শবাসনা,
বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়।।"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, 'কলিনাটক' সমাপ্ত হয় নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে পারিলাম না। যাহাহউক এই কয়েকখানি লিখিত গ্রন্থ ভিন্ন প্রাত্যহিক ও মাসিক 'প্রভাকরে' তাঁহার রচিত কত কত হাস্যরসোদ্দীপক উৎকৃষ্ট পদ্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। 'জামাইষষ্ঠী,' 'অরন্ধন,' 'বড়দিন,' 'পিটেসংক্রান্তি' বিষয়ক পদ্যগুলি যখন পাঠ করা যায়, তখনই

নূতনের মত মনকে আমোদিত করে। তঁহার কোন চরিতাখ্যায়ক * যথার্থ ই লিখিয়াছেন, "স্বভাববর্ণনে যেমন কবিকঙ্কণ, পরমার্থ কালীবিষয়ে যেমন কবিরঞ্জন, আদিরসে যেমন রায়গুণাকর, হাস্যরসে তেমনই ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত অদ্বিতীয় কবি।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী ও কবিতা সংগ্রহ' নামে যে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে গুপ্ত-কবি-সংক্রান্ত অনেক রহস্য অবগত হওয়া যায় এবং মন অপার আনন্দে ভাসমান হয়।

দাশরথিরায়ের পাঁচালী।

১৭২৬ শকে [১৮০৪ খৃঃ অঃ] দাশরথি রায়ের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়। ইঁহারা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাটোয়ার সন্নিহিত বাঁদমুড়া নামক গ্রামে ইঁহাদিগের পৈতৃক বাস। দাশরথি বাল্যকাল হইতে পাটুলির নিকটবর্ত্তী 'পীলা' নামক গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন। তিনি কিতাবতী বাঙ্গালা ও যৎকিঞ্চিৎ ইংরেজি শিক্ষা করিয়া মাতুলের সহায়তায় সাঁকাই নামক স্থানের নীলকুঠীতে সামান্য কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন ঐ সময়ে পীলাগ্রামে অক্ষয়কাটানী (অকাবাই) নাম্নী নৃত্য-গীত-ব্যবসায়িনী এক ইতরজাতীয়া কামিনী ছিল। দাশরথির বাল্যকাল হইতেই গীতবাদ্যে সবিশেষ অনুরাগ থাকায় যৌবনে উহার সহিত প্রণয়সঞ্চার হয়। কিছুদিনপরে অকাবাই এক ওস্তাদি কবির দল করে— দাশরথি তাহাতে গীত বাঁধিয়া দিতেন। কবির লড়াইএ গানদ্বারা পরস্পরকে গালাগালী দেওয়া হইয়া থাকে। তদনুসারে দাশরথি একদা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দল হইতে অত্যন্ত কটু গালি খাইয়া তাঁহার প্রতিপালক পূজনীয় মাতুলের অশ্রুজল দেখিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কবির দল ত্যাগ করেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি

---

* হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, 'কবিচরিত' প্রথম ভাগ, ১৭৫ পৃষ্ঠা।

বিষয়কর্ম্মরহিত হইয়াছিলেন। সুতরাং গ্রামে বসিয়া কার্য্যান্তরাভাবে স্বয়ং ছড়া ও গীত বাঁধিয়া দশজন বয়স্তের সহিত সকের এক পাঁচালীর দল করেন—পরে সেই দলই তাঁহার জীবিকা, সৌভাগ্য ও দেশব্যাপিনী "দাশুরায়" নামখ্যাতির কারণ হইয়া উঠে।

দাশুরায়ের অনেকগুলি পালা আছে, তন্মধ্যে আপাততঃ কতকগুলি বটতলায় দশখণ্ডে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে 'দাশুরায়ের পাঁচালী' নামক একখানি সুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ১৭৭৯ শকে (১৮৫৭ খৃঃ অব্দে) ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি অনেকগুলি পালা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি তিনি নিজের দলে গাওয়াইয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র হয় নাই—এক কন্যামাত্র হইয়াছিল; সেটিও নিঃসন্তান, বিধবাবস্থায় অনেকদিন হইল গতাসু হইয়াছে। তাঁহার পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী অনেকদিন জীবিত ছিলেন।

দাশুরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা তিনকড়ি রায় এবং তৎপরে তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র কিছুকাল পাঁচালীর দল রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা সকলেই গত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের বংশে ঐ ব্যবসা রাখিবার এক্ষণে আর কেহই নাই।

প্রভাস, চণ্ডী, নলিনী ভ্রমরোক্তি, দক্ষযজ্ঞ, মানভঞ্জন, লবকুশের যুদ্ধ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি তাঁহার রচিত অনেকগুলি পালা এক্ষণে মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ সকল পালার ছড়া ও গীতে কবিত্বপরিচায়ক অনেক স্থল আছে। করুণ ও হাস্য-রসের উদ্দীপ্তি স্থানে স্থানে এরূপ আছে যে, তাহা শুনিয়া মোহিত হইতে হয়। প্রভাসযজ্ঞে নিমন্ত্রিত বীরভূমের মূর্খ ব্রাহ্মণগণের ব্যাকুলতার বর্ণনা, প্রভাসযজ্ঞে প্রস্থিত দ্বিজপত্নীকে প্রতিবেশিনীগণের পরামর্শ দান, রুক্মিণীর বিবাহে নারদের রসভাষ প্রভৃতি পাঠ করিয়া তাঁহার রসোদ্দীপিনী ক্ষমতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রামপ্রসাদের গানের ন্যায় তাঁহার গান ও গানের সুর সহজ, এজন্য লোকে আগ্রহসহকারে উহা শিক্ষা করে। সেকালের প্রাচীনের মধ্যে দাশুরায়ের গান জানে না এরূপ লোক নাই বলিলেই হয়। এখনও অনেক ভিখারী মধ্যাহ্নকালে

গৃহস্থ প্রাচীনা কামিনীগণের ফরমায়েস মত দাশুরায়ের 'ঠাকরুণ বিষয়ক' গান গাহিয়া জীবিকার সংস্থান করে। কৃত্তিবাস, কাশীদাস দেবলীলা লিখিয়া যেমন বাঙ্গালার আপামর সাধারণের ভক্তিভাজন হইয়াছেন, দাশুরায় সেইরূপ বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবনিতার আনন্দ জন্য সহজ নূতনরূপ সঙ্গীতামোদ প্রদান করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছেন। কি ইতর, কি ভদ্র, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই—দাশুরায়ের গানের পক্ষপাতী, এরূপ সৌভাগ্য কয়জনের হয়!

দাশুরায় সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু পণ্ডিতের মুখে শুনিয়া এবং অভিধান দেখিয়া অনেক সংস্কৃতশব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ছড়া ও গীতে সেই সকল শব্দাড়ম্বর অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। অপভ্রংশ শব্দও ইহাতে অনেক আছে। ছড়াতে পয়ারের ন্যায় অক্ষর পরিমিত নাই—অনিয়মে বেশী ও কম আছে। তদ্ভিন্ন মিত্রাক্ষরতা এত অবিশুদ্ধ যে, তাহা দেখিয়া স্থানে স্থানে কবির প্রতি অশ্রদ্ধা হয়। তা ছাড়া খেঁউড়নামক উপাখ্যান সকল এত জঘন্য ও এত অশ্লীল যে, তাহা দেখিলে দাশুরায়কে ভদ্রসভায় বসিতে দিতে ইচ্ছা হয় না। যাহা হউক আমরা পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না—দুইটি গীতের উৎকৃষ্ট কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত করিলাম——

গোপীদিগের নিকটে বৈদ্যবেশী কৃষ্ণের উক্তি।

"ধনী! আমি কেবল নিদানে——

বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার, বিশেষগুণ সে জানে।
চারি যুগে মম আয়োজন হয়, একত্রেতে চূর্ণ করি সমুদয়,
গঙ্গাধর চূর্ণ আমারি আলয়, কেবা তুল্য মম গুণে;
অহে ব্রজাঙ্গনা কি কর কৌতুক, আমারি সৃষ্টি করা চতুর্ম্মুখ,
হরি বৈদ্য আমি, হরিবারে দুঃখ, ভ্রমণ করি এ ভুবনে;"

"দোষ কারও নয় গো মা!
আমি স্বখাদসলিলে ডুবে মরি শ্যামা!
ষড়রিপু হলো কোদণ্ডস্বরূপ
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ—" ইত্যাদি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি।

আমরা অনেকক্ষণ হইল ইদানীন্তনকালে প্রবেশ করিয়াছি, কিন্তু যাঁহাকে লইয়া ইদানীন্তনকালের এত গৌরব, তাঁহার বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কিছুই বলা হয় নাই। তিনি—সুগৃহীতনামা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। এক স্বতন্ত্র পুস্তকে ইঁহার জীবনচরিত * লিখিবার বিষয়ে অনেকদিন হইতে আমাদের অভিলাষ ছিল। কিন্তু নানাকারণে সে অভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায় অগত্যা এই সাধারণ পুস্তকের মধ্যেই—সুতরাং অবশ্যই সংক্ষেপে—তাঁহার জীবনচরিত লিখিত হইল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ (বীরসিঙা) নামক এক ক্ষুদ্র পল্লীতে ১৭৪২ শকের (১৮২০ খৃঃ অঃ) ১২ই আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন; ইঁহার পিতার নাম ৺ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতার নাম ভগবতী দেবী। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ৭ পুত্র ও ৩ কন্যার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় ১০৲ টাকা বেতনে সামান্য কর্ম্ম করিতেন। তৎকালে পল্লীগ্রামস্থ বালকদিগের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যেরূপ লেখাপড়া হইত, ঈশ্বরচন্দ্রেরও বাল্যকালে সেইরূপ লেখাপড়া হইয়াছিল। ৯ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তাহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া খৃঃ ১৮২৯ অব্দের ১লা জুনে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। অবস্থার ক্ষুণ্ণতাবশতঃ পুত্রের কলিকাতার ব্যয়নির্ব্বাহ করা বন্দোপাধ্যায়ের পক্ষে বড় কষ্টকর হইত, সুতরাং তথায় অবস্থানকালে অনেকদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে স্বহস্তে পাক, কদর্য্যস্থানে বাস, সামান্য দ্রব্য ভক্ষণ ও অপকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। এইরূপ ক্লেশভোগ করিয়া তিনি খৃঃ ১৮৪১ সালের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১২ বৎসর ৬ মাসকাল কলেজে থাকিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত ও সাঙ্খ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, এবং ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে

---

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহোদর শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ দর্শনেচ্ছুগণ ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিবেন।

৩০

'হিন্দু ল' বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। তৎকালে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজি অধ্যয়ন করা না করা ছাত্রদিগের ইচ্ছাধীন ছিল। নানাবিধ প্রতিবন্ধকবশতঃ কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজি অধ্যয়ন অধিক হয় নাই। ৫।৬ মাসকাল মাত্র যাহা পড়িয়াছিলেন, কলেজ ত্যাগ করিবার সময়ে তাহা লোপ পাইয়াছিল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালকমাত্রেই বাল্যকালে পড়া শুনায় কিছু অনাবিষ্ট থাকে। অল্প পরিশ্রম করিলেই পাঠাভ্যাস হয়, অথচ সহাধ্যায়িবর্গের সমকক্ষ হইতে পারা যায়, এই বুঝিয়া ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণ ও সাহিত্য শ্রেণীতে অধিক পরিশ্রম করেন নাই; সমস্ত গ্রন্থ না পড়িয়াও কিসে ভাল পরীক্ষা দিতে পারা যায়, সর্ব্বদা তাহারই ফিকির অনুসন্ধান করিতেন এবং সহাধ্যায়ীদিগের সহিত আমোদপ্রমোদ করিয়াই অধিককাল কাটাইতেন। অনন্তর তাঁহার বুদ্ধির কিঞ্চিৎ পরিপাক হইলে, তিনি অলঙ্কারশ্রেণীতে উঠিয়া কিছু পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন তাঁহার বিদ্যা ও গৌরবের পরিসীমা রহিল না। অতঃপর তিনি যখন যে শ্রেণীতে থাকিতেন, অবিসম্বাদিতভাবে সেই শ্রেণীর সর্ব্বপ্রধান ছাত্ররূপে পরিগণিত হইতেন এবং সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য রচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে প্রচুর পারিতোষিক পাইতেন। কলেজের অধ্যাপকবর্গ তাঁহার এইরূপ অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি সন্দর্শনে তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন এবং কলেজ ত্যাগ করিবার সময়ে তাঁহার বিদ্যার অনুরূপ হইবে বলিয়া "বিদ্যাসাগর" এই উপাধি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। এই উপাধি সংস্কৃতব্যবসায়ীমাত্রেরই হইতে পারে সত্য, কিন্তু আজি কালি শুদ্ধ "বিদ্যাসাগর" বলিলে—"হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতো মহেশ্বর স্ত্র্যম্বক এব নাপরঃ" ইত্যাদিবৎ জনসাধারণে কেবল উঁহাকেই প্রায় লক্ষ্য করিয়া থাকে।

বিদ্যাসাগরের কলেজে অবস্থানসময়ে ফোর্টউইলিয়ম্ কলেজের তৎকালীন সেক্রেটরি কাপ্তেন জি, টি, মার্শেলসাহেব কিয়ৎকালের জন্য সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে তিনি বিদ্যাসাগরকে সাতিশয় ভালবাসিতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদশূন্য হইলে মার্শেল সাহেব বিনা প্রার্থনায় তাঁহাকে কলেজ হইতেই লইয়া গিয়া ৫০৲ টাকা বেতনে ১৮৪১ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া দেন। ঐ সময়ে সাহেব

তাঁহাকে বলেন যে, ঈশ্বর! তুমি ইংরেজি শিক্ষা ও বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করিতে চেষ্টা কর, নতুবা কাজের লোক হইতে পারিবে না। হিতৈষী সাহেবের এই পরামর্শানুসারে তিনি ঐ সময়ে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু শিক্ষা দিবার লোকের অভাববশতঃ অচিরেই তাহা ত্যাগ করিতে হয়। মার্শেল সাহেবের জেদ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া আবার আরম্ভ করেন, এবং আবার ত্যাগ করিতে হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ অসুবিধাভোগ করিয়াও মধ্যে মধ্যে সামান্যরূপ সাহায্য পাইয়া এবং স্বয়ং যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া ইংরেজি ভাষাতে বিশিষ্টরূপ অধিকারলাভ করিয়াছিলেন।

মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগরের সহিত যত ঘনিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিলেন, ততই তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, তেজস্বিতা, উদারতা প্রভৃতি সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইতে লাগিলেন। তদবধি সকল বিষয়েই বিদ্যাসাগরের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন এবং তদীয় মতগ্রহণ ব্যতিরেকে প্রায় কোন কর্ম্ম করিতেন না। ঐ সময়ে ডাক্তার মৌএট্সাহেব এডুকেশন কৌন্সিলের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে সংস্কৃতবিদ্যা ও হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়ে কোন কথা জানিবার প্রয়োজন হইলে মার্শেল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেন; মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগরের দ্বারা মৌএট্সাহেবের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইতেন। এই সূত্রে মৌএট্ সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়। তদবধি তিনি বিদ্যাসাগরের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার পরমাত্মীয় ও যারপরনাই হিতৈষী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত কলেজের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদ শূন্য হওয়ায় বেতনের বৈলক্ষণ্য না থাকিলেও সাহেবেরা বিদ্যাসাগরকেই ঐ পদের যথার্থ উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া ঐ সালের এপ্রিল মাসে নিযুক্ত করেন। ঐ সময়েই তাঁহা কর্ত্তৃক কলেজের অধ্যয়নপ্রণালী অনেক সংশোধিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ফোর্ট উইলিয়মকলেজে অবস্থান সময়ে তত্রত্য সিবিলিয়ান ছাত্রদিগের পাঠ্যপুস্তক কদর্য্য ভাষারচিত বাঙ্গালা হিতোপদেশের পরিবর্ত্তে মার্শেল সাহেবের আদেশক্রমে বিদ্যাসাগর 'বাসুদেবচরিত' নামে সর্ব্বপ্রথম এক বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করেন। গবর্ণ-

মেণ্টের অনুমোদিত না হওয়ায় তাহা মুদ্রিত হয় নাই। কিছুদিন পরে উক্ত সাহেব গবর্ণমেণ্টকে সম্মত করিয়া হিন্দি বেতালপঞ্চবিংশতির এবং মার্শমানপ্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাসের উত্তরভাগের বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে বিদ্যাসাগরকে অনুমতি করিয়াছিলেন। তদনুসারে এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে [১৯০৩ সংবৎ] 'বেতালপঞ্চবিংশতি' পুস্তক এবং ইহার পর বৎসরে অর্থাৎ ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে [১৯০৪ সংবৎ] 'বাঙ্গালার ইতিহাস' দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয়। ঐরূপ কার্য্যের উদ্দেশেই ১৮৫০ খৃঃ অব্দে [১৯০৬ সংবৎ] চেম্বর্স বাওগ্রাফী নামক ইংরেজি পুস্তক হইতে সঙ্কলিত করিয়া 'জীবনচরিত' নামক পুস্তকও বিরচিত হইয়াছে।

সংস্কৃত কলেজে প্রায় এক বৎসর কর্ম্ম করার পর তথাকার তাৎকালিক সেক্রেটরি বাবু রসময় দত্তের সহিত নানাবিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতের অনৈক্য হইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর অতি তেজস্বী লোক; তিনি আপনার মনের মত কাজ হইবে না বুঝিয়া বিরক্ত হইলেন এবং টাকার মায়া ত্যাগ করিয়া কলেজে প্রবিষ্ট হইবার ঠিক এক বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৮৪৭ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে কর্ম্মত্যাগ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। তিন মাসের পর সে প্রার্থনা মঞ্জুর হইল।

অতঃপর বিদ্যাসাগর কিয়ৎকালের জন্য বিষয়কর্ম্মশূন্য হইয়া লেখাপড়ার চর্চ্চায় বিশেষতঃ ইংরেজীর অনুশীলনেই সাতিশয় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। অনন্তর ফোর্টউইলিয়ম কলেজের হেড কেরাণীর পদ শূন্য হওয়ায় মার্শেল সাহেবের অনুরোধে ৮০৲ টাকা বেতনে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে স্মরণীয়নামা বেথুনসাহেব শিক্ষাসমাজের সর্ব্বাধ্যক্ষ (প্রেসিডেণ্ট) ছিলেন। মৌএটসাহেব বিদ্যাসাগরের গুণগান করিয়া তাঁহাকে বেথুনসাহেবের নিকট পরিচিত করিয়া দেন। তদবধি বেথুনসাহেব বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট স্নেহ ও সমাদর করিতেন এবং নানাবিষয়ে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া পরম আনন্দিত হইতেন। বেথুন সাহেব কলিকাতায় যে বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন, বিদ্যাসাগর তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী। ১৮৫০ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বেথুনসাহেব উক্ত

বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার তাঁহার উপর প্রদান করিয়াছিলেন। এই বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থই বিদ্যাসাগর ১৮৫১ খৃঃ অব্দে (১৯০৭ সং) 'চেম্বর্স রুডিমেণ্ট্‌স অব নলেজ' অবলম্বন করিয়া চতুর্থভাগ শিশুশিক্ষা বা 'বোধোদয়' নামক পুস্তক রচনা করেন। যাহা হউক, মার্শেল, মৌএট ও বেথুন সাহেব এই তিনজনই বিদ্যাসাগরের যথার্থ মুরুব্বী। যাহাতে তাঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি ও মানসম্ভ্রমের বৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে তিনজনেই সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শীদাবাদের জজ পণ্ডিত হইয়া যাইলে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। মৌএটসাহেব পীড়াপীড়ি করিয়া ১৮৫০ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বরমাসে ৯০৲ টাকা বেতনে বিদ্যাসাগরকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ঐ নিয়োগকালে এডুকেশন কৌন্সিলের মেম্বরেরা সংস্কৃত কলেজের তাৎকালিক অবস্থা এবং উহা উত্তরকালে কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে এক রিপোর্ট করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দিয়াছিলেন। বোধ হয় এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সেক্রেটারী রসময় বাবু কর্ম্মত্যাগ করিলেন। তিনি যেমন ছাড়িলেন, অমনি বিদ্যাসাগর সাহিত্যাধ্যাপকের পদ হইতে তাঁহার পদে ১০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। ইহার পর একমাস অতীত না হইতেই কৌন্সিলের সাহেবেরা বিদ্যাসাগরের প্রদত্ত রিপোর্ট * পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী ও এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদ উঠাইয়া দিয়া উভয় বেতনে অর্থাৎ মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে প্রিন্সিপালের পদ নূতন সৃষ্ট করিয়া ২১শে জানুয়ারী হইতে বিদ্যাসাগরকেই ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। যাহা হউক, ইতিপূর্ব্বেই বিদ্যাসাগর যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই অনুসারে কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় পাঠনারই পরিবর্ত্তন হইল। পূর্ব্বে ইংরেজি ছাত্রদিগের ইচ্ছাধীন (optional) পাঠ ছিল, এক্ষণে উচ্চ কয়েক শ্রেণীতে অবশ্য পাঠ্য (Compulsory) হইল। সংস্কৃতেও নিম্নশ্রেণীতে মুগ্ধবোধব্যাকরণ

---

* শ্রীযুত বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের প্রণীত 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে এই রিপোর্ট বাঙ্গালাভাষায় আদ্যোপান্ত অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ দর্শনেচ্ছুগণ উক্ত গ্রন্থের ২য় সংস্করণের ২০২-২১৮ পৃষ্ঠা দেখিবেন।

উঠিয়া গিয়া তৎপরিবর্তে বিদ্যাসাগরকর্তৃক বাঙ্গালাভাষায় রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা এবং ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ ব্যাকরণকৌমুদী অধ্যাপিত হইতে লাগিল। পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি হইতে সঙ্কলনপূর্ব্বক যে তিনভাগ 'ঋজুপাঠ' প্রস্তুত হইল, তাহাও উহারই সঙ্গেসঙ্গে পঠিত হইতে লাগিল। এই সময়ে কয়েকজন বুদ্ধিমান্ বালক উপক্রমণিকা হইতে সংস্কৃত আরম্ভ করিয়া লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক উচ্চ উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে লাগিল দেখিয়া ঐ সকল ভাষা ব্যাকরণপাঠের পর সংস্কৃত সিদ্ধান্তকৌমুদীর পাঠনা হইবে, পূর্ব্বে যে এই প্রস্তাব হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে বিদ্যাসাগর আর বড় মনোযোগ করিলেন না। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত নূতন প্রণালীর সফলতাসন্দর্শনে এডুকেশন কৌন্সিলের সাহেবেরা তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী হইতে তাঁহার বেতন ১৫০৲ হইতে ৩০০৲ টাকা করিয়া দিলেন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের তাৎকালিক নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইহারই পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে [১৯১১ সং] কালিদাসপ্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা 'শকুন্তলা' রচনা করেন।

১৮৫১ খৃঃ অব্দে বেথুন সাহেবের মৃত্যু হইলে তৎপ্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়নির্ব্বাহের ভার গবর্ণর জেনেরেল লর্ড ডালহৌসি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর হেলিডে সাহেবের উপর উহার তত্ত্বাবধানের ভার দেন। এই উপলক্ষে হেলিডে সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়। পরিচয় দিবসাবধি তিনি বিদ্যাসাগরের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে যখন গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে মফঃস্বলে বাঙ্গালা ও ইংরেজি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করা রাজপুরুষদিগের অভিমত হয়, তৎকালে হেলিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে তাঁহার মতে যে প্রণালীতে বাঙ্গালা শিক্ষা হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে এক রিপোর্ট দিতে বলেন। তদনুসারে তিনি এক প্রণালী প্রস্তুত করিয়া সাহেবের নিকট অর্পণ করিলে সাহেব তাহা মঞ্জুর করিয়া লন, এবং অতিরিক্ত ২০০৲ টাকা বেতন দিয়া তাঁহাকে এসিষ্টাণ্ট ইন্স্পেক্টরের পদ প্রদানপূর্ব্বক হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়া এই চারি জেলায় কতকগুলি বাঙ্গালা মডেল স্কুল স্থাপন

করিতে অনুমতি করেন। ঐ সকল আদর্শ বিদ্যালয় এবং অপরাপর বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অধীনে কলিকাতায় এক নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। এই অবধি তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, নর্ম্মাল স্কুল, চারি জেলার মডেল স্কুল ও কলিকাতাস্থ বাঙ্গালা পাঠশালার তত্ত্বাবধানকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ঐ সময় তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় হুগলী ও বর্দ্ধমান জিলায় ৪০টির অধিক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। মফঃস্বলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের এই প্রথম সূত্রপাত। এই সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় গবর্ণমেণ্ট হইতেই পাওয়া যাইবে, পূর্ব্বে এইরূপ কথা ছিল, কিন্তু পরে তাহা না হওয়ায়, চাঁদা দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। সেই চাঁদায় তিনি স্বয়ংও কিছু দিতেন এবং লেডি ক্যানিঙ্, সর সিসিল বীডন্, সর উইলিয়ম গ্রে এবং পাইকপাড়ার রাজা ৺প্রতাপনারায়ণ সিংহ প্রচুরপরিমাণে সাহায্য করিতেন। তৎকালে সিবিলিয়ান গর্ডন ইয়ং সাহেব স্কুল সমূহের ডিরেক্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইয়ং সাহেব সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে সম্মত না হওয়ার ফলে মনোবিবাদ ঘটে। এই সূত্রেই ১২৬৫ সালের ১৯শে কার্ত্তিক বিদ্যাসাগর পাঁচশত টাকার চাকুরি পরিত্যাগ করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার 'সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটরী' ও গ্রন্থাবলী হইতে যথেষ্ট অর্থাগম হইতেছিল। অতঃপর আর তিনি বেতনভোগী হইয়া সরকারি কার্য্যে কখন নিযুক্ত হন নাই। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার বিখ্যাত কলেজ মিট্রপলিটানের প্রতিষ্ঠা।

অতঃপর বিদ্যাসাগর এক গুরুতর কাণ্ডে ব্যাপৃত হইলেন। পতির মৃত্যু হইলে পুনর্ব্বার বিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকায় হিন্দু বিধবাদিগের যে সকল ক্লেশ, যে সকল দুরবস্থা ও যে সকল অনিষ্ট সঙ্ঘটনা হইয়া থাকে, তদ্দর্শনে বিদ্যাসাগরের সদয় অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই ব্যথিত থাকিত। তিনি অনেকদিন হইতে ঐ বিষয়ের চিন্তা করিতেছিলেন। শাস্ত্রে যে বিধবা বিবাহের বিধি আছে, ইহা তাঁহার পূর্ব্বে বোধ ছিল না। সুতরাং তিনি মনে করিয়াছিলেন, বিধবা বিবাহ যে বিশুদ্ধ যুক্তির সম্পূর্ণ অনুমোদিত, তদ্বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিবেন, এবং তাহাতে মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল কার্য্য বিহিত ও নিষিদ্ধ আছে, তৎসমুদয়ের উল্লেখ

করিয়া দেখাইবেন যে, হিন্দুদিগের পরম শ্রদ্ধাস্পদ উক্ত সংহিতার এত বিধি ও এত নিষেধ আমরা প্রতিপালন করি না,—যদি অকারণে সে সকল লঙ্ঘন করিয়াও আমাদের জাতিপাত বা অধর্ম্ম না হয়, তবে এতাদৃশ প্রবল কারণসত্ত্বে বিধবাবিবাহ নিষেধরূপ একটি নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কেন আমরা অধার্ম্মিক বা জাতিচ্যুত হইব? ইত্যাদি যুক্তি ঐ প্রবন্ধে লিখিত ছিল। যাহা হউক, একদা 'কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ' পরাশর-সংহিতার এই বচনাংশ দর্শন করিয়া হঠাৎ তাঁহার সমগ্র পরাশরসংহিতাদর্শনে প্রবৃত্তি জন্মে, এবং পরাশরসংহিতা খুলিয়া দেখেন যে, তাহাতে বিধবাবিবাহবিধায়ক——

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥'

এই স্পষ্ট বচন আছে। এই বচন দর্শন করিয়া চিরাভিলষিত বিষয়ের সিদ্ধি হইবে ভাবিয়া বিদ্যাসাগরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি ঐ বচন ও অন্যান্য পেমাণ অবলম্বন করিয়া বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনপূর্ব্বক ১৮৫৫ খৃঃ "বিধবা-বিবাহ হওয়া উচিত কিনা?" এই নামে একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন। এই পুস্তক পাঠ করিয়া হিন্দু-সমাজে একবারে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। প্রাচীন হিন্দুরা বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক খৃষ্টীয়ান বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন; অনেক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং অনেক ধনবান্ লোকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের সাহায্যে বিধবা বিবাহনিষেধক প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যা-সাগরলিখিত পুস্তকের অনুকরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। কোন কোন পুস্তকে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ গালিবর্ষণেরও ত্রুটি ছিল না। প্রায় সকল সংবাদপত্র হইতেই বিদ্যাসাগরের উপর অনবরত প্রস্তরবৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু মহামনা বিদ্যাসাগর অবিকৃতচিত্তে সে সমুদয় সহ্য করিয়া ঐ বৎসরেই বিধবা-বিবাহ-সংক্রান্ত দ্বিতীয় পুস্তক প্রচার করিলেন। ঐ পুস্তকে এরূপ পাণ্ডিত্য ও এরূপ গাম্ভীর্য্যসহকারে প্রতিপক্ষদিগের প্রদত্ত সর্ব্ববিধ আপত্তির খণ্ডন করিলেন, এরূপ নৈপুণ্যের সহিত শাস্ত্রার্থের মীমাংসা করিলেন ও দুর্বিগাহ শাস্ত্রীয় বিচার সকল এরূপ সরল ও মধুর ভাষায় রচনা করিয়া জলবৎ সহজ

করিয়া দিলেন যে, তাহা পাঠ করিয়া সকলেরই বিদ্যাসাগরকে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া বোধ হইল। যাহা হউক, এই দ্বিতীয় পুস্তক বহির্গত হইলে অনেক কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেরও মনে বিধবাবিবাহ যে অশাস্ত্রীয় নহে, ইহা অন্ততঃ অপরিস্ফুটরূপেও প্রতীয়মান হইল। এক্ষণে বিদ্যাসাগর পুস্তক রচনায় নিবৃত্ত হইয়া—কিরূপে বিধবাবিবাহ কার্য্যে পরিণত হইবে, তদর্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগরকৃত কোন কর্ম্মই অঙ্গহীন থাকিবার নহে। পাছে বিধবাবিবাহে উৎপাদিত সন্তানগণের উত্তরকালে ধনাধিকারবিষয়ে কোনরূপ গোলযোগ হয়, এইজন্য তিনি ঐ বিষয়ে এক আইন প্রস্তুত করাইতে উদ্যোগী হইলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালী কর্ম্মের উপলক্ষে সর্ জেম্‌স্ কল্‌বিল, জে আর কলবিন, জে পি গ্রাণ্ট, সিসিল বীডন প্রভৃতি বড় বড় সাহেবদিগের নিকটে বিদ্যাসাগর পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট স্নেহ ও সমাদর করিতেন। বিদ্যাসাগর ঐ সকল সাহেবদিগের সাহায্যে এবং ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৺রামগোপাল ঘোষ, ৺রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি দেশীয় প্রধান প্রধান লোকের উদ্যোগে কলিকাতার বিধিদায়িনী সভা হইতে এই মর্ম্মে এক আইন পাস করাইলেন যে 'বিধবা বিবাহে উৎপাদিত সন্তানেরাও হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ধনাধিকারী হইবে।' এই আইনকে ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন কহে।

অনন্তর বিধবাবিবাহের প্রকৃত চেষ্টা হইতে লাগিল। বিধবাবিবাহে কায়-মনোবাক্যে সাহায্য করিবেন বলিয়া অনেক প্রধান প্রধান লোকে পার্চমেণ্টে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন। ঐ কার্য্যে সাহায্য করিবার অর্থের জন্য চাঁদা হইতে লাগিল এবং মুর্শীদাবাদ জেলার তাৎকালিক জজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৭৭৮ শকের ২১শে অগ্রহায়ণে এক বিধবা কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিলেন। ইহার পর দুই একটি করিয়া বিধবা-বিবাহ হইতে লাগিল। যাহা হউক, ঐ সময়ে দেশের সকল সমাজেই কেবল বিধবাবিবাহ-সংক্রান্ত কথারই ঘোরতর আন্দোলন হইতে লাগিল; স্থানবিশেষে স্বপক্ষ বিপক্ষদিগের গালাগালি মারামারি প্রভৃতিও আরম্ভ হইল এবং দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখেই বিদ্যাসাগরের নাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে পূর্ব্বোল্লিখিত দাশরথিরায় বিধবাবিবাহের একপালা পাঁচালী রচনা করিয়া গাইতে আরম্ভ করিলেন ; বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত নানাবিধ গান পথে—ঘাটে—মাঠে সর্ব্বত্রই শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল ; এবং শান্তিপুরের "বিদ্যাসাগর পেড়ে" নামক একপ্রকার বস্ত্র উঠিল। উহার প্রান্তভাগে নিম্নলিখিত গীতটি সন্নিবদ্ধ ছিল——

"সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥
কবে হবে শুভদিন, প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম—বিধবারমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম ;
মনের সুখে থাক্‌ব মোরা মনোমত পতি লয়ে॥
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে, আভরণ পরিব সবে,
লোকে দেখ্‌বে তাই—আলোচাল কাঁচ্‌কলা মাল্‌সার মুখে দিয়ে ছাই ;——
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় লয়ে॥"

এই সকল বৃহৎ ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়াও বিদ্যাসাগর গ্রন্থ রচনায় বিরত হন নাই। ঐ ১৮৫৬ খৃঃ অব্দেই তিনি দুই ভাগ 'বর্ণপরিচয়,' 'চরিতাবলী,' 'কথামালা,' 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' এই ৫ খানি পুস্তক রচনা করেন। প্রথম ৪ খানি মডেল স্কুলের বালকদিগের পাঠার্থ রচিত হয় ; ৫ম খানি কলিকাতাস্থ বেথুন সোসাইটী নামক সমাজে পঠিত ও পশ্চাৎ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। এই সময়েই তিনি কিছুকালের জন্য কলিকাতাস্থ তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন এবং সেই কালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়াছিলেন ; তাহাই ১৮৬০ খৃঃ অব্দে পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিদ্যাসাগর বড় তেজস্বী ; তিনি সংসারবিদ লোক নহেন। নিজের অভিমত কার্য্য কর্ত্তৃপক্ষেরা অনুমোদন না করিলে তাঁহাদের নিকট হইতে 'ফিকির জুকির' করিয়া কাজ আদায় করিয়া লওয়া বিদ্যাসাগরের কোষ্ঠীতে লেখে নাই। সুতরাং এইরূপে অব্যাহতপ্রভাবে কিছুকাল কর্ম্ম করার

পর নানাকারণে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের উপর বিরক্ত হইতে লাগিলেন, এবং সেই বিরক্তিনিবন্ধন ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বসিলেন!

কর্ম্ম ত্যাগ করার পর তিনি ১৮৬২ খৃঃ অব্দে 'সীতার বনবাস' ও 'ব্যাকরণ-কৌমুদীর চতুর্থভাগ,' ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে 'আখ্যানমঞ্জরী,' ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে মল্লিনাথটীকাসহকৃত মেঘদূতের পাঠাদিবিবেক, পীড়িতাবস্থায় বর্দ্ধমানে অবস্থিতি-কালে ১৮৭০ খৃঃ অব্দে 'ভ্রান্তিবিলাস,' বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ ১৮৭১ খৃঃ অব্দে 'উত্তররামচরিত' ও 'অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের টীকা, এবং 'বহু-বিবাহ হওয়া উচিত কি না' এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব এই কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। এই প্রকাশিত পুস্তকগুলি ভিন্ন তাঁহার রচিত আরও অনেকগুলি পুস্তক আছে, তাহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কর্ম্মত্যাগ করার পর অনেক সময়েই তাঁহাকে অস্বাস্থ্যজন্য কষ্ট পাইতে হইয়াছে, তন্নিমিত্তই হউক, অথবা নানাকারণে সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট বহু-লোকের সমাগম হয় তন্নিবন্ধন অবকাশাভাবেই হউক, তিনি আশানুরূপ অধিক পুস্তক রচনা করিতে পারেন নাই। ঐ লোকসমাগমবিঘ্ন নিবারণের জন্য তিনি কখন কখন নির্জ্জন স্থানে গিয়া অবস্থিতি করেন, কিন্তু তথা হইতেও নানাকার্য্যে সর্ব্বদাই কলিকাতায় যাইবার প্রয়োজন হওয়ায় তাঁহার অনেক সময় অনর্থক অতিবাহিত হয়।

এস্থলে অনেকের জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বিদ্যাসাগর কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার কিরূপে চলে?—ইহার উত্তর এই—সরস্বতীর প্রসাদে তাঁহার সে বিষয়ে কোন কষ্ট নাই। কলিকাতার 'সংস্কৃত প্রেস' নামক ছাপাখানা ও স্বরচিতপুস্তকবিক্রয়, এই উভয়ে তাঁহার বার্ষিক যথেষ্ট আয় আছে। অন্য লোক হইলে সেই আয়ে বিলক্ষণ বিষয় করিয়া লইত; কিন্তু বিদ্যাসাগর সে ধাতুর লোক নহেন—তিনি যাহা পান, তাহাই ব্যয় করিয়া ফেলেন। তিনি স্বগ্রামস্থ বিদ্যালয়ের জন্য, ডাক্তারখানার জন্য, বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য এবং গ্রামস্থ অনাথ ও নিরুপায় লোকদিগের সাহায্যের-

জন্য মাসে মাসে বিস্তর টাকা দান করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নৈমিত্তিক ব্যয়ও আছে। উদাহরণস্বরূপ তাহার একটার উল্লেখ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, কয়েক বৎসর হইল, তিনি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সামাজিক বিজ্ঞানসভায় ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন!

বিদ্যাসাগরের চারি কন্যা ও একমাত্র পুত্র। পুত্র শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সন ১২৭৭ সালের ২৭এ শ্রাবণ এক বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহে স্বয়ং নির্লিপ্ত থাকিয়া কেবল পরকে মজাইতেন, এই কথা পূর্ব্বে যাঁহারা বলিতেন, এক্ষণে নারায়ণের বিধবাবিবাহদ্বারা তাঁহাদের সে মুখ বন্ধ হইয়াছে। ১৮১৩ শকে ১৩ই শ্রাবণ (১৮৯১, ২৮এ জুলাই) মঙ্গলবার ইহার পরলোক হইয়াছে।

বেতালপঞ্চবিংশতি হইতে বহুবিবাহবিচার পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরের রচিত বাঙ্গালা সংস্কৃতে যে, ৩০ খানি পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, যথাক্রমে তাহাদের নাম সকল উল্লিখিত হইল। এই সকল পুস্তক দেশমধ্যে অতি বহুলরূপে প্রচলিত। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি যাঁহাদের কিছুমাত্র আদর আছে, তাদৃশ কোন পাঠকের নিকটেই বোধ হয় বিদ্যাসাগররচিত কোন পুস্তকই অপরিজ্ঞাত নাই। অতএব এ সকল পুস্তকের পৃথক্ সমালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে যে সুশ্রাব্য সংস্কৃত শব্দ সম্মিষ্ট বাঙ্গালা গদ্যরচনার বিশুদ্ধ রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বিদ্যাসাগরের বেতালপঞ্চবিংশতিই তাহার মূল কারণ। বেতালপঞ্চবিংশতির পূর্ব্বে ওরূপ প্রকৃতির বাঙ্গালা রচনা ছিল না। বিদ্যাসাগরই উহার সৃষ্টিকর্ত্তা। উঁহার বেতালপঞ্চবিংশতিও প্রথম বলিয়া, বোধ-হয়, সবিশেষ প্রযত্নে বিরচিত হইয়াছে, এই জন্যই উহার রচনা যেরূপ কোমল, মনোহর ও মধুবর্ষিণী হইয়াছে, বিদ্যাসাগরেরও অন্য কোন পুস্তকের রচনা সেরূপ হয় নাই। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ঐ পুস্তক যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, তৎকালে বিদ্যাসাগরও ভাবিয়াছিলেন যে, দীর্ঘ দীর্ঘ সমাসসমন্বিত রচনা উৎকৃষ্ট বাঙ্গালার উপযোগিনী হইবে। এই জন্য প্রথমবারে প্রকাশিত পুস্তকের একস্থানে—"উত্তাল-তরঙ্গমালাসঙ্কুল

উৎফুল্ল-ফেননিচয়চুম্বিত ভয়ঙ্কর তিমি-মকর-নক্র-চক্র-ভীষণ-স্রোতস্বতীপতি-প্রবাহ-মধ্য হইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভূত হইল" এইরূপ রচনা ছিল। কিন্তু ওরূপ রচনা বাঙ্গালার মধ্যে থাকা উচিত নহে, এই বোধ তাঁহার নিজেরই মনে পরে উদিত হওয়ায় এক্ষণকার সংস্করণে ওরূপ ভাগ সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই বেতালপঞ্চবিংশতি যেমন মধুররচনার, জীবনচরিত সেইরূপ ওজস্বিনী রচনার দৃষ্টান্তস্থল—"উদয়োন্মুখী প্রতিভার নিত্যবিদ্বেষিণী ঈর্ষ্যা তাঁহার অভ্যুদয়াশা ত্বরায় উচ্ছিন্ন করিল" ইত্যাদিরূপ প্রগাঢ় রচনা বোধ হয় এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালা পুস্তকে দৃষ্ট হয় নাই। দুঃখের বিষয়, বিদ্যাসাগরের হস্ত হইতেও এরূপ প্রগাঢ়রচনা আর বাহির হইল না। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা-ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের যে উপক্রমণিকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দেশ-মধ্যে সাধারণতঃ সংস্কৃত শিক্ষাবিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। পূর্ব্বে অনেকদিন হইতেই ইংরেজিভাষায় কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই সংস্কৃত শিখিতে অভিলাষ হইত, কিন্তু উহার দ্বারে যে ভীষণমূর্ত্তি ব্যাকরণ দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে দেখিয়া কেহই নিকটেই ঘেঁসিতে পারিতেন না। বিদ্যাসাগর সেই পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে কি পল্লী, কি নগর সর্ব্বত্রই বিদ্যানুশীলনরত কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই যে, কিছু না কিছু সংস্কৃতের চর্চ্চা করিতেছেন, উপক্রমণিকাদ্বারা ব্যাকরণের দুর্গম-পথ পরিষ্কৃত হওয়াই তাহার মূলকারণ। সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠকরিয়া সংস্কৃত-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হইলে এক্ষণকার সংস্কৃতানুশীলনকারীদিগের মধ্যে কয়-জনের ভাগ্যে সংস্কৃত শিক্ষাকরা ঘটিয়া উঠিত? ফলতঃ বিদ্যাসাগরের যদি আর কোন কার্য্যও না থাকিত, তথাপি উপক্রমণিকাদি রচনাদ্বারা সংস্কৃত-ভাষার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়ারূপ এই একমাত্র কার্য্যের জন্যও দেশীয় লোকদিগের নিকট তিনি চিরকাল কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতেন সন্দেহ নাই।

বিদ্যাসাগররচিত সীতার বনবাসকে অনেকে "কান্নার জোলাপ" কহে। ঐ পুস্তকের প্রথমাংশ ভবভূতিপ্রণীত উত্তরচরিতের প্রায় অবিকল অনুবাদ, কিন্তু অপর সমুদয়ভাগ কেবল নূতনরূপ রচনাই নহে, উহাতে যে কি মধুর,

কি চমৎকারজনক ও কি অলৌকিক কাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নহে। বোধ হয় উহাতে এমত একটি পত্রও নাই, যাহা পাঠ করিতে পাষাণেরও হৃদয় দ্রব না হয়। করুণরসের উদ্দীপনে বিদ্যাসাগরের যে, কি অদ্ভুত শক্তি আছে, তাহা এক সীতার বনবাসেই পর্য্যাপ্তরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহা-হউক, আমরা ঐ পুস্তকপাঠকরিয়া তৎকালে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বিদ্যাসাগরের লেখনীই মধুময়ী; উহা হইতে যাহা কিছু নির্গত হয়, তাহাই মধুবর্ষী হইয়া পড়ে। বলিতে কি, সীতার বনবাস পাঠাবসানে বিদ্যাসাগরকে ঐরূপ কার্য্যে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত তাঁহার স্বনামাঙ্কিত একটি স্বর্ণময়ী লেখনী সোমপ্রকাশসম্পাদকদ্বারা অপ্রকাশ্যভাবে উপহার দিবার জন্য আমাদের বড়ই অভিলাষ হইয়াছিল; লেখনী নির্ম্মাণকরাইবার জন্য অনেক চেষ্টাও করিয়াছিলাম; কিন্তু নানাকারণে তৎকালে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই—ভাবিয়াছিলাম, অপর কোন সুযোগে উহা প্রদান করিব। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এপর্য্যন্ত তেমন সুযোগ আর ঘটিয়া উঠিল না!

বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, চরিতাবলী প্রভৃতি শিশুদিগের পাঠোপযোগী কয়েকখানি পুস্তক বিদ্যাসাগরের নিতান্ত সরলরচনার উদাহরণস্থল। ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ হইতেছে যে, বিদ্যাসাগর কি সরল, কি মধুর, কি ওজস্বিনী—যেরূপ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার সর্ব্ববিধ রচনাই লোকে সাতিশয় সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই সেই বিষয়ে সেই সেই পুস্তককে আদর্শস্বরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ' ও 'বহুবিবাহবিচার' নামক পুস্তকদ্বয় সারগর্ভ যুক্তি-সমেত রচনার নিকষস্থল। বাঙ্গালা ভাষায়, শাস্ত্রীয় বিচার করা এবং সেই বিচার সরল ভাষা সহযোগে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া, এ উভয়ই কঠিন ব্যাপার। বিদ্যাসাগর যে কিরূপ পাণ্ডিত্যসহকারে ও কিরূপ সুন্দর প্রণালীতে সেই বিষয়ের সমাধান করিয়াছেন, তাহা সেই সেই গ্রন্থ একবার অধ্যয়ন না করিলে কোনমতেই হৃদয়ঙ্গম হইবার নহে। তন্মধ্যে বহু বিবাহ বিচারে উচিতমত গাম্ভীর্য্যরক্ষার কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছে, একথা অনেকেই

কহিয়া থাকেন, কিন্তু বিধবাবিবাহবিচারে যে কোন অংশে কিছু ত্রুটি হইয়াছে, তাহা শক্ররাও বলিতে পারে না। ফলতঃ এই পুস্তকে বিদ্যাসাগরের বিদ্যা, বুদ্ধি, কৌশল, বহুদর্শিতা, সারগ্রাহিতা, মীমাংসকতা, বিনয়, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি অশেষ গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। আমাদের একজন সুবিজ্ঞ আত্মীয় কহিয়াছিলেন, 'বিধবাবিবাহ পুস্তকের শীর্ষস্থ পঙ্‌ক্তিগুলি যথা—'পরাশরবচন বিবাহিতাবিষয়—বাগ্‌দত্তাবিষয় নহে,' ইত্যাদি অক্ষরগুলি ইংরেজির ইটালিক্ অক্ষরের ন্যায় বাঁকা বাঁকা অক্ষরে মুদ্রিত হইলে ভাল হইত।" কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি এইমাত্র উত্তর করেন, ইংরেজি জিওমেট্রির প্রতিজ্ঞা-গুলি ইটালিক অক্ষরে আছে।" তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা-গুলি যেরূপ অভ্রান্ত, অকাট্য যুক্তিপরম্পরাদ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়াছে, বিধবা বিবাহ পুস্তকের শীর্ষকস্থ পঙ্‌ক্তিগুলিও তৎপরবর্ত্তী বিচারের দ্বারা সেইরূপে নিঃসংশয়িতরূপে উপপাদিত হইয়াছে। অতএব উভয় পুস্তকেরই শীর্ষস্থ প্রতিজ্ঞা-গুলি একবিধ অক্ষরে মুদ্রিত হওয়া উচিত।

বাঙ্গালারচনায় বিদ্যাসাগরের এইরূপ অসাধারণ শক্তিদর্শনেই সুধীরঞ্জনের বঙ্গভাষা গর্ব্ব করিয়াছেন—

"কি কারণ তোষামোদ করিব সকলে। পিপাসা যাবে না কভু গোষ্পদের জলে॥
বিশেষতঃ বারি বিনে কিছু নাই ডর। একাকী ঈশ্বর মম বিদ্যার সাগর॥
তার যদি জননীর প্রতি থাকে টান। ত্বরায় উঠিবে মম যশের তুফান॥"

বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের দ্বারা বঙ্গভাষার যশের তুফানই উঠিয়াছে।

কেহ কেহ কহেন বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালারচনানৈপুণ্যবিষয়ে অদ্বিতীয়তা জন্মিয়াছে সত্য, কিন্তু বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনীশক্তি বা মৌলিকতা (Originality) নাই—অর্থাৎ বিদ্যাসাগর অনুবাদ ভিন্ন মূলগ্রন্থ রচনা করিতে পারেন না।' বিদ্যাসাগর রচিত যে সকল পুস্তকের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অধি-কাংশই কোন না কোন পুস্তকের অনুবাদ, মূলগ্রন্থ তাহাদের মধ্যে অল্পই আছে, এ কথা অযথার্থ নহে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, বিদ্যা-সাগরের রচনাপ্রণালীর প্রাদুর্ভাবের সময়ই বাঙ্গালাভাষার পক্ষে অন্ধকারাবস্থা

হইতে আলোকে প্রবিষ্ট হইবার প্রায় প্রথম উদ্যমকাল; ঐরূপ কালে সকল ভাষাতেই মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থই অধিক হইয়া থাকে, ইহা এক সাধারণ নিয়ম। বিদ্যাসাগর সে নিয়মের অনধীন হইতে পারেন নাই—সুতরাং তাঁহাকে মূলগ্রন্থ অপেক্ষা অনুবাদগ্রন্থই অধিক করিতে হইয়াছে। কিন্তু যিনি উপক্রমণিকা, কৌমুদী, বিধবাবিবাহসংক্রান্ত ১ম ও ২য় পুস্তক, সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়কপ্রস্তাব, সীতার বনবাস ও বহুবিবাহবিচার রচনাকরিয়াছেন, তাঁহাকে মূলরচনা করিবার শক্তিবিহীন বলা নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য হয়।

বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনাপ্রণালী পাঠকদিগের সুবিদিত থাকিলেও আমাদিগের অবলম্বিত রীতি অনুসারে বিধবা বিবাহ পুস্তকের উপসংহারস্থ শেষঅংশটি নিম্ন-ভাগে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কতকাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদশয্যায় শয়নকরিয়া থাকিবে? একবার জ্ঞানচক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন যথেষ্ট হইয়াছে, অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক নিরাকরণকরিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ, দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া লৌকিকরক্ষাব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন, দেশাচারের আনুগত্য-পরিত্যাগ ও সঙ্কল্পিত লৌকিকরক্ষাব্রতের উদ্যাপন করিয়া যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া আছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থাদর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস-হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের প্রবল স্রোতে দেশ
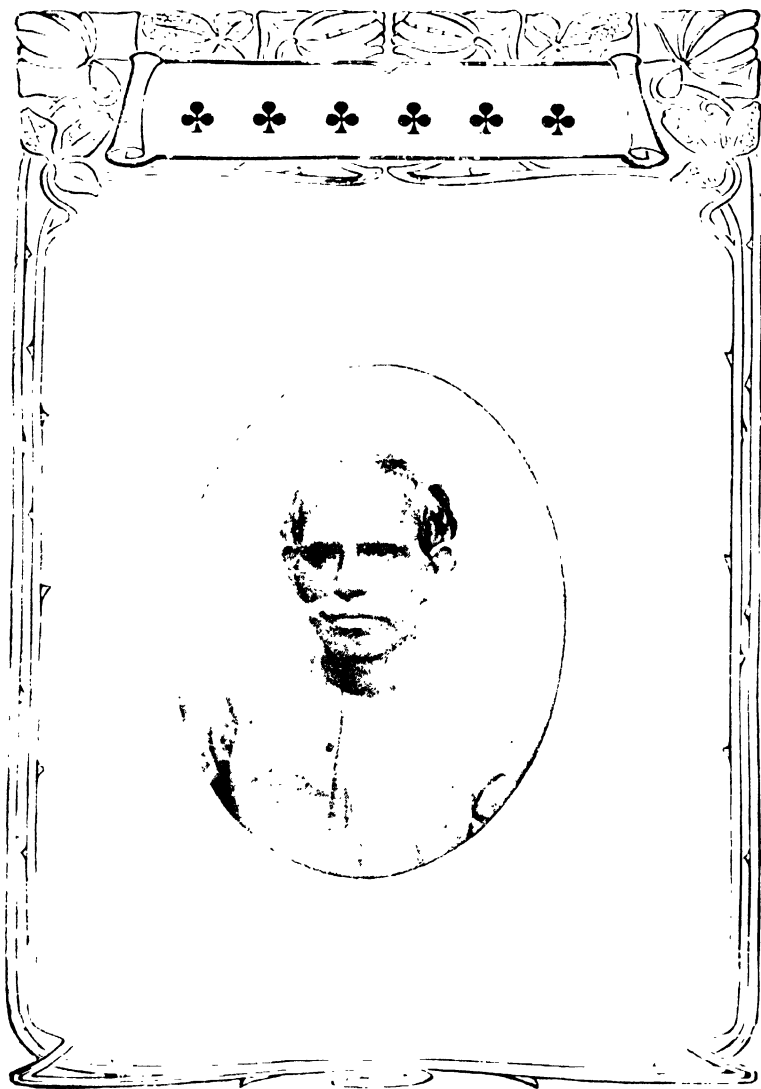
উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ, তাহারা দুর্নিবার রিপুবশীভূত হইয়া ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ, ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোক-লজ্জাভয়ে তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন-পূর্ব্বক তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ! তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণ-হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বোধ হয় না, যন্ত্রণা যন্ত্রণা বোধ হয় না, দুর্জয় রিপু সকল এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণপ্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফলভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই; কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে!

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারিনা!!"

অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত চারুপাঠ প্রভৃতি।

বাঙ্গালা গদ্যরচয়িতাদিগের গুণানুক্রমে নামকরিতে হইলে বিদ্যাসাগরের পরই অক্ষয়কুমারদত্তের নামোল্লেখ করিতে হয়। ইনি ১৭৪২ শকের শ্রাবণ মাসে জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী 'চুপী' নামক গ্রামে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৬পীতাম্বর দত্ত। অক্ষয়কুমার, বাল্যকালে গুরু-

মহাশয়ের নিকট সামান্যরূপ বাঙ্গালা লেখা পড়া শিখিয়া কিঞ্চিৎ পারসী অধ্যয়ন করেন। ইহাঁর পিতা বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতার দক্ষিণ উপনগর খিদিরপুর নামক স্থানে অবস্থান করিতেন। অক্ষয়কুমার ১০ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে তথায় গমন করিয়া ইংরেজিশিক্ষার নিমিত্ত অত্যন্ত যত্নবান্ হন এবং ইহার উহার নিকট পড়া বলিয়া লইয়া বাটীতে বসিয়াই ইংরেজি শিখিতে থাকেন। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে সে অধ্যয়নে বিশেষ কোন ফললাভ হইত না, এজন্য তিনি সর্ব্বদাই ক্ষুন্নমনা থাকিতেন। তাঁহার পিতা এরূপ অবস্থাপন্ন ছিলেন না যে, তাঁহাকে কোন বিদ্যালয়ে রীতিমত পড়াইতে পারেন। যাহা হউক অনন্তর তাঁহার কোন আত্মীয়ের অনুগ্রহে কলিকাতার গৌরমোহন আঢ্যের 'ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরি' নামক বিদ্যালয়ে ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে তিনি অধ্যয়ন করিতে পান এবং দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও নিরতিশয় পরিশ্রমসহকারে ২॥০ বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজি ভাষায় একপ্রকার জ্ঞানলাভ করেন।

অতঃপর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টার জন্য তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তিনি বিদ্যালয়ত্যাগ করিয়াও বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করেন নাই। ঐ অবস্থাতেও স্বয়ং অনুশীলন করিয়া এবং ২।১ জন কৃতবিদ্যলোকের সাহায্য লইয়া সমুদয় ক্ষেত্রতত্ত্ব, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, কণিক্ সেক্সন্, ক্যাল্কুলস প্রভৃতি গণিত, ঐ গণিতজ্ঞানসাপেক্ষ জ্যোতিষ, মনোবিজ্ঞান ও তৎসহ ইংরেজি সাহিত্যবিষয়ক প্রধান প্রধান গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা বিজ্ঞানের অনুশীলনে তাঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল, এক্ষণে ঐ সকল অধ্যয়নদ্বারা সে অনুরাগ কতকদূর চরিতার্থ হইল।

অক্ষয়বাবু অর্থার্জ্জনের চেষ্টারজন্যই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত বিশেষরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সামান্য আয়ের নিমিত্ত সামান্য কার্য্যেই ব্যাপৃত হইয়া তাঁহাকে অনেকদিন থাকিতে হইয়াছিল। এই সময়ে, যাহাতে স্বদেশীয়দিগের বিশেষ উপকার

হয়, তদ্বিষয়ক প্রবন্ধরচনা করিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু ইংরেজি ভাষায় সুনিপুণ হইয়া তদ্ভাষায় গ্রন্থরচনা করিলে বিশেষ ফললাভ হইবে না, ইহা তিনি বুঝিয়া বাঙ্গালারচনার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তদ্বিষয়ে সম্যক্ সমর্থ হইবার জন্য কিঞ্চিৎ সংস্কৃতও শিক্ষা করিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালায় পদ্যরচনারই অধিক প্রাদুর্ভাব ছিল, এই জন্য তিনিও প্রথমে পদ্যরচনা করিতেই আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রভাকরসম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত আলাপ ও আত্মীয়তা হইলে তাঁহার অনুরোধে গদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত নানাবিষয়ক গদ্যময় প্রবন্ধ লিখিয়া প্রভাকরপত্রেই প্রকাশ করেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই যে 'তত্ত্ববোধিনী' সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ১৭৬৫ শকের [১৮৪৩ খৃঃ অঃ] ভাদ্র মাস হইতে শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির যত্নে ঐ সভা হইতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নামে এক মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার এক সভ্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনিই উক্ত পত্রিকার সম্পাদকতাকার্য্যে ব্রতী হইয়া ১৭৭৭ শক [১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ] পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসরকাল অবাধে ঐ কার্য্য সম্পাদন করেন। ঐ কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া তিনি যেরূপ যত্ন, যেরূপ পরিশ্রম ও যেরূপ অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। অক্ষয়বাবু যে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গদ্য রচনার রীতি আবিষ্কৃত করিয়াছেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই তাহা সম্যক্ প্রকাশিত হয়। দেশের হিতকর, সমাজের সংশোধক, বস্তুতত্ত্বের নির্ণায়ক কত কত জ্ঞানগর্ভ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ যে, তৎকালে ঐ পত্রিকায় প্রকটিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। 'চারুপাঠ', 'ধর্ম্মনীতি' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তক সকলের অধি-কাংশই সর্ব্বপ্রথমে ঐ পত্রেই প্রচারিত হয়। তাঁহার ঐ সকল রচনা পাঠ করি-বার জন্য গ্রাহকেরা ব্যগ্রভাবে পত্রিকা প্রকাশের দিনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন এবং অনেকে তাঁহার উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া আপন আপন আচার ব্যবহারের সংশোধন করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনদ্বারা অক্ষয় বাবুর আর কিছু অধিক হইত না, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কার্য্যা-

স্তরপরিহারপূর্ব্বক নিয়তই উহার উন্নতিবর্দ্ধনার্থ চেষ্টা করিতেন। ঐ চেষ্টা সফল করণাশয়ে স্বয়ং নানাবিধ ইংরেজিগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, ফরাসীভাষা শিক্ষা করেন, এবং মেডিকাল কলেজে গমন করিয়া দুই বৎসরকাল রসায়ন ও উদ্ভিদ শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন। ফলতঃ এই সময়ে তিনি আপনার উন্নতি, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও পত্রিকার উন্নতি জন্য এতাদৃশ কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার জীবনসহচর ভয়ঙ্কর শিরোরোগের উৎপত্তি হইয়াছিল।

১৮৫৫ খৃঃ অব্দে অক্ষয়বাবু তত্ত্ববোধিনীর কার্য্য একপ্রকার ত্যাগ করিয়া মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকেব পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বসঞ্চিত পীড়ার দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায় সে কার্য্যে কোন বিশেষ যোগ্যতাপ্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ২।৩ বৎসরমাত্র তথায় তিনি ছিলেন, কিন্তু তাহারও অধিককাল পীড়াবকাশেই যাপিত হইয়াছিল। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় ও দেশের দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, উল্লিখিত পীড়া অক্ষয় বাবুকে একবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি নর্ম্মাল স্কুল ত্যাগ করিয়া অবিচ্ছেদে পীড়ার যন্ত্রণাভোগ করিতেছিলেন এবং পল্লীগ্রামে অবস্থান করা যুক্তিসিদ্ধ হওয়ায় বালিগ্রামে 'মোহনউদ্যান' নামক একটি বাগানবাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। গত ১৮০৮ শকের ১৪ই জ্যৈষ্ঠে [১৮৮৬ খৃঃ অব্দে] ৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। অক্ষয়কুমার আমিষ ভক্ষণ করিতেন না, তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

অক্ষয়বাবুর রচনানৈপুণ্য দর্শনে সুধীরঞ্জনের বঙ্গভাষা গর্ব্বিতবচনে কহিয়াছেন—

"কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার। পেয়েছি কপালগুণে অক্ষয়কুমার॥
তাহার বাসনা সবে শুনিবারে পায়। অক্ষয়যশের মালা পরাইবে মায়॥"

বঙ্গভাষার এ গর্ব্ববাক্য নিষ্ফল হয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রিয়পুত্র অকালে ওরূপ রোগগ্রস্ত না হইলে তাঁহার মুখ আরও উজ্জ্বল হইত।

অক্ষয়বাবু তিনভাগ চারুপাঠ, দুইভাগ 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার,' 'ধর্ম্মনীতি,' 'পদার্থবিদ্যা' ও দুইভাগ 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' এই কয়েকখানি পুস্তকের প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১ম ও ২য় ভাগ চারুপাঠে প্রকাশিত

প্রস্তাবগুলির মধ্যে কয়েকটি পূর্ব্বে সংবাদপ্রভাকরে ও কতকগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছিল, অবশিষ্টগুলি গ্রন্থকার এই পুস্তকের জন্যই নূতন রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে বিশ্বের নিয়ম ও বাস্তবপদার্থসংক্রান্ত এরূপ মনোহর ও জ্ঞানপ্রদ বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় নাই। এই পুস্তক দুইখানি ঐ বিষয়ে যেমন সর্ব্বপ্রথম, তেমনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দুই পুস্তক পাঠ করিলে যে কত নূতন বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গ্রন্থকার ইংরেজি গ্রন্থ হইতেই ঐ সকল বিষয় সঙ্কলন করিয়াছেন, সত্যকথা, কিন্তু তাঁহার রচনা দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, উহা ইংরেজির অনুবাদ। বিজ্ঞাপনে স্বীকার না থাকিলে কিয়ৎকাল পরে উহা মূল রচনাই হইয়া যাইত। অক্ষয়বাবুর সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষরূপ অধিকার ছিল না, কিন্তু তাঁহার রচনা দেখিয়া কে বলিতে পারে যে, এ সকল রচনা প্রগাঢ় সংস্কৃতজ্ঞের লেখনী হইতে নির্গত হয় নাই? তাঁহার রচনা যেমন সবল, তেমনই মধুর, তেমনই বিশুদ্ধ ও তেমনই জ্ঞানপ্রদ। তিনি অতি দুরূহ বিষয় সকলও চিত্রপ্রদর্শনপূর্ব্বক এমন সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন যে, পাঠমাত্র সে সকল পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়। অধিক আর কি বলিব, তাঁহার দুইভাগ চারুপাঠ বাঙ্গালা শিক্ষার্থী বালকদিগের জ্ঞানরত্নের অক্ষয়-ভাণ্ডার স্বরূপ।

৩য় ভাগ চারুপাঠ ও ১ম ও ২য় ভাগের সমানই কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে; জনসমাজে ইহারও আদরের সীমা নাই। তবে এখানি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উচ্চ অঙ্গের হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত 'স্বপ্নদর্শন' নামক প্রস্তাবগুলিতে কয়েকটি প্রগাঢ় বিষয়ের রূপকবর্ণনা আছে এবং গুরুতর প্রাকৃতিক ঘটনা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল স্থলেও, অক্ষয়বাবুর লেখনী যেরূপ সরলতা সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহা করিতে ক্রটি করে নাই। এই পুস্তকের রচনা ও ভাব-গাম্ভীর্য্য কিরূপ উপাদেয় হইয়াছে, তাহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা উহার অন্তর্গত 'মিত্রতা' 'জীববিষয়ে পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা' এবং 'সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সুখের তারতম্য' নামক প্রস্তাব তিনটি অন্ততঃ একবারও পাঠ করেন।

১ম ও ২য় ভাগ 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' এবং 'ধর্ম্মনীতি' এই তিনখানি একরূপ প্রকৃতির পুস্তক। তিনখানিরই প্রস্তাবগুলির এক এক অংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়, পরে সেই সকল একত্র সঙ্কলনপূর্ব্বক স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ও প্রায় একবিধ। জর্জ কুম্বসাহেব 'কনষ্টিটিউষন্ অব ম্যান' নামক যে এক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহারই সারসঙ্কলনপূর্ব্বক দুইভাগ 'বাহ্যবস্তু' রচিত হইয়াছে। জগদীশ্বরের নিয়মপালন করিলেই সুখ, লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ,—জগদীশ্বরের বিশ্বরাজ্যপালন সংক্রান্ত নিয়ম—কোন্ নিয়মানুসারে চলিলে কিরূপ উপকার ও কোন্ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কিরূপ অপকার—ইত্যাদি উচ্চ অঙ্গের বিচার ও মীমাংসা সকল ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল নিয়মানুসারে সম্পূর্ণরূপে চলিতে পারিলে সংসারের অনেক দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখবৃদ্ধি হয়—ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু সে সমুদয় যথোচিতরূপে পালন করা কাহারও সাধ্য হয় কি না তাহা সন্দেহস্থল। 'ধর্ম্মনীতি'তেও শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতিসাধন, দম্পতির পরস্পর ব্যবহার, সন্তানের প্রতি পিতামাতার ও পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য ইত্যাদি অনেক গুরুতর বিষয়ের উপদেশ, বিচার ও মীমাংসা আছে। সে সকল বিষয় অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হয়, মন উন্নত হয়, অনেক কুসংস্কার দূর হয় এবং কর্ত্তব্যকর্ম্মে দৃঢ়তর আস্থা জন্মে। বাহ্যবস্তুতেও এই সকল বিষয়েরই অনেক উপদেশ আছে; সুতরাং ধর্ম্মনীতি, বাহ্যবস্তুর প্রতিরূপস্বরূপ হইলেও আমাদের দৃষ্টিতে এইখানিই অধিকতর রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। কারণ ইহাতে তত আড়ম্বর নাই—বাহ্যবস্তু অনর্থক আড়ম্বরে পরিপূর্ণ। রচনাও বাহ্যবস্তু অপেক্ষা ধর্ম্মনীতিতে অধিকতর সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে লক্ষিত হয়। অক্ষয়বাবুর প্রায় সকল পুস্তকে অনেক ইংরেজি শব্দ বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়াছে। সেগুলি সুন্দর হইয়াছে।

অক্ষয়বাবু সকল পুস্তকেই 'পরম কারুণিক' 'পরম পিতা' 'পরাৎপর পরমেশ্বর' 'অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় মহিমা' প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। ঈশ্বর ভাল পদার্থ বটে, তাঁহাকে মনে করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্যও বটে, কিন্তু তালটি পড়িলেই—পাতাটি

নড়িলেই—পাখীটি উড়িলেই—অর্থাৎ সকল কার্য্যেই যদি লোককে ঈশ্বরের উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের বোধে সে উপদেশ সফল হয় না। ঈশ্বর প্রগাঢ় চিন্তার বিষয়—অমনতর খেলাবার বিষয় নহেন। আমরা জানি, ঘন ঘন উল্লিখিত 'অত্যাশ্চর্য্য' 'অনির্ব্বচনীয়াদি' শব্দের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে অনেক পাঠকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন—ঈশ্বরানুরাগ প্রকাশ করেন না।

'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' নামক পুস্তক দুইখানি অক্ষয়বাবু অল্পদিনমাত্র প্রচারিত করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার শেষ গ্রন্থ। এইচ, এইচ, উইলসন্ সাহেব দুইখানি পারসীক ও কয়েকখানি হিন্দী ও সংস্কৃত পুস্তক অবলম্বনপূর্ব্বক ইংরেজি ভাষায় "রিলিজস্ সেক্‌ট্‌স অব হিণ্ডুস্" নামক যে প্রবন্ধ রচনা করিয়া এসিয়াটিক্ রিসর্চ্চ নামক পুস্তকাবলীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, প্রথমভাগ খানি সেই প্রবন্ধকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি প্রস্তাব পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল—সেইগুলির সহিত অপর কতকগুলি নূতন বিষয় সংযোজিত হইয়া এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভে ১০৬ পৃষ্ঠায় একটি দীর্ঘ উপক্রমণিকার যোজনা করিয়াছেন। ঐ উপক্রমণিকা প্রথমভাগে শেষ হয় নাই—২য় ভাগের ২৮২ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। ঐ উপক্রমণিকাটিই এই দুই গ্রন্থের প্রগাঢ় ও সার পদার্থ। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শব্দবিদ্যার—বিশেষতঃ সংস্কৃতশাস্ত্রের—অনুশীলন দ্বারা লাটিন, গ্রীক, কেল্‌টিক, টিউটোনিক্, লেটিক, স্লাবনিক, হিন্দু, পারসীক প্রভৃতি বিভিন্নবংশীয় বিভিন্ন জাতীয়দিগের যে একভাষিকতা, একজাতিকতা ও একধর্ম্মিকতার সংস্থাপন করিয়াছেন, তদ্বিষয় বহুল প্রমাণপ্রয়োগ ও উদাহরণসহকারে বিবৃত করিয়া কিরূপে হিন্দুদিগের মধ্যে বৈদিকধর্ম্মের প্রচলন ও প্রাদুর্ভাব হয়, এবং কিরূপে বৈদিকধর্ম্মের পর পৌরাণিক ও তান্ত্রিকাদি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা অতি বিস্তৃতিপূর্ব্বক বহু বহু প্রমাণসহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং তৎকরণাবসরে সাঙ্খ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি ষড় দর্শন, বৌদ্ধধর্ম্ম, অনেক পুরাণ ও উপপুরাণ এবং তন্ত্র প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ মতবাদ সকল সংক্ষেপে ও সুচারুরূপে বিবৃত করিয়াছেন। এই সকল সংস্কৃতাদি প্রমাণ সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে যে প্রত্যেক গ্রন্থই

অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে, তাহা নহে। প্রফেসর বপ্, মোক্ষমূলর এবং উইলসন্ প্রভৃতির রচিত ইংরেজি গ্রন্থ হইতে অনেক সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাকে অনেক অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে ও অনেক সংগ্রহ করিতে হইয়াছে এবং সে সংগ্রহকরণেও তাঁহার সামান্য বুদ্ধিমত্তা, সামান্য সারগ্রাহিতা ও সামান্য মীমাংসকতা প্রকাশিত হয় নাই। উপক্রমণিকার পর ভারতবর্ষে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি যে সকল উপাসকসম্প্রদায় ও তাহাদের নানাবিধ অবান্তর ভেদ আছে, তাহাদের সকলেরই নির্দ্দেশ ও ইতিবৃত্ত ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল ইতিবৃত্ত অতি সরল ও সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ 'ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়' দুইভাগ অক্ষয়বাবুর বিদ্যা বুদ্ধি, অনুসন্ধিৎসা, সারগ্রাহিতা প্রভৃতির উৎকর্ষবিষয়ে দেদীপ্যমান প্রমাণ।

অক্ষয় বাবু এই পুস্তকে বেদ, সংহিতা, দর্শন, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র বিষয়ে যেরূপ অভিমতি সকল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লইয়া বিচার করা আমাদের এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং তদ্বিষয়ে আমরা কিছুই বলিব না, কিন্তু ইহা অবশ্য বলিব যে, তিনি হিন্দু জাতির পরম শ্রদ্ধাস্পদ ও পরম গৌরবস্থল কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি প্রাচীন মহর্ষিগণের প্রতি যথোচিত সম্মানসহকৃত বাক্‌প্রয়োগ করেন নাই। অনেকস্থলে তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন ও বিদ্রূপ করিয়াছেন। তিনি বিদেশী গ্রন্থকারদিগের নামোল্লেখ সময়ে "শ্রীমান্ লেসেন" "শ্রীমান্ উইলসন্" "শ্রীমান্ বেকন" "শ্রীমান্ ম-মূলর" "শ্রীমান্ কোম্‌ত" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতির কেহই তাঁহার নিকটে 'শ্রীমান্' শব্দ প্রয়োগের পাত্র হন নাই! হিন্দুদ্বেষী ইংরেজোপাসক কোন নব্য যুবকের লেখায় এরূপ থাকিলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু প্রবীণ বিজ্ঞ লেখক অক্ষয় বাবুর লেখনী হইতে তাদৃশ বাক্য সকল বহির্গত হওয়ায় কেবল যে আমরাই অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, তাহা নহে, সমস্ত হিন্দু সমাজের যে কেহ ইহা পাঠ করিবেন, বোধ হয়, তিনিই দুঃখিত হইবেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের শর্ম্মিষ্ঠানাটক প্রভৃতি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত * অনেকের মতে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। অনুমান ১৭৫০ শকে জেলা যশোহরের অন্তর্গত কপোতাক্ষ নদীতীরবর্ত্তী 'সাগরদাঁড়ি' নামক গ্রামে কায়স্থকুলে মধুসূদনের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা ৺রাজনারায়ণ দত্ত কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতে একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন এবং তদুপলক্ষে কলিকাতার উপনগর খিদিরপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। মধুসূদন তাঁহারই নিকট অবস্থানপূর্ব্বক কলিকাতার হিন্দুকলেজে ইংরেজি অধ্যয়ন করিয়া বিলক্ষণ কৃতবিদ্য হন এবং ১৬।১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই জাতীয়ধর্ম্মকে অসার বোধ করিয়া ১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইনি পিতার একমাত্র পুত্র, সুতরাং অন্ধের যষ্টির ন্যায় জীবনের অবলম্বন ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে সেই অবলম্বনচ্যুত হইয়া দত্ত মহাশয় সংসারকে যে কিরূপ অন্ধকারময় দেখিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করা বাহুল্য। তিনি ওরূপ অবস্থাতেও মায়াত্যাগ করিতে না পারিয়া ৪ বৎসর পর্য্যন্ত খরচ পত্র দিয়া পুত্রকে বিসপ্ কলেজে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। ঐ স্থানে অবস্থানকালে মধুসূদন হিব্রু, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি নানা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর মাইকেল কিছুকালের জন্য বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজনগরে অবস্থান এবং তথায় বিদ্যাবিষয়ে বিলক্ষণ খ্যাতিপ্রতিপত্তিলাভ করিয়া ইউরোপীয় পত্নীসমভিব্যাহারে এদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের পর হইতে বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিতে ইঁহার প্রবৃত্তি জন্মে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন। অনন্তর আইন শিক্ষার অভিলাষে ইংলণ্ডযাত্রা করেন এবং তথায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতার হাই-কোর্টে ব্যারিষ্টারের কার্য্য করিতে করিতেই ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ২৯শে জুন রবিবারে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

তিনি প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শর্ম্মিষ্ঠানাটক, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমা-

* শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মধুসূদনের একটি উৎকৃষ্ট জীবনী লিখিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত সবিস্তার জানিতে চাহেন, তাঁহারা বসু মহাশয়ের এই গ্রন্থ পাঠ করুন।

সম্ভব, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণকুমারী নাটক, বীরাঙ্গনা, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী ও হেক্টর বধ এই ১১ খানি কাব্য গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন। এতগুলি গ্রন্থের তন্ন তন্ন করিয়া সমালোচনা করা সাধারণ কথা নহে, এবং করিলেও আমাদের এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহার স্থান সমাবেশ হওয়া অসম্ভব, এজন্য সে চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া স্থূলরূপে কিঞ্চিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী ও কৃষ্ণকুমারী—কবিবর এই তিনখানি নাটক রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠাই তাঁহার প্রথম চেষ্টার ফল। চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি, শুক্রাচার্য্যদুহিতা দেবযানী ও দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা সংক্রান্ত যে উপাখ্যান মহাভারতে বর্ণিত আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটকের রীতি এই যে, উহাতে নাটকীয়পাত্রেরা একবারে প্রবিষ্ট হয় না। উহার প্রথমে প্রস্তাবনা নামে একটি প্রকরণ থাকে—সেই প্রকরণে সূত্রধার, নট নটী বা বিদূষক সমবেত হইয়া আপনাদের নিজ নিজ কথা-প্রসঙ্গে নাটকীয় বস্তুর অবতারণা করে—তৎপরে সেই সূত্রে নাটকীয় পাত্র আসিয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত হয়। এক্ষণকার চলিতযাত্রার বাসুদেবী, কালুয়া ভুলুয়া মেথরাণী বা ভিস্তীওয়ালার কাণ্ড যেরূপ, সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনাও সেইরূপ। তবে চলিত যাত্রাওয়ালারা সহৃদয়তার অভাবে বাসুদেবী প্রভৃতির সহিত প্রধান যাত্রার কোন সম্বন্ধই রাখিতে পারে না, কিন্তু সংস্কৃতনাটকে তাহা হয় না—প্রস্তাবনার সহিত মূল নাটকের বিলক্ষণ সম্বন্ধ থাকে এবং সেই সম্বন্ধ স্থানবিশেষে যে কিরূপ রমণীয়—যাঁহারা শকুন্তলা, রত্নাবলী, বেণীসংহার ও মুদ্রারাক্ষস নামক সংস্কৃতনাটকের প্রস্তাবনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন। ইংরেজি নাটক এরূপ আরব্ধ হয় না—উহাতে প্রস্তাবনা নাই—রঙ্গস্থলে একবারেই নাটকীয় পাত্র প্রবিষ্ট হয়। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল নাটক রচনা হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে গ্রন্থকারের রুচি অনুসারে ঐ দুইরূপ প্রণালীই অনুসৃত হইয়া থাকে। এইজন্য আমরা ঐ দুইরূপ নাটককে পৃথক্‌রূপে বুঝাইবাব অভিপ্রায়ে "সংস্কৃতসরণী" ও "ইংরেজিসরণী" এই দুইটী পৃথক্ নাম দিলাম।

ইতিপূর্ব্বে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' প্রভৃতি যে সকল নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার রচয়িতারা সংস্কৃতজ্ঞ লোক—সুতরাং সে সকলে সংস্কৃতধরণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মাইকেল মহাশয়ের নাটক ইংরেজিধরণ ত্যাগ করিয়া যে সংস্কৃতধরণী হইবে, তাহা সম্ভব নহে। শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি তাঁহার সকল নাটকই ইংরেজিধরণে আরব্ধ হইয়াছে। এই নাটকে শর্ম্মিষ্ঠার সুশীলতা, দেবযানীর উগ্রভাব ও বিদূষকের পরিহাসরসিকতা উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে—তবে রাজা দেবযানীলাভে গদগদভাবে তাদৃশ আনন্দপ্রকাশ করিয়াও পরক্ষণেই যে আবার শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি সানুরাগ নয়নপাত করিয়াছেন, তাহা পবিত্রপ্রণয়ের উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই। আর বিদূষক ও নটী সংক্রান্ত কাণ্ডও বিলক্ষণ বিরক্তিকর।

পদ্মাবতী নাটকের উপাখ্যানটি কবির স্বকপোলকল্পিত। ইহার স্থূল বিবরণ এই যে, বিদর্ভনগরাধিপতি রাজা ইন্দ্রনীল মৃগয়ার্থ বিন্ধ্যপর্ব্বতে উপস্থিত হইলে, দৈবক্রমে ইন্দ্রাণী শচী, যক্ষরাজপত্নী মুরজা ও কামকান্তা রতি তথায় গিয়া উপস্থিত হন। নারদ তাঁহাদিগকে তথায় দেখিয়া কন্দল বাধাইবার অভিলাষে একটি স্বর্ণপদ্ম প্রদানপূর্ব্বক কহেন যে, "তোমাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, তিনিই ইহা গ্রহণ করুন।" অনন্তর তাঁহারা আপন আপন সৌন্দর্য্যের জন্য পরস্পর বিলক্ষণ বিবাদ করিয়া পরিশেষে রাজা ইন্দ্রনীলকে মধ্যস্থ মানেন। ইন্দ্রনীল রতিকে সর্ব্বপ্রধান সুন্দরী বলিয়া দেওয়ায় শচী ও মুরজা ক্রুদ্ধ হইয়া যান এবং রতি প্রসন্না হইয়া মাহেশ্বরীপুরীপতির কন্যা অলৌকিকরূপসম্পন্না পদ্মাবতীর সহিত ইন্দ্রনীলের বিবাহ দিয়া দেন। বিবাহের পর শচী ও মুরজার কোপে উভয়কেই বিস্তর ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল, পরে রতিদেবীর অনুকূলতায় সে সকল ক্লেশ দূর হয়।—স্বর্ণপদ্ম লইয়া রূপগর্ব্বিত দেবীগণের বিবাদের উপাখ্যানটি নূতন নহে। ট্রয়নগরে রাজপুত্র পারিসকে মধ্যস্থ মানিয়া এথেনা, জুনো ও বিনস্ দেবীর সুবর্ণআপেলসংক্রান্ত সৌন্দর্য্যবিবাদমীমাংসার যে বিবরণ প্রাচীন গ্রীকদিগের ধর্ম্মবিবরণে প্রসিদ্ধ আছে, উহা তাহা হইতেই গৃহীত। তথাপি কবি উহাকে বাঙ্গালায় অতি মনোরমরূপে অবতারিত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই পুস্তকে

বিশেষ প্রশংসা বা অপ্রশংসার বিষয় কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে ইহারও আদ্যোপান্তে বিদূষকের সংসর্গ আছে। তদ্ভিন্ন মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে পদ্মাবতীর সহিত রাজার মিলনাদি, মরীচি সকাশে শকুন্তলা-সহ দুষ্মন্তের মিলনের অনুকৃতি বলিয়াই বোধহয়। ফলতঃ শকুন্তলাপাঠের পরই যে, কবি এই নাটকরচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি স্পষ্ট-প্রমাণ লক্ষিত হয়। এই নাটকের মধ্যে অনেকগুলি গীত দৃষ্ট হইল। পদ্য-গুলি নূতন প্রকার—অর্থাৎ অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দে রচিত। বাঙ্গালা পয়ারের প্রতিঅর্দ্ধের শেষ অক্ষরে মিল থাকে, এইজন্য উহাকে মিত্রাক্ষরছন্দ বলা যায়—অমিত্রাক্ষরে সেরূপ মিল নাই। এই ছন্দ ইংরেজির মিল্টন্ প্রভৃতির গ্রন্থে বহুসমাদৃত, বাঙ্গালায় কেহই এ পর্য্যন্ত উহার অনুকরণ করেন নাই— মাইকেলই উহার সৃষ্টিকর্ত্তা বা প্রবর্ত্তয়িতা, এবং পদ্মাবতীনাটকই উহার প্রথমপ্রয়োগস্থল।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের উপাখ্যানটি কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক মূল লইয়া রচিত। বোধহয়, রঙ্গলালবন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মিনী উপাখ্যান" পাঠ করিয়াই কবির, ঐরূপ উপাখ্যানে নাটকরচনা করিবার, প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। জয়পুর-পতি জগৎসিংহ ও মরুদেশাধিপ মানসিংহ ইহাঁরা উভয়েই উদয়পুরাধিপতির দুহিতা কৃষ্ণকুমারীরপ্রতি আসক্ত হইয়া উদয়পুরের প্রতিকূলে ঘোরতর সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিলে রাজা তন্নির্ব্বাপণে আপনাকে অসমর্থ বোধকরিয়া সর্ব্ববিবাদের মূলীভূত আপন আত্মজার প্রাণবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হন এবং কৃষ্ণকুমারী তাহা জানিতে পারিয়া আত্মহত্যাদ্বারা সকল দিক্ বজায় রাখেন—ইহাই এই গ্রন্থের স্থূলমর্ম্ম। আমরা পুস্তকখানি পাঠকরিয়া পরম প্রীত হইলাম, বিশেষতঃ ধনদাসের লোভ ও ধূর্ত্ততা এবং মদনিকার চাতুরীবর্ণন বড়ই সুকৌশলসম্পন্ন বলিয়া বোধ হইল। এই নাটকের কোন কোন অংশে কিছু কিছু দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণকুমারীকে হত্যাকরিবার পরামর্শে রাজা ও রাজভ্রাতার বিলাপ এবং আত্মহত্যাকরণসময়ে কৃষ্ণকুমারীর চির-বিদায়গ্রহণ পাঠকরিয়া আমাদের নয়ন এরূপ অশ্রুপ্লুত হইল যে, কোন বিষয়ই আর দৃষ্টিগোচর হইল না।

সকল সংস্কৃত নাটকেরই উপসংহার শুভান্ত হয়—অশুভান্ত বর্ণন সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে নিষিদ্ধ। কিন্তু ইংরেজিকাব্যে অশুভান্ত ঘটনা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেইগুলিই আবার তজ্জাতীয় কাব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট। ওরূপ বর্ণনাপাঠ পূর্ব্বে আমাদের ভাল লাগিত না। কিন্তু বোধহয় কাল-ভেদে বা অবস্থাভেদে রুচিভেদ হইয়া থাকে—সুতরাং আমাদেরও রুচি কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—এজন্য এখন আমরা বুঝিতে পারি যে, করুণরসের উদ্দীপন করাই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে অশুভান্ত ঘটনার বর্ণনাদ্বারা সে রস যেরূপ উদ্দীপ্ত হয়—অন্য কোনরূপে সেরূপ হইতে পারে না। আরও আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদিগের আদিকাব্য রামায়ণ, সীতার পাতাল-প্রবেশরূপ অশুভান্ত ঘটনাতেই পর্য্যবসিত। অথচ তাহা কোন আলঙ্কারিকেই অযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং কৃষ্ণকুমারীনাটক অশুভান্ত বলিয়া আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি বোধ হইল না।

'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এ দুইখানি প্রহসন—অর্থাৎ হাস্যরসোদ্দীপক ক্ষুদ্র অভিনেয় পুস্তক। ইহার প্রথমখানি কলিকাতাস্থ এক নবরাবুর, সভা করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার ছলে, সুরাপানাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ প্রকৃতির যতগুলি পুস্তক হইয়াছে, তন্মধ্যে এই খানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাদ্বারা কলিকাতাবাসী অনেক নববাবুর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, এবং সেই চিত্র-গুলি যে, কিরূপ যথাযথ ও হাস্যরসোদ্দীপক হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন। সরজন্ ও বাবাজীর বৃত্তান্ত, জ্ঞানতরঙ্গিণী-সভায় বক্তৃতা, সুরাপান ও খেমটার নাচ, কুলকালাদিগের তাসখেলা, সুরামত্ত নববাবুর প্রলাপশ্রবণে জননীর শঙ্কা প্রভৃতি বর্ণিত সমস্ত ঘটনাগুলিই যেন আমাদের চক্ষুর উপর নৃত্য করিতেছে। এক্ষণকার বাবুরা যে, কিরূপ ইংরেজিমিশ্রিত বাঙ্গালাভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাও ইহাতে প্রচুররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ—একজন পল্লীগ্রামস্থ বৃদ্ধ জমীদারের

লম্পটতাবর্ণনসম্পৃক্ত। মাইকেলমধুসূদন দত্ত এমন সুসামাজিক লোক হইয়াও কি জন্য যে, এরূপ অসঙ্গত ও জঘন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের বোধ আছে, গোঁড়া হিন্দুরা অপরাপর অপকর্ম্মে রত হইলেও জাতিভ্রংশকর যবনীসংসর্গে কখনই ওরূপ ব্যগ্র হন না। ঐ কাণ্ড যৌবনের উদ্রেক সময়ে হইলেও কথঞ্চিৎ সম্ভব হইত—এ তাহা নহে—প্রাচীন অবস্থায়! যে দোষ সমাজমধ্যে বহুলপ্রচার হইয়া উঠে, পরিহাস-চ্ছলে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যক্তিবিশেষের দুরবস্থাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই দোষের হেয়তাবোধসম্পাদনই প্রহসনরচনার উদ্দেশ্য। কিন্তু পল্লীগ্রামস্থ জমীদারদিগের মধ্যে গ্রন্থকারের বর্ণিতরূপ ভক্তপ্রসাদ কয়জন আছেন?—কৈ পাঠকগণ! ওরূপ জমীদার সচরাচর দেখিতে পান কি?—ফলতঃ এই পুস্তকখানি পল্লীগ্রামস্থ জমীদারদিগের না হইয়া গ্রন্থকারেরই কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছে।

মাইকেলের নাটকসমালোচনায় এই প্রসঙ্গেই আমাদিগকে আর একটি কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে। এক্ষণে দেখিতে পাওয়াযায় যে, অনেকেই নাটকীয় অঙ্ক সকলের প্রথমে 'প্রথম গর্ভাঙ্ক' 'দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক' ইত্যাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা বিলক্ষণ বুঝিয়া দেখিলাম যে, সেইগুলি সেই সেই অঙ্কের অবান্তর ভাগ। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ঐ সকল 'গর্ভাঙ্ক' শব্দদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত নহে। কারণ সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা গর্ভাঙ্ক শব্দের অন্যরূপ অর্থের বোধনার্থ লক্ষণ করিয়াছেন—সাহিত্য-দর্পণকার লেখেন যে, অঙ্কের মধ্যেই রঙ্গদ্বার, প্রস্তাবনা, বীজ ও ফলোৎপত্তি-সমেত যে, অপর এক অঙ্ক প্রবিষ্ট হয়, তাহাকেই গর্ভাঙ্ক বলা যায়। * এতদুক্তলক্ষণ গর্ভাঙ্কের সহিত এক্ষণকার নাটকরচয়িতাদিগের গর্ভাঙ্কের একতা হয় না।

---

* অথ প্রস্তাবাদ্গর্ভাঙ্কমাহ। অঙ্কোদরপ্রবিষ্টো যো রঙ্গদ্বারামুখাদিমান্। অঙ্কোঽপরঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সবীজঃ ফলবানপি॥—যথা বালরামায়ণে রাবণংপ্রতি কঞ্চুকী "শ্রবণৈঃ পেয় মনেকৈ র্দৃশ্যংদীর্ঘৈশ্চ লোচনৈর্বহুভিঃ। ভবদর্থমিব নিবদ্ধং নাট্যংসীতাস্বয়ম্বরণং"। ইত্যাদিনা বিরচিতঃ সীতাস্বয়ম্বরো নাম গর্ভাঙ্কঃ॥ ১২৭ পৃ।

তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ এই দুই খানি কাব্য আদ্যোপান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কাব্যরচনার প্রারম্ভ দুইরূপে হইয়া থাকে—একরূপ এই যে, উপাখ্যানের মূল হইতে আরম্ভ করা;—দ্বিতীয় রূপ, কোন এক মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ করা। এই দ্বিতীয় পদ্ধতি ইউরোপীয় কাব্যে সর্ব্বদা অনুসৃত হইয়া থাকে। গ্রীককবি হোমরের ইলিয়াড্ রচনাই বোধ হয় উহার মূল। সংস্কৃতেও যে, এই সমধিক-কৌতূহলজনিকা পদ্ধতির প্রচলন নাই, একথা বলা যায় না—সংস্কৃত নাটক-মাত্রেই, দশকুমারচরিতনামক আখ্যায়িকায় এবং বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে রামায়ণ ও মহাভারতেও কিয়ৎপরিমাণে এই পদ্ধতিরই অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। যাহা হউক, এক্ষণে অনেকে ইহাকে ইংরেজি-পদ্ধতি বোধকরেন, এই জন্য আমরাও উহার নাম ইংরেজি পদ্ধতি রাখিলাম। তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ উভয় কাব্যই এই ইংরেজি পদ্ধতিক্রমে আরব্ধ হইয়াছে। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক অসুরদ্বয়ের উপদ্রবে উৎপীড়িত সুরগণ তিলোত্তমানাম্নী অপরূপরূপা এক সুরসুন্দরীর সৃষ্টি করেন—দৈত্যদ্বয় তাহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া প্রত্যেকেই তাহাকে আপন প্রণয়িনী করিবার জন্য বিবাদ করে এবং সেই বিবাদে পরস্পর পরস্পরের কর্ত্তৃক হত হয়,—এই ভারতীয় উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াই তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য বিরচিত হইয়াছে। ইহা ৪টি সর্গে বিভক্ত। এই পুস্তক প্রথমে বহির্গত হইলে আমরা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু মিষ্টবোধ না হওয়ায় ত্যাগ করি। কিছু দিন পরে কাহারও কাহারও মুখে ইহার প্রশংসাবাদ শুনিয়া আবার ইহা পড়িতে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু আবার ত্যাগ করি; এইরূপ ২।৩ বার করিয়াও গ্রন্থখানি একবারও আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে পারি নাই। আমরা প্রথমে ইহা পাঠ করিতে পারি নাই বলিয়া কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে; তিলোত্তমা রসবতী নহেন;—ইহাতে উৎকৃষ্ট রস আছে, কিন্তু সেই রস কর্ণের অনভ্যস্ত কর্কশায়মান নূতন ছন্দ, দুরান্বয়, 'ভূষেন' 'অস্থিরি' 'কাম্প্তিল' 'কেলিমু' প্রভৃতি মাইকেলি নূতনবিধ ক্রিয়া-পদ, ব্যাকরণ-দোষ

প্রভৃতি কণ্টকাবৃত কঠিন ত্বকে এরূপ আচ্ছাদিত যে, তাহা ভেদকরিয়া স্বাদগ্রহ করিতে সকলের পক্ষে পরিশ্রম পোষায় না।

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রতিপাদ্য নামের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। এই কাব্য বীররসাশ্রিত এবং ইহা ৯ সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকার বীরবাহুর পতন হইতে গ্রন্থারম্ভ করিয়াও উপাখ্যানের সম্পূর্ণতা সম্পাদনার্থ প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণের বহুল অংশ ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বর্ণিত বিষয়গুলি যে, সমুদয়ই বাল্মীকি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও নহে; কবিতা-জননী অসাধারণী কল্পনাশক্তির বলে কবি, কত কত নূতন বিষয়েরও সৃষ্টি করিয়াছেন। মেঘনাদবিষয়ে বাক্প্রয়োগ করা বড় সহজ কথা নহে। বাঙ্গালাবিনোদী-দিগের মধ্যে এক্ষণে দুইটি বিশেষ দল হইয়াছে—এক দলের লোকে মেঘনাদের অতি প্রশংসাকারী,—ইংরেজীতে কৃতবিদ্যগণই এই দলে অধিক। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে এরূপ আছেন যে, তাঁহারা মাইকেলের লেখা 'ম'—বলিলেই ঘুসী উচাইয়া আইসেন; 'ন্দ' পর্য্যন্ত বলিবার অপেক্ষা রাখেন না। আর এক দল না বুঝিয়াও অনর্থক নিন্দা করেন। আমরা এই দুই দলের নাম 'গোঁড়া' ও 'নিন্দক' রাখিলাম—আমরা স্বয়ং কপাটি খেলার ঘোলষাঁড়ের ন্যায় উভয়দলেই থাকিব। সুতরাং দুইদলের নিকটই আমাদের অপরাধ মার্জ্জনীয় হইবে।

মেঘনাদবধ মাইকেলসাগরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন। ইহাতে কবি—কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, সহৃদয়তা ও কল্পনাশক্তির এক শেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা যে কবির তিলোত্তমা পাঠ করিতে বিরক্ত হইয়াছিলাম, সেই কবির সেই ছন্দোগ্রথিতই মেঘনাদ যে, কত আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। সেতু-দ্বারা বদ্ধ মহাসমুদ্রদর্শনে রাবণের উক্তি, পুত্রশোকাতুরা চিত্রাঙ্গদার রাবণ সমীপে খেদ, ইন্দ্রজিতের রণসজ্জা, পতিদর্শনার্থ মেঘনাদপ্রিয়া প্রমীলার বহির্গমন, অশোক বনে সরমার নিকট সীতার পূর্ব্বপরিচয়দান, শ্রীরামের যমপুরী দর্শন প্রভৃতি বর্ণনাগুলি পাঠ করিলে মনোমধ্যে দুঃখ, শোক, উৎসাহ, বিস্ময় প্রভৃতি ভাবের কিরূপ আবির্ভাব হয়, তাহা বর্ণনীয় নহে। বাঙ্গালায় বীররসাশ্রিত কাব্যের

উচিতরূপ সদ্ভাববিরহ এই এক মেঘনাদ দ্বারা অনেক অংশে পূরিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক কবি পৃথিবীস্থ বস্তুর বর্ণন করিয়াই ক্ষান্ত হন, ইনি সেরূপ হন নাই ; ইনি কল্পনাদেবীর অক্লান্তপক্ষের উপর আরোহণ করিয়া স্বর্গ—মর্ত্ত্য—পাতাল—কোথাও বিচরণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইনি এই কাব্যের আত্মস্বরূপ রসটিকে যেরূপ বীরপুরুষ করিয়াছেন, তাহার পরিচ্ছদস্বরূপ রচনাটিকেও সেইরূপ ওজস্বিনী করিয়া দিয়াছেন। এই সকল গুণগ্রাম থাকায় মেঘনাদবধ একটি উৎকৃষ্ট কাব্যমধ্যে গণ্য হইয়াছে। একজন কৃতবিদ্য কবি মেঘনাদের টীকা করিয়াছেন, এবং আর একজন ইহার একখানি সমালোচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সংবাদপত্রে ইহার গুণদোষ ব্যাখ্যা লইয়া যে, কত বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা কবি ও কাব্যের পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে।

মেঘনাদ এইরূপ গুণশালী ও সৌভাগ্যসম্পন্ন হইলেও নির্দ্দোষ নহে। তিলোত্তমাসম্ভবের কবিতায় দূরান্বয় ও ব্যাকরণ দোষ যত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে তত দেখা যায় না সত্য বটে, কিন্তু দানিনু, চেতনিলা, অস্থিরিলা প্রভৃতি চক্ষুঃশূলস্বরূপ নূতন ক্রিয়াপদের কিছুমাত্র ন্যূনতা নাই। তা ছাড়া, ‘দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত’ ‘মরি কিবা’ ‘হায়রে যেমতি’ ইত্যাদি কতকগুলি কথার এত শ্রাদ্ধ হইয়াছে যে, সে গুলি দেখিলে হাস্যসম্বরণ করিতে পারা যায় না। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা প্রভৃতি অনেক অলঙ্কার অনেকস্থলে উৎকৃষ্টরূপে সম্বদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু এমত অনেক স্থলও আছে, সেখানে সেই সেই অলঙ্কারগুলি অতি কষ্টে বুঝিয়া লইতে হয়। ২।৩টি কথা দ্বারা উৎকৃষ্ট কবিরা যে সকল অলঙ্কার নির্ম্মিত করিয়া থাকেন, মেঘনাদে সেগুলি প্রস্তুত করিতে কখন কখন দুই তিন পংক্তিও লাগিয়াছে। মাইকেলের আর একটি দোষ এই, তিনি বোধ হয়, অভিধান দেখিয়া অপ্রচলিত কঠিন কঠিন শব্দ বাহির করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার রচনাও দুর্ব্বোধ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট কবির রচনায় যেরূপ কোমল ও সর্ব্বদা প্রচলিত শব্দের প্রয়োগদ্বারা প্রাঞ্জলতা, মনোহারিতা, চিত্তাকর্ষকতা ও মধুরতা জন্মিয়া থাকে, ইহাতে তাহার কিছুই হয় নাই।*

* মাইকেলের সহাধ্যায়ী ও পরম বন্ধু পরলোকগত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন :—

এস্থলে আর একটি বিষয়ের বিচার করা আবশ্যক হইতেছে। কেহ কেহ কহেন যে, 'মেঘনাদবধ যে, এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দই তাহার প্রধান কারণ; মিত্রাক্ষর ছন্দে দুই পঙ্ক্তিতেই সমুদয় ভাব শেষ করিতে হয়, সুতরাং বীররসের অনুরূপ ওজস্বিনী রচনা ইহাতে স্থান পায় না—এদিকে অমিত্রাক্ষরে

ভাবের উচ্চতা, বর্ণনার সৌন্দর্য্য, করুণারসের উদ্দীপনা, তাঁহার এই সকল গুণ যখন বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যখন তাঁহার দোষ বিবেচনা করা যায়, তখন তাঁহাকে ঐ উচ্চ আসন প্রদান করিতে মন সঙ্কুচিত হয়। জাতীয় ভাব বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন বাঙ্গালী কবিতে সেরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট পাণ্টালুন দেখা যায়। আর্য্যকুলসূর্য্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া রাক্ষস-দিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষ্মণকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করানো, খর ও দূষণের মৃত্যু, ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন—বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে। বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে কবিকঙ্কণ যেমন জাতীয়ভাবসম্পন্ন তেমন অন্য কোন কবি নহেন। কবির রচনাতে প্রাঞ্জলতা না থাকিলে তাহা মধুর ও মনোহর হয় না। সকল শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে মিল্টনের রচনা তত প্রাঞ্জল নহে, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য গুণ যেরূপ আছে, তাহাতে মাইকেল কখনই তাঁহার সমতুল্য হইতে পারেন না। মিল্টনে যেরূপ ভাবের গভীরতা, শব্দ বিন্যাসের রাজগাম্ভীর্য্য ও রচনার জমজমাট দৃষ্ট হয়, মাইকেলের কবিতাতে তত্টা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মিল্টনের প্রাঞ্জলতার অভাব মাইকেলে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। 'যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে' 'নাদিল দম্ভোলি কড়্ কড়্ রবে' ইত্যাদি বিকট বিকট প্রয়োগ দ্বারা মাইকেল মধুসূদনের কাব্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রসভঙ্গ দোষ মেঘনাদবধের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। গম্ভীর বিষয় বর্ণনাকালে মাইকেল মধুসূদন 'পেদাইনু' 'নাদিলা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে হাস্যের উদ্রেক হয়। দশরথের প্রেতাত্মা রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিবার সময় তিনি 'রামভদ্র' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে ঐ প্রকার ভাবেরই উদ্রেক হয়। দ্বিতীয় সর্গের শেষে ঝড় থামিবার পর শান্তির অবস্থার বর্ণনার মধ্যে গৃধিনী, শকুনি ও পিশাচের পালে পালে আগমনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বীভৎস রসের প্রবর্ত্তনা দ্বারা শান্তিরসের ভঙ্গ করা হইল; কিন্তু এই সকল ও অন্য বহুবিধ দোষসত্ত্বেও কে না স্বীকার করিবে যে, মাইকেল মধুসূদন একজন অসাধারণ কবি?—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা পৃষ্ঠা ৩৪—৩৬।

ভাব প্রকাশার্থ যতদূর ইচ্ছা, ততদূর যাওয়া যাইতে পারে, সুতরাং আয়তনের স্বল্পতাবশতঃ ক্ষোভ পাইতে হয় না'—ইত্যাদি। একথা আমরা সম্পূর্ণরূপ অস্বীকার করি না, কিন্তু ইহাও বলি যে, যখন কাশীরাম, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, রঙ্গলাল, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ মিত্রাক্ষরতা রক্ষা করিয়াও বীররস বর্ণনে অসমর্থ হন নাই, তখন ইনিও চেষ্টা করিলে যে অসমর্থ হইতেন, তাহা বোধ হয় না। আমাদের বোধ হয়, ইনি একটা নূতনরূপ কাণ্ড করিয়া "উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা, কালোহ্যয়ং নিরবধির্ব্বিপুলাচ পৃথ্বী" ভবভূতির এই গর্ব্ব-বাক্য স্বয়ং প্রয়োগ করিবার বাসনারই বশবর্ত্তী হইয়া এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং ইংরেজির অনুকরণপ্রিয় আমাদের কৃতবিদ্যদলও মিল্টনের ছন্দের অনুকরণ বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত হইল দেখিয়া আহ্লাদে ঐ প্রণালীর গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু কবি যতই গর্ব্ব করুন এবং কৃতবিদ্য দল তাঁহার যতই সমর্থন করুন—অসঙ্কুচিত মনে বলিতে হইলে আমরা অবশ্য বলিব যে, অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ আমাদের অথবা একটি বিশেষ দলভিন্ন দেশের কাহারও প্রিয় হয় নাই। আমরা মেঘনাদ বধের যে, ওরূপ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিলাম, তাহা ছন্দের গুণে নহে—কবিত্বের গুণে। ওরূপ অসাধারণ কবিত্বের প্রশংসা না করিয়া কে থাকিতে পারে?

মাইকেলের রচনা ও ছন্দের বিষয়ে দেশের লোকের যে কিরূপ অভিপ্রায়, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পদ্যটীতে অনেক প্রকাশিত হইবে।

"ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য।"

দ্রুহিণ-বাহন সাধু অনুগ্রহণিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে—দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুন্ত—দুর্জ্জয়—
পললাশী বজ্রনখ-আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিল?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর-প্রহারে,
যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।
অর্কস্মারুহের তলে বিদ্রুত গমনে—
(অন্তরীক্ষ-অধ্বে যথা কলম্বলাঞ্ছিত,
সু আশুগ-ইরম্মদ গমে সন্ সনে)
চতুষ্পাদ ছুচ্ছুন্দরী মর্ম্মরিয়া পাতা,
অটছে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ-সম

নড়িছে পশ্চাৎভাগে। হায়রে যেমতি
সুশ্যামল বঙ্গগৃহে কন্যায় শরদে,
বিশ্বপ্রসূ বিশ্বম্ভরা দশভুজা কাছে,—
(স্মাদ্রীশ-আত্মজা যিনি গজেন্দ্রাস্য মাতা)
ব্যজেন চামর লয়ে ঋত্বিক্ মণ্ডলী।
কিম্বা যথা ঘটিকাযন্ত্রের দোলদণ্ড
ঘন মুহুর্মুহুঃ দোলে। অথবা যেমতি
মধু-ঋতু-সমাগমে আর্য্যাত্মজালয়ে—
(বিষ্ণু-পরায়ণ যাঁরা) বিচিত্র দোলনে—
দারু-বিনির্ম্মিত-দোলে রমেশ হরষে।
কিম্বা যথা আর্কফলা নেড়া শীর্ষে নড়ে,
বাদেন মুরজ যবে হরিসঙ্কীর্ত্তনে।
সুবিরল তনুরুহে তনু আবরিত,
শোভে যথা ইন্দ্রলুপ্ত-কীট-ক্ষত মৌলী।
কিম্বা যথা বীতরুহ দ্বিরদশরীর।
লম্বোদর-বাহন মূষিক বপুঃ-সম
তব সুকুমার কান্তি নবনী-গঞ্জিত।
চারুপাদ চতুষ্টয় গমনসময়ে
কি সুন্দর বিলোকিতে! হায়রে যেমতি
চতুর্দ্দণ্ড সহযোগে চালায় নাবিক
ক্রীড়াতরী। প্রতিপদে নখর পঞ্চম
অতি ক্ষুদ্র, সহকার-সম্ভূত কীটাণু
যথা, তাহে তির্য্যগতা সূক্ষ্মতা কিয়তী!
(বেতস দ্রুমের কিম্বা সূচ্যগ্র তনিষ্ঠ
তথা ন্যুব্জ আকর্ষ্যগ্র ভাগ সমতুল)
সুদীর্ঘ মস্তক, বসুমিত্রাস্য যেমতি—
কিন্তু অগ্রভাগ সূক্ষ্ম। তীক্ষ্ণ রদরাজী
শ্রেণীদ্বয়ে ব্যবস্থিত বক্ত্র-অভ্যন্তরে।
মৌক্তিক প্রলম্বপ্রায় শোভে ঝলমলে,
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত-প্রসাধন্যুপম
সে দশন-আবলি, সুষমা কি সুন্দর!
ত্রপিষ্ঠা তরুণ্যম্বক-তুল্য নেত্রযুগ;
উন্মীলিত কিম্বা মুকুলিত বোধাতীত।
সুকোমল মধ্যাহ্নার্ক—মরীচি নিকর
অসহ্য সে দৃশে;—হায় ত্বিষাম্পতি তেজঃ
দিবাভীত-নেত্র যথা না পারে সহিতে
পদ্মগন্ধে! বপুগন্ধে দিক্ আমোদিত
করিয়া গমিছ কোথা? তোমার সৌরভে
দ্রাক্ষাত্মজা শীধুসতী গুরু বলি মানে;
দাস-রাজ-তনয়া-সুরভিগন্ধি তব
শরীর-সুরভি যদি লভিতেন কভু,
পরিবরতিয়া স্বীয় পদ্মগন্ধা নাম
লইতেন পূতিগন্ধা-আখ্যান বিষাদে
(বিসর্জ্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে)।
মুন্যৃষভ পরাশর জীবিত থাকিলে,
সত্যবতী ত্যজি পাণি পীড়িতেন তব
জগতের হিতহেতু মলাদন করি
পেয়েছ সুগন্ধ; যথা ব্যোমকেশ শূলী
অজর-শিবার্থ তীব্র বিষ অশনিলা।
নিরমিতে, ভামিনি! কি সূতিকা-আগার
শৈবালাহরণ জন্য অট ইতস্ততঃ?
পর্ণশালা বিরচিতে সৌমিত্রি-কেশরী—

মহেষ্বাস—উর্ম্মিলা-বিলাসী অটবীতে
আহরিলা পত্রচয় যথা ত্রেতাযুগে।
যাও, ধনী, যাও চলি বসুধা-গরভে
ত্বরিত, নতুবা নাশ করিবে বায়সে।
হায়রে গরাসে যথা আশী-বিষ ক্রুর
মণ্ডূকেরে; সৈংহিকেয় অথবা যেমতি
পৌর্ণমাসী অন্তে গ্রাসে অত্র্যক্ষি সম্ভবে;
কিম্বা মিত্রবর্গ যশ হরে মধু যথা।
ইতি ছুচ্ছুন্দরীবধে কাব্যে প্রস্তাবনা
নাম প্রথমসর্গ সমাপ্ত*।”

বীরাঙ্গণা কাব্য—এখানিও অমিত্রাক্ষরছন্দোনিবদ্ধ। শকুন্তলা, তারা, রুক্মিণী, কেকয়ী প্রভৃতি ১১ জন অঙ্গনার দুষ্মন্ত, সোম, দ্বারকানাথ, দশরথ প্রভৃতি নিজ নিজ প্রিয়তমগণের নিকট লিখিত ১১ খানি পত্রিকা লইয়া এই কাব্য বিরচিত। এই খানির রচনা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ প্রাঞ্জল;—কবিত্ব ইহাতেও যে, প্রচুর পরিমাণে আছে, তাহা বলা বাহুল্য। তিলোত্তমা ও মেঘনাদের ছন্দে যতি-ভঙ্গের যে সকল দোষ আছে, ইহাতে তাহাও অপেক্ষাকৃত কম। সে যাহা হউক, এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃহস্পতি-পত্নী তারা, বৃহস্পতি-শিষ্য সোমের প্রতি অনুরক্তা হইয়া এক পত্র লিখিয়াছে; গুরুপত্নীগমন আমাদের শাস্ত্রানুসারে মহাপাতকের মধ্যে গণ্য;—শিষ্যের সহিত গুরুপত্নীর মাতৃত্বসম্বন্ধ—যে সেই সম্বন্ধ লঙ্ঘনপূর্ব্বক পুত্রসম শিষ্যের প্রতি পাপানুরাগে মত্ত হইয়া তাদৃশ নির্লজ্জভাবে পত্র লিখিতে পারিয়াছে, কবি সেই কামোন্মত্তা পাপীয়সীকে কোন্ মুখে ‘বীরাঙ্গণা’ বলিয়া ডাকিলেন? এবং কোন্ লজ্জায় পতিব্রতাপতাকা শকুন্তলা ও রুক্মিণীর সহিত একাসনে উপবেশন করাইলেন?—ছিছি! লজ্জার কথা!!

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের এক সর্গমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কৃষ্ণ-বিরহাতুরা রাধিকার বিলাপস্বরূপ কয়েকটি গীত। রচনা বেশ কোমল ও মধুর বোধ হইল। মাইকেলীক্রিয়ার ভাগ ইহাতে অতি অল্পই আছে। কবি ইহাতে

* ১২৭৫ সালের ১২ই আশ্বিনের অমৃতবাজার পত্রিকায় ‘ছুচ্ছুন্দরীবধকাব্য’ নামে একটি হাস্যকর অনুকরণ প্রকাশিত হয়। ঢাকা জেলার পানকুণ্ড গ্রাম নিবাসী জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় উক্ত ‘ব্যঙ্গকাব্যের’ রচয়িতা।

কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণাদির ন্যায় নিজের কবিত্ব প্রখ্যাপিকা ভণিতিও দিয়াছেন, যথা—

মধু—যার মধুধ্বনি—কহে কেন কাঁদ, ধনি;
ভুলিতে পারে কি তোমা শ্রীমধুসূদন?

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী—কবি যৎকালে ইউরোপে গমন করিয়া ফরাসী-দেশস্থ ভর্‌সেল্‌স্‌ নগরে অবস্থান করেন, তৎকালে এই কাব্য রচিত হয়। কবির স্বহস্ত লিখিত ইহার উপক্রমভাগ লিথোগ্রাফে মুদ্রিত হইয়াছে—তদ্দ্বারা তাঁহার হস্তলিপিদর্শনেচ্ছুগণ পরিতৃপ্ত হইবেন। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দের চতুর্দ্দশ পঙ্‌ক্তিতে একশতটি পৃথক্ পৃথক্ বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। মাইকেলের যে সকল প্রধান গুণ ও প্রধান দোষ আছে, সমুদয়ই ইহাতে সমভাবে লক্ষিত হইল। আমরা নিম্নভাগে উহার প্রথম প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিলাম—

"হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি!
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে;—
"ওরে বাছা, গৃহে তব রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি অজ্ঞান তুই! যারে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে॥

হেক্টরবধ—এখানি মাইকেলের গদ্য কাব্য। তিনি বিখ্যাতনামা হোমরের রচিত ইলিয়াড্ নামক কাব্য গ্রীক্ ভাষায় পাঠ করিয়া তাহারই উপাখ্যান বাঙ্গালায় লিখিয়াছেন। ইহাতে কবিত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু সার পদার্থ আছে, তাহার অধিকাংশই, বোধ হয়, মূলকবির—অতএব তদ্বিষয়ে কোন কথাই বক্তব্য নাই—তবে সেই সকল কবিত্বাদি মাইকেল কিরূপ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই এস্থলে বিচার্য্য। আমরা সেই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অতীব দুঃখসহকারে কহিতেছি যে, তিনি এই পুস্তকখানির রচনা বিষয়ে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মাইকেল নাটক ও পদ্য রচনা করিয়া যে কিছু খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, সেই তাঁহার ভাল ছিল। তিনি আবার গদ্যকাব্য রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে গেলেন কেন? এই কাব্যরচনায় না আছে চাতুর্য্য, না আছে লালিত্য, না আছে পাণ্ডিত্য। এই রচনায় ব্যাকরণকে পদদলিত করাই যেন রচয়িতার অভীষ্ট ছিল বোধ হয়—নচেৎ রিপুস্তদ, সিঞ্চন, বিপদার্ণব, মহামহা অক্ষৌহিণী, ব্যগ্রতাব্যক্তার্থে, মনান্তর, তুষ্ণীভাবে, হে দেবকুলেন্দ্রদুহিতে,! পতিবিরহকাতরা কলত্রবৃন্দ, ইত্যাদি ভূরি ভূরি ভয়ঙ্কর ব্যাকরণদোষ কি জন্য পদে পদে থাকিবে? একজন সংস্কৃতজ্ঞ লোক দ্বারা শোধন করিয়া লইলেই চলিতে পারিত। রণযূথ, মরানর, শুনকদ্বয় প্রভৃতি কতকগুলি শব্দের অর্থ কোষকারদিগেরও অগম্য। কোন কোন বাক্যের অন্বয় ও অর্থবোধই হয় না। 'পিতলপদ, কুঞ্চিত-কাঞ্চন-কেশর-মণ্ডিত আশুগতি অশ্বসমূহে' ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিলে 'শবপোড়ান' 'মড়াদাহ' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হাস্যাস্পদ বাক্যের কথা মনে আইসে। ৩য় পত্রস্থ 'আমাদের দুষ্মন্তপুত্র পুরুর ন্যায় ইনিও" ইত্যাদি বাক্য পাঠ করিয়া রচয়িতার মহাভারতাভিজ্ঞতাদর্শনে পাঠকেরা অবাক্ হইয়া থাকেন! নিম্মিতেছ, প্রদানিবে, উত্তরিলেন—ইত্যাদি তাঁহার প্রিয় ক্রিয়াপদ সকল পদ্যমধ্যে যদিও কথঞ্চিৎ সহ্য হইয়াছিল, গদ্যেও তাহা কে সহ্য কবিবে?

যাহা হউক এই সামান্য অকিঞ্চিৎকর পুস্তকের সমালোচনায় আর অনর্থক সময়ক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে, আর একটি কথা বলিয়াই নিবৃত্ত হইব। মাইকেল সাহেব এই পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে উৎসর্গ করিয়া

দিয়াছেন এবং সেই উৎসর্গ পত্রিকামধ্যে লিখিয়াছেন "মহাকাব্যরচয়িতাকুলের মধ্যে ঈলিয়াস্ রচয়িতা কবি যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন। আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের ও পঞ্চপাণ্ডবের জীবনচরিত-মাত্র। তবে কুমারসম্ভব, শিশুপাল বধ, কিরাতার্জ্জুনীয়, ও নৈষধ ইত্যাদি কাব্য উরূপাখণ্ডের অলঙ্কারশাস্ত্রগুরু অরিস্তাতলীসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু ঈলিয়াসের নিকট এ সকল কাব্য কোথায়"—কিন্তু আমরা গ্রিফিথ্, ট্যালবয়হুইলার, ওয়েষ্ট মিনিষ্টর রিবিউ-লেখক প্রভৃতি অনেক বিলাতী সাহেবের নিকট ঈলিয়াড ও রামায়ণ মহাভারতাদির যশ তুল্যরূপেই শুনিয়াছি—কোন সাহেবের মুখে ঈলিয়াডের নিকট রামায়ণমহাভারতাদি কোথায় লাগে এরূপ কথা শুনি নাই।

ভূদেবমুখোপাধ্যায়কৃত সফলস্বপ্নাদি।

শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৭৪৭ শকের ২রা ফাল্গুন (১৮২৫খৃঃ অব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি) জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা বিশ্বনাথতর্কভূষণমহাশয় এক-জন গণনীয় অধ্যাপক ছিলেন। ইহার পিতামহ ৺হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম মহাশয় জ্ঞাতিবিরোধ পরিহারমানসে হুগলী জেলার খানাকুল থানার অন্তর্গত নতিবপুর নামক গ্রাম হইতে পৈতৃক বাস উঠাইয়া কলিকাতা হরীতকীবাগানে সামান্যরূপ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। কলিকাতাই ভূদেবের জন্মস্থান। ভূদেব ৮ম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কলিকাতা সংস্কৃতকলেজে প্রবিষ্ট হন এবং ৩ বৎসর তথায় অবস্থানপূর্ব্বক মুগ্ধবোধব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। অনন্তর তিনি সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ইংরেজী পড়িতে অভিলাষী হন, এবং ২ বৎসর অন্যান্য স্কুলে থাকিয়া শেষ ৬ বৎসর হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করেন। এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি একজন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্রমধ্যে পরিগণিত ছিলেন—প্রতিবর্ষে পারিতোষিক ও যথাকালে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন।

ঐ সময়ে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের বেতন ৫ টাকা ছিল। উচ্চশিক্ষার জন্য মাসিক এই ব্যয়ও তৎকালে লোকে গুরুতর বোধ করিত—এই জন্য ধনিসন্তান ব্যতিরেকে সাধারণ গৃহস্থ সন্তানেরা হিন্দুকলেজে প্রায় অধ্যয়ন করিতে পারিত না। তৎকালে তর্কভূষণ মহাশয়ের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তিনি যে, পুত্রকে হিন্দুকলেজে পড়াইতে পারেন, তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তিনি বড় বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ছিলেন। অতএব বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, ভালরূপে ইংরেজি না শিখিলে উন্নতির কোন উপায় নাই। এইজন্য তিনি সহস্র ক্লেশ পাইয়াও পুত্রের অধ্যয়নব্যয় যোগাইতে কাতর হন নাই।

কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময়ে ভূদেববাবু যেরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে কলেজের প্রিন্সিপাল, এডুকেশনকৌন্সিলের অধ্যক্ষ কেম্‌রেন্ সাহেব প্রভৃতি বড় বড় সাহেব তাঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সুতরাং তৎকালে তিনি বিষয়কর্ম্মের জন্য প্রার্থী হইলে অবশ্যই কোন উচ্চপদে নিযুক্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু তখন তাঁহার সেদিকে প্রবৃত্তি ছিল না—তিনি মিশনরিদিগের ন্যায় নানা স্থানে বিদ্যালয়স্থাপন করিয়া দেশের সর্ব্বত্র বিদ্যাপ্রচার করিবেন, এই এক নূতন আমোদে মত্ত হইলেন এবং তদনুসারে কয়েকজন বান্ধবের সহিত শেয়াখালা, চন্দননগর, শ্রীপুর প্রভৃতি কয়েকস্থানে স্কুলস্থাপন করিয়া স্বয়ং সেই সকল স্কুলের অধ্যাপকতাকার্য্যসম্পাদনপূর্ব্বক কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু যেরূপ অর্থ ও লোকবলে মিশনরিরা স্কুলস্থাপনাদিকার্য্যে কৃতকার্য্য হন, এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের সে সকল কিছুই ছিল না। কেবল মন ছিল, কিন্তু সংসারে শুদ্ধ এক মনের বলেই সকল কার্য্য সাধিত হয় না। সুতরাং কয়েক বৎসর পরেই তাঁহাকে সে আমোদ ত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য উপায়ান্তরের চেষ্টা দেখিতে হইল এবং মাসিক ৫০ টাকা বেতনে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের ইংরেজি ২য় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন। এস্থানে ভূদেববাবুকে অধিকদিন থাকিতে হয় নাই। দশ মাস পরেই সাহেবেরা তাঁহাকে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে হাওড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড্ মাষ্টার করিয়াদিলেন।

ভূদেববাবুর দ্বারা হাওড়া স্কুলের অনেক উন্নতি হয়। তাঁহার সময়ে অনেকগুলি ছাত্র জুনিয়র স্কলার্সিপ পরীক্ষায় অত্যুৎকৃষ্টরূপে উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে গমন করে। সুতরাং সত্বরেই একজন অত্যুৎকৃষ্ট শিক্ষক বলিয়া তাঁহার যশঃ সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হয়। ঐ সময়ে হজ্‌সন প্রাট্‌ সাহেব হাওড়ার মাজিষ্ট্রেট এবং উক্ত স্কুলের সেক্রেটরী ছিলেন। তিনি হাওড়া স্কুলের রীতি, নীতি, শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া ভূদেববাবুর প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং ভূদেববাবুকে একজন বড় উপযুক্ত লোক বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যখন দক্ষিণবাঙ্গালার স্কুল-ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হন, তৎকালে ভূদেববাবুর নিকট কর্ত্তব্যবিষয়ে অনেক পরামর্শ গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালাভাষার প্রতি ভূদেববাবুর বিশেষ অনুরাগ ছিল, এক্ষণে সেই অনুরাগ প্রাট্‌সাহেবের প্রোৎসাহনায় উদ্দীপিত হইল, এবং তিনি বাঙ্গালাভাষার 'শিক্ষাবিধায়ক' নামে এক পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসও ঐ সময়ে লিখিত হয়। অতঃপর হুগলীতে একটি বাঙ্গালা নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজন উপস্থিত হওয়ায় ভূদেববাবু মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ৬ই জুন তারিখে উক্ত বিদ্যালয়ের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে নিযুক্ত হইয়া আইসেন।

ভূদেববাবু একরূপ কাজ অধিক দিন ভাল বাসিতেন না—সর্ব্বদাই নূতন কার্য্যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিতেন; হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের কার্য্যও তাঁহার পক্ষে নূতন হইল। এই কার্য্য পাইয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তিনি যে, কিরূপ যত্ন, কিরূপ পরিশ্রম ও কিরূপ অভিনিবেশের সহিত অধ্যাপনাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার নহে। তাঁহার সময়ে হুগলী নর্ম্মাল-স্কুলের যে অতিশয় উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকে অবগত আছেন। এই সময়ে ছাত্রদিগের পাঠের নিমিত্ত বাঙ্গালা ভাষার অধিক পুস্তক ছিল না, ভূদেববাবু ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য-সম্পাদন প্রসঙ্গেই অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করেন, তন্মধ্যে 'প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান' ১ম ও ২য় খণ্ড, 'পুরাবৃত্তসার', 'ইংলণ্ডের

ইতিহাস', 'রোমের ইতিহাস' ও ইউক্লিডের ৩ অধ্যায় 'জ্যামিতি' মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহার 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'ও ঐ সময়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

হুগলী নৰ্ম্মালের কার্য্যসম্পাদনাবসরে ভূদেববাবু কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন যে, ১৮৬২ খৃঃ অব্দের জুন মাসে যখন মেড্‌লিকট্ সাহেব প্রতিনিধি স্কুল ইন্‌স্পেক্টর হয়েন, তখন কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ভূদেববাবুকে ৪০০৲ টাকা বেতনে তাঁহার সহকারিরূপে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। মেড্‌লিকটের ন্যায় উদারপ্রকৃতি সাহেব অতি কম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি কয়েক মাসমাত্র ভূদেববাবুর সহিত কৰ্ম্ম করিয়া এরূপ প্রীত হইলেন যে, কিসে তাঁহাকে উন্নত করিয়া তুলিবেন, স্বতঃ পরতঃ তাহার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। ইতিপূৰ্ব্বে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেব প্রজা সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বার্ষিক ৩০০০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত সে টাকা ব্যয়িত হয় নাই। এক্ষণে মেড্‌লিকট্ সাহেব ভূদেববাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া যথোচিতরূপে সেই টাকার বিনিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কয়েকটি গুরুট্রেনিং স্কুল ও তদধীন গ্রাম্য পাঠশালা সমুদয় স্থাপিত করিলেন। ভূদেববাবুই উহার একপ্রকার সৃষ্টিকর্ত্তা; এজন্য ঐ নূতন প্রণালী বৰ্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর ও যশোহর এই তিন জেলায় প্রচলিত করিবার নিমিত্ত ১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ভূদেববাবুকেই এডিসনল ইন্‌স্পেক্টর নামক নূতন পদের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নিযুক্ত করিলেন। এ কাজও ভূদেববাবুর নূতন কাজ হইল, অতএব ইহাতেও তিনি যারপর নাই পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের সন্তান, এই-জন্যই বোধ হয়, অনেক বিষয়েই প্রাচীন প্রণালীর প্রতি বিশেষ ভক্তিসম্পন্ন। সেই ভক্তিবশতই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা সকলে অধিকাংশ প্রাচীন প্রণালী অনুসারেই শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। যাহা হউক, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই প্রণালীর সফলতা সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং অপরাপর জেলাতেও ইহার বিস্তার আরম্ভ করিলেন। এই এডিসনাল ইন্‌স্পেক্টরের অবস্থাতেই ভূদেববাবু ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের মে মাস হইতে ৵০ আনা মূল্যে 'শিক্ষাদর্পণ' নামে একখানি মাসিক

পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ পত্রিকা কয়েক বৎসর উত্তম-রূপে চলিয়াছিল। উহা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের নামে ছিল ; শোক ও পরিতাপের বিষয় যে, ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের মে মাসে তাঁহাকে ঐ পুত্রটির সহিত পত্রিকাখানিকেও বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে!

ভূদেববাবু বিলক্ষণ সুবুদ্ধি, সুচতুর, দূরদর্শী ও উচ্চাশয়সম্পন্ন লোক। তাঁহার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলস্থিত এবং পঞ্জাব প্রদেশীয় শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধীয় ইংরেজী রিপোর্ট তাঁহার উৎকৃষ্ট ক্ষমতার স্পষ্ট উদাহরণ। তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ সকল প্রদেশীয় বিদ্যালয়পরিদর্শনে প্রেরিত হইয়া স্বল্পকালমধ্যে তত্রত্য শিক্ষা-প্রণালীর দোষগুণ সমস্ত বুঝিয়া তন্ন তন্ন করিয়া তাহার যেরূপ বিচার করিয়াছেন এবং কাহারও প্রতি কোন দোষারোপ না করিয়াও যেরূপে আপন মত বজায় করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই তাঁহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ, তাহা কতক বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন কার্য্যকুশলতাসন্দর্শনে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বড়ই প্রীত হইলেন এবং শিক্ষাসংক্রান্ত উচ্চ শ্রেণীর সাহেব কর্ম্মচারীদিগের বার্ষিক বৃদ্ধিসহ উচ্চ বেতনসম্বলিত যে শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে, ইঁহাকেও তাহার এক শ্রেণীতে নিবিষ্ট করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে ঐ পুরস্কার প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন তাহা নহে। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে নর্থ সেণ্ট্রাল নামক নূতন ডিবিজনের ইংরেজি বাঙ্গালা সমস্ত বিদ্যালয়ের ভারপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে ডিবিজনাল ইন্স্পেক্টর করিয়া দিলেন। ইহার কিয়দ্দিন পরে ক্রমে ক্রমে শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে তিনি অধিরূঢ় হয়েন।

হুগলী নর্ম্মালে অবস্থান সময়ে ভূদেববাবু চুঁচুড়ায় বাটী করিয়াছিলেন। অনেক-দিন সেই বাটীতেই অবস্থানপূর্ব্বক বাঙ্গালার পশ্চিম বিভাগ ও বিহার প্রদেশের ইন্স্পেক্টরী কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বিহারে তখন ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী ভাল পুস্তক ছিল না। তিনি ঐ স্থানে ইন্স্পেক্টর থাকিবার সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় স্কুলপাঠ্য ভাল ভাল অনেক পুস্তক হিন্দীতে অনুবাদ করাইয়া ঐ বিষয়ে ঐ দেশের যেরূপ উপকার করিয়াছেন, তাহা কাহারও বিস্মৃত হইবার যো নাই। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ১লা ডিসেম্বর হইতে যে 'এডুকেশন গেজেট' নামক সংবাদপত্র তাঁহার

হস্তে আসিয়াছে, তাহাও ঐ স্থান হইতেই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ভূদেববাবু মহারাণীর নিকট হইতে C. I. E. (কম্পানিয়ন টু ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার) নামক সম্ভ্রমসূচক উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৮২ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সাহেবের বিধিদায়িনী সভার (লেজিস্‌-লেটিব কৌন্সিলের) একজন সদস্য (মেম্বর) নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তন্নিবন্ধন তাঁহার নামের পূর্ব্বে "অনরেবল" এই উপাধি যোজিত হইয়াছিল। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের জুন মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর ৺বারাণসীধামে যাইয়া কয়েক বৎসর তথায় বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বারাণসী হইতে চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসিয়া (১৮৬৩ সাল হইতে চুঁচুড়াতেই বাস করিতেছিলেন) সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি সাধনকল্পে এবং এ প্রদেশে বেদান্তদর্শনের যাহাতে চর্চ্চা হয়, সেই উদ্দেশ্যে ১৮৮৯ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখে একটি চতুষ্পাঠী সংস্থাপিত করেন। ১৮৯৪ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে তিনি স্বীয় পিতার নামে 'বিশ্বনাথ ফণ্ড' নাম দিয়া একটি ধনভাণ্ডার সংস্থাপনে এক লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দান করিয়া যান। সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতিকল্পে এই ফণ্ডের সংস্থাপন হয়। দুইটি দাতব্য ঔষধালয়—একটি কবিরাজী ও একটি হোমিওপ্যাথি ইহার ব্যয়ে পরিচালিত। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে সপ্ততিতমবর্ষবয়ঃক্রমকালে ভূদেববাবুর মৃত্যু হয়।

শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব—ভূদেববাবুর হস্ত হইতে যে যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, যথাস্থলে সে সকলের নাম উল্লিখিত হইল। তন্মধ্যে শিক্ষাবিধায়ক তাঁহার প্রথম উদ্যমের ফল। অপর কেহই ইতিপূর্ব্বে ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, সুতরাং ঐ পুস্তকই বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষাপ্রণালীসংক্রান্ত প্রথম পুস্তক। উহাতে শিক্ষাসংক্রান্ত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট উপদেশ আছে। তদনুসারে চলিলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই অনেক উপকার হইতে পারে, সত্য বটে, কিন্তু গ্রন্থকার শিক্ষকদিগকে একবারে ধনস্পৃহা শূন্য হইয়া কেবল প্রীতিবশতঃ শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিবার যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, সংসারী ব্যক্তির পক্ষে সেরূপ উপদেশানুসারে কার্য্য করা বড় কঠিন। তিনি যৌবনাবস্থায় স্বয়ং ঐ প্রকার উদ্যম

করিয়া স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে গিয়াছিলেন, সত্য—কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ভূদেববাবুর দ্বিতীয় পুস্তকের নাম 'ঐতিহাসিক উপন্যাস।' ইহা "সফলস্বপ্ন" ও "অঙ্গুরীয় বিনিময়" এই দুই ভাগে বিভক্ত। দুইটী ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যানে ঐ দুই ভাগ বিরচিত হইয়াছে। গল্পচ্ছলে প্রকৃত ইতিবৃত্তের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপদেশ দিবার অভিপ্রায়েই এই গ্রন্থ লিখিত হয়। "রোমান্স অব হিষ্টিরি" নামক ইংরেজি গ্রন্থই ইহার আদর্শ। সফল স্বপ্নের উপাখ্যানটী ঐ পুস্তক হইতেই সংগৃহীত। ঐ উপাখ্যান অতি ক্ষুদ্র, তাহাতেও রচনাচাতুর্য্য বা কৌশল তাদৃশ কিছুই নাই। গজনী নগরাধিপতি সবক্তাগীন্ প্রথমে দাস ছিলেন, এই প্রকৃত ইতিবৃত্তাংশটি একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যানের সহিত পাওয়া যায়। ফলতঃ এই ভাগের উপর আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই।

অঙ্গুরীয় বিনিময়েরও কিয়দংশ উক্ত 'রোমান্স অব হিষ্টিরি' নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু উহার অবশিষ্ট ভাগ গ্রন্থকারের স্বকপোলকল্পিত। গ্রন্থের স্থূলবিবরণ এই, মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী দিল্লীর বাদসাহ আরঙ্গজেবের কন্যা রোসিনারাকে পর্ব্বতপথ হইতে অপহরণ করিয়া কিয়দ্দিবস নিজ দুর্গে স্থাপন করেন। তথায় শিবাজীর গুণগ্রামে রোসিনারা বশীভূত হইলে উভয়ের প্রণয়সঞ্চার ও বিবাহের প্রস্তাব হয়। ইতিমধ্যে মোগল সেনাপতি ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া রোসিনারাকে পিতৃসদনে প্রেরণ করিলে রোসিনারা পিতার নিকট শিবাজীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাদসাহ কন্যার মুখে শত্রুর প্রশংসা শ্রবণে কুপিত হইয়া কারাবদ্ধ নিজ পিতা সাজেহানের নিকট তাঁহাকে প্রেরণ করেন। এদিকে শিবাজী পুনর্ব্বার নিজ দুর্গ অধিকার করিয়া মোগলদিগের সহিত কয়েকবার যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধে জয়লাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বাদসাহের হিন্দু সেনাপতি রাজা জয়সিংহের সহিত একাকী সাক্ষাৎ করেন। জয়সিংহ বাদসাহের সহিত তাঁহার সন্ধিবন্ধন করিয়া দিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে বাদসাহের আর একজন শত্রুর সহিত যুদ্ধকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন। সেই যুদ্ধের পর শিবাজী দিল্লী গমন করিলে ধূর্ত্ত আরঙ্গজেব তাঁহার সম্মান না করিয়া বরং কিঞ্চিৎ

অপমান এবং প্রকারান্তরে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। শিবাজী কৌশলক্রমে তথা হইতে পলায়ন করিয়া যান। রোসিনারা বরাবর শিবাজীর প্রতি সমান আসক্ত ছিলেন। শিবাজী প্রস্থানের পূর্ব্বে রোসিনারাকেও সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার সমুদয় উপায় করিয়া নিজ এক অঙ্গুরীয়ের সহিত এক বার-বনিতাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রোসিনারা যদিও মনে মনে শিবাজীকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তথাপি উক্ত বারবনিতার সহিত অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া আসিবার সুযোগসত্ত্বেও তিনি শিবাজীর ভার্য্যা হইলে সজাতীয়-দিগের নিকট শিবাজীর যেরূপ অপদস্থ হইবার সম্ভাবনা, তৎসমস্ত অনুধাবন করিয়া আসিলেন না, কিন্তু শিবাজীর অঙ্গুরীয়ের সহিত নিজ অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া এক পত্রদ্বারা প্রিয়তমের নিকট মনের সমুদয় কথা লিখিয়া পাঠাইলেন।

এই উপন্যাসমধ্যে প্রকৃত ইতিবৃত্ত কতটুকু আছে, তাহা ইতিহাসবিদেরা বুঝিয়া লইবেন। যাহা হউক, ভূদেববাবু এই উপন্যাস বর্ণনপ্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রীয়-দিগের অস্ত্র শস্ত্র, সেনা, দিল্লীনগর, তত্রত্য রাজভবন, সাজেহানের দুরবস্থাও তাঁহার নির্ম্মিত ময়ূরতক্ত নামক সিংহাসন প্রভৃতি অনেক ঐতিহাসিক বিষয়ের যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শিবাজীর স্বদেশহিতৈষিতা, সাহসিকতা ও ধূর্ত্ততা, তাঁহার প্রতি রোসিনারার অকৃত্রিম অনুরাগ ও তাদৃশ অনুরাগসত্ত্বেও শিবাজীর সহিত মিলিত না হইয়া নিজের সাংসারিক সমুদয় সুখে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক অবস্থিতি, আরঙ্গজেবের ধূর্ত্ততা, কুটিলতা, বিশ্বাসঘাতকতা, রামদাস স্বামীর স্বদেশহিতৈষিতা এবং শিষ্যবাৎসল্য প্রভৃতি বিষয়ের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে; বিশেষতঃ জয়সিংহের সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎকার ও বক্তৃতা এবং আরঙ্গজেবের সহিত তাঁহার সন্দর্শন ও কথোপকথন আরও বিস্ময়কর ও বহুল বিষয়ের উপদেশজনক হইয়াছে। বাদসাহের জন্মতিথির বিবরণ প্রভৃতি যে যে বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই ইতিহাসমূলক। শিবাজী বর্ণ-জ্ঞানশূন্য ছিলেন বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, ইহাতে কৌশলক্রমে তাহারও রক্ষা করা হইয়াছে। ফলকথা অঙ্গুরীয়বিনিময়খানি এইরূপ প্রকৃতির পুস্তক মধ্যে

উৎকৃষ্ট পুস্তক। পুস্তকের ভাষাটি আরও কিঞ্চিৎ প্রসাদগুণবিশিষ্ট, সরল ও মাধুর্য্যসম্পন্ন হইলে ইহা আরও অপূর্ব্ব পদার্থ হইয়া দাঁড়াইত।

ভূদেববাবু ইংরেজি উপন্যাসের পদ্ধতিতেই যে, ইহার উপাখ্যান আরম্ভ করিয়াছেন, একথা বলা বাহুল্য। এস্থলে আর একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে—যৎকালে এই অঙ্গুরীয়বিনিময় রচিত হয়, তখন 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' বল, 'কর্ম্মদেবী' বল, 'দুর্গেশনন্দিনী'ই বা বল, ঐতিহাসিক-উপন্যাসনামক কোন গ্রন্থ বাঙ্গালায় রচিত হয় নাই; অতএব ঐ বিষয়ে যে, বাঙ্গালাগ্রন্থকার-দিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে ও প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, ভূদেববাবুই তাহার মূল। এক্ষণে ঐরূপ প্রকৃতির গ্রন্থরচয়িতারা যে, সকলেই সকল বিষয়ে ভূদেব-বাবুর অনুকরণ করিয়াছেন, একথা আমরা বলি না, কিন্তু সকলেই যে, ভূদেববাবু হইতেই উহার প্রথম স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, একথা অবশ্য বলিব।

ভূদেববাবুর 'পুরাবৃত্তসার', 'ইংলণ্ড ও রোমের ইতিহাস', ১ম ও ২য় ভাগ 'প্রাকৃতিকবিজ্ঞান' ও ইউক্লিডের যে কিয়দংশ রচনা করিয়াছিলেন, তদ্দারা বিদ্যার্থীদিগের যথেষ্ট উপকার হইতেছে, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু সে সকল পুস্তকের সমালোচনা করা এ প্রস্তাবের তত উদ্দেশ্য নহে। তবে এই একটি কথা বলা আবশ্যক যে, ইউক্লিড ভিন্ন তাঁহার বিরচিত কোন পুস্তক অপর গ্রন্থের ঠিক্ অনুবাদ নহে। তিনি গ্রন্থান্তর হইতে বস্তু সমাহরণ-পূর্ব্বক স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ঐ সকল পুস্তকের বিষয়ে কোন কথা না বলা হইলেও তিনি এক্ষণে যে 'এডুকেশন গেজেট'নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভূদেববাবুই প্রথমে হজ্‌সন্ প্রাট্ সাহেবকে 'এডুকেশন গেজেট' পত্র প্রকাশ করিবার পরামর্শ দেন। যখন সেই পরামর্শ দেন, তখন 'সোমপ্রকাশ' অথবা অন্য কোন তাদৃশ সংবাদ পত্র বাঙ্গালার জন্মে নাই। পরে প্রাট্ সাহেবের চেষ্টায় ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ১ই জুলাই হইতে এডুকেশন গেজেট পত্র প্রকাশিত হয়। তখন উহার সম্পাদক ওব্রাইন স্মিথ নামক একজন পাদরী সাহেব ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে

ঐ পত্রের জন্য প্রথমে মাসিক ৭৫৲ টাকা, পরে ১৫০৲ টাকা, অনন্তর ৩০০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। কয়েক বৎসর পরে স্মিথ সাহেব স্বদেশ গমনোন্মুখ হইয়া বৃত্তিসহ ঐ পত্রের সত্ব গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। গবর্ণমেণ্ট বাবু প্যারীচরণ সরকারকে ঐ ৩০০৲ টাকা দিয়া উক্ত পত্রের সম্পাদক এবং মেনেজার নিযুক্ত করেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ৭ই মে ইষ্টারন্ বেঙ্গল রেলগাড়ীতে শ্যাম নগরে যে দুর্ঘটনা ঘটে, তৎসংক্রান্ত কয়েকটি প্রবন্ধ ঐ পত্রে প্রকাশিত হওয়ায় সম্পাদকের সহিত গবর্ণমেণ্টের মনোমালিন্য জন্মে, এবং তজ্জন্য প্যারীবাবু ঐ সম্পাদকতা ত্যাগ করেন। অনন্তর ডিরেক্টর এট্‌কিন্‌সন্ সাহেবের এবং ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর গ্রে সাহেবের একান্ত অনুরোধ উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া ভূদেববাবু ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে এডুকেশন গেজেট স্বহস্তে লইয়াছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের ভৃতিভুক্ সম্পাদক হন নাই—নিজে ঐ পত্রের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। এখন গবর্ণমেণ্ট উহার সাহায্যার্থ যাহা কিছু করিতেছেন, ইচ্ছা করিলে তাহার অন্যথা করিতে পারেন, কিন্তু কাগজের স্বত্ব আর প্রত্যাহরণ করিতে পারেন না। এক্ষণে উক্ত এডুকেশন গেজেট কিরূপ চলিতেছে একথার উত্তরে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সংবাদ পত্রের ভদ্রাভদ্রতাবিচার গ্রাহক সংখ্যার উপরে দৃষ্টিপাত করিলেই কতকদূর মীমাংসিত হইতে পারে। ভূদেববাবু যৎকালে ঐ পত্র প্রাপ্ত হন, তখন উহার মূল্যপ্রদাতা গ্রাহক ২৮৯ ছিল, এক্ষণে (১৮৮৭ অব্দে) প্রায় ৮০০ হইয়াছে।

পুষ্পাঞ্জলি—স্বদেশানুরাগকে বেদব্যাসরূপে এবং জ্ঞানসঞ্চয়কে মার্কণ্ডেয়-রূপে বর্ণনা করিয়া তাঁহাদিগের কথোপকথনচ্ছলে দেবীরূপে বর্ণিতা পৃথিবীর (ভারতবর্ষের) পৌরাণিক, আধুনিক, শাস্ত্রীয়, লৌকিক বিবিধ বিষয়ের বর্ণন করাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার তাহা করিবার সময়ে আপনার চিন্তাশীলতা, বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা, বহুবিষয়জ্ঞতা, স্বদেশহিতৈষিতা প্রভৃতি গুণের বিলক্ষণ প্রখ্যাপন করিয়াছেন। বিশিষ্টরূপ অভিনিবেশ সহকারে তাঁহার পুস্তক পাঠ করিলে ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় অনেক তত্ত্ব অবগত হইতে পারা

যায়, কিন্তু ঐ সকল তত্ত্ব এতই নিগূঢ় যে, অনেকেই তাহার মর্ম্মোদ্‌ভেদ করিতে পারেন না।

পারিবারিক প্রবন্ধ—এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়, নাম দ্বারাই প্রকাশিত হইতেছে। হিন্দুদিগের পরিবার সংক্রান্ত যত কিছু বিষয় আছে, তাহার অনেকগুলি—যথা বাল্যবিবাহ, দাম্পত্যপ্রণয়, উদ্বাহ সংস্কার, স্ত্রীশিক্ষা, গহনাগড়ান, গৃহিণীপনা, সতীধর্ম্ম, সৌভাগ্যগর্ব্ব, দম্পতীকলহ, চাকরপ্রতিপালন, পরিচ্ছন্নতা, কৃত্রিমস্বজনতা, কুটুম্বতা, জ্ঞাতিত্ব, অতিথিসেবা, পশ্বাদিপালন;—পিতামহ, পিতামাতা, পুত্রকন্যা, পুত্রবধূ, নিরপত্যতা, গৃহশূন্যতা, দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ, বহুবিবাহ, ধর্ম্মচর্য্যা, অপত্যপালন, সন্তানের শিক্ষা প্রভৃতি—এই পুস্তকে সবিস্তর বিবৃত হইয়াছে। ভূদেববাবু একজন বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্, বহুদর্শী ও প্রাচীন সম্পন্ন গৃহস্থ। তাঁহার এই দীর্ঘকালের ভূয়োদর্শন-সমুত্থ পারিবারিক ব্যবস্থা-সংক্রান্ত উক্তি সকল অনেকের পক্ষেই যে, সবিশেষ উপদেশপ্রদ হইবে, তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্য। আমরা এ পুস্তকের গুণ দোষের বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া এইমাত্র বলিব যে, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই পারিবারিক প্রবন্ধখানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করা কর্ত্তব্য—আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, পরিশ্রম বিফল হইবে না।

সামাজিক প্রবন্ধ—ইহাতে সমাজতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধসমূহ লিপিবদ্ধ হয়াছে। ইহা গ্রন্থকারের গভীর চিন্তাশীলতা ও বহুদর্শিতার ফল।

১৮৯৩ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর স্যর চার্লস ইলিয়ট এসিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট স্বরূপে ভূদেববাবুর রচিত উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন :—No single volume in India contains so much wisdom and none shows such extensive reading. It is the result of the life-long study of a Brahmin of the old class in the formation of whose mind eastern and western philosophy has had an equal share". অর্থাৎ সমগ্র ভারতের মধ্যে এমন আর একখানি গ্রন্থ কুত্রাপি নাই যাহাতে একাধারে এত

জ্ঞান ও এত বেশী অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন সমভাবে আয়ত্ত থাকিয়া যাঁহার মনকে গঠিত করিয়াছে, উহা এমন একজন প্রাচীন তন্ত্রের ব্রাহ্মণ সন্তানের আজীবন অধ্যয়নফল।

বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ—রত্নাবলী, মৃচ্ছকটিক ও উত্তর রচিত এই তিন খানি সংস্কৃত নাটকের সমালোচনা।

আচার প্রবন্ধ—এই গ্রন্থে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী অনুষ্ঠান সমূহের বর্ণন আছে। ভূদেববাবু আচার প্রবন্ধের উপক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিয়াছেন—"সদাচারের মূল ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অর্থে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিপালন। এখনকার কালে বিধি প্রতি-পালনের ব্যাঘাতক পাঁচটী বস্তু দৃষ্ট হয়। (১) বিধিবিষয়ক অজ্ঞতা, (২) বিধির প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, (৩) বিজাতীয় অনুকরণের আতিশয্য, (৪) স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য, (৫) স্বাভাবিক আলস্য।.........

"শাস্ত্রাচারলোপের উল্লিখিত তিনটি হেতুই আগন্তুক। এগুলি পূর্ব্বে অল্প বলবান্ ছিল, এখন প্রবল হইয়াছে। উহাদের অপনয়ন অতি কঠিন হইলেও একান্ত অসাধ্য বলিয়া মনে করা যায় না। (১) যদি শাস্ত্রীয় বিধি সকল জানিবার জন্য তেমন অভিলাষ হয়, তবে তাহা জানা হইতে পারে। এখনও দেশে অনেকটা শাস্ত্রজ্ঞান আছে, এখনও দেশের মধ্যে অনেক লোকে শাস্ত্রীয় বিধির পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন এবং পালন করিয়া থাকেন। (২) বিজাতীয় শিক্ষার দোষ ও ছাত্রবর্গের কৈশোরে ও যৌবনেই অতি প্রবল হয়। বয়োধিক এবং চিন্তাশীলদিগের মধ্যে ঐ দোষ অনেক ন্যূন হইয়া থাকে। এবং বিজাতীয় শিক্ষার দোষে শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, সেই বিজাতীয় শিক্ষার বিশেষ প্রগাঢ়তা জন্মিলেও ঐ দোষ অনেকটা কাটিয়া যাইতে পারে। যেমন মলিন বস্তু দ্বারা বলবৎ ঘর্ষণে তৈজসাদির পূর্ব্বমলিনতা দূর হয়, তেমনি যে বিজাতীয় শিক্ষা আচারমালিন্য জন্মায়, তাহারই সম্যক্ অনুশীলনে ঐ মালিন্য অপনীত হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপীয় বিজ্ঞান বিদ্যার বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা স্বদেশীয় শাস্ত্রাচারের সারবত্তা বহুপরিমাণে যুক্তিমুখেও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। ... ...

(৩) "যে ইংরেজ জাতি এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাবল্যের প্রকৃত হেতু কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলেই দৃষ্ট হয় যে, ঐ প্রাধান্যের হেতু অনাচার বা অত্যাচার নহে, উহার হেতু তাঁহাদের স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের উপযোগী আচার রক্ষার নিবন্ধন শরীর ও মনের দৃঢ়তা এবং পটুতা এবং পরস্পর ঐকান্তিক সহানুভূতি। আমাদের শাস্ত্রোক্ত আচারগুলির উদ্দেশ্য বিচার করিলে সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হয় যে, শাস্ত্রাচার দ্বারা শরীরের সারবত্তা, তেজস্বিতা এবং পটুতা জন্মে এবং মনের উদারতা এবং সাত্ত্বিকতা সম্বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা দ্বারাই এতদ্দেশীয় জনগণ ইংরেজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর গুণের অধিকারী হইতে পারেন। * *

"মনুষ্যে পশুধর্ম্ম ও জড়ধর্ম্ম দুইই আছে। পশুধর্ম্ম হইতে স্বেচ্ছাচার জন্মে। যখন যাহা করিতে ইচ্ছা হইলে, তখনই তাহা করিতে প্রবৃত্তি হওয়া, তাহার ফলাফল বিচার না করা, পশুর ধর্ম্ম। ঐ পশুভাবের ন্যূনতা সাধন আমাদিগের শাস্ত্রের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রের অভিপ্রায়, মানুষ আপন উদ্দেশ্যের স্থিরতা, মনোযোগের ঐকান্তিকতা, চিত্তের প্রশস্ততা এবং শরীরের পটুতা সম্বর্দ্ধন সহকারে সকল কাজ করেন। খাবার সামগ্রী দেখিলেই খাইলাম, শয়নের ইচ্ছা হইলেই শুইলাম, ক্রোধাদির প্রবৃত্তি হইলেই তদনুযায়ী কার্য্য করিলাম, এইরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার আর্য্যশাস্ত্রের বিগর্হিত। এ গুলির নিবারণ শাস্ত্রাচারের সুপালন ভিন্ন আর কোন প্রকারেই সুন্দররূপে সিদ্ধ হয় না। শাস্ত্রাচারের পালনেই সত্ত্বগুণের সম্বর্দ্ধন হইয়া, ঐ সকল রজো-গুণসম্ভূত দোষের পরিহার হইতে পারে।" উপক্রমণিকাধ্যায়ের এই অংশে আচার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যাইবে। শাস্ত্রানুযায়ী আচার পালন করিয়া হিন্দুজাতি যাহাতে সদাচারী ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন হন এই উদ্দেশ্যে ভূদেববাবু আচার প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন। হিন্দুর শাস্ত্রসম্মত আচারের নিগূঢ় তাৎপর্য্য এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যান—কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরী প্রভৃতি।

এই তিন খানি পদ্যময় কাব্য খিদিরপুরে কৃতনিবাস রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। ইনি ১৭৪৮ শকে (১৮২৬ খৃঃ অব্দে) কাল্‌নার সন্নিহিত বাকুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলাল বাল্যাবস্থায় মিশনরি স্কুলে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া কিয়ৎকাল হুগলী কলেজে ইংরেজি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শারীরিক পীড়া-নিবন্ধন বিদ্যালয়ে অধিকদূর শিক্ষা করিতে পারেন নাই, কিন্তু বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া স্বয়ং অনুশীলনদ্বারা ইংরেজি কাব্যশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কৈশোরাবস্থা হইতেই বাঙ্গালা কবিতা রচনায় ইঁহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল, তজ্জন্য সর্ব্বদাই কবিতা রচনা করিয়া প্রভাকরাদি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেন। বোধ হয় প্রভাকর সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহবাসে তাঁহার রচনাশক্তি অনেক মার্জ্জিত হইয়াছিল। যাহা হউক বাঙ্গালা-রচনা বিষয়ে নৈপুণ্য থাকায় তিনি অতি অল্প বয়সেই কয়েকখানি বাঙ্গালা পত্রিকার সম্পাদকতা ও সহকারিসম্পাদকতা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরে ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে পূর্ব্বোল্লিখিত এডুকেশন গেজেট প্রচারিত হইলে তৎ-সম্পাদক ওব্রাইন স্মিথ্ সাহেবের সহকারী হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত উক্ত পত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ঐ পত্রে তাঁহার গদ্য পদ্য উভয়বিধ রচনাই প্রকাশিত হইত। তাঁহার গদ্য সকলের প্রীতিপ্রদ না হউক—পদ্য অনেকেই আদরপূর্ব্বক পাঠ করিতেন। এই সময়েই অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে তাঁহাকর্ত্তৃক 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরেই রাজপুরুষেরা তাঁহাকে প্রথমে ইন্‌কমট্যাক্সের আসেসরী ও পরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী পদে নিযুক্ত করেন। তিনি অনেক দিন ঐ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। গত ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ১৩ই মে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত গুরুতর কার্য্যভারসত্বেও আবাল্যপরিচিত কবিতারচনাকে তিনি বিস্মৃত হন

নাই—ঐ অবস্থাতেও ১৮৬২ খৃঃ অব্দে 'কর্ম্মদেবী' ও ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে 'শূর-সুন্দরী' নামক কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ ৩ খানি কাব্য ভিন্ন "বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ" ও "শরীরসাধনীবিদ্যার গুণোৎকীর্ত্তন" নামে আরও ২ খানি পদ্যগ্রন্থ আছে। তিনি সংস্কৃত কুমারসম্ভব কাব্যেরও পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

পদ্মিনী উপাখ্যান—দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন রাজপুতানান্তর্গত চিতোরের অধিপতি ভীমসিংহের মহিষী অপরূপরূপা পদ্মিনীর রূপ গুণের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অপহরণ করিবার মানসে সসৈন্যে চিতোর আক্রমণ করেন; এই উপলক্ষে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া রাজপুত ও পাঠানদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হইলে পর, অবশেষে পাঠানদিগের জয় ও চিতোরনগরের ধ্বংস হয়, পদ্মিনী ধর্ম্মলোপভয়ে অগ্নিপ্রবেশ করেন এবং ভীমসিংহও রণশায়ী হন—এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই কাব্য বিরচিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেমন কতক বাস্তব ও কতক অবাস্তব ঘটনার বর্ণন থাকে, ইহাতেও তাহাই আছে। কবি, স্থানে স্থানে ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ হইতে অনেক ভাবসঙ্কলন করিয়াছেন, ইহা বিজ্ঞাপনের মধ্যে স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং তদুল্লেখে আমাদের আর প্রয়োজন নাই। যাহা হউক তিনি যে, বর্ত্তমানকালিক কৃতবিদ্যদিগের রুচির অনুরূপ বিশুদ্ধপ্রণালীতে কাব্যরচনার মানস করিয়াছিলেন, তাঁহার সে মানস সফল হইয়াছে। পদ্মিনী উপাখ্যান বীর ও করুণরস প্রধান গ্রন্থ; ইহাতে নায়ক নায়িকার অন্যোন্যানুরাগসূচক অনেক কথোপকথন বর্ণিত আছে, কিন্তু কোথাও নিরবগুণ্ঠন আদিরস অবতারিত হয় নাই। পদ্মিনীর রূপ, তাঁহার দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব বাদসাহকে প্রদর্শন, ভীমসিংহের বন্ধন, ছল প্রয়োগপূর্ব্বক পদ্মিনীকর্ত্তৃক তাঁহার উদ্ধারসাধন, সেনাগণের যুদ্ধ, ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি যুদ্ধার্থ ভীমসিংহের উৎসাহবাক্য, পদ্মিনীর অগ্নিপ্রবেশ, রাজপুত নরনারীগণের তেজস্বিভাব, কালমাহাত্ম্য প্রভৃতি সমুদয়গুলিই উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণিত বিষয়ের অনেক স্থানেই সুকবির হস্তচিহ্ন স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারা যায়;

ফলতঃ পদ্মিনী উপাখ্যান বিশুদ্ধপ্রণালীতে রচিত একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার পূর্ব্বে এরূপ পদ্যকাব্য বোধ হয় আর কেহই রচনা করেন নাই।

এই গ্রন্থে চলিতছন্দঃ পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন ভঙ্গত্রিপদী, একাবলী, মালঝাঁপ, ভুজঙ্গপ্রয়াত ও আরও কয়েকটি নূতনবিধ ছন্দঃ প্রযুক্ত হইয়াছে। ২।৪টি স্থল ভিন্ন ছন্দের যতিভঙ্গ কুত্রাপি হয় নাই। মিত্রাক্ষরতার বিশুদ্ধ নিয়ম প্রায় সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থসংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে; তাহা পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে—স্নানার্থ আগত ব্রাহ্মণের মুখে অত বড় প্রকাণ্ড উপাখ্যান তখনই শ্রবণ করিতে বসা পথিকের পক্ষে উচিত হয় নাই; ব্রাহ্মণের স্নানাহারের পর গল্প আরম্ভ করিলে ভাল হইত। কবি ঐ ব্রাহ্মণের মুখেই সমুদয় উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মধ্যে মধ্যে অসামাজিক লোকের ন্যায় বক্তার মুখ বন্ধ করিয়া নিজেও দু কথা বলিয়া লইয়াছেন—যথা—

"সরোরুহে হেরিলে খঞ্জন,—অধিপতি হয় সেই জন।
নৃপ হয়ে দেখে যেই, কি লাভ করিবে সেই, ভেবে দেখ ভাবুকগণ!"
"একি বিপরীত ভাব জলে অগ্নি জ্বলে।
কবি কহে বিজলী চমকে মেঘ দলে"॥ ইত্যাদি

এগুলি আমাদিগের ভাল লাগে না। গ্রন্থোল্লিখিত পাত্রের উক্তির মধ্যে কবির নিজের উক্তি থাকিলে বর্ণনার বৈচিত্র্যভঙ্গ হয়। ভারতচন্দ্র প্রভৃতি প্রধান কবিরাও মধ্যে মধ্যে সেরূপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেগুলি এক এক সন্দর্ভের শেষে থাকায় তত দোষাবহ হয় নাই; উপরি উদ্ধৃত শ্লোক-গুলি সন্দর্ভের মধ্যভাগেই প্রদত্ত হইয়াছে।—আলাউদ্দীন পদ্মিনীর জন্য উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন, কিন্তু চিতোরের দুর্গে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিয়াও যখন পদ্মিনীকে দেখিতে না পাইলেন, তখন পদ্মিনী কোথায় গেল তাহার অনুসন্ধান করিলেন না!—পদ্মিনীর জন্য খেদ করিলেন না—পদ্মিনী প্রাপ্ত না হওয়ায় এত ধন, এত সৈন্য ও এত সময়ের ধ্বংস যে অনর্থক হইল,

তাহা ভাবিয়া নির্ব্বিঘ্নমনে একবারও আক্ষেপ করিলেন না!—করিলে ভাল হইত। ঐ সমুদয় ভিন্ন কোন কোন স্থলের দুর্ব্বোধতা, কতকগুলি শব্দের অবাচকতা ও স্থলবিশেষে ব্যাকরণাশুদ্ধি প্রভৃতি আরও কতকগুলি দোষ এ গ্রন্থে আছে, তাহা সামান্যবোধে উপেক্ষিত হইল। ফলকথা আমরা একবার বলিয়াছি, আবার বলিতেছি যে, ঐ সকল দোষসত্ত্বেও পদ্মিনী উপাখ্যান একখানি মনোরম গ্রন্থ হইয়াছে। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ নিম্নভাগে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, তৎপাঠেই গ্রন্থকারের কবিত্ব অনেক অংশে বোঝা যাইবে।

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য।

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,—কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,—কে পরিবে পায়?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,—নরকের প্রায়!
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে,—স্বর্গ সুখ তায়।
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,—মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়তনয় হে,—ক্ষত্রিয় তনয়।
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয়নিলয় হে,—হৃদয়নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,—বিলম্ব কি সয়?
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ্ হে,—ভেরীর আওয়াজ্।
সাজ্ সাজ্ সাজ্ বলে সাজ্ সাজ্ সাজ্ হে,—সাজ্ সাজ্ সাজ্" ॥ ইত্যাদি

অগ্নিপ্রবেশকালে সহচরীদিগেরপ্রতি পদ্মিনীর উৎসাহ বাক্য।

"এসো এসো সহচরীগণ!—এসো সহচরীগণ! হুতাশনগ্রাসে করি জীবন অর্পণ ॥
ধর সবে মনোহর বেশ,—বাঁধ বিনাইয়ে কেশ; চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ ॥
ওরে সখি! আজ রে সুদিন,—ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন; শুধিব জীবনদানে পতিপ্রেম ঋণ ॥
আজ অতি সুখের দিবস,—পাব সুখ মোক্ষ যশ; বিবাহের দিন নহে এরূপ সরস ॥
পরিণয় প্রমোদ উৎসবে, ভেবে দেখ দেখি সবে; পতি যে পদার্থ কিবা কে জানিতে তবে?

সবে তবে চলোলো বালিকা—যথা মুদিতা মালিকা।
অলি যে আনন্দদাতা জানে কি কলিকা?
সকলেতে জেনেছ এখন,—পতি অতি প্রাণধন;
যার জন্যে যুবতীর জীবন যৌবন॥
হেন ধন নিধন অন্তরে,—এই ছার কলেবরে;
রাখিবে এ ছার প্রাণ আর কার তরে?
বিশেষতঃ যবনের ঠাঁই—কোনরূপে রক্ষা নাই;
ভাবিলে ভাবীর দশা মনে ভয় পাই॥
সতীত্ব সকল ধর্ম্মসার,—যার পর নাহি আর;
যুগে যুগে ক্ষত্রিয়ের এই ব্যবহার॥
অতএব এস লো সকলে,—গিয়ে প্রবেশি অনলে।
যথা পতি তথা গতি লোকে যেন বলে"॥ ইত্যাদি

উপসংহারে।

"করাল কালের কাণ্ড যেন সদাক্রীড়াভাণ্ড, এ ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত তাহার।
কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র, তার কাছে সব একাকার॥
সিংহাসন অধিষ্ঠাতা, শিরোপরে হেমছাতা, ধাতা প্রায় প্রতাপ যাঁহার।
তাঁহার যেরূপ গতি, অন্নদাস ছন্নমতি, মরণেতে তারো সে প্রকার॥"
"কালের নাহিক বোধ, নাহি মানে উপরোধ, বড় সুখে বড় রূপে বাদী।
সুখপুষ্প যথা ফুটে, অতিবেগে তথা ছুটে, কট মট বিকট নিনাদি॥
কিবা চারুরূপধর, কিবা বহুধনেশ্বর, কিবা যুবা নানাগুণধর।
কালের সুভোগ্য সব, হয় তার মহোৎসব, পেলে হেন খাদ্যপরিকর॥"
"হাঁরেরে নিষাদ কাল! একি তোর কর্ম্মজাল, শোভা না রাখিবি ভববনে?
যথা কিছু দেখ ভাল, না ঠাহর ক্ষণকাল, জালে বদ্ধ কর সেইক্ষণে॥
ওরে ও কৃষককাল, কি কর্ষিছে তব হাল? জঞ্জাল জঙ্গল বৃদ্ধি পায়।
উত্তম বাছের বাছ, ফলপ্রদ যেই গাছ, অনায়াসে উপাড়িয়ে যায়॥

সুরুবক যেই হয়, পরিপক্ক শস্যচয়, সে করে ছেদন সুসময়।
তুই কাল নিদারুণ, নাস্তি জ্ঞান গুণাগুণ, কাটিছ তরুণ শস্যচয় ॥
ধিক্ কাল কালামুখ, ভারতের কোন সুখ, না রাখিলি ভুবনভিতর।
কোথা সব ধনুর্দ্ধর, কোথা সব বীরবর, সব খেয়ে ভরিলি উদর!”

কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরী—ওরিণ্টপতির দুহিতা কর্ম্মদেবী যশলমীরাধিপতির পুত্র সাধুর শৌর্য্য, বীর্য্য ও রূপে বিমোহিত হইয়া রাঠোর রাজপুত্র অরণ্যকমলের সহিত পিতৃকৃত সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করেন, এই সূত্রে সংগ্রাম উপস্থিত হইলে অরণ্যকমলের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সাধু হত হন; কর্ম্মদেবী পতির মৃত্যুর পর স্বহস্তে আপনার এক বাহু ছেদন করিয়া পিতৃকুলকবির নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং অপর বাহু নিজ শ্বশুরকে দেখাইবার জন্য ছিন্ন করিতে ভ্রাতাকে অনুরোধ করেন। যেখানে এই কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়, তথায় ‘কর্ম্মসরোবর’ নামে এক সরোবর নিখাত হইয়াছে—এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কর্ম্মদেবী রচিত হইয়াছে। শূরসুন্দরীর স্থূল মর্ম্ম এই—দিল্লীশ্বর আক্‌বর সাহ, নিজ শ্যালক মানসিংহের অপমানকারী উদয়পুরের রাণার উপর কুপিত হইয়া যুদ্ধে তাঁহাকে পরাস্ত করেন, এবং তাঁহার কুলে কলঙ্ক দিবার মানসে দিল্লীর অন্তঃপুরে রমণীদিগের নৌরোজা নামক সকের বাজার স্থাপনপূর্ব্বক তথায় উক্ত রাণার ভ্রাতৃকন্যা পৃথ্বীরায়পত্নীকে কৌশলে আনয়ন করিয়া তাঁহার সতীধর্ম্ম নাশের চেষ্টা করেন। শূরসুন্দরী আক্রমণ সময়ে তরবারি দ্বারা বাদশাহকে বিনাশ করিতে উদ্যত হওয়ায় তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া ‘আর কখনও কোন রাজপুত মহিলাকে অন্তঃপুরে আনিবেন না’ এতদ্বিষয়ে এক স্বীকৃতিপত্র লিখিয়া দেন।

এই দুই পুস্তকেই রাজপুতরমণীদিগের সাহস, তেজস্বিতা, পতিভক্তি ও সতীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরী উভয়ের চরিত্রই ওজস্বী, উদার ও অতি নির্ম্মলরূপে চিত্রিত হইয়াছে। সাধুর মৃত্যুর পর ভ্রাতার নিকট কর্ম্মদেবীর বক্তৃতা ও আক্রমণোদ্যত বাদসাহের বক্ষে পদাঘাত করিয়া শূরসুন্দরীর তিরস্কারবাক্য যে, কিরূপ সুন্দর হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ পাঠ করিয়া

দেখিবেন। পদ্মিনী উপাখ্যানের ন্যায় এই দুইখানিও বিশুদ্ধ কাব্য হইয়াছে; ইহাদের কোনস্থলেই অশ্লীলতার গন্ধ নাই। কবি প্রসঙ্গক্রমে রাজপুতজাতি ও দিল্লীর বাদসাহদিগের নানাবিষয় সংক্রান্ত যে সমস্ত বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপাঠে ঐতিহাসিক বহুল জ্ঞানলাভ হয়। তদ্ভিন্ন তিনি কাবুলী মেওয়া, আম্র, কাঁঠাল, আনারস প্রভৃতি দেশীয় ফল, ঢাকাই মস্‌লিন, কাশ্মিরী শাল প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের চিত্তাকর্ষকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরী পদ্মিনীর ন্যায় পাঠকের তত মনোহরণ করিতে না পারুক, কিন্তু এ দুইখানিও যে উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক কাব্য হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

স্নানার্থ আগত ব্রাহ্মণের মুখে পদ্মিনীর বৃহৎ উপাখ্যান শ্রবণের যে অযৌক্তিকতা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, কর্ম্মদেবীতে ব্রাহ্মণকে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দেওয়ায় সে দোষ পরিহৃত হইয়াছে; শূরসুন্দরীতে তাদৃশ দোষের সঙ্ঘটনই হয় নাই। কিন্তু এই শেষ পুস্তকে বাদসাহ ও যোধাবাইকে অনর্থক কতকগুলা ছাই ভস্ম মাখান হইয়াছে। তাঁহাদিগকে যোগী ও যোগিনী সাজাইবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। তদ্ভিন্ন পদ্মিনী উপাখ্যানে আর আর যে সকল দোষগুণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এ উভয়েও সে সকল বর্ত্তমান আছে; তন্মধ্যে ব্যাকরণ দোষ পদ্মিনী উপাখ্যান অপেক্ষা এই দুই পুস্তকে কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইল। পুনঃ সংস্করণে সে দোষগুলি সংশোধিত হইলে এ দুইখানি পুস্তক আরও মনোরম হইবে।

পদ্মিনী উপাখ্যানের ন্যায় ইহাতেও পয়ার-ত্রিপদী ভিন্ন, তাহাদেরই রূপান্তর-স্বরূপ নানাবিধ নূতন ছন্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভগবতীর স্তোত্রে সংস্কৃতানুকারক—

"নিশুম্ভ শুম্ভঘাতিনি! প্রচণ্ড চণ্ডপাতিনি!
প্রশান্ত দান্তপালিনি! প্রসীদ মুণ্ডমালিনি!

এই প্রমাণিকাচ্ছন্দটি উপযুক্ত স্থলে অর্পিত হওয়ায় বড় মধুর হইয়াছে।

রামনারায়ণ তর্করত্নের পতিব্রতোপাখ্যান—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব—নবনাটক—রুক্মিণীহরণ প্রভৃতি।

কলিকাতার দক্ষিণ হরিনাভি গ্রামনিবাসী ৺রামধন শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র রামনারায়ণ তর্করত্ন উপরি লিখিত গ্রন্থগুলির প্রণয়নকর্ত্তা। ১৭৪৫ শকে (১৮২৩ খৃঃ অব্দে) ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমে চতুষ্পাঠীতে কিয়ৎকাল সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন, এবং তথায় পাঠ সমাপন করিবার দুই বৎসর পরে ঐ বিদ্যালয়েরই অন্যতম শিক্ষকতা-পদ লাভ করেন। অনেকদিন পর্য্যন্ত তিনি ঐ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। পরে যথাসময়ে পেন্সন লইয়া ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করিয়াছেন।

তর্করত্ন পঠদ্দশাতেই ১৮৫২ খৃঃ অব্দে 'পতিব্রতোপাখ্যান' এবং কলেজত্যাগ করিবার এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে 'কুলীনকুলসর্ব্বস্বে'র রচনা করেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে 'রত্নাবলী,' 'বেণীসংহার,' 'শকুন্তলা,' 'নবনাটক,' 'মালতীমাধব' ও 'রুক্মিণীহরণ' নামক ৬ খানি নাটক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম দুইখানি পারিতোষিক গ্রন্থ—অর্থাৎ রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কুণ্ডীর জমিদার ৺কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় পতিব্রতোপাখ্যান নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচয়িতাকে এবং কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নামক উৎকৃষ্ট নাটক রচয়িতাকে ৫০৲ টাকা করিয়া পারিতোষিক দিবেন, সংবাদপত্রে এইরূপ দুইটি বিজ্ঞাপন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দিয়াছিলেন। তদনুসারে তর্করত্ন ঐ দুই প্রবন্ধ লেখেন এবং উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় নির্দ্ধারিত পারিতোষিক লাভ করেন। ঐ দুই পুস্তক এবং 'নবনাটক' এই তিনখানি তর্করত্নের স্বকপোলকল্পিত বস্তু দ্বারা গ্রথিত;—রুক্মিণীহরণের উপাখ্যানটিমাত্র পুরাণ হইতে সঙ্কলিত, কিন্তু নাটক নিজের রচিত; তদ্ভিন্ন অপর নাটকগুলি সংস্কৃত হইতে অনূদিত। এতদ্ভিন্ন তিনি আর ২।১ খানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই।

পতিব্রতোপাখ্যানে পতিব্রতা রমণীদিগের স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যবিষয়ে নানাবিধ উপদেশ, উদ্ধৃত পুরাণাদির বচন দ্বারা সে সকলের সমর্থন এবং সতী ও অসতী-

দিগের অনেকরূপ উপাখ্যানাদি আছে। এরূপ গ্রন্থের সমালোচনা করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে।

তর্করত্নের অপর পারিতোষিক গ্রন্থ—'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক। গ্রন্থকার নিজেই বিজ্ঞাপন মধ্যে ইহার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন। যথা—"এই নাটক ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রথমে কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান; ২য়ে ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব; ৩য়ে কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার; ৪র্থে শুক্রবিক্রয়ীর দোষোদ্ঘোষণ; ৫মে নানা রহস্য ও বিরহীপঞ্চাননের বিয়োগপরিদেবন; ৬ষ্ঠে বিবাহনির্ব্বাহ। এই রীতিক্রমে এই নাটক রচিত হইয়াছে। ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্যপ্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে।—একথা সত্যই বটে; কুলীনকুলসর্ব্বস্ব অভিনিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে বল্লালপ্রতিষ্ঠিত কৌলীন্যের বিষময় ফল সকল নয়নাগ্রে যেন নৃত্য করিতে থাকে। তর্করত্ন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ নহেন—বৈদিক; তাঁহার দ্বারা রাঢ়ীয় কুলপ্রথার এতদূর উদ্ঘাটন হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়। ঐ সকল বিষয়ের বর্ণনাবসরেও তিনি সামান্য কবিত্ব ও সামান্য রসিকত্ব প্রদর্শন করেন নাই। অনৃতাচার্য্যের চরিত, রসিকা নাপ্তিনীর সহিত দেবলের রহস্য, ফুলকুমারীর খেদ, মহাকুলীন অধর্ম্মরুচির সহিত তৎপুত্র উত্তমের কথোপকথন, গর্ভবতী হরির মার কন্যা হইবার জন্য পুরোহিত সমীপে স্বস্ত্যয়নকরণ প্রার্থনা, বৈদিক ব্রাহ্মণের ফলার, অভব্যচন্দ্রের বিবরণ প্রভৃতি সকল স্থলগুলিই অতি উত্তম ও চিত্তাকর্ষকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রীজাতি, বালক, বালিকা ও ভৃত্যের ভাষাগুলিও অনেকস্থলেই সুন্দররূপে অনুকৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার বড় পরিহাসরসিক;—সে পরিহাসরসিকতা সর্ব্বস্থলেই প্রচুর পরিমাণে বিস্তারিত করা হইয়াছে। বোধ হইতেছে, কুলীনকুলসর্ব্বস্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালা কোন নাটক রচিত হয় নাই; ইহাই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা নাটক। তর্করত্ন সর্ব্বপ্রথমেই ওরূপ উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতে পারিয়াছেন, এ বিষয়ে অনেকে সংশয় করেন—তাঁহারা কহেন, 'ঐ নাটক তর্করত্নের রচিত নহে, তদীয় জ্যেষ্ঠ

সহোদর প্রসিদ্ধ কবি ৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত—তর্করত্নের নাম দিয়া প্রকাশিত' ইত্যাদি—ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যেরূপ অসামান্য কবি ছিলেন, তাহাতে তাঁহার লেখনী হইতে ওরূপ পুস্তক নির্গত হওয়া বিচিত্র কথা নহে, কিন্তু উক্ত নাটক প্রকাশের পর যদি তর্করত্ন একবারে তূষ্ণীম্ভূত হইতেন—আর কোন রচনা না করিতেন, তাহা হইলে ঐ সন্দেহ সঙ্গত হইত। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পরও তর্করত্ন ক্রমে ক্রমে ছয়খানি নাটক রচনা করিলেন এবং 'নাটুকে রামনারায়ণ'—তাঁহার খ্যাতি হইল, তখন আর ওরূপ সন্দেহ করা কোন মতে যুক্তি-সিদ্ধ নহে।

তর্করত্ন সংস্কৃতজ্ঞ লোক, সুতরাং সংস্কৃত নাটকের রীত্যনুসারে নান্দী ও প্রস্তাবনার পর নাটক আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু সংস্কৃতে "কার্য্যনির্ব্বহণেঽদ্ভুতম্" এই এক যে প্রধান নিয়ম আছে, তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। ফলতঃ কুলীন-কুলসর্ব্বস্বের উপাখ্যানাংশে কিছু বৈচিত্র্য নাই। তর্করত্ন বড় শ্লেষোক্তি-প্রিয়; তাঁহার শ্লেষবচন সকল অনেকস্থলেই প্রীতিপ্রদ হইয়াছে, কিন্তু কোন কোন স্থলে নিতান্ত অতিরিক্ত হওয়ায় বিরক্তিকরও হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তিনি বাঙ্গালার মধ্যে মধ্যে যে সকল স্ব-রচিত সংস্কৃত শ্লোক বিন্যস্ত করিয়া তাহার বাঙ্গালা অর্থ করিয়া দিয়াছেন, সে স্থলে কেবল সেই বাঙ্গালাগুলি থাকিলেই সুসঙ্গত হইত। যাহা হউক, যখন কুলীনকুলসর্ব্বস্ব বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম নাটক, তখন উহার সহস্র গুরুতর দোষ থাকিলেও উহা মার্জ্জনীয়—আমাদের উল্লিখিত দোষ সকল ত সামান্য। আমরা নিজেও বামণ জাতি, এইজন্য পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ কুলীনকুলসর্ব্বস্ব হইতে অপর কোন অংশ উদ্ধৃত না করিয়া উত্তম মধ্যম ও অধম তিন প্রকার ফলারের লক্ষণগুলিই নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম—

"ঘিয়ে ভাজা তপ্তলুচি, দু-চারি আদার কুচি, কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছক্কা আর শাকভাজা, মতিচুর বঁদে খাজা, ফলারের জোগাড় বড়ই॥
নিখুতি জিলাপী গজা, ছানাবড়া বড় মজা, শুনে সক্ সক্ করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা, যত পাই তত হয় তোলা॥

খুরি পুরি ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়, কাতারি কাটিয়ে শুকো দই।
অনন্তর বামহাতে, দক্ষিণা পানের সাতে, উত্তম ফলার তাকে কই॥"
"সরুচিঁড়ে শুকোদই, মত্তমান ফাকা খই, খাসা মণ্ডা পাতপোরা হয়।
মধ্যম ফলার তবে, বৈদিক ব্রাহ্মণে কবে, দক্ষিণটা ইহাতেও রয়॥"
"গুমো চিঁড়ে জলো দই, তিত গুড় ধেনো খই, পেটভরা যদি নাহি হয়।
রৌদ্দুরেতে মাথা ফাটে, হাত দিয়ে পাত চাটে, অধম ফলার তাকে কয়॥"

নবনাটক—জোড়াসাঁকো নাট্যশালাকমিটী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তর্করত্ন বহুবিবাহবিষয়ক এই নবনাটক প্রণয়ন করেন। গবেশবাবু নামক একজন জমীদার স্ত্রীপুত্রসত্ত্বেও অধিক বয়সে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন; তাঁহার নবপ্রণয়িনীর উৎপীড়নে প্রথমাপত্নীর গর্ভজপুত্র দেশত্যাগী হন, বিষয়বিভব নষ্ট হয়, পূর্ব্ব-পত্নী যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন এবং তিনি নিজেও নবপত্নীদত্ত বশীকরণ ঔষধ সেবনের গুণে অপ্রতিবিধেয় রোগে আক্রান্ত হইয়া গতাসু হন—এই সামান্য উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বহুবিবাহের দোষপ্রতিপাদক অপরাপরবিষয়ও ইহাতে বর্ণিত আছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থকার পরিহাস ও শ্লেষোক্তি-প্রিয়—সেই পরিহাস ও শ্লেষ চিত্ততোষ, নাগর, রসময়ী গোয়ালিনী ও দন্তাচার্য্যের চরিত্রে বিলক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ নাগরের ইংরেজি-শব্দ-সম্বলিত কথোপকথনটি এমনই সুন্দর হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিবা-মাত্র ঐরূপ কতকগুলি নাগর আমাদের চক্ষুর উপর আসিয়া উপস্থিত হন। তর্করত্ন, নাগরের কোন বেশভূষা দেন নাই—পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে আমরা দাড়ী, ছড়ি, চসমা, মাথার মধ্যস্থলে স্ত্রীলোকের মত সিঁতে প্রভৃতি দিয়া তাঁহাকে সাজাইয়া দিতে বলিতাম!

নবনাটকে পরিহাসোদ্দীপক অনেক প্রসঙ্গ থাকিলেও ইহা করুণরসোত্তম গ্রন্থ। সুবোধের অলীক মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে সাবিত্রীর মূর্চ্ছা; তাঁহার উদ্বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগ; গবেশের রোগ, অনুতাপ ও মৃত্যু; বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইবামাত্র মাতৃ পিতৃ বিয়োগের, বিশেষতঃ উদ্বন্ধনে মাতার প্রাণত্যাগের, সংবাদ শ্রবণে

সুবোধের বিলাপ ও মূর্চ্ছাদি পাঠ করিবার সময়ে বোধ হয় কেহই অনর্গল অশ্রু-পাত না করিয়া থাকিতে পারেন না। তর্করত্ন ঐ সকলস্থলে করুণরসের প্রচুররূপে উদ্দীপ্তি করিয়াছেন, এবং ঐ রসেই গ্রন্থের সমাপন হইয়াছে। কুলীনকুলসর্ব্বস্বে গান ছিল না, ইহাতে কয়েকটি গানও আছে—সেগুলিও অতি মধুর হইয়াছে। অভিনীত হইবার উদ্দেশেই এই নাটক রচিত হয়, সুতরাং ইহা কয়েকবার অভিনীত হইয়াছিল, একথা বলা বাহুল্য।

রুক্মিণীহরণ নাটক—এই নাটকের উপাখ্যান পৌরাণিক। গ্রন্থকার সে অংশে আর কোন বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই; তবে তোতলা দরিদ্র ব্রাহ্মণ ধনদাস ও দেবর্ষি নারদের কথোপকথনে অনেক পরিহাস-রসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু 'ধনদাস' নামটি ব্রাহ্মণোচিত হয় নাই। তর্করত্ন ইংরেজি নাটক রচয়িতাদিগের অনুকরণে ইহাতে নান্দীপ্রস্তাবনাদি কিছুই দেন নাই, তাহাতে কথা নাই; কিন্তু তিনি সংস্কৃতজ্ঞ হইয়া কিরূপে এই নাটকে ও পূর্ব্বোক্ত নবনাটকে 'গর্ভাঙ্ক' এই নামে প্রকরণবন্ধ করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সংস্কৃত পারিভাষিক 'গর্ভাঙ্ক' শব্দে যাহা বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে (২৬২ পৃষ্ঠায়) উল্লেখ করিয়াছি। গর্ভাঙ্ক শব্দের সেই অর্থ ত্যাগ করিয়া অপর অর্থে প্রয়োগ করা তর্করত্নের পক্ষে উচিত হয় নাই।

তর্করত্নের আর আর নাটকগুলি সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত। তবে সে সকল অনুবাদ অবিকল নহে। আধুনিক নিয়মানুসারে অভিনয়োপযোগী করিবার নিমিত্ত তাহাদের রসভাবাদির অনেক পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও সন্নিবেশন করা হইয়াছে। সে পরিবর্ত্তাদি অনেক স্থলে মন্দ হয় নাই। ইহার রচিত সকল নাটকই স্থানে স্থানে অভিনীত হইয়াছে। তর্করত্নের অনেক পুস্তকেই রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের নামসংযোগ দর্শন করিতেছি; অতএব বোধ হইতেছে যে, তিনিই ঐ সকল গ্রন্থপ্রণয়নের উৎসাহদাতা। সুতরাং বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজ তাঁহার নিকট অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

—:*:—:*:—

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ—নবীনতপস্বিনী প্রভৃতি।

জেলা নদীয়ার অন্তর্গত চৌবেড়িয়া গ্রামনিবাসী দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ,' 'নবীনতপস্বিনী' নাটক প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৭৫১ শকে (১৮২৯ খৃঃ অব্দে) ইহার জন্ম হয়;—পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। দীনবন্ধু প্রথমে হুগলীকলেজে ও পরে কলিকাতা হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজিতে বিলক্ষণ কৃতবিদ্য এবং শেষোক্ত কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে গণনীয় হইয়া ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি কলেজ ত্যাগ করিয়া প্রথমে ডাকমুন্সীর (পোষ্ট মাষ্টারের) কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিয়ৎকাল সেই কার্য্য সম্পাদন করিলে পর কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির গুরুতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ইন্স্পেক্‌টিং পোষ্ট মাষ্টারী অর্থাৎ ডাকঘরের তত্ত্বাবধায়কতা পদে নিযুক্ত করেন। তদবধি শেষ পর্য্যন্ত তিনি সেই কার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন; এবং ক্রমশই তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়াছিল; এবং কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহার কার্য্যকুশলতাদর্শনে অতীব প্রীত হইয়া সম্মানসূচক 'রায়বাহাদুর' উপাধি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ১লা নবেম্বরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

দীনবন্ধু বাবু সর্ব্বপ্রথমে ১৮৬০ খৃঃ অব্দে 'নীলদর্পণ' নাটক প্রকাশ করেন। উক্ত নাটকে রচয়িতার নাম না থাকায় অনেকদিন সকলে তাঁহাকে গ্রন্থকার বলিয়া জানিতে পারে নাই—ক্রমে প্রকাশ হইয়াছে। তৎপরে তিনি ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে 'নবীনতপস্বিনী' ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে 'বিয়েপাগলা বুড়ো', ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে 'সধবার একাদশী', ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে 'লীলাবতী', ১৮৭১ খৃঃ অব্দে 'সুরধুনী' এবং ১৮৭২ খৃঃ অব্দে 'জামাইবারিক' ও 'দ্বাদশকবিতা' প্রকাশ করিয়াছেন। এই সাত খানি গ্রন্থের মধ্যে সুরধুনী ও দ্বাদশ কবিতা ভিন্ন সকলগুলিই নাটক বা প্রহসন। 'কমলেকামিনী' দীনবন্ধুর মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল। 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' 'পোড়া মহেশ্বর' 'কুড়ে গরুর ভিন্ন মাঠ' এবং 'পদ্যসংগ্রহ' নামক আর কয়েকখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করেন।*

* দীনবন্ধুর অভিন্ন-হৃদয় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—দীনবন্ধুর অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকৃত ঘটনামূলক এবং অনেক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাঁহার প্রণীত চরিত্রে অনুকৃত হইয়াছে। 'নীলদর্পণে'র

নীলদর্পণ—যৎকালে কৃষ্ণনগর, যশোহর প্রভৃতি প্রদেশে নীলকর সাহেবেরা প্রজাদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করেন, সেই সময়ে এই নাটক প্রচারিত হয়। ইহাতে গোলোক বসু নামক এক সমৃদ্ধ কায়স্থ পরিবারের নীলোপদ্রবে ধনে প্রাণে ধ্বংস হইবার বর্ণনপ্রসঙ্গে বলপূর্ব্বক প্রজার ভূমিতে নীল-বপন, দাদন না লইলে তাহাদিগকে কুঠীতে ধরিয়া লইয়া গিয়া শ্যামচাঁদ ও রাম-কান্ত প্রহারে দাদন গতান, গ্রামদগ্ধ করা, নীলবপনে অনিচ্ছু প্রজাদিগের উপর মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করা, মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের সহিত ভাব প্রণয় করিয়া প্রজাদিগের কৃত মোকদ্দমা সকল বিফল করিয়া দেওয়া, বলপূর্ব্বক লোকের স্ত্রী পরিবারের জাতিনাশ করা, হত্যা করা প্রভৃতি নীলকর সাহেবদিগের কৃত ভূরি ভূরি অত্যাচার সকল বিলক্ষণ কবিত্বসহকারে বর্ণিত হই-য়াছে। গ্রন্থবর্ণিতরূপ সকল অত্যাচারই নীলকরদিগের কর্ত্তৃক সত্য সত্যই সম্পাদিত হইত কি না সে বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে—কিন্তু বর্ণনা পাঠ করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়, এবং নীলকরদিগকে পিশাচ রাক্ষস হইতেও সহস্রগুণে অপকৃষ্টজাতি বলিয়া বোধ জন্মে। মিথ্যা মোকদ্দমায় জেলে প্রেরিত গোলোকবসুর উদ্বন্ধনে মৃত্যু, নীলকর কর্ত্তৃক আহত গ্রন্থনায়ক নবীন-মাধবের প্রাণ বিয়োগ, পতিপুত্রশোকাকুলা সাবিত্রীর উন্মাদ, উন্মত্তাবস্থায় তাঁহা কর্ত্তৃক নিজপুত্রবধূহনন, সহসা উন্মাদাপগমে জ্ঞানসঞ্চার হওয়ায় অনুতাপে তাঁহার প্রাণত্যাগ—ইত্যাদি স্থলে গ্রন্থকার করুণরসের সাতিশয় উদ্দীপ্তি করিয়াছেন। সে সকল স্থল পাঠ করিবার সময়ে কোন মতেই অশ্রু সম্বরণ করা যায় না।

অনেকগুলি ঘটনা প্রকৃত, নবীনতপস্বিনীর বড় রাণী ছোটরাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। 'সধবার একাদশী'র প্রায় সকল নায়ক নায়িকাগুলিই তাৎকালিক জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি, তদ্বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা। 'জামাইবারিকে'র দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল। প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ এবং প্রচলিত খোশগল্প হইতে সার সংগ্রহ করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব্ব চিত্তরঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্টি করিতেন। 'নবীন তপস্বিনী'তে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোঁদলকুৎকুতের ব্যাপার প্রাচীন উপন্যাসমূলক; 'জলধর' 'জগদম্বা' Merry wives of Windsor হইতে নীত"।

নীলদর্পণ এইরূপ করুণরসপূর্ণ হইলেও ইহা যে নাটকাংশে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে না। কারণ নাটকের সকল অংশই অভিনেয় হওয়া উচিত, কিন্তু প্রজাদিগের উপর শ্যামচাঁদ ও রামকান্ত প্রহার, গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির উদরে মুষ্ট্যাঘাত, উড়ানিপাকান দড়ীতে গোলোকচন্দ্রের মৃতদেহ দোদুল্যমান রাখা, গলায় পা দিয়া সরলতাকে হত্যা করা প্রভৃতি কাণ্ড সকল অভিনয়ের যোগ্য হইতে পারে না। ইংরেজি নাটকে এ সকল সম্পূর্ণরূপে দোষা-বহ হয় না বটে, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ওরূপ কাণ্ডসকল রঙ্গস্থলে দর্শকদিগের উদ্বেজক হয় বলিয়া, নেপথ্যে সম্পাদন করিয়া সংস্কৃত নাটকরীতির অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন নীলদর্পণে কোন কোন অযোগ্যস্থলে সাধুভাষাসমন্বিত বক্তৃতা আছে, সেগুলি স্বভাবসঙ্গত নহে। তা ছাড়া গ্রন্থকার অকারণ ২।১টি পাত্রকে রঙ্গস্থলে আনিয়াছেন ;—দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে দুইজন অধ্যাপককে রঙ্গভূমিতে আনিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাইলাম না।

নীলদর্পণ লইয়া দিনকত হুলস্থূল পড়িয়াছিল। উহাতে বর্ণিত নীলকরকৃত অত্যাচার সকল সাহেবদিগের গোচর করাইবার জন্য ঐ নাটক ইংরেজিতে অবিকল অনুবাদিত করা হয়। তদ্দর্শনে ইংলিষমানপত্রের সম্পাদক আপনা-দিগের খ্যাতিলোপকর পুস্তকের মুদ্রণ করিয়াছে বলিয়া, মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিলে লোকহিতৈষী শ্রদ্ধাস্পদ পাদরী জে, লঙ সাহেব উক্ত পুস্তকের মুদ্রণ ও অনুবাদকরণ জন্য সমস্ত দোষের ভার নিজস্কন্ধে লইয়া আদালতে উপস্থিত হন। উক্ত আদালতের তৎকালীন জজ সরমর্ডাণ্ট ওয়েল্‌স সাহেব এই মোকদ্দমার বিচার করিয়া ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ২৪শে জুলাই উক্ত মহাত্মার এক মাস কারাবাস ও সহস্র মুদ্রা * অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। ইহাতে বাঙ্গালীরা যেরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। যাহা হউক, ঐ হঙ্গামে নীলদর্পণের নাম দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও কর্ণ-

* এই মুদ্রা কলিকাতার ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় তৎক্ষণাৎ দিয়াছিলেন—সাহেবকে দিতে হয় নাই।

গোচর হইতে বাকি ছিল না ;—ইহা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে।

নবীনতপস্বিনী—দীনবন্ধু বাবুর দ্বিতীয় নাটক। ইহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, রমণীমোহন নামক রাজা দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়া গর্ভবতী প্রথমাপত্নীর প্রতি বড়ই অনাদর করেন ; তাহাতে বড়রাণী এক দাসীর সহিত বহির্গত হইয়া অরণ্য বাস করেন, তথায় তাঁহার এক পুত্র জন্মে। রাজপুত্র ও রাণী তপস্বিবেশে সপ্তদশবর্ষ পর্য্যন্ত নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে রাজধানীতে উপস্থিত হন। ঐ সময়ে ছোটরাণীর মৃত্যু হওয়ায় রাজাকে সকলে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন, এবং এক রাজসভাসদের দুহিতা অপরূপলাবণ্যা 'কামিনী'কে কন্যা স্থির করেন। কিন্তু ছোট রাণীর মৃত্যুর পর রাজার মনে বড় রাণীর পূর্ব্বশোক উচ্ছলিত হওয়ায় তিনি বিবাহ করিতে অসম্মত হন। ইত্য-বসরে তপস্বিবেশধারী রাজপুত্র বিজয় ও কামিনীর পরস্পর অনুরাগ সঞ্চার হয়, এবং কামিনীর মাতা, তপস্বী হইলেও বিজয়কে কন্যাদান করিতে অভিলাষিণী হন ; তাহাতে কামিনীর পিতা কুপিত হইয়া কৌশলপূর্ব্বক বিজয়কে চোররূপে রুদ্ধ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত করান ; তথায় অভিজ্ঞানাদিদর্শনে রাজা বিজয়কে পুত্ররূপে চিনিতে পারেন, রাণীকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন, এবং বিজয়-কামিনীর বিবাহ হয়। এই উপাখ্যানের, নাটক-রীতিতে বিস্তার ও সুকৌশলসহকারে বর্ণনাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার দুইটী অতি রমণীয় পদার্থ তন্মধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছেন। সে দুইটার ছাঁচ বিলাত হইতে আনা হইয়াছে বলিয়া আমরা কোন দোষ দিইনা,— যে হেতু বিলাতীয়ের অনুরূপ দ্রব্য এ দেশে উত্তমরূপে নির্ম্মাণ করিয়া দেশীয়-দিগের মন মোহিত করিতে পারিলে তাহাতে বাহাদুরীও আছে—দেশের উপ-কারও আছে। সেই দুইটী জিনিষ কি ?—মল্লিকা আর মালতী। ইহারা যুবতী, রূপবতী, সতী, বুদ্ধিমতী ও রসবতীর অগ্রগণ্যা। স্বামী, সখী ও সখী-পতির সহিত কিরূপ বিমল আমোদ করিতে হয়, তাহা যাঁহারা না জানেন, তাঁহারা কিছুদিন মল্লিকা মালতীর সহচারিণী থাকিবেন। "মরণ আর কি। ভাতারের সঙ্গে ও কিলা ?" মালতীর এই কথার উত্তরে মল্লিকার "তা রঙ্গ

কর্‌বার জন্যে বুঝি পথের লোক ডেকে আন্‌বো ?” এই উক্তি কত লোককে কত উপদেশ দিতে পারে। মিছামিছি রাজী হইয়া জলধরকে তাহার স্ত্রীর দ্বারা ঝাঁটা খাওয়ান, তৎপশ্চাৎ তাহাকে স্বগৃহে আনয়নপূর্ব্বক আল্কাৎরা তুলা মাখাইয়া হোঁদল কুঁৎকুঁতে রূপে লৌহপিঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যগুলি যদিও কুলবালার পক্ষে কিছু অসঙ্গত হয়, তথাপি যখন ঐ সকল কার্য্য তাহাদের পতির জ্ঞাতসারে হইয়াছিল এবং যখন জলধরের আকারপ্রকার ঐরূপ, তখন তাহা দোষাবহ হইতে পারে না। ফলতঃ আমাদের বিবেচনায় নবীনতপস্বিনীর মল্লিকা মালতীর বিবরণটি সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও প্রীতিপদ।

রতিকান্ত, জলধর, জগদম্বা, রাজা, মাধব, গুরুপুত্র, সুরমা, বিদ্যাভূষণ, বড়রাণী, বিজয়, কামিনী প্রভৃতি নাটকোক্ত অপরাপর পাত্রগুলির চরিতও প্রায় সর্ব্বস্থলেই স্বভাবসঙ্গতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কবি মধ্যে মধ্যে—

“মাছ মরিল বেরাল কাঁদে শান্ত কর্‌লে বকে।
বেঙের শোকে সাঁতারপানি হেরি সাপের চকে॥”
“মালতী মালতী মালতী ফুল। মজালে মজালে মজালে কুল॥”
—“আমরি আমরি যমেরই ভুল॥”—
“মধুপান কত্তো পারি। মাচির কামড় সৈত্তে নারি॥”
“কামিনীর কথা শোনে তারে বলি পতি।
পতিপায় থাকে মন তারে বলি সতী॥”
“স্বামিমুখে মন্দ কথা সাপিনীদশন।
ফুটিলে মানিনীমনে, অমনি মরণ॥”

এইরূপ যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা দিয়াছেন, তাহা সেই সেই স্থানে কিরূপ মধুর হইয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নহে। ফলতঃ ‘নবীন তপস্বিনী’খানি একটি উৎকৃষ্ট নাটক। ইহার কয়েক স্থলে যে কিঞ্চিৎ অসঙ্গত ও অনুচিত ঘটনার বর্ণন আছে—তাহা আমরা আর উল্লেখ করিলাম না। দীনবন্ধুবাবু নীল-দর্পণের পর অনেকদিন পর্য্যন্ত কোন রচনা করেন নাই, এই জন্য অনেকে বলিত, “দীনবন্ধুবাবু তাদৃশ কবি নহেন—নীলদর্পণও ভাল হয় নাই—কেবল

সময় গুণে লোকের আদৃত হইয়াছিল”—নবীনতপস্বিনী প্রকাশিত হইবার পর অবধি তাঁহাদের সে মুখ বন্ধ হইয়াছে। এই নাটক কয়েকস্থানে অভিনীতও হইয়াছে।

লীলাবতী—দীনবন্ধুবাবুর তৃতীয় নাটক। হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় নামক এক সমৃদ্ধ ব্যক্তি আপনার গুণবতী কন্যা লীলাবতীর নদেরচাঁদ নামক নিতান্ত দুশ্চরিত্র এক শ্রেষ্ঠ কুলীন পাত্রের সহিত বিবাহ দিবার কল্পনা করেন। কিন্তু লীলাবতী পূর্ব্বহইতেই আপনাদিগের বাটীতে প্রতি-পালিত রূপগুণশালী ললিতমোহন নামক যুবকের প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় ইহা জানিতে পারিয়াও ললিতকে লীলাবতী দান করিতে ইচ্ছুক হন নাই। কারণ তাঁহার পুত্র অরবিন্দ বারবৎসরকাল নিরুদ্দেশ থাকায় তিনি ললিতকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া লীলাবতীকে বড় কুলীনে দিবার মানস করিয়াছিলেন। লীলাবতী নদেরচাঁদের হস্তে না পড়িয়া ললিতের পত্নী হয়, এজন্য ললিতের বন্ধু সিদ্ধেশ্বর, চট্টোপাধ্যায়ের শ্যালক শ্রীনাথ, অরবিন্দের স্ত্রী ক্ষীরোদবাসিনী, লীলাবতীর সই সারদাসুন্দরী প্রভৃতি সকলেই নিতান্ত ইচ্ছা ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টার কোন ফল হইবে না বুঝিয়া ললিত, চট্টোপাধ্যায়ের বাটী হইতে পলায়ন করেন, সুতরাং চট্টোপাধ্যায়কে পোষ্যপুত্র লইবার জন্য অপর একটি বালক স্থির করিতে হয়। অরবিন্দ আপন জনকের রক্ষিতা স্ত্রীর কন্যা চাঁপাকে নিজপত্নীভ্রমে আলিঙ্গন করিয়া তৎপ্রায়শ্চিত্তার্থই বহির্গত হইয়াছিলেন। ঐ চাঁপা সন্ন্যাসিবেশে ভ্রমণ করিয়া অরবিন্দকে নানা সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন এবং চট্টোপাধ্যায়ের পোষ্য-পুত্র লইবার অব্যবহিতপূর্ব্বেই অরবিন্দ সাজিয়া তথায় উপস্থিত হন। ইহার ২।৩ দিন পরেই ললিতের সহিত প্রকৃত অরবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রথমে মহাগোলযোগ ঘটে, পরে প্রথম অরবিন্দ পুরুষবেশ ত্যাগ-করিয়া চাঁপারূপে প্রকাশিত হইলে গোলযোগের নিবৃত্তি এবং ললিতের সহিত লীলাবতীর বিবাহ হয়—এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া পরমকৌশল-সহকারে এই নাটকের রচনা করা হইয়াছে। বর্ণিত পাত্রগুলির প্রকৃতি

সকল প্রায় সর্ব্বস্থলেই যথাযথ সংরক্ষিত হইয়াছে। হেমচাঁদের সহিত সারদা-সুন্দরীর কথোপকথন ও হেমচাঁদের কটুবাক্যে সারদার বাক্স উল্টাইয়া ফেলা অতি মনোরম হইয়াছে; চট্টোপাধ্যায়ের কুলান্ধতা, শ্রীনাথের গোয়ার্ত্তুমী, কন্যাপ্রদর্শন সময়ে হেমচাঁদ ও নদের চাঁদের বক্তৃতা, ক্ষীরোদবাসিনীর বিলাপ, লীলাবতীর প্রলাপ, সন্ন্যাসিবেশধারিণী চাঁপার ব্যবহার এ সকলও অতি উৎকৃষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। দীনবন্ধুবাবু একজন বিলক্ষণ কৃতবিদ্য লোক, সুতরাং তাঁহার রচিত পুস্তকে উপাখ্যানের মনোরম বৈচিত্র্য থাকা যেরূপ সম্ভাবিত, এগ্রন্থে তাহাই আছে।

দীনবন্ধুবাবু খুব রসিক লোক। তিনি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া অনেক খোস্‌গল্প সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেইগুলি পুস্তকমধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন। সেরূপ করায় অনেকস্থলই মধুর হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কোন কোন স্থলে বোধ হয় সেই গল্পগুলি প্রকাশ করিবার জন্যই সেই সেই প্রকরণের অবতারণা করিয়াছেন। কন্যাপ্রদর্শনাবসরে রঘুয়া ভৃত্যকে আনয়ন করিয়া তন্মুখ হইতে 'অল্লিকে সল্লিকে লোকে' ইত্যাদি উড়িয়া শ্লোক প্রকাশ করা এবং মাতালসভায় রস ও ভূতের বিচার করাই তাহার প্রমাণ। আমাদের বিবেচনায় ঐ গুলি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। সে যাহা হউক, নদের-চাঁদ গাঁজা, গুলি ও মদ খায় বলিয়াই তাহার প্রতি শ্রীনাথের তাদৃশ ঘোরতর বিদ্বেষ, কিন্তু দীনবন্ধুবাবু সেই শ্রীনাথকেই মদ, গাঁজা ও গুলিতে বুঁদ করিয়া তুলিয়াছেন! ইহা সঙ্গত হয় নাই। শ্রীনাথ স্বয়ং বিশুদ্ধচরিত থাকিয়া নদেরচাঁদের প্রতি ঐরূপ উদ্ধতভাবে ঘৃণা প্রদর্শন করিলে তাহা সঙ্গত হইত। গ্রন্থকার হেমচাঁদের বক্তৃতামুখে পয়ারকে গয়ার বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিই বলুন দেখি, লীলাবতী, সারদাসুন্দরী ও ললিত প্রভৃতির মুখে যে সকল দীর্ঘ দীর্ঘ মাইকেলী ছন্দ নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা কি গয়ার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে? যাঁহারা লীলাবতীর অভিনয় দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, ঐ সকল কবিতা শ্রোতার কিরূপ কর্ণশূল হয়।

বিয়েপাগ্‌লাবুড়ো—সধবার একাদশী ও জামাইবারিক এতিন খানি

প্রহসন। দীনবন্ধুবাবুর বিদ্যা, বুদ্ধি, রসিকতা ও উপাখ্যান রচনাচাতুর্য্য যেরূপ প্রসিদ্ধ, এই তিনখানিই তাহার উপযুক্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এই তিন পুস্তকেরই আদ্যোপান্ত হাস্যরসে পরিপূর্ণ; মধ্যে মধ্যে করুণরসেরও আবির্ভাব আছে। সে গুলিও অতি মনোহর হইয়াছে। বিয়েপাগ্‌লাবুড়ো নামক পুস্তকে, ঐরূপ এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে নাচাইয়া গ্রামের কোন ভদ্রলোক-কর্ত্তৃক শিক্ষিত কয়েকজন বিদ্যালয়ের ছাত্র মিছামিছি বিবাহ দিয়া কৌতুক করিয়াছে। কৌতুক বেশ আমোদজনক হইয়াছে এবং স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অধিক বয়সেও পুনর্ব্বার বিবাহ করণেচ্ছু লোকদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কনক বাবু বিজ্ঞ লোক হইয়াও স্কুলের অল্পবয়স্ক ছেলেগুলিকে অমনতর বেলেল্লাগিরি কাজ করিতে শিক্ষা-দিয়া ভাল করেন নাই। আর তা ছাড়া, ঐ ছেলেগুলো বাসর ঘরে শালী-শালাজ প্রভৃতি সাজিয়া যে ঘোরতর ইয়ারকি দিয়াছে, প্রৌঢ়া যুবতীরাও সকলে সেরূপ পাকা ইয়ারকি দিতে পারে না। সুতরাং সেগুলি কিছু অস্বাভাবিক হইয়াছে।

সধবার একাদশী খানি মদের কথাতেই আরব্ধ ও মাতালের কথাতেই পর্য্যবসিত। ইহাতে হাস্যরসোদ্দীপক অনেক বিষয় বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু আদ্যোপান্ত অশ্লীল বথামি ও মাতলামীর কথাতেই পরিপূর্ণ। সমাজ-প্রচলিত কোন দোষের সবিস্তর বর্ণন, সেই দোষ জন্য অনিষ্ট সঙ্ঘটন ও তৎপরে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যক্তির অনুতাপ ও চরিত্রশোধন প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে বর্ণন করিয়া সেই দোষের প্রতি সমাজের ঘৃণা উৎপাদন করাই, বোধ হয়, প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ কতক-গুলা বথামীর গল্প লিখিলেই যদি প্রহসন হইত, তাহা হইলে কলিকাতার মেছোবাজার ও সোণাগাছী প্রভৃতি স্থানে দৈনন্দিন যে সকল ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়, সেইগুলি অবিকল লিখিয়া লইলেও অনেক প্রহসন হইতে পারিত। উল্লিখ্যমান প্রহসনে অটল ও নিমেদত্ত বরাবর সমান মাতলামী, ও বেশ্যা প্রভৃতি লইয়া সমান ঢলাঢলি করিয়াছে। তাহাদের চরিত্র উত্তমরূপে চিত্রিত

হইয়াছে সত্য, কিন্তু তৎপাঠে সমাজের কিছুমাত্র শিক্ষালাভ নাই। সুতরাং ওরূপ বিবরণ লিখিয়া প্রহসনরচনার কি প্রয়োজন ছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ফলতঃ বড়ই দুঃখের বিষয় যে, দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় সুসামাজিক লোকের হস্ত হইতেও এরূপ জঘন্য পদার্থ বহির্গত হইয়াছে!

জামাইবারিক প্রহসনখানির উপাখ্যান সমধিকচাতুর্য্যসম্পন্ন। বিজয়-বল্লভ নামক এক কায়স্থ জমীদার বড় বড় কুলীনসন্তানদিগকে কন্যাদান করিয়া ঘরজামাইএ রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সকলের একত্র অবস্থানের জন্য একটি পৃথক্ প্রশস্ত গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন—লোকে ঐ গৃহকে জামাইবারিক বলিত। জামাইরা তথায় থাকিয়া গাঁজা গুলি মদ খাইতেন এবং সময় মত পাস্ পাইলে তবে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইতেন। তাঁহাদের স্ত্রীরা অনেকেই স্ব স্ব স্বামীর প্রতি নিতান্ত সাহঙ্কার ব্যবহার করিত। অভয়কুমার নামে ঐরূপ এক জামাই ছিলেন। একদা তাঁহার স্ত্রী পদাঘাত করিব, বলায় তিনি অভিমানে শ্বশুরবাটী হইতে চলিয়া আইসেন এবং দুই পত্নীর বিবাদানলে দহ্যমানশরীর পদ্মলোচন নামক নিজ প্রতিবাসীর সহিত মিলিত হইয়া বৃন্দাবন গমনপূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এদিকে অভয়ের স্ত্রী কামিনী পতির অবমাননা করণজন্য অনুতাপে তাপিত হইয়া পতির অন্বেষণার্থ সভর্তৃকা এক বিশ্বস্ত প্রতিবেশিনী সহিত বৃন্দাবন গমন করিয়া বৈষ্ণবীবেশে থাকেন। তথায় বৈষ্ণবরূপী অভয়ের সহিত কণ্ঠীবদল হইলে পর সমুদয় প্রকাশিত হয়—ইহাই এই প্রহসনের স্থূল মর্ম্ম।

জামাইদিগের অতদূর দুরবস্থা, দুই পত্নীকর্ত্তৃক পদ্মলোচনের শরীর ভাগ করিয়া লওয়া ও একের ভাগে পতিত স্বামীর অঙ্গে অন্যের আঘাতাদি করা, রাত্রিকালে স্বামিভ্রমে চোরকে ধরিয়া দুই সতীনের ওরূপ কাড়াকাড়ি ও প্রহার করা প্রভৃতি কার্য্যগুলি নিতান্ত অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইয়াছে—সুতরাং সেই সেই অংশগুলি তত প্রীতিকর না হউক, অপর সমুদয় অংশ বিলক্ষণ মনোহর হইয়াছে। ভবী ময়রাণী, হাবার মা ও কামিনীর পরস্পর

কথোপকথন, বাড়ীর ভিতর যাইবার জন্য জামাইদিগকে পাস্ দেওয়ার অবসরে গ্রন্থকারের সকল বন্ধুরই নামোল্লেখ ও কৌশলক্রমে যবনজাতীয় আব্‌দুল লতিফ্‌কেও তন্মধ্যে আনয়ন, স্বামীর অবমাননা করিয়াই হঠাৎ কামিনীর অনুতাপ উপস্থিত হওয়া এবং বৃন্দাবনে মিলনের সময়ে কামিনীর মনের সমুদয় কথা খুলিয়া খেদ করা, এই সমুদয়স্থলেরই বর্ণনাবসরে কবি বিলক্ষণ কবিত্ব ও পরিহাসরসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। রামায়ণ ও পীরের গানগুলি নূতন না হইলেও বিলক্ষণ কৌতুককর হইয়াছে। কেলীন্যানুরোধে যাঁহারা ঘরজামাই রাখেন বা ঘরজামাই থাকেন, এই পুস্তক পাঠে তাঁহাদের অনেকেরই চৈতন্য হইবার সম্ভাবনা।

সুরধুনীকাব্য ও দ্বাদশকবিতা এ দুইখানি পদ্যময়। হিমালয় হইতে সাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী নদ, নদী, পর্ব্বত, দেশ, নগর, গ্রাম ও তত্তৎস্থানীয় ঐতিহাসিক বিবরণ এবং প্রধান প্রধান বস্তু ও ব্যক্তিদিগের বর্ণনা করাই এই গ্রন্থ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত কবি যুবতী গঙ্গাকে পদ্মা সখীর সহিত পিতৃভবন হিমালয় হইতে পতি সাগরের সমীপে প্রেরণ করিবার উপাখ্যানের কল্পনা করিয়াছেন, এবং সেই কল্পিত উপাখ্যানের বর্ণনপ্রসঙ্গে অনেক স্থানের অনেক বিবরণ লিখিয়াছেন। যে সকল প্রসিদ্ধ নগরাদি গঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী নহে, গঙ্গায় পতিত যমুনা সরযূ ঘর্ঘরা কৌশিকী প্রভৃতি সখীরূপা অপরাপর নদী-দিগের মুখে সে সকলেরও বর্ণনা করা হইয়াছে। ফলতঃ এই গ্রন্থ পাঠে হিমালয় হইতে সাগর পর্য্যন্ত নদীসন্নিহিত অনেক প্রধান প্রধান স্থানের বিবরণ কাব্য-রসাস্বাদসহকারে জ্ঞাত হইতে পারা যায়।

দীনবন্ধু বাবু পূর্ব্বোল্লিখিত নাটকগুলি রচনা করিয়া যেরূপ যশোলাভ করিয়া-ছিলেন, সুরধুনী কাব্যে সেরূপ করিতে পারেন নাই। ইহার কবিতা সকল সর্ব্বস্থলে প্রীতিকর হয় নাই—এমন কি ইহারও অনেক পদ্য "কেবল চৌদ্দোয় চেনা যায়।" ইংরেজিতে যাহাকে 'এনাক্রণিজ্‌ম্' অর্থাৎ কালিক-দোষ কহে, ইহাতে তাহাও সংঘটিত হইয়াছে। কবির রচনায় গঙ্গার হিমালয় হইতে সাগর গমনের প্রথম সময়ই প্রকাশিত হয়, কিন্তু তখন কাশীর মানমন্দির, বহরমপুরের

কলেজ, কৃষ্ণনগরের কার্ত্তিক বাবুর গান—এ সকল কোথায় ছিল? এই গ্রন্থের বিষয়ও কবির নূতন উদ্ভাবিত নহে; কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মনসার ভাসান ও গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী এই ৪ খানি প্রাচীন পুস্তকে প্রায় এইরূপ বিষয় সকলই বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বাদশকবিতা—'শকুন্তলার তনয়দর্শনে দুষ্মন্তের মনের ভাব' 'চন্দ্র' 'সূর্য্য' 'কোকিল' ইত্যাদি দ্বাদশটী পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ের বর্ণনা একত্র করিয়া এই পুস্তক নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত কোন কোন কবিতা পূর্ব্বে সংবাদপত্রাদিতেও প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে "আপনি বর্ত্তমান বঙ্গভাষার জনক—বঙ্গভাষা আপনার তনয়া" এই বলিয়া পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। এই পুস্তকের কবিতা সকল আদ্যোপান্ত উৎকৃষ্ট না হউক, কিন্তু অধিকাংশই যে অতি সুন্দর হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা এ বিষয়ের বাহুল্য না করিয়া পাঠকদিগের প্রদর্শনার্থ একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এতৎপাঠে তাঁহারা ঐ পুস্তকের দোষ গুণ কতক বুঝিবেন।

পরিণয়।

সুপবিত্র পরিণয়, অবনীতে সুধাময়, সুখ-মন্দাকিনীর নিদান।
মানব মানবীদ্বয়, হৃদয়ের বিনিময়, করিবার বিশুদ্ধ বিধান॥
একাসনে দুইজন, যেন লক্ষ্মীনারায়ণ, বসে সুখে আনন্দ অন্তরে।
এ হেরে উহার মুখ, উদয় অতুল সুখ, যেন স্বর্গ ভুবনভিতরে।
প্রণয় চন্দ্রিকাভাতি, ঘরময় দিবারাতি, বিনোদ কুমুদ বিকসিত।
আনন্দ বসন্তবাস, বিরাজিত বারমাস, নন্দনবিপিন বিনিন্দিত॥
যেদিকে নয়ন যায়, সন্তোষ দেখিতে পায়, গিয়েছে বিষাদ বনে চলে।
সুখী স্বামী সমাদরে, কান্তাকর ক'রে করে, পিরীতি পূরিত বাণী বলে,—
"তব সন্নিধানে সতি! অমলা অমরাবতী, ভুলে যাই নর-নশ্বরতা;
অভাব অভাব হয়, পরিতাপ পরাজয়, ব্যাধি বলে বিনয়বারতা॥"

রমণী অমনি হেসে, স্নেহের সাগরে ভেসে, বলে কান্ত! কামিনী কেমনে;
বেঁচে থাকে ধরাতলে, যেই হতভাগ্য ফলে, পতিত পতির অযতনে?
নবশিশু সুখরাশি, প্রণয়-বন্ধন-ফাঁসি, পেলে কোলে কালসহকারে।
দম্পতীর বাড়ে সুখ, যুগপৎ চুম্বে মুখ, কাড়াকাড়ি কোলে লইবারে॥
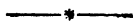
প্যারিচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল প্রভৃতি।

কলিকাতা নিবাসী ৺প্যারীচাঁদ মিত্র 'টেক্‌চাঁদ ঠাকুর' এই কল্পিত নামে অন্তরিত থাকিয়া 'আলালের ঘরের দুলাল' 'মদখাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' 'রামারঞ্জিকা' 'যৎকিঞ্চিৎ' ও 'অভেদী' প্রভৃতি নামে কয়েকখানি গদ্য গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'আলালের ঘরের দুলাল'ই প্রথম ও প্রধান।

এই পুস্তকে গ্রন্থকার বাবুরামবাবু নামক এক পল্লীগ্রামস্থ জমীদারের আচার ব্যবহার, তাঁহার প্রশ্রয়প্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র মতিলালের বিদ্যাশিক্ষা ও দুশ্চরিত্রতা এবং কনিষ্ঠ পুত্র রামলালের বরদাপ্রসাদ বিশ্বাস নামক এক সদাশয় ধর্ম্মশীল ব্যক্তির সহবাসে সদ্‌গুণলাভ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া একটি অনতিদীর্ঘ উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন। ঐ উপাখ্যানের মধ্যে পল্লীগ্রামস্থ অনেক জমীদারে দোল দুর্গোৎসব নাচ তামাসা প্রভৃতি কার্য্যে মুক্তহস্ত হইয়াও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষাদি আবশ্যক কার্য্যে যেরূপ কৃপণতা করেন, কোন লোককে জব্দ করিবার ইচ্ছা হইলে তাহার উপর যেরূপ মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করেন—কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে মিথ্যাবাদী সাক্ষী, মোক্তার, উকিল, আদালতের আমলা প্রভৃতি যেরূপে তাঁহাদের ধনশোষণ করে, অধর্ম্মী বঞ্চক জালকারক মুখসর্ব্বস্ব ব্যক্তি বিশেষকে সর্ব্বকর্ম্মসুদক্ষ মনে করিয়া তাহার পরামর্শে তাঁহারা যে প্রকারে নানা কুক্রিয়ায় রত ও পরিশেষে বিপজ্জালে জড়িত হন, তাহা বাবুরামের চরিত্রে বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ছেলে বাল্যকালে পিতামাতার অনুচিত প্রশ্রয় পাইলে এবং সৎশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইলে যেরূপ বিগড়িয়া যায়, বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাহার নানা কুক্রিয়া

যে প্রকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ধনবান্ বালকের সহিত দেশের অসৎ বালক জুটিয়া যে প্রকারে তাহাকে অধঃপাতে দেয়, তাহা মতিলালের চরিতবর্ণনে বিশেষরূপে চিত্রিত হইয়াছে—কুপরামর্শদায়ী স্বার্থপর দুষ্টলোকে স্বার্থসাধনোদ্দেশে লোকের কি সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহা ঠক্‌চাচা ও বাঞ্ছারামে বিশেষ ব্যক্ত হইয়াছে—এবং সৎপরামর্শে ও সাধুসঙ্গে লোকের চরিত্র কিরূপ বিশুদ্ধ হইতে পারে, তাহা বরদাবাবু, বেণীবাবু, বেচারামবাবু, ও রামলালের চরিত্রে সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে বড় মানুষের সভা, কলিকাতার আদি বৃত্তান্ত, পোলিস, বাজার, বিবাহের ঘোঁট, বরযাত্রীদিগের দুর্দ্দশা, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারি, সমারোহশ্রাদ্ধ, নীলকরের উপদ্রব প্রভৃতি অন্যান্য নানাবিষয়েরও সুন্দর বর্ণনা করা হইয়াছে। উপাখ্যানটী আগ্রহের সহিত শুশ্রূষণীয় না হউক, শিক্ষাপ্রদ বটে। পরম শত্রু ঠক্‌চাচা ও বাবুরামের প্রতি বরদাবাবুর অনুগ্রহ, কুক্রিয়াশীল মতিলালের দুরবস্থার একশেষ, নষ্টমতি ঠক্‌চাচার যাবজ্জীবন দীপান্তর বাস, ধর্ম্মপরায়ণ রামলালের সর্ব্ববিধ সুখলাভ ইত্যাদি অনুধ্যান করিলে 'ধর্ম্মের জয়—পাপের নাশ' এই কথার তাৎপর্য্য সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

গ্রন্থবর্ণিত অনেক বিষয়ই স্বভাবসঙ্গত হইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি আবার নিতান্ত অস্বাভাবিকও বোধ হয়। মতিলালের বদমায়েশী বড় অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইয়াছে। তাহার মা কাঁদিতে কাঁদিতে নিকটে আসিয়া বলিল, 'মতি! তোমার ভগিনী ও বিমাতার সকল দিন আধপেটা খাওয়াও হয় না; মতি অমনি রাগিয়া দুই চক্ষু লাল করিয়া মাএর গালে ঠাস্ করিয়া চড় মারিল!' একথা কি মনে ধারণা করা যায়? ঐরূপ প্রহার করাইবার অগ্রের মাএর সহিত কোনরূপ কলহ করাইলে ভাল হইত না কি? গ্রন্থকার একস্থলে বাবুরামের স্ত্রৈণতা বর্ণনে লিখিয়াছেন—"স্ত্রী 'এ জল নয় দুধ' বলিলে বাবুরাম চোখে দেখিয়াও অমনি বলিতেন, 'তাই ত—এ জল নয়—এ দুধ্'—স্ত্রী উঠ্ বলিলে উঠিতেন—বস্ বলিলে বসিতেন।" ইত্যাদি—কিন্তু সেই বাবুরামের, তিনি কি বিবেচনায় ঘটকালী করিয়া স্ত্রীপুত্রাদিসত্বে বুড়বয়সে পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়াইলেন? যে পুরুষ স্ত্রীর অমন ঘণ্টার গরুড়, তাহার কি আবার বিবাহ করিতে সাহস হয়?—বাবুরামের

স্ত্রী মতিলাল কর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং যুবতী কন্যাকে লইয়া বৃন্দাবনগমন করিলেন। বৃন্দাবন বৈদ্যবাটীর নিকটে নয়—তথা হইতে প্রায় ৩ মাসের পথ। দুইটী চিরগৃহরুদ্ধা যুবতী স্ত্রী নিঃসম্বলে ও নিরবলম্বনে ধর্ম্মবজায় রাখিয়া কিরূপে অত পথ যাইতে পারিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছু লেখা উচিত ছিল!

এস্থলে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য হইতেছে। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা বহুবিধ কষ্টস্বীকার করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করেন, চতুষ্পাঠী করিয়া অধ্যাপনা করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সহস্র ক্লেশভোগ করিয়াও তাহা করিতে পারিলেই তাঁহারা চরিতার্থ হন। অধ্যাপনার প্রণালীও এদেশে স্বতন্ত্র-রূপ—ছাত্রদিগকে অন্ন দিয়া পড়াইতে হয়। বিদ্যাধ্যাপনের এরূপ উদার রীতি বোধ হয়, কোন দেশে নাই। অধ্যাপকের বৈষয়িক সুখে বিসর্জ্জন দিয়া জ্ঞানার্জ্জন, জ্ঞানবিতরণ কার্য্যেই সর্ব্বদা নিরত থাকেন, এইজন্য তাঁহাদের আবশ্যক ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ দেশীয় ধার্ম্মিক বিজ্ঞ লোকেরা শ্রাদ্ধবিবাহাদি সকল কার্য্যের উপলক্ষেই তাঁহাদিগকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিয়া থাকেন। তাহাই অধ্যাপকদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। তদ্দারা তাঁহারা কথঞ্চিৎ পরিবারদিগের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই কৃতার্থম্মন্য হইয়া অভিলষিত কার্য্যে চির-জীবন যাপন করেন। অতএব আমাদের ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগের ন্যায় শ্লাঘ্য-কর্ম্মা ও উদারাশয় পণ্ডিত কোন্ জাতির মধ্যে কত আছেন? যদিও উৎসাহ-বিরহাদি নানাকারণে এক্ষণে সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন না, তথাপি সাধারণ্যে ঐ শ্রেণীস্থ লোকের উপরে প্রাচীন ও নব্য উভয় তন্ত্রেরই কৃতবিদ্য বিজ্ঞলোকদিগের অদ্যাপি বিলক্ষণ গৌরববুদ্ধি আছে; যেহেতু তাঁহারা আপনাদিগের মধ্যে একদল ঐরূপ উন্নতমনা লোক আছেন, এজন্য ভিন্ন জাতীয়দিগের নিকট গর্ব্ব করিয়া থাকেন;—কিন্তু পাঠকগণ! দেখুন, হিন্দু জাতির গৌরবস্থল সেই ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগের প্রতি টেকচাঁদ বাবু কিরূপ বিদ্রোচিত বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছেন! তিনি বাবুরামের শ্রাদ্ধবর্ণনপ্রসঙ্গে লিখিয়া-ছেন—"দিন রাত্রি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অধ্যাপকের আগমন, যেন গো মড়কে মুচির

পার্ব্বণ।" !!—কেবল ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপরেই কেন? ব্রাহ্মণজাতির প্রতিই টেকচাঁদ বাবুর যেন কিছু বিদ্বেষ আছে বোধ হয়, যেহেতু তিনি আগড়পাড়াস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগোষ্ঠীর বর্ণনায় লিখিয়াছেন, "বামুনে বুদ্ধি প্রায় বড় মোটা—সকল সময়ে সব কথা তলিয়া বুঝিতে পারে না—ন্যায়শাস্ত্রের ফেঁকড়ি পড়িয়া কেবল ন্যায়শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হয়" ইত্যাদি—এক্ষণে টেকচাঁদ বাবুর প্রতি আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, ন্যায়শাস্ত্র বোঝা কি মোটাবুদ্ধির কর্ম্ম? এপর্য্যন্ত ঐ 'মোটাবুদ্ধি' ব্রাহ্মণ ভিন্ন কয়জন সরুবুদ্ধি ইতরজাতীয় লোকে ন্যায়শাস্ত্র বুঝিতে পারিয়াছেন? এদেশে ব্রাহ্মণেরাই চিরকাল শাস্ত্রচর্চ্চা ও বুদ্ধির পরিচালনা করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের সন্তানেরা, সাধারণ্যে, অপরিশীলিতবুদ্ধি অন্যান্য জাতীয়দিগের সন্তানগণ অপেক্ষা অধিক মোটাবুদ্ধি হইবেন, তাহা সম্ভব নহে।

ভাষা—এক্ষণে এই পুস্তকের ভাষাবিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহাদের ভাষা অপেক্ষা ইহার ভাষা কিছু স্বতন্ত্ররূপ;—সাধারণ লোকে সচরাচর যেরূপ ভাষায় কথোপকথন করে, এই পুস্তকের অধিক ভাগই সেইরূপ গ্রাম্য ভাষায় লিখিত। পাঠকগণের প্রদর্শনার্থ অগ্রে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—যথা—

"শামের নাগাল পালাম না গো সই—ওগো মরমেতে মরে রই"—টক্—টক্—পটাস্—পটাস্, মিয়াজান গাড়োয়ান এক একবার গান করিতেছে—টিট্‌কারি দিতেছে ও শালার গোরু চল্‌তে পারে না বলে লেজ মুচ্‌ড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে। একটু একটু মেঘ হইয়াছে—একটু একটু বৃষ্টি পড়িতেছে—গোরু দুটা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া একখানা ছক্‌ড়া গাড়ীকে পিছে ফেলিয়া গেল। সেই ছক্‌ড়ায় প্রেমনারায়ণ মজুন্দার যাইতেছিলেন—গাড়ীখানা বাতাসে দোলে—ঘোড়া দুটা বেটো ঘোড়ার বাবা—পক্ষিরাজের বংশ—টংয়স্ টংয়স্ ডংয়স্ ডংয়স্ করিয়া চলিতেছে—পটাপট্ পটাপট্ চাবুক পড়িতেছে কিন্তু কোনক্রমেই চাল বেগড়ায় না।" ইত্যাদি।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, গ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা অবলম্বনকরা ভাল, কি বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারাদিপ্রবর্ত্তিত ভাষা গ্রহণকরা ভাল?—এ প্রশ্নের

মীমাংসা করা কিছু কঠিন। কারণ লোকের রুচিই এ বিষয়ের প্রমাণ—সকল লোকের যাহা ভাল লাগিবে, তাহাকে অবশ্যই ভাল বলিতে হইবে। দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ ভাষার রচনাই এক্ষণে অনেক লোকের অধিক প্রীতিপ্রদ হইতেছে, এবং সেই জন্যই এইরূপ ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে এবং দিন দিন তাদৃশ পুস্তকের সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে। ৺কালী-প্রসন্ন সিংহ এবম্বিধ ভাষাতেই 'হুতোম্‌পেচার নক্‌সা' প্রণয়ন করিয়া সমাজে যথেষ্ট যশোলাভ করিয়াছিলেন। আজি কালি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায়ের যে সকল উপাখ্যান পুস্তক লোকে আদরপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকে, সে সকলেরও ভাষা কিয়ৎপরিমাণে প্রায় এইরূপ। অতএব এই ভাষা সাধা-রণ লোকের কতক মনোরঞ্জন করিয়াছে, বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্ববিধগ্রন্থরচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শ-স্বরূপ হইতে পারে কি না?—আমাদের বিবেচনায় কখনই না। হুতোমপেচা বল, মৃণালিনী বল—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয়বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে; ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তক নির্ব্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালী ভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন কি?—বোধ হয়, পারিবেন না?—ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহা সর্ব্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষার গ্রন্থরচনা করা উচিত কি না?—আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার

কুচি ও কুমুড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেই-রূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্ত্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণকরা পাঠকদিগের আবশ্যক। ফলকথা এই যে, পাঠক যেমন নানাপ্রকার, তাঁহাদের রুচিও সেইরূপ নানা-প্রকার; একবিধ রচনাপাঠে সর্ব্ববিধ পাঠকদিগের রুচি চরিতার্থ হওয়া কোনমতেই সম্ভাবিত নহে—অতএব ভাষার মধ্যে নানাপ্রকার রচনারীতি থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। যাহা হউক আমাদের বিবেচনায় হাস্যপরিহাসাদি লঘুবিষয়ের বর্ণনায় আলালী ভাষা যেরূপ মনোহারিণী হয়, শিক্ষাপ্রদ বা প্রগাঢ় গুরুতর বিষয়ের বিবরণ কার্য্যে বিদ্যাসাগরী ভাষা সেইরূপ প্রীতিপ্রদা হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুতর বিষয়ের কথা আমাদের মনে উদিত হইল। কিছুদিন অতীত হইল সিবিল সর্বিস্ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত জন্ বীম্‌স সাহেব বাঙ্গালা ভাষাবিষয়ে একখানি ইংরেজিপুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন। তিনি ঐ পুস্তিকায়, বঙ্গভাষার পুস্তকরচনাবিষয়ে একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। সে প্রস্তাবের স্থূল তাৎপর্য্য এই—

এক্ষণে দুই দল লোক বাঙ্গালার পুস্তক রচনা করিতেছেন, তন্মধ্যে এক-দল প্রচুর সংস্কৃতশব্দ ব্যবহার করেন এবং অপর দল ইতর ও চলিত ভাষা পুস্তকমধ্যে নিবেশিত করেন। অতএব ঐরূপ দলাদলী ভাব না থাকিয়া যাহাতে বাঙ্গালা ভাষা প্রণালীবদ্ধ হইয়া একরূপ দাঁড়ায়, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তিনি এই প্রসঙ্গে ইউরোপের নানাদেশীয় সাহিত্য সমাজের ইতিবৃত্তের উল্লেখ করিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালাসাহিত্যের ভাষানির্ণয়ের জন্য একটি সভা করা আবশ্যক। ঐ সভা হইতে যে অভিধান প্রকাশিত হইবে, তাহার অনন্তর্গত কোন শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রযুক্ত হইতে পারিবে না, এরূপ নিয়ম করা কর্ত্তব্য'—ইত্যাদি।

বীম্‌স সাহেব ভিন্নদেশীয় হইয়া আমাদের ভাষা-ব্যবস্থাপনের জন্য যে, এত যত্নশীল হইয়াছেন, তদর্থ তাঁহাকে আমরা শতবার ধন্যবাদ দিই। কিন্তু তিনি 'Treatment of the Nexus' নামক পুস্তিকায় যে প্রস্তাব

করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। বাঙ্গালাকে সংস্কৃতভাষা করিয়া না তুলিয়া এবং উহার মধ্যে রূঢ়, স্থানীয় ও অশ্লীল শব্দসকল প্রবেশ করিতে না দিয়া মাঝামাঝিরূপে রচনার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, তিনি উক্ত পুস্তিকামধ্যেই নিজের, এই যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি, কিন্তু সেই ব্যবস্থা করণার্থ সভা ও অভিধান প্রস্তুত করিয়া গ্রন্থকারদিগের হস্তপদ বন্ধন করিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করি না; যেহেতু সময়ের গতি ও সমাজের রুচি অনুসারে অপনা হইতেই সেরূপ ব্যবস্থা হইয়া উঠিবে—অথবা উঠিবেই কেন, কতকদূর উঠিয়াছে। এক্ষণে সংস্কৃতজ্ঞ উৎকৃষ্ট লেখকেরাও দীর্ঘসমাস-সমন্বিত বাক্যরচনা প্রায় করেন না, এবং অভিমত অর্থের প্রতিপাদক সাধু-শব্দ না পাইলে তত্তৎস্থলে অপর ভাষাও গ্রহণ করিয়া থাকেন—এদিকে আলালী ভাষার পক্ষপাতীদিগেরও অনেক ভাললোকে এখন বুঝিতেছেন যে, চলিত গ্রাম্যভাষা কখন পুস্তকের ভাষা হইতে পারে না এবং সে ভাষায় পুস্তকরচনা করিলে তাহা বিজ্ঞসমাজে সম্যক্ প্রশংসা পায় না। ফলকথা যখন এইরূপে আপনা হইতেই ভাষার স্থায়িরূপ আকার দণ্ডায়মান হইতেছে, তখন আর তদর্থ নিয়মস্থাপনের প্রয়োজন কি?—আর করিলেই বা স্বাধীন-রুচি বিজ্ঞলেখকেরা আপনাদের অনভিমত বোধ করিলে কেন তাহা প্রতি-পালন করিবেন?—তবে রাজশাসন হয়, সে ভিন্ন কথা—কিন্তু এ জন্য রাজশাসন হওয়াও বড় বিড়ম্বনার বিষয়।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের নিমিত্ত কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত না হউক ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, দর্শন, রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, যন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতি ইংরেজিগ্রন্থে যে সকল বাচক, লাক্ষণিক বা পারিভাষিক শব্দ প্রযুক্ত আছে, বাঙ্গালা ভাষায় সেগুলিকে আনিয়া ব্যবহার করিবার জন্য একটি নিয়মস্থাপন করা কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায় সংস্কৃতগ্রন্থে যতদূর পাওয়া যায়, তাহা অবিকল লইয়া এবং যাহা না পাওয়া যায়, সরল ও সুসঙ্গতভাষায় সুবিজ্ঞলোক-

দিগের দ্বারা তাহা অনুবাদিত করিয়া একখানি অভিধান প্রস্তুত করা আবশ্যক।* তাহা হইলে ঐ সকল বিষয়ে যাঁহারা গ্রন্থরচনা করিবেন, তাঁহাদিগের যথেষ্ট সুবিধা হইবে এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারেরা আপনাদিগের অভিপ্রায়ানুসারে ভিন্ন ভিন্নরূপে সঙ্কলিত নূতন নূতন শব্দের প্রয়োগ করায়, সে সকল বুঝিবার জন্য পাঠকদিগের যে ক্লেশ ও অসুবিধা হয়, তাহাও সম্পূর্ণরূপে অপগত হইবে।

টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত অপর পুস্তকগুলির মধ্যে আর কোনখানিই আলালের ঘরের দুলালের সমান প্রীতিপদ হয় নাই। কিন্তু সকলগুলিই আলালীভাষায় লিখিত। তাঁহার ২য় পুস্তক 'মদখাওয়া বড়দায়, জাত থাকার কি উপায়।' ইহাতে পরস্পর অসম্বন্ধ কয়েকটি মাতলামী ও বথামীর গল্পমাত্র। তৎপাঠে বিশেষ কোন লাভ নাই। তাঁহার তৃতীয় পুস্তক 'রামারঞ্জিকা'। ইহাতে পতি ও পত্নীর কথোপকথনচ্ছলে এমন সকল বিষয়ের বিবরণ আছে, যাহা পাঠ করিলে আমাদের স্ত্রীলোকেরা সাংসারিক অনেক বিষয়ে অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু ঐ সকল কথার মধ্যে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদির সংস্কৃত বচন সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া মনঃসংযম, মোক্ষ প্রভৃতির যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সঙ্গত বোধ হইল না। কারণ উপদেশ্য়া পদ্মাবতীকে উক্তরূপ উপদেশের বোধ-সমর্থা বিদুষী বলিয়া পূর্ব্বে বর্ণন করা হয় নাই। গ্রন্থকার হরিহর ও পদ্মাবতীর উক্তি প্রত্যুক্তিতেই গ্রন্থ চালাইতেছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ ১৮শ অধ্যায় হইতে

* গ্রন্থকারের এই উক্তি সমর্থন করিয়া 'সাহিত্য-পরিষৎ' পত্রিকায় (১৩০২) কোন বিজ্ঞ মহাশয় লিখিয়াছেন:—"মহামতি বীমস্ সাহেবের প্রস্তাব প্রসঙ্গে বঙ্গভাষানুরাগী মহোদয়গণ যাহা লিখিয়াগিয়াছেন, সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ তৎসম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছেন। পারিভাষিক শব্দের নির্দ্ধারণ এবং স্থানীয় নাম গুলির একতাসাধন যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষায় যাঁহাদের প্রবেশ আছে, বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহাদের অনুরাগ আছে, সংক্ষেপে যাঁহারা স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি-সাধনে তৎপর রহিয়াছেন, পরিষদ তাহাদের সাহায্য পাইলে নিরতিশয় উপকৃত হইবেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ' বঙ্গভাষায় উন্নতিসাধনের উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুত অপূর্ব্ব চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র রায় প্রমুখ মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' শীর্ষে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্য সফল হউক।

"আমার পিতা সৌদাগরী কর্ম্ম করিতেন" ইত্যাদি বলিয়া যে তিন ব্যক্তির জীবনবৃত্ত বর্ণন করিয়াছেন, কি সঙ্গতিক্রমে সে স্থলে সেগুলির অবতারণা করা হইল, তাহা আমরা কিছুই বুঝিলাম না!

টেকচাঁদের ৪র্থ পুস্তক 'গীতাঙ্কুর'। ইহাতে ব্রহ্মবিষয়ক অনেকগুলি গীত আছে—নিম্নভাগে তাহার একটি উদ্ধৃত হইল—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

"বিপদ কে বলে বিপদ। বুঝিলে বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ॥
তুমি হে প্রেম-আধার, প্রেম করহ বিস্তার, চরমে হবে নিস্তার, এ জন্য বিপদ॥
কত রাগ কত দ্বেষ, অহঙ্কার অশেষ, পাপের দারুণ ক্লেশ বাড়ায় সম্পদ॥
বিপদে ঔষধ ধন, মন করি সংশোধন, করিয়া পাপনিধন, দেয় নিরাপদ।
তুমি হে মঙ্গলায়ন, এ পামরে কর ত্রাণ; বিপদে সম্পদে যেন, ভাবি ঐ পদ॥"

'যৎকিঞ্চিৎ' নামক পুস্তক ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অবিনাশিত্ব, পরলোক ও উপাসনা প্রভৃতি বিষয়ক। ইহা এবং 'অভেদী' এ দুইখানিই একপ্রকার ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক—সাহিত্য গ্রন্থ নহে, সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি কয়েকখানি আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন। ইনি চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত নৈহাটির সন্নিহিত কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১৭৬০ শকে [১৮৩৮ খৃঃ অঃ] জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহুকাল ডেপুটী কলেক্টরী কার্য্য করিয়া অনেককাল পেন্সনভোগ করিয়াছিলেন। যাদবচন্দ্রের চারি পুত্র, সকলেই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। বঙ্কিমচন্দ্র পিতার তৃতীয় পুত্র। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে বহুদিন হুগলীর মহম্মদ মহসীন কলেজে অধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় বি, এ, পাস করেন—তৎপরে বি, এল, উপাধিও প্রাপ্ত হন।

কলেজে অবস্থানকালেই ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। "এই পদে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় তিনি জলদস্যু বহুল খুলনা মহকুমায় (এখন খুলনা আর যশোহর জিলার মহকুমা নহে পরন্তু একটি স্বতন্ত্র জিলা) অকুতোভয়ে দস্যুশাসন করিয়া লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ করেন। তিনি নানাস্থানে কার্য্য করিয়া কিছুদিনের জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের সহকারী 'সেক্রেটারী' পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই বিবাহ। বিবাহের অল্পদিন পরে প্রথমাপত্নীর মৃত্যু হইলে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পুত্র সন্তান ছিল না, তিনটি কন্যামাত্র ছিলেন।*

কলেজে পঠদ্দশার সময় হইতেই বঙ্কিম বাবুর বাঙ্গালা রচনায় অনুরাগ ছিল, এজন্য মধ্যে মধ্যে পদ্য লিখিয়া প্রভাকরাদি সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেন। ঐ অবস্থায় 'ললিতা মানস' নামে একখানি ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তকও মুদ্রিত করিয়াছিলেন; সেখানি এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। এই পুস্তক প্রকাশের পর অনেকদিন পর্য্যন্ত তিনি কোন বাঙ্গালা রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। তৎপরে ১৮৬৪ খৃঃ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সময় ও গুণ উভয়েই দুর্গেশনন্দিনীই প্রথম।

দুর্গেশনন্দিনী একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। গড়মান্দারণ নামক গ্রামের কোন দুর্গে পূর্ব্বকালে বীরেন্দ্রসিংহ নামা এক জায়গীরদার আধিপত্য করিতেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হীনবংশীয়া এক কামিনীর পাণিগ্রহণ ও তাঁহার গর্ভে এক কন্যা উৎপাদন করায় নিজ পিতা কর্তৃক অবমানিত হইয়া গৃহত্যাগ করেন, এবং মোগল সম্রাট্‌দিগের রাজপুতসেনামধ্যে নিবিষ্ট থাকিয়া খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি স্বগ্রামে যে কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে উক্ত স্থানস্থ শশিশেখর নামক এক ব্রাহ্মণের উপপত্নী গর্ভজা। শশিশেখর ঐ উপপত্নী গ্রহণ জন্য

---

* বঙ্কিমচন্দ্র, 'ভারতগৌরব গ্রন্থাবলী' পৃঃ ১১।

লজ্জায় দেশত্যাগী হইয়া বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য এক দণ্ডীর নিকট বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তথায়ও এক শূদ্রার গর্ভে কন্যা উৎপাদন করায় গুরু কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া কিয়ৎকাল নিরুদ্দেশ ছিলেন। পরে পরমহংস হইয়া 'অভিরামস্বামী' এই পরিবর্ত্তিত নামে দিল্লীতে প্রকাশিত হইলে তাঁহার শূদ্রাগর্ভজা কন্যা বিমলা তথায় গিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। ঐ স্থানে অভিরাম স্বামীর কৌশলে ও রাজা মানসিংহের সহায়তায় বীরেন্দ্রসিংহ বিপাকে পড়িয়া বিমলার পাণিগ্রহণ করেন, এবং পিতৃবিয়োগের সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হয়েন। তথায় তাঁহার প্রথম পত্নীগর্ভজা মাতৃহীনা কন্যা তিলোত্তমা বিমলা কর্ত্তৃকই প্রতিপালিত হইয়া ক্রমে যৌবনদশায় পদনিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময়ে মোগল ও পাঠানদিগের যুদ্ধারম্ভ হওয়ায় রাজা মানসিংহ সসৈন্যে ঐ প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ পাঠান-পরাজয়কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঘটনাক্রমে এক রজনীতে গড়মান্দারণের সমীপস্থ প্রান্তরমধ্যগত দেবমন্দিরে ঐ বিমলা ও তিলোত্তমাকে দর্শন করেন এবং দর্শনক্ষণ হইতেই তিলোত্তমা ও রাজকুমারের পূর্ব্বরাগ সঞ্চার হয়। রাজকুমার ঐ সমরকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও অতিরাগ-বশতঃ বিমলার সহকারিতায় এক গুপ্তদ্বার দিয়া বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গমধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক তিলোত্তমার সমীপস্থ হয়েন। ঐ সময়েই পাঠানরাজ কতলুখাঁর সেনাপতি ওসমান সুযোগ পাইয়া সসৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বীরেন্দ্রসিংহ, বিমলা, জগৎ-সিংহ, তিলোত্তমা প্রভৃতি সকল পরিবারকে বন্দীভূত করেন। বন্দীভাবের পর কতলুখাঁর আজ্ঞায় বীরেন্দ্রের শিরশ্ছেদ হয়; আহত জগৎসিংহ, ওসমান ও কতলুখাঁর দুহিতা আয়েষার যত্ন ও শুশ্রূষায় আরোগ্যলাভ করেন; বিমলা পতি-হন্তা কতলুখাঁর প্রাণবধ করিয়া পলায়ন করেন; মোগলপাঠানের সন্ধি হয়, এবং তিলোত্তমার সহিত জগৎসিংহের বিবাহ হয়—দুর্গেশনন্দিনীস্থ উপাখ্যানের স্থূল-তাৎপর্য্য এই। কিন্তু এই তাৎপর্য্যমাত্রশ্রবণে দুর্গেশনন্দিনী কিরূপ পদার্থ, তাহা পাঠকেরা কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, অতএব আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা ঐ গ্রন্থখানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করুন।

অভিরামস্বামী, বীরেন্দ্রসিংহ, জগৎসিংহ, ওস্‌মান, তিলোত্তমা, আয়েষা ও বিমলা এই কয়েকজনই এই আখ্যায়িকার প্রধান পাত্র। অভিরামস্বামী বোধ হয়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয়বিনিময়স্থ রামদাসস্বামীর অগ্রজ হইবেন। ইনি যৌবনদশায় যেরূপ থাকুন, প্রৌঢ়াবস্থায় বিলক্ষণ বিজ্ঞ বিচক্ষণ হইয়াছিলেন। ইঁহারই পরামর্শে মোগল পাঠানের যুদ্ধ সময়ে মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিতে বীরেন্দ্রসিংহের প্রবৃত্তি হয়। এই পরামর্শদানের পর ইঁহার আর বড় সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নাই—বীরেন্দ্রের বধকালে একবারমাত্র দেখা দিয়াছিলেন। তৎপরে ইনি কতলুখাঁর বধের জন্য বিমলার নিকট ছুরিকা প্রেরণ করেন, এবং তিলোত্তমার পীড়ার সময়ে রাজপুত্রকে আনাইয়া তাঁহার মন আর্দ্র করেন এবং তিলোত্তমার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। বিমলাকে বীরেন্দ্রসিংহে অর্পিত করিবার সময়ে ইঁহার যেরূপ বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছিল, অপর কোন স্থলে সেরূপ হয় নাই—অতএব আমাদের বিবেচনায় বুদ্ধিকৌশলে ইনি পূর্ব্বোল্লিত রামদাস স্বামীর তুল্য লোক নহেন।

বীরেন্দ্রসিংহ উদ্ধতস্বভাব মহাবীর। এ গ্রন্থে তাঁহার অধিক কার্য্য বর্ণিত নাই। কতলুখাঁর সভায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞার সময়ে তাঁহার সাহস, তেজস্বিতা, মৃত্যুভয়শূন্যতা, দৃপ্ততা প্রভৃতি যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ক্ষত্রিয়বীরের একান্ত অনুরূপ।—গ্রন্থের নায়ক জগৎসিংহ নবীনবয়স্ক, বুদ্ধিমান, তেজস্বী, ধার্ম্মিক, সাহসিক ও প্রেমিক লোক। তিনি আখ্যায়িকামধ্যে আদ্যোপান্ত উপস্থিত থাকিয়া কত কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই, সুতরাং সে সমুদয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উল্লেখ করা বাহুল্য। তবে একথা বলিতে পারি যে, জগৎসিংহের ক্ষত্রিয়োচিত আচার, বীরোচিত সাহস, প্রেমিকোচিত অনুরাগ, ধার্ম্মিকোচিত কার্য্যকলাপ, মহাকুলসম্ভূতোচিত তেজস্বিতা প্রভৃতির কোথাও কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় নাই। তিনি কারাগার মধ্যে উপস্থিতা তদ্গতজীবিতা তিলোত্তমাকেও যে, অননুরাগসূচক বাক্যে ব্যথিত করিয়াছিলেন, তাহাও অনুচিত হয় নাই। কারণ তিনি তৎপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, তিলোত্তমা কতলুখাঁর উপপত্নী হইয়াছেন। এ কথা

শ্রবণের পর তিলোত্তমার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বভাব থাকা সম্ভব নহে।—আয়েষা পরম সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, অসাধারণ গুণশালিনী, যুবতী রাজকন্যা। তিনি বিপৎ সময়ে রাজপুত্রের যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা না করিলে হয়ত তাঁহার আরোগ্যলাভই দুর্ঘট হইত; কিন্তু সেই আয়েষাও মুক্তকণ্ঠে অনুরাগ প্রকাশ করিলেও রাজপুত্রের মনে তাঁহার প্রতি এক নিমেষের জন্যও অন্যভাব জন্মে নাই; ইহা নায়কের পক্ষে সাধারণ গুণ নহে। ফলতঃ তিনি না বুঝিয়া তিলোত্তমার প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুন না কেন, তাঁহার প্রতি তিলোত্তমার সেই প্রগাঢ় অনুরাগ কোনমতে অপাত্রে ন্যস্ত হয় নাই।

গ্রন্থকার কতলুখাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও সেনাপতি ওস্‌মানকে কেবল মুখে 'পাঠান-কুলতিলক' বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে—সত্য সত্যই তাঁহাকে পাঠান-কুলতিলক করিয়া তুলিয়াছেন! গড়মান্দারণের দুর্গে প্রবেশ করিয়া একাকিনী বিমলার সহিত তাঁহার কথোপকথন, বন্দীভূত আহত রাজপুত্রের প্রতি তাদৃশ সদয় ব্যবহার, আপনার মনোরথপ্রিয়া আয়েষা করতলগত শত্রুর প্রতি অনুরক্তা হইয়াছে, বুঝিয়াও স্থিরভাবে তাহা সহ্য করা, সামর্থ্য সত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি অন্যরূপ অনিষ্টাচরণ না করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহাকে আহ্বান করা, পরাজয় হইলেও প্রাণরক্ষার্থ ক্ষমা প্রার্থনা না করা প্রভৃতি ওস্‌মানের কৃত কার্য্যগুলির যে কোনটির দিকে অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাহাতেই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হয়। পাঠানদিগের চরিত্র সচরাচর যেরূপ বর্ণিত হয়, তাহাতে ওস্‌মানের ঐ 'সমগ্র' উদার কার্য্য না দেখিয়া 'কতক' দেখিলেও তাঁহাকে পাঠান-কুলতিলক বলা যাইতে পারিত।

গ্রন্থনায়িকা দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমা সুন্দরী, ধীরা, নবীনা, অনুরাগিণী নায়িকা। তিনি শৈলেশ্বর শিবমন্দিরে জগৎসিংহকে দেখিয়াই মুগ্ধ হয়েন, বাটীতে আসিয়া নির্জ্জনে অন্যমনস্ক হইয়া খাটের গায়ে কালী দিয়া 'অ' 'ই' হিজিবিজি ও 'কুমার জগৎসিংহ' ইত্যাদি লেখেন এবং আর আর কত কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে কারাগারে জগৎসিংহের নিকট উপস্থিত হয়েন। ঐ স্থানে তিলোত্তমার অবস্থা অতি মনোহররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ নবীনা রাজকন্যা

সুযোগ পাইয়া দুর্গ হইতে বাহির হইয়াছিলেন, যেখানে যাইবার কথা ছিল তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন, কিছুই মনে নাই, কেবল 'জগৎসিংহ' এই নাম মুখ হইতে নির্গত হওয়ায় সহচর তাঁহাকে পুনর্ব্বার দুর্গমধ্যে আনিয়া কারাগারে জগৎসিংহের গৃহদ্বারে উপস্থাপিত করিল। গৃহপ্রবেশে তিলোত্তমার পা সরে না, কথঞ্চিৎ প্রবেশ করিলেন, প্রাচীর ধরিয়া অধোবদনে দাঁড়াইলেন, জগৎসিংহ চিনিয়া 'বীরেন্দ্রসিংহকন্যা! এখানে কি অভিপ্রায়ে?' এই নিরনুরাগ শুষ্ক সম্ভাষণ করিলেন। শুনিয়া তিলোত্তমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল ও মূর্চ্ছা হইল। আয়েষা আসিয়া তাঁহার মূর্চ্ছাপনয়ন করিলেন এবং তাঁহারই অনুমতিতে দাসীর স্কন্ধে ভর দিয়া তিলোত্তমা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।—এই প্রকরণের বিবরণটি যে, কিরূপ স্বভাবসঙ্গত ও কিরূপ মধুর হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না—পাঠ মাত্র সমুদয় ব্যাপার যেন চিত্তপটে চিত্রিত হইয়া উঠে।

তিলোত্তমার বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত ৩টি স্থলে আমাদের কিঞ্চিৎ বিবাদ আছে। ১মতঃ—তিলোত্তমা ও বিমলা সায়ংকালে শৈলেশ্বর পূজা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যাসময়ে শিবপূজা করিতে যাওয়া আমাদের দেশে রীতি নাই; আর তাহা থাকিলেও বাহকেরা যে, ঝড়বৃষ্টি জন্য সেই প্রান্তরমধ্যে দুইটি স্ত্রীলোককে ফেলিয়া পলাইল, অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হইল না! ইহা কিছু অসঙ্গত বোধ হয়। ২য়তঃ—শিবমন্দিরে জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার দর্শনমাত্র পরস্পরের মনে অনুরাগ সঞ্চার হয়। সংস্কৃত কবিরা সর্ব্বদাই প্রায় এইরূপ অনুরাগের বর্ণন করিয়া থাকেন। সংস্কৃতকাব্য বঙ্কিমবাবুর আখ্যায়িকার আদর্শ নহে—তাঁহার আদর্শ ইংরেজি কাব্য। কিন্তু ইংরেজি আখ্যায়িকানুরাগীরা আমাদিগের পুণ্ডরীকমহাশ্বেতাদির ন্যায় রূপদর্শনমাত্র সঞ্চারিত অনুরাগে 'পাশব অনুরাগ' (animal love) বলিয়া দোষ দিয়া থাকেন, সুতরাং বঙ্কিমবাবুর ন্যায় ইংরেজিবিৎ লোকের গ্রন্থে সে দোষ সঙ্ঘটন হওয়া উচিত হয় নাই। ৩য়তঃ—এই পুস্তকের নায়ক নায়িকা সাহেব বিবি নহেন—হিন্দু। হিন্দুদিগের সমানবর্ণ ব্যতিরেকে অসমানবর্ণে বিবাহ হওয়া তখন রীতি ছিল না। সুতরাং

জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার পরস্পর সমান বর্ণত্ব জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে অনুরাগ সঞ্চার হওয়া এবং তিলোত্তমার প্রকৃত পরিচয় পাইবার অগ্রেও তাঁহার জন্য জগৎসিংহের সেই সেই রূপ মনোভাব প্রকাশ করা আমাদের বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। কালিদাস এরূপস্থলে কিপ্রকার সাবধান হইয়াছেন, পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন।—

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহার মনে বিতর্ক উঠিল, পাছে এ ব্রাহ্মণকন্যা হয়! ক্ষণেক পরে মনে মনেই সে তর্কের মীমাংসা হইল এবং স্থির করিলেন—

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্যমস্যা মভিলাষি মে মনঃ।
সতাংহি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণ মন্তঃকরণ প্রবৃত্তয়ঃ॥

এইরূপ চিন্তার পর কিছুক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন বটে; কিন্তু মনের সম্যক্ প্রীতি হইল না। পরে যখন শকুন্তলাকে ক্ষত্রিয়কন্যা বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া কহিলেন—

ভব হৃদয় সাভিলাষং সম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়ো জাতঃ।
আশঙ্কসে যদগ্নিং তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্॥

আয়েষা যথার্থই দেবকন্যারূপিণী। ইঁহার রূপ, গুণ, বুদ্ধি, বিবেচনা, উদারতা, ধৈর্য্য সকলই অলৌকিক। ইনি জগৎসিংহের পীড়িতাবস্থায় অক্লান্ত-ভাবে যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছিলেন—ওস্মান ইঁহার পাণিগ্রহণাভিলাষের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন—জগৎসিংহের প্রতি পত্নী-ভাবে গাঢ়ানুরক্তা হইয়াও যেরূপে মনোভাব গোপনে রাখিয়াছিলেন—কারাগারে ওস্মানের কথায় অসহিষ্ণু হইয়া যেরূপ দৃপ্তভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন—রাজপুত্র বিদায় লইবার সময়ে সাক্ষাৎ-করণ-প্রার্থী হইলে যে কারণে দর্শন দিতে অসম্মতা হইয়াছিলেন—তাঁহাকে যেরূপে পত্র লিখিয়াছিলেন—এবং তিলোত্তমার সহিত তাঁহার বিবাহ সময়ে অলঙ্কারাদি প্রদানপূর্ব্বক যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন—সে সমুদয় নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে মনোমধ্যে বিস্ময়,

করুণা, ভক্তি, ও আনন্দরসের প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়া উঠে। অঙ্গুরীয়বিনিময়ের রোসিনারাও ইহার ভগিনী বটে, কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা ইহার সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্য অনেক গুণে অধিক।

এক্ষণে বিমলা—বিমলা যে, অভিরামস্বামীর কন্যা ও বীরেন্দ্রের ধর্ম্মপত্নী তাহা বীরেন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে সকলে জানিত না—প্রধান পরিচারিকাই বোধ করিত। বিমলা আখ্যায়িকার আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্রই ভ্রমমাণা। তিনিই প্রথমে দেবমন্দিরে জগৎসিংহের সহিত কথা কহেন; তিনি মনোহরবেশে সুসজ্জিত হইয়া আস্‌মানীর দ্বারা বিদ্যাদিগ্‌গজের দুরবস্থা করিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক রজনীতে সেই দেবমন্দিরে যাইয়া জগৎসিংহের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করেন; তিনিই জগৎসিংহকে গুপ্তদ্বার দিয়া তিলোত্তমার নিকট উপস্থিত করিয়া দেন; তাঁহারই অসাবধানতায় পাঠানদিগের কর্ত্তৃক দুর্গ অধিকৃত হয়; তাঁহারই পত্রে আখ্যায়িকাস্থ পাত্রগণের পরিচয় বিষয়ক সমুদয় অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং তিনিই সুরা ও নৃত্যগীত দ্বারা কতলুখাঁর মন মোহিত করিয়া আলিঙ্গন-সময়ে ছুরিকাদ্বারা তাঁহার প্রাণবধ করিয়া পতিবধ-প্রতিহিংসার সাধন করেন। বিমলাকে তাদৃশ রূপবতী বলিয়া বোধ না হউক, কিন্তু তাঁহার ন্যায় রসিকা, প্রমোদমানা, বিবেকবতী ও প্রত্যুৎপন্নমতি কামিনী অতি দুর্লভ। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই তিনি প্রচুর পরিমাণে আপন গুণের পরিচয় দিয়াছেন; সে সমুদয়ের বিস্তৃতরূপে উল্লেখ করা বাহুল্য, সুতরাং আমরা পাঠকগণকে অন্ততঃ দুইটি স্থান অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি—যখন পাঠান সেনাপতি বিমলাকে ওড়না দ্বারা ছাদের আলিসার সহিত বাঁধিয়া রহিমখাঁর জিম্মায় দিয়া যান, তখন রহিমখাঁকে "সেখজী! তুমি বড় ঘামিতেছ, একবার আমার বন্ধন খুলিয়া দেও যদি, তবে আমি তোমাকে বাতাস করি; পরে আবার বাঁধিয়া দিও" ইত্যাদি সরস কথায় ভুলাইয়া মুক্তিলাভ করা—সেই এক স্থান—এবং যখন কতলুখাঁর জন্মতিথি-রজনীতে মনোহরবেশধারিণী বিমলা কৌশলে তাঁহার বক্ষে ছুরিকা নিখাত করিয়া—"পিশাচী নই সয়তানী নই—বীরেন্দ্র-সিংহের বিধবা স্ত্রী" এই বলিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করেন—সেই এক স্থান।

অধিক কি, বিমলার চরিত্র গ্রন্থকার আদ্যোপান্তই এরূপ মনোহর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, উঁহাকেই সময়ে সময়ে গ্রন্থের নায়িকা বলিতে আমাদের ইচ্ছা হয়। ফলতঃ জগৎসিংহের সহিত রজনীতে সাক্ষাৎ করিবার জন্য মন্দিরে যাইবার পূর্ব্বে প্রকৃত অভিসারিকার ন্যায় তাদৃশ বেশভূষা করা এবং আস্‌মানীর দ্বারা রোকা বামণ বিদ্যাদিগ্‌গজকে উচ্ছিষ্টান্ন প্রভৃতি খাওয়াইয়া তাহার তত‌দূর দুরবস্থা করা এই দুইটি ভিন্ন বিমলার সমুদয় কার্য্যগুলিই আমাদের পরমপ্রীতিপ্রদ হইয়াছে।

দুর্গেশনন্দিনীর অন্তর্গত কয়েকটি পাত্রের চরিত্র যেরূপে সমালোচিত হইল, বোধ হয়, তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, এই আখ্যায়িকাখানি একটি মনোরম পদার্থ হইয়াছে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছি। ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে উত্তরোত্তর সমধিক পরিমাণেই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। উপাখ্যানগ্রন্থের ইহা একটি প্রধান গুণ। ইংরেজির নানাবিধ নবেল পুস্তক পাঠ করিয়া বঙ্কিমবাবু আপন পাত্রগণের অলঙ্কার সংগ্রহ করেন, এই কথা বলিয়া কেহ কেহ দোষারোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা রায় দীনবন্ধু মিত্রের নবীনতপস্বিনীর সমালোচনায় ব্যক্ত করিয়াছি যে, সেরূপ করা আমাদের বিবেচনায় গুণ বৈ দোষ নহে। এস্থলে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, দুর্গেশনন্দিনীস্থ কোন কোন পাত্রের অনেক অস্থি মাংস প্রসিদ্ধ সার্‌ওয়ালটর স্কটের 'আইবান হো' নামক ইংরেজি নবেল হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে; কিন্তু আমরা বিশ্বাস্য ব্যক্তি বিশেষের মুখে শুনিয়াছি, বাস্তবিক তাহা নহে। দুর্গেশনন্দিনী—রচনার পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবু 'আইবান হো' পাঠই করেন নাই।

এই গ্রন্থের ভাষা চলিত বটে, কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত আলালীও সম্পূর্ণ নহে—তদপেক্ষা উন্নত ও মধুর। ইহার রচনায় যে একটি নূতনবিধ ভঙ্গী আছে, ইহার পূর্ব্বকালীন কোন বাঙ্গালা পুস্তকে সে ভঙ্গীটি দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সেটি ইংরেজির অনুকরণ হইলেও বিলক্ষণ মধুর। কিন্তু এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, গ্রন্থকার স্বয়ং, বর্ণিত পাত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে

যে; অত অধিক বাক্ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা আমাদের মিষ্ট লাগে না—বরং তদ্দ্বারা স্থানে স্থানে রসভঙ্গ হইয়াছে বোধ হয়। আমাদিগের মতে, তুমি গ্রন্থকার!—

> "রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ।
> রামস্য সহ সৌমিত্রে রাক্ষসানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
> বৈদেহ্যাশ্চৈব যদ্বৃত্তং প্রকাশং যদিবা রহঃ।
> তচ্চাপ্যবিদিতং সর্ব্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি॥"

ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক দত্তবর বাল্মীকির ন্যায় কোন দৈবশক্তিবলে তোমার পাত্রগণের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সমুদয় ভাব অবগত হইতে পারিয়াছ—সুতরাং তুমি সেইগুলি অবিকল মুখে ব্যক্ত করিবে মাত্র—তুমি তাহাদের সহিত কথা কহিতে যাইবে কেন?—তাহারা কোন্‌কালের লোক—তুমি কোন্‌কালের লোক! যাত্রাস্থলে প্রহ্লাদের বধার্থ উদ্যতখড়্গ দ্বারীকে যদি পুলিসের সার্জ্জন গ্রেফ্‌তার করিতে যায়, তবে কেমন দেখায়?

আমরা প্রথম সংস্করণে দুর্গেশনন্দিনীর ভাষাগত কতিপয় দোষের প্রদর্শন করিয়াছিলাম এবং আশা করিয়াছিলাম যে, পুনঃসংস্করণে সেগুলি সংশোধিত হইবে। কিন্তু সপ্তম সংস্করণেরও পুস্তক দেখিলাম, সে সকল দোষ তদবস্থই রহিয়াছে! বঙ্কিমবাবুর পুস্তকগুলি বাঙ্গালা-সাহিত্য-সাগরের উজ্জ্বল রত্ন—সে সকল রত্নকে ওরূপ কীটাণুবিদ্ধ দেখিলে আমাদের ক্লেশ বোধ হয়। আমরা এবারে সে সকল দোষের আর পুনরুল্লেখ করিলাম না।

কপালকুণ্ডলা (২য় সংস্করণ)—২৫০ বৎসর গত হইল গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমনকারী নবকুমার নামক এক ব্রাহ্মণযুবক ঘটনাক্রমে একাকী হিজলীর সমুদ্রকূলে পরিত্যক্ত হইয়া এক কাপালিকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাপালিক আপন যোগসিদ্ধির বাসনায় তাঁহাকে বলি দিবার উদ্যোগ করিলে—কাপালিকেরই প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলা নাম্নী এক পরম রূপবতী রমণী তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। নবকুমার অনূঢ়া সেই প্রাণদাত্রীকে বিবাহ করিয়া সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক নিজ বাসস্থান সপ্তগ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথি-

মধ্যে মতিবিবি নামে এক যুবতী যবনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। মতিবিবি বাস্তবিক ব্রাহ্মণ কন্যা এবং নবকুমারেরই পূর্ব্বপরিণীতা পত্নী। মুসলমানদিগের উৎপীড়নে উঁহার পিতা সপরিবারে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ও জাতিভ্রষ্ট হইয়া আগরায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তথায় রূপলাবণ্যসম্পন্না মতিবিবি বাদসাহপুত্র প্রভৃতি আগ্রার অনেক আমীর ওম্রার সহিত দূষিতচরিতা হইয়া বিস্তর ধন ও গৌরব লাভ করে। এই সময়ে সে নিজের কোন দুরভিসন্ধিসাধনার্থ উড়িষ্যা গিয়াছিল —তথা হইতে প্রত্যাগমন সময়ে পথিমধ্যে নবকুমারের সাক্ষাৎ ও পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি গাঢ়ানুরাগা হইয়া পড়ে; কিন্তু তৎকালে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করে। নবকুমারও সপ্তগ্রামে আসিয়া পত্নীসহবাসে কিছুকাল যাপন করিলেন। মতিবিবির ইচ্ছা ছিল, জাহাঙ্গীর বাদসাহ হইলে সে তাঁহার প্রধান মহিষী হইবে; সে অভিলাষ সিদ্ধ না হওয়ায় আপন পূর্ব্ব স্বামীর সহবাসে কালযাপন করিবার অভিলাষে সপ্তগ্রামে আসিল, এবং রূপ গুণ ধন রত্ন প্রভৃতি দ্বারা নবকুমারের মন ভুলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যখন কোন-রূপে কৃতকার্য্য হইল না, তখন কপালকুণ্ডলার অনিষ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। ঐ সময়ে হিজলীর কাপালিকও সন্ধান করিয়া কপালকুণ্ডলার অমঙ্গলসাধনার্থ ঐ স্থানে আসিয়াছিল। মতিবিবি বা পদ্মাবতী তাহার সহিত মিলিল। পদ্মাবতীর মানস সফল হইল—তাহার কৌশলে কপালকুণ্ডলাকে দুশ্চরিত্রা বলিয়া নব-কুমারের প্রতীতি জন্মিল; কাপালিক সুরাপান দ্বারা নবকুমারের বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া তাঁহাদের উভয়কেই গঙ্গাতীরস্থ শ্মশানে লইয়া গেল; তথায় সহসা গঙ্গার তট ভগ্ন হওয়ায় কপালকুণ্ডলা জলমগ্না হইয়া অদৃশ্যা হইলেন—এই স্থূল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই আখ্যায়িকা বিরচিত। ইহা যদিও দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় ইতিহাসমূলক নহে, তথাপি স্থানে স্থানে অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

মৃণালিনীর স্থূল বিবরণ এই যে, মগধরাজের পুত্র হেমচন্দ্র মৃণালিনী নাম্নী মথুরার এক বৌদ্ধকন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া গোপনে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া বণিক্‌বেশে কিয়ংকাল তথায় অবস্থান করেন, এই সময়ে বখ্‌তিয়ার

খিলিজী মগধরাজ্য জয় করিয়া লয়েন। হেমচন্দ্রের গুরু মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রের দ্বারাই অপহৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধারের বাসনা করিয়া তাঁহাকে মৃণালিনীর সহিত বিযুক্ত রাখিবার অভিলাষে কৌশলপূর্ব্বক মৃণালিনীকে গৌড়নগরস্থ আপন শিষ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন এবং বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া যবনজয় করিবার উদ্দেশে হেমচন্দ্রকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। হেমচন্দ্র প্রথমে গৌড়নগরে আসিয়া এক ভিখারিণীর দ্বারা মৃণালিনীর সন্ধান করেন, কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইবার পূর্ব্বেই মাধবাচার্য্য তথায় উপস্থিত হইয়া হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপে লইয়া আইসেন। মৃণালিনীও মাধবাচার্য্য-শিষ্যভবনে অপ্রকৃত কারণে অপমানিতা হইয়া উক্ত ভিখারিণীর সহিত নবদ্বীপে আসিয়াই অবস্থান করেন। ঐ সময়ে বখ্‌তিয়ার খিলিজী, নবদ্বীপাধিপতি লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকরণিক পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতায় অক্লেশে নবদ্বীপ জয় করিলেন—হেমচন্দ্র প্রতিবন্ধকতা করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন না, কিন্তু ঐ স্থানেই অনেক বিঘ্ন বিপত্তির পর মৃণালিনীর সহিত তাঁহার সমাগম হইল। অনন্তর তাঁহারা গৃহদাহদগ্ধ পতির অনুমরণ সময়ে পশুপতি-পত্নী মনোরমা কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিপুল অর্থরাশি গ্রহণ করিয়া সমুদ্রকূলে গমনপূর্ব্বক এক নূতনপুরী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচনায় আমরা কিঞ্চিৎ অধিক স্থান প্রদান করিয়াছি—উপস্থিত আখ্যায়িকাদ্বয়ে তত অধিক স্থান দিতে পারিব না। অতএব সংক্ষেপে বলিতেছি যে, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী দুইখানিই এতজ্জাতীয় পুস্তকের মধ্যে উৎকৃষ্ট পুস্তক হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বঙ্কিমবাবু ইংরেজিতে বিলক্ষণ কৃতবিদ্য লোক; তিনি ইউরোপীয় প্রধান প্রধান কবিদিগের রচিত অনেক আখ্যায়িকা পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছেন, সুতরাং কি প্রণালীতে বর্ণনীয় পাত্রগণের কার্য্যকলাপ নিবদ্ধ হইলে ইউরোপীয় রুচি-সম্পন্ন পাঠকদিগের কৌতূহলোদ্দীপক হইবে, তাহা উত্তম জানেন এবং গ্রন্থের সর্ব্বস্থানেই আপনার সেই জ্ঞানের প্রচুর উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি নবকুমার, কাপালিক, কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবির এবং হেমচন্দ্র, মৃণালিনী, গিরিজায়া, মাধবাচার্য্য,

পশুপতি, মনোরমা প্রভৃতির চরিতগুলি অনেকস্থলেই স্বভাবসঙ্গত ও মনোহর-রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। পাঠের সময় প্রায় সকলগুলিই চিত্তক্ষেত্রে সজীব-ভাবে যেন বিচরণ করিতে থাকে; ইহা রচয়িতার সামান্য নৈপুণ্য নহে। এই দুই পুস্তকেই কতকগুলি গীত ও কবিতা নিবেশিত আছে, তাহার কয়েকটী অতি মনোরম হইয়াছে, বিস্তৃতি-ভয়ে আমরা তাহার কিছু উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

কপালকুণ্ডলার মতিবিবি—লুৎফউন্নিসা—বা পদ্মাবতীকে গ্রন্থকার মুখে যেরূপ রূপবতী বলিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনা পাঠ করিয়া আমরা উহার সে প্রকার রূপ দেখিতে পাইলাম না—আমাদের চক্ষুতে মতিবিবি 'বাটামুখী' এক 'ধুমোধামা' নাগ্নী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, তাহার বুদ্ধিকৌশল, অধ্যবসায়, নবকুমারের প্রতি সেই প্রখর অনুরাগ, তাঁহাকে পাইবার জন্য সেই দুশ্চেষ্টা, তন্মধ্যেও মনের কিঞ্চিৎ উদারতা প্রভৃতি যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ঐজাতীয় স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই সঙ্গত হইতে পারে। অদৃষ্টদোষে সংসারসুখে বঞ্চিতা এক হতভাগিনীর চরিত্র বর্ণন করিবার অভিলাষেই বোধ হয়, কবি কপালকুণ্ডলার সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। যদি সে অভিপ্রায় থাকে, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থের নায়ক বা নায়িকার গুণ এরূপ হওয়া উচিত, যাহা অন্যের স্পৃহণীয় হইতে পারে। কপাল-কুণ্ডলার রূপ ও অন্যান্য অনেক রমণীয় গুণ ছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার তাদৃশী উদাসীন-প্রকৃতিকতা কি কোন সংসারীর বাঞ্ছনীয় হইতে পারে? কপাল-কুণ্ডলার ন্যায় কামিনীকে কোন পাঠক আপন গৃহিণী করিতে চাহেন কি?—আমরা ত কখনই না! স্ত্রীর যদি অলৌকিক রূপ থাকে—অন্যান্য বিষয়ে অসাধারণ গুণ থাকে, আর তোমার প্রতি তাহার কিছুমাত্র অনুরাগ না থাকে—সংসারের সকল কার্য্যেই তাহার ঔদাসীন্য হয়, তবে সে স্ত্রীকে লইয়া তোমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে?—কপালকুণ্ডলার সাংসারিক কোন বিষয়ে আস্থা ছিল না—স্ত্রীজাতির সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় গুণ যে পতিগতপ্রাণতা, তাহা তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না—সুতরাং সে স্ত্রীর অপগমে নবকুমারের কোন ক্ষতি হইয়াছে,

তাহা আমাদের বোধ হয় না। আর এক কথা এই, কপালকুণ্ডলা অশুভান্ত আখ্যায়িকা; ইহার উপসংহারে নায়িকার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং তদর্থ পাঠক-দিগের শোক উপস্থিত হইবে। যাহাকে শোচনীয় করিতে হইলে, তাহার পূর্ব্বাবস্থা ভাল ছিল, অগ্রে সেরূপ বর্ণনা করিয়া রাখা আবশ্যক। সুখোচিত ব্যক্তির দুঃখ দর্শনে মন যেরূপ আর্দ্র হয়, সামান্যাবস্থা লোকের দুরবস্থায় কখন সেরূপ হয় না। রাম যুধিষ্ঠিরাদি রাজপুত্র ও সুখাভ্যস্ত ছিলেন, এইজন্য তাঁহারা বনগমন করিয়া ফলমূলাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন শুনিয়া আমরা কান্দিয়া অস্থির হই, কিন্তু সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি কত অসভ্য জাতীয়েরা যে যাবজ্জীবন বনে বনে ফিরিতেছে ও ফলমূলাদি দ্বারা উদরপূরণ করিতেছে, তাহা দেখিয়া শুনিয়াও কিছুমাত্র ক্লেশবোধ করি না! এ আখ্যায়িকার নায়িকা কপাল-কুণ্ডলার পূর্ব্বাবস্থা কিরূপ ছিল, গ্রন্থকার তাহা কোনস্থলে বর্ণন করেন নাই; এমন কি তিনি কাহার কন্যা? কোন দেশে বাস করিতেন? কিরূপে খৃষ্টান-দিগের হস্তগত হইয়াছিলেন ইত্যাদি পরিচয়ও কোথাও দেওয়া হয় নাই, সুতরাং তাঁহার অমঙ্গলে পাঠকদিগের উচিতমত সমবেদনার আবির্ভাব হওয়া সম্ভব নহে।

মৃণালিনীর চরিত্র সেরূপ হয় নাই। তিনি ধনী লোকের কন্যা ও আদরের ধন ছিলেন, এ জন্য তাঁহার সহিত পাঠকদিগের বরাবর সমদুঃখতা রহিয়া গিয়াছে। হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের বাটী হইতে তাঁহার বিবাসন এবং নবদ্বীপস্থ সরোবরকূলে হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক তাঁহার অবমাননা, এ দুই স্থল পাঠ করিবার সময়ে বোধ হয়, অনেককেই সাশ্রুনেত্র হইতে হয়। এই উপাখ্যানস্থ ভিখারিণী গিরিজায়া যেন একটি আহ্লাদে পুতুল; বাচালতা কিঞ্চিৎ কম হইলে গিরিজায়া আরও মনোহারিণী হইত। মনোরমাকে গ্রন্থকার একটি অদ্ভুত পদার্থ করিয়া তুলিয়া-ছেন। উহার বিবরণ পাঠ করিতে মনে একপ্রকার আমোদ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এক স্ত্রীরই বহুরূপার ন্যায় একক্ষণে 'সরল বালিকা ভাবের' ও পরক্ষণেই 'গম্ভীরপ্রকৃতি প্রৌঢ়যুবতীভাবের' প্রাপ্তি হওয়া কতদূর স্বভাবসঙ্গত, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

আমরা এবিষয়ে আর প্রস্তাব বাহুল্য না করিয়া একটি বিষয়ের উল্লেখমাত্র করিয়া নিরস্ত হইব। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে" ইত্যাদি—সুতরাং তাঁহার মতে পদ্মের মৃণালে কণ্টক আছে; কিন্তু সেটী ভ্রম—এ ভ্রম কেবল যে তাঁহারই হইয়াছে, তাহা নহে; অনেক বাঙ্গালা কবিরই রচনায় এই ভ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। ৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের পাঁচালীতে আছে—"পদ্মের মৃণালে কাঁটা, ঠাকুরে পিরালী খোঁটা" ইত্যাদি—মাইকেল মেঘনাদবধে (২য় সর্গে) লিখিয়াছেন, "কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী" ইত্যাদি—সুতরাং এই ভ্রমকে একপ্রকার 'সাধারণ ভ্রম' বলিতে হইবে। কি জন্য বহুলোকের এরূপ ভ্রম হইল, তাহার কারণান্বেষণে আমাদের এই বোধ হয় যে, পদ্মিনীর কোন পদার্থটিকে মৃণাল বলে, তাহা সকলের জানা নাই—অনেকের বোধ আছে যে, পুষ্পদণ্ডটিরই নাম মৃণাল। ঐ দণ্ড ঈষৎ হরিতবর্ণ এবং তাহাতে কণ্টক আছে সত্য, কিন্তু সেটি মৃণাল নহে; অমরসিংহ তাহাকে নালা ও নাল শব্দে অভিহিত করিয়াছেন—স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইলে তাহাকে 'পদ্মনাল' বলা যায়। কোন কোন আভিধানিকের মতে মৃণালশব্দে পদ্মনালও বুঝায় সত্য বটে—কিন্তু সংস্কৃত কবিরা মৃণাল শব্দের ঐ অর্থে কখন প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহাদের মৃণাল চন্দ্রের ন্যায় ধবলবর্ণ ও অপূর্ব্ব কোমল পদার্থ। তাঁহারা বিরহসন্তপ্তা নবীনা কামিনীদিগকে তাপোপশমের নিমিত্ত মৃণাল-বলয় ও মৃণাল-হার পরাইয়া থাকেন। রত্নাবলী, শকুন্তলা, নৈষধ, কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে, অতএব সে সকল উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই *। মৃণাল কণ্টকময় হইলে তাহার হার বলয়াদি রচনা করিয়া কবিরা অন্তর্জ্বালায় ব্যথিত অবলাদিগকে আবার কণ্টকক্ষত জন্য শারীরিক জালা দিতে যাইতেন না। ফলকথা পদ্মের নাল মৃণাল নহে—মূল

---

* তথাপি দুইটি লিখি—

পরিচ্যুত স্তৎকুচকুম্ভমধ্যাৎ কিংশোষ মায়াসি মৃণালহার।
ন সূক্ষ্মতন্তোরপি তাবকস্য তত্রাবকাশো ভবতঃ কথং স্যাৎ॥ রত্নাবলী॥

অয়ং স তে শ্যামলতামনোহরং বিশেষশোভার্থ মিবোজ্‌ঝিতাম্বরঃ।
মৃণালরূপেণ নবো নিশাকরঃ করং সমেত্যোভয়কোটি মাশ্রিতঃ॥ শকুন্তলা॥

হইতে তালআঁঠির কলের মত যে মোটা শিকড় মাটীর ভিতর প্রবেশ করে, তাহাকেই মৃণাল কহে ; উহাতে কণ্টক থাকে না—উহা যেমন শুভ্র তেমনি কোমল। সচরাচর উহাকে মোলাম (বোধ হয় মৃণাল শব্দেরই অপভ্রংশ) বলে। মোলাম খাওয়া যায়, এজন্য বাজারেও কখন কখন বিক্রীত হয়।

আমরা এই প্রসঙ্গে আর একটি সাধারণ ভ্রমের কথা উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।—অনেকের বোধ আছে যে, কুমুদিনীশব্দের অর্থ কুমুদপুষ্প এবং পদ্মিনী, কমলিনী প্রভৃতি শব্দের অর্থ পদ্মপুষ্প। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে—কুমুদিনী শব্দে পত্রপুষ্পদণ্ড প্রভৃতি সমেত কুমুদ-লতা (কুমুদের ঝাড়) এবং পদ্মিনী, কমলিনী, নলিনী, সরোজিনী প্রভৃতি শব্দে ঐরূপ সমুদয়-সমেত পদ্মলতাকে * বুঝায়। আমরা উক্তরূপ দুইপ্রকার ভ্রমেরই নিরাসার্থ প্রমাণস্বরূপ অমরকোষ হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

কুমুদিনীর নাম।

"অথ কুমুদ্বতী। কুমুদিন্যাং"+

পদ্মিনীর নাম।

+"নলিন্যান্তু বিসিনী পদ্মিনীমুখাঃ"+

পদ্মের নাম।

+"বা পুংসি পদ্মং নলিনং"

রক্তোৎপলং কোকনদং +

পদ্মনালের নাম।

+"নালা—নালম্"+

মৃণালের নাম।

+"অথাস্ত্রিয়াং। মৃণালং বিসম্" ইত্যাদি

দুর্গেশনন্দিনীর ভাষাগত যেরূপ গুণদোষ আছে, এ দুই পুস্তকের ভাষাতেও সেই সেইরূপ গুণদোষ লক্ষিত হইয়া থাকে।

---

* মূলনালদলোৎফুল্ল ফলৈঃ সমুদিতা পুনঃ।
পদ্মিনী প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈ র্বিসিন্যাদিশ্চ সা স্মৃতা॥ (রাজনির্ঘণ্ট)

শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী তৎপ্রণীত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক গ্রন্থের ২য় সংস্করণ, ২৮৩-২৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত গ্রন্থসকলে এক নূতন বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার পদ্ধতি অবলম্বন করেন। তাহা একদিকে বিদ্যাসাগরী বা অক্ষয়ী ভাষা, অপরদিকে আলালী ভাষার মধ্যগা। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আমার পূজ্যপাদ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'সোম প্রকাশে' বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার অনুকরণকারিদিগের নাম 'শব পোড়া মড়াদাহের দল' রাখিলেন। অভিপ্রায় এই, যাহারা 'শব' বলে তাহারা 'দাহ' বলে, যাহারা 'মড়া' বলে, তাহারা তৎসঙ্গে 'পোড়া' বলে, কেহই 'শব পোড়া' বা 'মড়াদাহ' বলেন না। তাঁহার মতে বঙ্কিমী দল ঐরূপ ভাষাদোষে দোষী। আমরা, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদল, সোম প্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমীদলকে 'শব পোড়া মড়াদাহের দল' বলিয়া বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমের দল ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সোমপ্রকাশের ভাষাকে 'ভট্টাচার্য্যের চাণা' নাম দিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

বঙ্গদর্শন * এই নামে একখানি মাসিকপত্রিকা সন ১২৭৯ সালের

---

* বঙ্গদর্শনের 'পত্রসূচনায়' বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—"যাঁহারা বাঙ্গালাভাষায় বা সাময়িক পত্র-প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদের রচনাপাঠে বিমুখ। ইংরেজী-প্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষার লেখকমাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধি-বিহীন, লিপি-কৌশল-শূন্য; নয়ত ইংরেজীগ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয় ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরেজী গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরেজীতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি? সহজে কালো চামড়ার অপরাধে ধরা পড়িয়া আমরা নানারূপ সাফাইয়ের চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুল জবাব কেন দিব? ইংরেজী ভক্তদিগের এইরূপ। সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের 'ভাষায়' যেরূপ শ্রদ্ধা, তদ্বিষয় লিপি-বাহুল্যের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা 'বিষয়ীলোক' তাঁহাদিগের পক্ষে সকল ভাষাই সমান। কোন ভাষার বহি পড়িবার তাঁহাদের অবকাশ নাই। ছেলে স্কুলে

(১৮৭২ খৃঃ অব্দ) বৈশাখ মাস হইতে প্রচারিত হয়। বঙ্কিমবাবুর প্রতিভা

দিয়াছেন, বহিপড়া আর নিমন্ত্রণ রাখার ভার ছেলের উপর; সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থাদি এক্ষণে কেবল নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র, গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, অপ্রাপ্তবয়ঃ পৌরকন্যা এবং কোন কোন নিষ্কর্ম্মা রসিকতাব্যবসায়ী পুরুষের কাছেই আদর পায়। কদাচিৎ দুই একজন কৃতবিদ্য সদাশয় মহাত্মা বাঙ্গালা গ্রন্থের বিজ্ঞাপন বা ভূমিকা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া বিদ্যোৎসাহী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

"লেখাপড়ার কথা দূরে থাক্, এখন নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজীতে। সাধারণের কার্য্য, মিটিং, লেক্চর, এড্রেস, প্রোসিডিংস সমুদায় ইংরেজিতে। যদি উভয়পক্ষ ইংরেজী জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরেজীতেই হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরেজী। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয়পক্ষ ইংরাজীর কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজীতে পঠিত হইবে।

"ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজী একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহুবিদ্যার আধার, এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের একমাত্র সোপান; এবং বাঙ্গালীরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থল ভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ ইংরাজীতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মান মর্য্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মান মর্য্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল সে অরণ্যে রোদন, ইংরাজ যাহা না দেখিল তাহা ভস্মে ঘৃত।

"আমরা ইংরাজী বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে ইংরাজ হইতে এদেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজী শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্তরত্ন-প্রসূতি ইংরাজি ভাষার যত অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গলের জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেকগুলি কথা আছে যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরাজীতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে যে তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে, সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজীতে না বলিলে, সমগ্র

আর এক আকারে দেখা দিল। বঙ্কিমবাবু বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকায়

ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানাজাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, এক-পরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজীর দ্বারা সাধনীয়, কেন না এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজীভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয়ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যতদূর ইংরাজী চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান এবং অনেক সুখে সুখী; যদি এই তিন কোটি বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই; আমরা যত ইংরাজী পড়ি, যত ইংরাজী কহি বা যত ইংরাজী লিখিনা কেন, ইংরাজী কেবল আমাদিগের মৃতসিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্‌টি পিতল হইতে খাঁটী রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা কুৎসিতা বন্যনারী জীবন যাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয়। ইংরাজী লেখক, ইংরাজী বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যত-দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

"এ কথা কৃতবিদ্য বাঙ্গালীরা কেন যে বুঝেন না তাহা বলিতে পারি না। যে উক্তি ইংরাজীতে হয়, তাহা কয়জন বাঙ্গালীর হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারে; যদি কেহ এমত মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন সকলের জন্য সে সকল কথা নয়, তবে তাঁহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমগ্র বাঙ্গালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই, সমস্ত দেশের লোক ইংরাজী বুঝেন না; কস্মিন্ কালে বুঝিবে এমত ও প্রত্যাশা করা যায় না। কস্মিন্ কালে কোন বিদেশীয় রাজা দেশীয় ভাষার পরিবর্ত্তে আপন ভাষাকে সাধারণের বাচ্যভাষা করিতে পারেন নাই, সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবেনা বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না, বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।

ইহা হস্তান্তরে যায়, ও সেই সঙ্গে ইহার আকর্ষণী শক্তিও গেল এবং ক্রমে তিরোভাব হইল। এক্ষণে ইহা আবার হস্তান্তরে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, * কৃষ্ণকান্তের উইল, * আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী কমলাকান্তের দপ্তর, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আরও অনেকগুলি আখ্যায়িকা † বঙ্কিমবাবুর বিরচিত আছে। আমরা দুর্গেশনন্দিনীর যেরূপ

---

* * * * *

"বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরই বাঙ্গালার অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালারচনা পাঠে বিমুখ। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ"।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 'বার্ত্তাবহ' করিয়া তাহার সাহায্যে "বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচারকল্পে তিনি 'বঙ্গদর্শন' প্রচার করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহা "আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা সাধনে" সচেষ্ট হয়েন; কারণ, "যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই তাহাতে কাহারই উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না!"। 'বঙ্গদর্শনের' তৃতীয় উদ্দেশ্য "যাহাতে নব্যসম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়"।

† পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলির সবিস্তার বিবরণ যাঁহারা জানিতে চাহেন, এবং গ্রন্থবর্ণিত নায়ক নায়িকার চরিত্র-সমালোচনা দেখিতে চাহেন তাঁহাদিগকে ৺গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্র', শ্রীযুত হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম', ৺পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত 'কাব্যসুন্দরী' শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক পুস্তিকা এবং 'ভারতী', সাহিত্য' প্রভৃতি মাসিকপত্রিকায় সময়ে সময়ে লিখিত প্রবন্ধ সকল পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

* বঙ্কিমবাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি লিপিচাতুর্য্যে ও ঘটনাবৈচিত্রে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলেও 'গৃহসুখ বিমুগ্ধ' বাঙ্গালীর পক্ষে গার্হস্থ উপন্যাস যেরূপ হৃদয় স্পর্শ করে, অন্য কিছুতে সেরূপ হয় না বলিয়া আমরা কবির 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামক দুইখানি গার্হস্থ উপন্যাসের কিঞ্চিৎ সমালোচনা নিম্নে যোজনা করিলাম। উভয় পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় একই, পরস্ত্রীর প্রতি প্রেম, ইহার ফলে নিজ স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার হ্রাস, কিন্তু সেই সঙ্গে আত্মগ্লানি। নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল উভয়েই জ্ঞানপাপী, মনের দুর্ব্বহ আবেগ দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অথচ অক্ষম, উভয়েই সংসারের ধ্বংসের কারণ হইলেন; কিন্তু সারাংশ এক হইলেও একটী বিশেষ বৈষম্য আছে। নগেন্দ্রনাথ ও

সমালোচনা করিয়াছি এ সকল পুস্তকেরও সেইরূপ সমালোচনা করিতে যাইলে, এক বঙ্কিমবাবুর পুস্তকের সমালোচনাতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তক পর্য্যবসিত

সূর্য্যমুখীর বিচ্ছেদমানসে উপন্যাসকার ঘটনাজাল বিস্তার করিয়া ধীরা, উজ্জ্বলা অবনতমুখী কুন্দনন্দিনীকে আনিয়াছেন। আবার গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের মধ্যে ঘটনাবৈচিত্রে বিচ্ছেদ। এত ধীরে, নিস্তব্ধে, অজানিতভাবে ঘটনাসূত্রের সমাবেশ হইল, যে গোবিন্দলাল বা ভ্রমর বা পাঠকবর্গ হঠাৎ তাহা প্রতীতি করিতে পারিবেন না। এইখানেই বঙ্কিমবাবুর নৈপুণ্য ও অসাধারণ শক্তির পরিচয়। হরদেব ও কমলমণির সহস্র চেষ্টাতেও যাহার প্রতিকার হইবার উপায় ছিল না, পরস্পর বাদানুবাদে ভ্রমর ও গোবিন্দলাল তাহা অন্তর্হিত করিতে পারিতেন। এক ক্ষেত্রে হস্তপরিমিত মেঘ উঠিয়া সুখস্বচ্ছন্দপূর্ণ সংসার ছাইয়া ফেলিল, ফুৎকারে সে মেঘ উড়িয়া যাইত। অপর ক্ষেত্রে অভাবহীন জীবন, দেবোপম আদর্শচরিত্র— সম্মুখে জ্বলন্ত পাবকরূপী রূপপ্রভা—সে প্রভা আপন জাল বিস্তার করিয়া গগন ছাইয়া ফেলিল; তাহা ভেদ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে যে অভিমান ভ্রমরে দেখিতে পাই এবং যে অভিমান ভ্রমরের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল, সে অভিমান সূর্য্যমুখীতে একেবারেই নাই। ভ্রমরের অভিমান বর্ত্তমান মানিনীগণের অভিমানের অনুরূপ নহে; এ অভিমান এত স্বাভাবিক, এত পরিস্ফুট, এত তেজোময়, এত ভাবব্যঞ্জক ও এত গৌরব-প্রণোদিত যে ইহাতে একটি মহত্ব ও সৌন্দর্য্য আছে। এ চরিত্র নিন্দনীয় হওয়া দূরে থাকুক আরও উজ্জ্বল ও মধুর হইয়াছে। ভাস্বর চিত্র অধিকতর ভাস্বর করিতে গিয়া কবি হরিদাসী বৈষ্ণবী ও হীরাকে আনিয়াছেন; না আনিলে এমন দুইটি শিক্ষাপ্রদ চরিত্র হইতে বঞ্চিত হইতে হইত।

সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ কতকটা অপ্রাকৃতিক বলিয়া বোধ হয়, আবার তাঁহার অভাবনীয় পুনরুদ্ধারও তদ্রূপ। এরূপ অপ্রাকৃতিক বা অনৈসর্গিক ঘটনা আমরা "কৃষ্ণকান্তের উইলে" পাই না। উহাতে কল্পনার সাহচর্য্য কবি প্রায় পরিহার করিয়াছেন। ফলতঃ এই শেষোক্ত উপন্যাসকে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই দুই গ্রন্থের নামকরণ সম্বন্ধে কিছু লেখা আবশ্যক। নামকরণ কবির উপযুক্ত হইয়াছে। উইলের ক্রমিক পরিবর্ত্তন, প্রকৃত উইল স্থানে জাল উইল সংস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে চিত্রাঙ্কিত ব্যক্তিগণের ভাগ্যলিপির শুভাশুভ ফলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এ উইলের আধিপত্য কম নহে, ইহা প্রারম্ভ হইতে শেষ অবধি পাত্রপাত্রীগণের চরিত্রগঠনে ও পরিবর্ত্তনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। আবার পাপপ্রেমের বিষবীজ

হইয়া যায়। অতএব আমরা তাহা করিতে পারিলাম না। বঙ্কিমবাবুর

নগেন্দ্রের গৃহে উপ্ত হইল। হীরা জলসেক করিল; ফলে ঐ বীজ-সমুৎপন্ন বৃক্ষই বিষবৃক্ষে পরিণত হইল। বিষবৃক্ষকে যথার্থই বঙ্কিমবাবু 'বিষবৃক্ষ' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাই সমাজে এ বিষবৃক্ষ দিয়া তিনি পাপের পরিণাম ও ফলাফল দেখাইয়া ভরসা করিয়াছেন যে এই গ্রন্থে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।

উভয় গ্রন্থে কবি যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা অতি মহৎ। মর্ত্তে যাবতীয় সুখ অধিকৃত হইলেও, চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি ব্যতিরেকে প্রকৃত সুখ সম্ভবপর নহে, এ কথা কবি অতি স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে' ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদের শেষে যথার্থই বলিয়াছেন "লোকে বলে ইহলোকে পাপের দণ্ড দেখা যায় না। ইহা সত্য হউক বা না হউক তুমি দেখিবেনা যে চিত্ত সংযমে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তি ইহলোকে বিষবৃক্ষের ফলভোগ করিল না"। এ বিষয়ে উনত্রিংশ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত না করিলে বিষয়টি তেমন হৃদয়ঙ্গম হয় না। "মনুষ্য মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সকল সংযত করিতে পারেন এবং সংযত করিয়া থাকেন। সেই ব্যক্তি মহাত্মা; কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করেনা তাহার জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্ত সংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এই বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী; একবার ইহার পুষ্টি হইলে, আর নাশ নাই এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধবর্ণ পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম দেখিতে অতি রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময়; যে খায় সে মরে।............

"চিত্তসংযম পক্ষে প্রথমতঃ চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ চিত্ত সংযমের শক্তি আবশ্যক। ইহার মধ্যে শক্তি প্রকৃতিজন্যা; প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং চিত্তসংযম পক্ষে শিক্ষাই মূল। কিন্তু গুরূপদেশকে কেবল শিক্ষা বলিতেছি না; অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা।"

আমরা এবার কয়েকটি প্রধান চরিত্রের সমালোচনা করিব।

ভ্রমর ও সূর্য্যমুখী—উভয়েই বাঙ্গালী রমণীর আদর্শ, পতিপরায়ণা সাধ্বী—ভ্রমর অভিমানিনী, সূর্য্যমুখী সদ্গুণান্বিতা। সূর্য্যমুখী স্বামীর সুখের জন্য কুন্দের সহিত বিবাহে অসম্মতা হইলেন না, কিন্তু স্ত্রী-স্বভাব বশতঃ, ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করায়, বিবাহের রাত্রে নীরবে চলিয়া গেলেন। ভ্রমর সন্দেহে নির্ভর করিয়া মিথ্যা কলঙ্কারোপণে স্বামীকে নির্ম্মম পত্র লিখিলেন, সে পত্রে বিষময় ফল ফলিল। তবে ভ্রমরের ভাবিবার বিষয় ছিল না কেন

আখ্যায়িকার মোহিনীশক্তি এদেশীয় লোকের কথা দূরে থাকুক, ইংলণ্ড,

---

না তাঁহার বৈরী কুলটা, ব্যাভিচারিণী রোহিণী, আর সূর্য্যমুখীর বৈরী কে? স্বহস্ত-প্রতিপালিতা, আশ্রিতা, লাবণ্যভূষিতা, সরলা, অনাথা কুন্দনন্দিনী। সূর্য্যমুখী দেখিলেন দুগ্ধদানে কাল-ভুজঙ্গিনীকে পোষণ করিয়াছেন, তথাপি যেখানে স্নেহের অধিকার, সেখানে ঈর্ষা বা ঘৃণা সহজে স্থান পায় না; তাই সূর্য্যমুখীর ও কুন্দের মধ্যে বৈষম্যেও সাম্য দেখিতে পাই। সেই কারণে সূর্য্যমুখী প্রত্যাগমনের পর মনে করিয়াছিলেন যে সপত্নীকে লইয়া সুখে কালাতিপাত করিবেন এবং কুন্দ বিষভক্ষণ না করিলে তিনি যে সে বিষয়ে সফলকাম হইতেন ইহা আমাদের বিশ্বাস।

কুন্দনন্দিনী—ইনি বিধবা হইয়া নগেন্দ্রকে ভাল বাসিয়াছিলেন এজন্য অনেকে ইঁহাকে কুলটা বলেন। অতৃপ্ত ও অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা, নগেন্দ্রের উত্তেজনা, আশ্রয়দাতার ভাবী মনোবেদনা এ সকল কুন্দের মন আলোড়িত করে। যদিও তিনি নগেন্দ্রের সুখসচ্ছন্দ—পরিবার-মণ্ডলে পারিবারিক অশান্তির কারণ হইয়াছিলেন, বিষভক্ষণে প্রাণত্যাগ করিয়া সে পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী কুলকামিনীতে কুন্দের ন্যায় প্রকৃতি বিরল নহে, তবে কুন্দের বিশেষত্ব এই যে তাঁহার প্রকৃতিতে 'নৈতিক সৌন্দর্য্য' নাই। যে সৌন্দর্য্যপ্রভাবে বাঙ্গালী কুলকামিনীরা অল্প বয়স হইতেই সতীত্ব-গৌরব ও পাতিব্রত্য মনের অজ্ঞাতে শিক্ষা করেন, সে শিক্ষা কুন্দের ছিল না, তাই তিনি নগেন্দ্রের পাপ প্রবৃত্তির সম্মুখে আত্মহারা হইলেন, প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কখন তাহার শিক্ষার বিষয় হয় নাই।

দেবেন্দ্র ও হীরা—একটি অপরটির অনুকৃতিমাত্র। দুইটিই পাপচিত্র, অথচ এরূপ চরিত্রের প্রাদুর্ভাব সংসারে বিরল নহে। দেবেন্দ্র স্ত্রীকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত, তাই পরদার ও মদ্যে প্রসক্তি, আর হীরা বালবিধবা, কায়ক্লেশে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু চোর ধরিতে গিয়া আপনি ধরা পড়িল। দেবেন্দ্রের ন্যায় পাপ চরিত্রের সম্মুখীন না হইলে হীরা ধর্ম্ম অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিত; কিন্তু হীরার সে শিক্ষা বা চেষ্টা ছিলনা। দেবেন্দ্র এক দিনের সাক্ষাতে হীরাকে চিনিলেন, নিজ কার্য্য সিদ্ধির এমন অমোঘ অস্ত্র আর কোথায় পাইবেন! হীরাও দেবেন্দ্রসমাগমে স্বর্গসুখ উপলব্ধি করিল। হীরা দেবেন্দ্রের কপট প্রণয়সম্ভাষণে প্রথম হইতেই প্রতারিত হয় নাই বরং দেবেন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য যে কুন্দলাভ তাহা হীরা স্পষ্টই বুঝিয়াছিল। এই সকল কারণে হীরা দেবেন্দ্রের প্রতি প্রবল অনুরাগ শমিত করিয়াছিল বটে, কিন্তু একবারে নির্ম্মূল করিতে পারে নাই। দেবেন্দ্রের প্রণয় অপাত্রে ন্যস্ত জানিয়া ক্রোধবশতঃ "চোরে" "দোবে" কে দিয়া দেবেন্দ্রের সম্মান বাড়াইল। উহার প্রতিশোধ

জর্ম্মানী প্রভৃতি দূর দেশীয় ভিন্নজাতীয় লোকদিগকেও মুগ্ধ করিয়াছে;

দেবেন্দ্র হৃদে আসলে লইলেন। হীরা, "পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষু", পুনরায় দেবেন্দ্র সমাগমে যাইল, কিন্তু এবার চতুরা হীরার চতুরতা বিলুপ্ত হইল। মনুষ্য মোহবশতঃ এরূপ ভ্রমে নিপতিত হয়, হীরারও তাহাই হইল। যখন মোহ ঘুচিল, হীরার জ্ঞানচক্ষু ফুটিল, তখন হীরার ধর্ম্ম গিয়াছে! হীরার ক্রোধ তখন দেবেন্দ্র হইতে কুন্দের উপর পড়িল। হীরার ন্যায় চরিত্রে ইহা যে কতদূর স্বাভাবিক তাহা বলা যায় না; ফলে হীরা কুন্দকে বিষ ভোজনে প্রবৃত্তি দিল। পরিণামে সে মনোবেদনায় দারুণ প্রপীড়িত হইয়া উন্মাদগ্রস্তা হইল। পাপের পরিণাম ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল—উভয়েই চিত্তসংযম অভাবে পাপের পিচ্ছিলসোপানে অবরোহণ করেন। নগেন্দ্র পাপপ্রবৃত্তির সঞ্চারমাত্রেই নিজের প্রতি অনাদর ও তাচ্ছিল্য করিতে ত্রুটি করেন নাই এবং নিরন্তর চিত্ত-বৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন, ফলে অনুতাপে দগ্ধ হইয়াছেন। আর গোবিন্দলাল যদিও ভ্রমরকে এবং কৃষ্ণকান্তের সমগ্র সংসারকে রক্ষা করিবার জন্য এবং দুর্ব্বল হৃদয়ে বল সঞ্চারের জন্য ভগবানের নিকট শক্তি ভিক্ষা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার চিত্ত দমনের চেষ্টা নগেন্দ্রের অনুপাতে অনেক কম বলিয়া বোধ হয়। পিতার মৃত্যুর রাত্রে মাতাকর্ত্তৃক কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্র ও হীরাকে বিষবোধে প্রত্যাখ্যান করিতে সম্প্রাদিষ্ট হইয়াছিলেন; ইহার কারণ নগেন্দ্র ও হীরা উভয়েই চিত্তসংযমে অপ্রবৃত্ত; কুন্দের সংস্পর্শে নগেন্দ্রের যাহা হইল, দেবেন্দ্রের সংস্পর্শে হীরারও তাহাই হইল। কবি নিজেই হীরা সম্বন্ধে বলিয়াছেন "হীরা চিত্ত সংযত করিতে জানিত, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া সহজে পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্রকে অপ্রণয়ী জানিয়া চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহাও অল্পদূরমাত্র; কিন্তু যতদূর অভিলাষ করিয়াছিল, ততদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল। দেবেন্দ্রকে অঙ্কাগত প্রাপ্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার কাছে প্রেম স্বীকার করিয়াও অবলীলাক্রমে তাঁহাকে বিমুখ করিয়াছিল। আবার সেই পুষ্পগত কীটানুরূপ হৃদয়বেধকারী অনুরাগকে কেবল পরগৃহে কার্য্য উপলক্ষ্য করিয়া শমিত করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহার বিবেচনা হইল যে, দেবেন্দ্র প্রণয়শালী, তখন আর তাহার চিত্তদমনে প্রবৃত্তি রহিল না। এই অপ্রবৃত্তি হেতু বিষবৃক্ষে তাহার ভোগ্যফল ফলিল।" আবার রোহিণীর যে হিংসা ও দ্বেষ ছিল, হীরারও তাহাই ছিল। রোহিণী ভাবিল গোবিন্দবাবুর স্ত্রী—তাহা অপেক্ষা আমি কোন বিষয়ে কম, কিন্তু তাহার ভাগ্যে এত সুখ ও আমার ভাগ্যে এত দুঃখ কেন? হীরাও তাহাই ভাবিয়াছিল লোকে বলে "পাঁচ কেন সাত হইল না? পাঁচ বলে, "আমি সাত হইতাম- কিন্তু দুই

শুনিয়াছি দুর্গেশনন্দিনী ইংরেজি ও জর্ম্মান ভাষায় অনূদিত হইয়াছে! অতএব উল্লিখিত 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি বিষয়ে এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, বঙ্কিমবাবুর অখ্যায়িকা পুস্তক যেরূপ হইয়া থাকে, এ গুলিও অবিকল সেইরূপই হইয়াছে।

কৃষ্ণচরিত্র প্রথমভাগ—এখানি মহাভারত বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা—আখ্যায়িকা পুস্তক নহে। এরূপ পুস্তক বিষয়ে মতামত প্রদর্শন করা আমাদের এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। এতদ্বিষয়ে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, ইহার রচনা যুক্তিমতী, ওজস্বিনী ও বঙ্কিমবাবুর আখ্যায়িকা রচনার ন্যায়ই মধুবর্ষিণী ও চিত্তাকর্ষিণী।

——:——

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত নীতিসার প্রভৃতি।

৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'নীতিসার' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থের প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৭৪২ শকে [খৃঃ ১৮২০ অব্দে] কলিকাতার দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোঁতা

আর পাঁচে সাত—বিধাতা অথবা বিধাতার সৃষ্ট লোকে যদি আমাকে আর দুই দিত তা হলেই আমি সাত হইতাম"।

"সূর্য্যমুখীর উপর আমার এত রাগই বা কেন? সেত কখন আমার কিছু মন্দ করে নাই, বরং ভালই বাসে, ভালই করে। তবে রাগ কেন? তা কি হীরা জানে না? হীরা না জানে কি? কেন বলবো? সূর্য্যমুখী সুখী—আমি দুঃখী, এইজন্য আমার রাগ। সে বড়, আমি ছোট—সে মনিব, আমি বাঁদী। যদি বল ঈশ্বর তাহাকে বড় করিয়াছেন, তার দোষ কি? আমি তার হিংসা করি কেন? তাতে আমি বলি, ঈশ্বর আমাকে হিংসুকে করেছেন, আমারই বা দোষ কি? এইরূপ হীরাও রোহিণীতে চরিত্রগত অনেকটা সাদৃশ্য আছে।"

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রকৃত জীবন-চিত্রাঙ্কণ এক এবং ইহার সহিত কল্পনাপ্রসূত বিষয়ের অবতারণা আর এক। এই শেযোক্ত শ্রেণীর পুস্তককে উপন্যাস বলা যায়। বঙ্কিমবাবু তাঁহার সকল গ্রন্থেই কল্পনার সাহচর্য্য লইয়াছেন এ কারণ তিনি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার। অধিকন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' প্রকৃত জীবন এরূপ সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন যে, তাঁহাকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে কোন অংশে ন্যূন বলা যায় না।

নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা ৺হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন একজন গণ্যমান্য অধ্যাপক ছিলেন। দ্বারকানাথ ১৮৩২ খৃঃ অব্দে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৪৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থানপূর্ব্বক অতি প্রশংসিত ছাত্র-রূপে তথাকার পাঠ্য সমুদয় অধ্যয়ন করেন—এই সঙ্গে কিঞ্চিৎ ইংরেজি শিক্ষাও তাঁহার হইয়াছিল। উক্ত ১৮৪৫ খৃঃ অব্দেই তিনি ঐ কলেজের পুস্তকাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া কিছুদিন পরেই ব্যাকরণাধ্যাপকের পদলাভ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যৎকালে কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তখন বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিয়ৎ-কালের জন্য তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন। অনন্তর তথাকার সাহিত্যাধ্যাপকের পদে অনেকদিন অবস্থিত থাকিয়া পেন্সন গ্রহণ করত অনেকদিন বাটীতে অব-স্থান করিতেছিলেন। গত ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ২২শে আগষ্টে তাঁহার পরলোক হইয়াছে।

সংস্কৃত কলেজে অবস্থানকালেই যখন গবর্ণমেণ্টের আদেশে চারিদিকে বাঙ্গালা পাঠশালা সকল স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময়ে—অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৮৫৫ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে বিদ্যাভূষণ মহাশয় দুইভাগ 'নীতিসার' এবং 'রোম ও গ্রীসের ইতিহাস' রচনা করেন। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র * 'সোমপ্রকাশ' নামক এক সংবাদপত্র প্রচারের বাসনায় সমুদয় উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন ; নানাকরণবশতঃ তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারায় ১৭৮০ শকের অগ্রহায়ণ [খৃঃ ১৮৫৮ অব্দের নবেম্বর] হইতে ইনি এই পত্রিকার সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়া সাপ্তাহিকরূপে উহা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সেই অবধি তাঁহার জীবনকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকর্ত্তৃকই ঐ পত্র প্রচারিত হইয়াছিল। এই পত্রিকাসম্পাদকতানিবন্ধন অবকাশাভাবেই, বোধ হয়, তিনি আর কোন গ্রন্থ রচনায় হস্তার্পণ করিতে পারেন নাই। এই কালমধ্যে কেবল 'ভূষণসার' নামে একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা ব্যাকরণ এবং 'বিশ্বেশ্বরবিলাপ' নামক একখানি ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তক তাঁহার লেখনী হইতে নির্গত হইয়াছে।

---

* সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য নামক এক বধির ব্যক্তি।

নীতিসার দুইভাগ—ইংরেজি ও সংস্কৃত নানাগ্রন্থ হইতে নীতিবাক্য সকল সঙ্কলন করিয়া এই দুই পুস্তক বিরচিত হইয়াছে। যৎকালে এই পুস্তকের রচনা হয়, তখন বালকদিগের পাঠোপযোগী নীতিবিষয়ক পুস্তক অতি অল্প ছিল, অতএব এই পুস্তকদ্বয়ের প্রচার দ্বারা ছাত্রদিগের নীতিশিক্ষাবিষয়ে অনেক উপকার হইয়াছে, বলিতে হইবে। ইহাদের ভাষা যেমন সরল, তেমনি বিশুদ্ধ; অনেক বিদ্যালয়েই এই পুস্তকের পাঠনা হইয়া থাকে, সুতরাং দেশীয় লোকেরা যে, ইহাদের গুণগ্রহণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

'রোমরাজ্যের ইতিহাস' ও 'গ্রীসদেশের ইতিহাস'—এই দুই পুস্তক বিষয়ে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করা আমাদের তত উদ্দেশ্য নহে। অতএব আমরা এইমাত্র বলিব যে, ঐ দুই দেশের যে সকল ইতিহাস এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় প্রকাশিত হইয়াছে, এই দুই পুস্তক তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুতরাং সমধিক বিষয়সম্বদ্ধ। ইহাদের—বিশেষতঃ রোমরাজ্যের ইতিহাসের—ভাষাও এরূপ সুন্দর যে, ইহাদিগকে সাহিত্যমধ্যে নিবেশিত করিলেও হানি হয় না। দুঃখের বিষয়, এরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তকও কোন বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট নাই!

সোমপ্রকাশ—বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম ও সম্ভ্রম দেশমধ্যে যে এতদূর বাড়িয়াছিল, নীতিসার বা ইতিহাস রচনা তাহার হেতু নহে—সোমপ্রকাশ পত্রের সম্পাদকতাই তাহার একমাত্র কারণ। তিনি এই পত্রের উন্নতিকরণবাসনায় যে, কত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, ইংরেজি ও সংস্কৃত কত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ও কত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সংবাদপত্রমাত্রেই শ্রেণীবিশেষের পক্ষপাতদোষে কিঞ্চিৎ দূষিত হইয়া থাকে; সোমপ্রকাশ সেই সাধারণ দোষে একবারে নির্লিপ্ত, একথা বলিলে হয় ত পাঠকগণ আমাদিগকে চাটুকার মনে করিবেন; এজন্য এই বলা যাইতেছে যে সোমপ্রকাশে ঐ দোষ বড়ই অল্প লক্ষিত হইত। যুক্তিবল অবলম্বন করিয়াই সোমপ্রকাশ বিচার করিত, এবং সেই সকল যুক্তি সম্পাদকের সরল ও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ হইতেই বহির্গত হইত। বিচারের সময়ে বিবাদমগ্ন হইয়া বাচ্যাবাচ্যবোধবিহীন হইতে সোমপ্রকাশকে আমরা কখন দেখি নাই। বিপক্ষে গালি দিলেও সোমপ্রকাশ

বিজ্ঞতা ও গাম্ভীর্য্যের সহিত তাহার উত্তর দিয়া থাকিত। গাম্ভীর্য্যরক্ষা সোমপ্রকাশের এক প্রধান ও রমণীয় গুণ। সেদিনও বহু-বিবাহসম্পর্কে যে বিচার হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সোমপ্রকাশের ন্যায় কেহই গাম্ভীর্য্যরক্ষা করিতে পারেন নাই। এই সকল গুণ থাকায় সোমপ্রকাশ বাঙ্গালা সংবাদপত্র সমূহের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়াছিল। দেশীয় ও ইউরোপীয় সকল সমাজেই সোমপ্রকাশ পরম সমাদর পাইয়াছে। দেশীয় সমাজকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শিক্ষাপ্রদানে সোমপ্রকাশ প্রচুররূপে সহায়তা করিয়াছে। অধিক কি অনেকে সোমপ্রকাশ পাঠ করিয়াই বিশুদ্ধরূপে বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা করিয়াছেন।*

---

* 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক গ্রন্থ-প্রণেতা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভাগিনেয় শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন ;—"দেখিতে দেখিতে সোমপ্রকাশের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। 'প্রভাকর' ও 'ভাস্কর' প্রভৃতি বঙ্গসমাজের নৈতিক বায়ুকে দূষিত করিয়া দিয়াছিল, সোমপ্রকাশের প্রভাবে তাহা দিন দিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। সোমবার আসিলেই লোকে সোমপ্রকাশ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তিযুক্ততা, তেমনি নীতির উৎকর্ষ। চিত্তের একাগ্রতাটাই সোমপ্রকাশের প্রভাবের মূলে ছিল। 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পাদন বিষয়ে অক্ষয়বাবুর চিত্তের অদ্ভুত একাগ্রতার অনেক গল্প শুনিয়াছি ; আর সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়াছি ; তাহার অনুরূপ সমগ্র হৃদয়মনের একীভাব আর কখনও দেখি নাই। তিনি সোমপ্রকাশে যাহা লিখিতেন, তাহার এক পংক্তিও কাহারও তুষ্টিসাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেন না। লোকসমাজে আদৃত হইবার লোকে লোকের রুচি বা সংস্কারের অনুরূপ করিয়া কিছু বলিতেন না। যাহা নিজে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদয়নিঃসৃত অকপট ভাবাতে ব্যক্ত করিতেন। তাহাই ছিল সোমপ্রকাশের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণ এতদূর প্রবল ছিল যে, বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ কাগজের বার্ষিক মূল্য করিয়াছিলেন ১০৲ দশ টাকা এবং তাহাও অগ্রিম দেয়। বাস্তবিক ১০টী টাকা অগ্রে প্রেরণ না করিলে কাহাকেও একখানি কাগজ দেওয়া হইত না। ইহাতেও সোমপ্রকাশের গ্রাহক সংখ্যা সে সময়ের পক্ষে বহুসংখ্যক ছিল।" ২৮৭-২৮৮ পৃষ্ঠা।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তাতরঙ্গিণী প্রভৃতি।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'চিন্তাতরঙ্গিণী,' 'বীরবাহুকাব্য,' 'বৃত্রসংহার,' 'ছায়াময়ী,' 'দশমহাবিদ্যা,' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ৮।৯ খানি কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি জেলা হুগলীর অন্তঃপাতী গুলিটা নামক গ্রামে মাতামহাবাসে ১৭৬০ শকে (১৮৩৮ খৃঃ অব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নিবাস উত্তরপাড়া—নাম ৺কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ৪ পুত্রের মধ্যে ইনি জ্যেষ্ঠ। হেমচন্দ্র বাল্যকালে গুরু মহাশয়ের নিকট যথারীতি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ২০ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে খিদিরপুরে গমন করেন এবং কলিকাতার হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ঐ বিদ্যালয়ে ও তৎপরে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নপূর্ব্বক তথাকার জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলার্সিপ প্রাপ্ত হন এবং সেই স্থানেই এণ্ট্রান্স পরীক্ষা প্রদান করেন। তৎপরে কলেজ পরিত্যাগপূর্ব্বক কয়েক বৎসর ইতস্ততঃ বিষয় কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হন ও তাহা করিবার সময়েই পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক বি, এ, ও বি, এল, উপাধি লাভ করেন। অনন্তর কয়েক মাস মুন্সেফের কার্য্য সম্পাদন করিয়া ১৮৬২ খৃঃ অব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে সবিশেষ দক্ষতাসহকারে কার্য্য করায় পরম গৌরব ও সম্মানের সহিত সরকারী উকিলের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। হাইকোর্টে প্রবিষ্ট হইবার কিয়ৎকাল পরেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। ঐ সময় তাঁহার অর্থাগম ও মানমর্য্যাদা যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল, কবিত্বশক্তিও সেইরূপ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। তাঁহার হৃদয় কবি-সুলভ কোমল ছিল, সেই কোমলতাহেতু তিনি আত্মপর না ভবিয়া—পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া—ব্যয় করিয়া ফেলিতেন; সুতরাং শেষ জীবনের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই।

তিনি কবিবর মাইকেল মধুসূদনের পরলোকগমন উপলক্ষে—

> "হায় মা ভারতী! চিরদিন তোর কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
> যেজন সেবিবে, ও পদযুগল সেই সে দরিদ্র হবে।"

বলিয়া যে খেদ করিয়াছিলেন—যথাসময়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিলেও ঐ উক্তি

ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় তাঁহার শেষ জীবনে বর্ণে বর্ণে সপ্রমাণ হইয়াছিল। কবিবর জীবনের সায়াহ্নে তাঁহার "পরশমণি", চক্ষুরত্ন, হারাইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে কমলার কৃপায় বঞ্চিত হইয়া বড় কষ্টেই পড়িয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি ও হিতবাদী সম্পাদক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রকাশিত "গ্রন্থাবলী" বিক্রয়লব্ধ অর্থ সাহায্য পাইয়া তাঁহাকে কাশীধামে অন্যতম সহোদর ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসে জীবনের শেষ কয়েক দিন (১৩১০, ১০ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত) অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। তিনি নেত্র ও যোত্রহীন হইয়া মানবস্বভাব-সুলভ বিষণ্ণতায় যে বিচলিত হন নাই তাহা নহে, তবে তাঁহার বিষাদ সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে নাই। তাঁহার অন্ধাবস্থার "চিত্তবিকাশে" তাঁহার চিত্তের যে অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছিল, নিম্নলিখিত কবিতাগুলি তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন। কবি তাঁহার সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ পূর্ব্বজীবনের সহিত দারিদ্র্য-দুঃখ-পীড়িত দৃষ্টিশক্তিহীন শেষ জীবনের তুলনা করিয়া মর্ম্ম-ব্যথায় গাহিয়াছেন—

'নিজ পর ভাবি নাই অনন্য উপায়,
যে এসেছে আশা করে দিয়াছি তাহায়,
এখন আপনি হেলে পড়েছি ধরায়,
স্বগণ আশ্রিতজন কাঁদিয়া বেড়ায়,
কে দেখে আমারে আজ ফিরায়ে নয়ন,
হের ঐ তরুটীর কি দশা এখন।'

আবার যতই দুঃখের পর দুঃখ, ঘোর অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ ও আপনার নেত্র-হীন অবস্থা স্মরণ করেন, তখন তাঁহার উচ্ছ্বসিত শোকবেগ নিরাশার স্রোত প্রবাহিত করিয়া মর্ম্মস্পর্শিণী ভাষায় বলিয়া উঠে—

'কি নিয়ে থাকিব তবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে,
ভবলীলা ঘুচেছে আমার।
বৃথা এবে এ জীবন, হরনা কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার।

জীবনের শেষকালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার।
বিভু! কি দশা হবে আমার?

* * * *

'সহেছি অনেক দিন, সব আর কত দিন,
দিনে দিনে ডুবি হে পাথারে।
সত্বর এ প্রাণ হরি, এ দুঃখ ঘুচাও হরি,
এ যাতনা দিও নাক কারে।'

পরক্ষণেই কবি শিক্ষার প্রভাবে ও মানসিক শক্তিবলে হৃদয়ে ধৈর্য্য ও শান্তি আনিবার চেষ্টা করিতেছেন—

"কি হবে কাঁদিয়া জগৎ ভরিয়া,
সবারি এ দশা, কিছু চির নয়,
চিরদিন কারো নাহি রয় স্থির,
চিরকাল কারো সমান না যায়।"

* * *

"কে পারে খণ্ডিতে অদৃষ্ট শৃঙ্খলে?
ঘটেছে আমার যা ছিল কপালে।
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে,
বৃথা তবে কেন কাঁদিয়া মরি!
"এস ভগবান, কর ধৈর্য্য দান,
কর শান্তিময় অশান্ত পরাণ,
সৌভাগ্য অভাগ্য ভাবিয়া সমান,
নিজকর্ম্ম যেন সাধিতে পারি?

চিন্তাতরঙ্গিণী, বোধ হয়, হেমবাবুর প্রথম পুস্তক। কোন জমীদার পুত্র গুরুজনকর্ত্তৃক বিষয়রক্ষার্থে জালকরণ ও মিথ্যাকথনের জন্য প্রণোদিত হন এবং তৎকার্য্যে অসমর্থ হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন, এই মূল

ঘটনা অবলম্বনপূর্ব্বক, প্রাচীনেরা নব্যসম্প্রদায়ের মনোভাব না বুঝিয়া কার্য্য করিলে কিরূপ অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহাই উপাখ্যানবর্ণনচ্ছলে ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তক একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ, এ, কোর্সমধ্যে নিবিষ্ট হইয়াছিল এবং এক সময়ে ইহা সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে বহুল সমাদর পাইয়াছিল। আমাদের স্মরণ হয়, একদা কোন ব্যক্তি অপর একজনকে দিবার জন্য নবপ্রকাশিত চিন্তাতরঙ্গিণীর এক খণ্ড কাহারও হস্তে দিয়া পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "সীতাপ্রেরিত মধুফল মারুতি রামচন্দ্রকে না দিয়া যেমন স্বয়ংই ভোগ করিয়াছিলেন, দেখিবেন, ইহা যেন সেরূপ না হয়!" উল্লিখিত ব্যক্তির উক্তরূপ উক্তির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই—পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

চিন্তাতরঙ্গিণী অতি ক্ষুদ্র পুস্তক—৩০ পৃষ্ঠামাত্র। ইহাতে সমালোচ্য বিষয় অধিক নাই—তবে ইহা শিক্ষাপ্রদ। ইহার ভাষা সরল, মধুর ও প্রায় নির্দ্দোষ—"নারিনু" "নারিনু" "কই" "কই" ইত্যাদিস্থলে পয়ার রচনা নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

বৃত্রসংহার কাব্য—হেমবাবুর প্রণীত সকল পুস্তক অপেক্ষা বৃহত্তর। হেমবাবু যখন মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত মেঘনাদ বধের টীকা লেখেন, বোধ হয়, তৎকালেই ঐ পুস্তকের অনুকরণে এবং ঐরূপ প্রণালীতে কাব্য লিখিতে তাঁহার ইচ্ছা জন্মে—বৃত্রসংহার সেই ইচ্ছার ফল।

শঙ্করের বরে লব্ধপ্রভাব বৃত্রাসুর দেবগণকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন;—দেবগণ পাতালে, শচী নৈমিষারণ্যে এবং দেবরাজ ইন্দ্র নিয়তির উপাসনার্থ কুমেরু পর্ব্বতে বহুকাল অবস্থিত হন। বৃত্রপত্নী ঐন্দ্রিলা শচীকে দাসী করিবার জন্য বৃত্রকে উত্তেজিত করিয়া নিজপুত্র রুদ্রপীড় দ্বারা নৈমিষারণ্য হইতে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া স্বর্গমধ্যে কারারুদ্ধ ও অপমানিত করেন। এদিকে ইন্দ্র নিয়তির উপাসনা শেষ করিয়া শঙ্করের নিকটে গমন করিলে তিনি দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্রনির্ম্মাণ করাইয়া তদ্দ্বারা বৃত্রবধ করিবার জন্য উপদেশ দেন, এবং শচীর অপমানে কুপিত গৌরী, বিরিঞ্চি ও বিষ্ণুর

উত্তেজনায় বৃত্রাসুরের ভাগ্যলিপি খণ্ডন করেন। অনন্তর দেব ও দানবে বিস্তর সংগ্রাম হয় এবং পরিশেষে দেবরাজের শরজালে বিদ্ধ হইয়া রুদ্রপীড় এবং বজ্রায়ুধে প্রহত হইয়া বৃত্রাসুর প্রাণত্যাগ করিলে মদগর্ব্বিতা ঐন্দ্রিলা হতাশায় উন্মত্ত হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন—ইহাই এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান। মহাভারতের বনপর্ব্বে বৃত্রবধের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। কিন্তু অঙ্কুরে ও বৃক্ষে যেরূপ প্রভেদ, ঐ উপাখ্যান ও বৃত্রসংহার কাব্যের উপাখ্যানে সেইরূপ প্রভেদ। মহাভারতবর্ণিত অতি সংক্ষিপ্ত বৃত্রবধ বিবরণকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া কবি কল্পনাবলে তদুপরি এই বৃত্রসংহার কাব্যরূপ বিশাল প্রাসাদের গঠন করিয়াছেন :

এই কাব্যে বৃত্রাসুর, রুদ্রপীড়, ঐন্দ্রিলা, ইন্দুবালা, ইন্দ্র, জয়ন্ত, অনল, বরুণ, শচী, দধীচি মুনি প্রভৃতি অতি সুন্দর ও যথোপযুক্তরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন। বৃত্র ও রুদ্রপীড়ের বীরত্ব, ঐন্দ্রিলার গর্ব্ব ও দুরভিলাষপূরণের বাঞ্ছা, ইন্দুবালার মনের কোমলতা, ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর সহিষ্ণুতা, অনলদেবের ঔদ্ধত্য, বরুণের গাম্ভীর্য্য, দধীচির লোকহিতার্থ প্রাণত্যাগ, বিশ্বকর্ম্মার বজ্রনির্ম্মাণ—এ সকল ব্যাপার পাঠমাত্র চিত্তমধ্যে যেন অঙ্কিত হইয়া যায়। রুদ্রপীড় ও ইন্দুবালা মেঘনাদবধের ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার স্থানীয়। তন্মধ্যে রুদ্রপীড় কিয়ৎপরিমাণে ইন্দ্রজিতের অনুরূপ হইলেও ইন্দুবালা প্রমীলা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথগ্‌বিধ পদার্থ। ইন্দুবালার পতিপ্রেম, পতিকৃত সামরিক নিষ্ঠুর কার্য্যের চিন্তায় মনের সেই সেই ভাব, পরদুঃখকাতরতা, পতির নিধন শ্রবণেই মৃত্যু—এ সকল কোমলতা ও মধুরতার একশেষ!

বৃত্রসংহারকাব্য দেবাসুর-সংগ্রাম-সংক্রান্ত; সুতরাং ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কার্ত্তিকেয়, অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র, জয়ন্ত, মদন, গৌরী, শচী, রতি প্রভৃতি অনেক দেবদেবীর ক্রিয়াকলাপ এবং অমরাবতী, ইন্দ্রভবন, পাতালপুরী, সুমেরু, কৈলাস, বিশ্বকর্ম্মার শিল্পশালা, মন্দাকিনী, দেবাসুরের পুনঃ পুনঃ নানারূপ যুদ্ধ প্রভৃতি মানব নয়নের অগোচর বহুবিধ অলৌকিক বস্তুর বর্ণন আছে, সে সকলের যুক্তাযুক্ততার বিচার করা অনাবশ্যক। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে,

যুদ্ধকার্য্য পুনঃ পুনঃ ও অতিরিক্তরূপেই বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কোন কোন স্থলে বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয় নাই।

এই পুস্তকে ছন্দ মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর দুইরূপই আছে। তন্মধ্যেও আবার প্রকারভেদ আছে। সংস্কৃত ছন্দের অনুরূপ হইবে ভাবিয়া কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দের চারি পঙ্‌ক্তিতে বাক্যশেষ করিয়াছেন। ফলতঃ মেঘনাদবধের ছন্দ অপেক্ষা বৃত্রসংহারের ছন্দ অনেক বিচিত্র ও শ্রুতিমধুর হইয়াছে।

হেমবাবু স্বয়ংই বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে, তিনি বাক্যকাল হইতে ইংরেজী শিক্ষা করিয়াছেন এবং সংস্কৃত জানেন না, সুতরাং তাঁহার পুস্তকে ইংরেজি ভাবসঙ্কলন ও সংস্কৃতানভিজ্ঞতার দোষ দৃষ্ট হওয়া সম্ভব। বাস্তবিক তাহাই হইয়াছে—

'ভুগুক অদৃষ্ট তবে তিক্ত আস্বাদনে চির যুদ্ধে সুরতেজে দানব দুর্ম্মতি।" ইত্যাদি স্থল সকলের অস্থি মাংস সমুদয়ই ইংরেজি। 'মিথ্যুক' 'লজ্জাস্কর' ইত্যাদি ভূরি ভূরি প্রয়োগ সংস্কৃতের নিতান্ত বিরোধী। আর এক কথা, তিনি অনেক স্থলেই অকারণে "সে" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। যথা—"অসুর মর্দ্দন আখ্যা কি হেতু সে তবে"—"থাকিতে হইবে স্বর্গে কন্দর্প সে যথা"—'না দিয়াছি কহ কিবা সে তোমায়'—ইত্যাদি। ফলতঃ বৃত্রসংহার বীররসাশ্রিত একখানি উচ্চ অঙ্গের কাব্যগ্রন্থ। ইহা সুরুচি-সম্ভূতা উদারভাবোদ্দীপিকা কল্পনাশক্তির উদা-হরণস্থল। ইহার ভাষাটি একটু মার্জ্জিত ও বিশদ হইলে আরও রমণীয় হইত। পাঠকদিগের প্রদর্শনার্থ বৃত্রসংহারের কিয়দংশ নিম্নভাগে উদ্ধৃত হইল।

নৈমিষারণ্যে অবস্থিতা শচীকে, মাতা ঐন্দ্রিলার দাসী করিয়া আনিয়া দিবার জন্য রুদ্রপীড়ের তথায় গমনের পর, রুদ্রপীড়পত্নী ইন্দুবালার সহচরী রতি সমীপে খেদ—

> কহে ইন্দুবালা, ফেলি গাঢ়শ্বাস, নেত্র আর্দ্র অশ্রুজলে,
> "বীরপত্নী হায়, সবার পূজিতা, সকলে আমায় বলে!
> পতি যোদ্ধা যার, তাহার অন্তরে, কত যে সতত ভয়,
> জানে সে কজন, ভাবে সে কজন, বীরপত্নী কি সে হয়!

কতবার কত, করেছি নিষেধ, না জানি কি যুদ্ধপণ।
যশ-তৃষা হায়, মিটে নাকি তাঁর, যশ কি স্বাদু এমন!
পল অনুপল, মম চিত্তে ভয়, সতত অন্তরে দহি।
সে ভয় কি তাঁর, না হয় হৃদয়ে, সমরের দাহ সহি!"
কহিয়া এতেক, উঠি অন্য মনে, অস্থির-চরণে গতি,
ভ্রমে গৃহ মাঝে, গৃহসজ্জা যত নেহালে যতনে অতি।

*   *   *   *   *

সকলি কোমল, প্রিয়ের আমার, সমরে শুধু নিদয়,
হেন সুকোমল, হৃদয় তাঁহার, কেমনে কঠোর হয়!
আমিও রমণী, রমণীও শচী, তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া, হইয়া নিষ্ঠুর, ধরিতে গেলা ধরায়?
কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই, মহাবীর পতি মম!
আমিও যদ্যপি, পড়ি সে কখন, বিপদে শচীর সম!
ভাবিতে সে কথা, থাকিয়া এখানে, আমার (ই) হৃদয় কাঁপে!
না জানি একাকী, গহন কাননে, শচী ভাবে কত তাপে!
ঐন্দ্রিল-দুহিতা, সেবিতে কিঙ্করী, স্বর্গে কি ছিল না কেহ?
ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বরী, দানবমহিষী, দাসী চাহি ভ্রমে সেহ!
আমারে না কেন, কহিলা মহিষী, আমি সেবিতাম তাঁয়।
পুরে না কি তাঁর, সাধের ভাণ্ডার, শচী না সেবিলে পায়?
কেন আ(ই)লা দৈত্য, এ অমরালয়ে, আছিল আপন দেশ;
পরে দিয়া পীড়া, লভিলা এখন, কি আশা মিটিবে শেষ!
যার দিয়া তারে, ফিরি যদি দেশে, যান পুনঃ দৈত্যপতি;
এ পোড়া আশঙ্কা, এ যন্ত্রণা যত, তবে সে থাকে না রতি!"

ছায়াময়ী—পদ্যকাব্য,—পল্লবনামক সপ্ত পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ইহার স্থূল বিবরণ এই যে, কোন ব্যক্তি প্রিয়তমা কন্যার মৃত্যুতে শোকাকুল হইয়া কন্যার শব ক্রোড়ে করিয়া নানাদেশ পরিভ্রমণ করে। অনন্তর একদিন সন্ধ্যা

সময়ে নদীকূলবর্ত্তী এক শ্মশানে শব স্থাপনপূর্ব্বক তৎসন্নিধানে বসিয়া শ্মশানস্থ ভূত, প্রেত, পিশাচদিগের ক্রীড়া কৌতুকাদিদর্শনে—শরীরের ধ্বংসেই জীবাত্মার ধ্বংস হয় কি না?—পরকাল ও তাহার সুখ দুঃখ প্রভৃতি মনুষ্যের কল্পনামাত্র কি না?—আমার সেই প্রিয়তমা কন্যা কি এই পিশাচীদের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে, কি, কি করিতেছে?—ইত্যাদি বিবিধরূপ চিন্তা তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল। সেই চিন্তার সমকালেই জ্যোৎস্নাময় গগনদেশ হইতে এক দেবী তাহার সন্নিধানে আসিয়া তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধদেশে চলিয়া গেলেন এবং নক্ষত্র-লোকে উপস্থিত হইয়া তাহাদের অভ্যন্তরভাগে পাপাচারী জীবাত্মাদিগের নানাবিধ নরক যাতনা প্রদর্শন করাইলেন এবং বিশ্বকেন্দ্রস্থ ধর্ম্মরাজের বিচার-প্রণালী দেখাইবার পর তাহাকে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যভূমিতে আনিয়া বলিয়া দিলেন যে, আমিই তোমার সেই কন্যা—এক্ষণে অশরীরিণী হইয়াছি।

গ্রন্থকারের কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি যেরূপ উচ্চ, তাহা বৃত্তসংহারকাব্যের সমালোচনায় বলা হইয়াছে; এ কাব্যেও তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। তিনি কাব্যে নরক ও যমের ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতির যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, সত্য কি অসত্য, তাহা বলিবার যো নাই; কারণ উহার প্রমাণ সংগ্রহার্থ ইচ্ছা করিয়া এখন তথায় যাইতে, বোধ হয়, কেহই প্রস্তুত হইবে না!—ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে পরকালাদি বিষয়ের যেরূপ প্রশ্ন সকল উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে আশা জন্মিয়াছিল—যে সে সকল প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা হইবে। কিন্তু তাহা কিছুই হয় নাই। ছায়াময়ী শেষে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অস্পষ্ট বাক্যমাত্র। মেঘনাদবধ কাব্যে মায়াদেবী রামচন্দ্রকে নরকযন্ত্রণা ও স্বর্গসুখ দুইই দেখাইয়াছেন, কিন্তু ছায়াময়ীর পিতার অদৃষ্টে নরকদর্শন ভিন্ন আর কিছুই ঘটে নাই। পরকালে স্বর্গ নরক দুই আছে বলিয়াই সাধারণের সংস্কার! যিনি পাঠকদিগকে একটির বিভীষিকা দেখাইলেন, অপটির প্রলোভনও তাঁহার দেখান কর্ত্তব্য ছিল।

আর এক কথা, গ্রন্থকার নরকবাসীদিগের মধ্যে টৈটস্ ওট্‌স্, নীরো, কংস, সিরাজ-উদ্দৌলা, ক্লিওপেট্রা প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়াছেন, এবং

তন্মধ্যে অশুচি প্রণয়ে আসক্তা বলিয়া ভারতচন্দ্রের বিদ্যাকেও নরকে ফেলিয়াছেন। কিন্তু অন্নদামঙ্গল পাঠ করিয়া বিদ্যাকে অসতী বলিয়া, বোধ হয়, কাহারও প্রতীতি জন্মে না। ভারতের বিদ্যা অসতী হইলে কালিদাসের শকুন্তলাও অসতী হইয়া পড়েন!

দশমহাবিদ্যা—ইহা একখানি ক্ষুদ্র গীতিকাব্য। কবি ইহাতে যে সকল স্বোদ্ভাবিত নানাবিধ নূতন ছন্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি বিলক্ষণ মধুর হইয়াছে। দশমহাবিদ্যা বলিলে পাঠকগণ যাহা বুঝেন, ইহা ঠিক তাহা নহে। সতী-শরীর-ধ্বংসের পর মহাদেব বিলাপ করিয়া বিচেতন হইলে নারদ সেই স্থানে আসিয়া গান ও বীণাবাদন করিলেন। বিশ্বনাথ তাহাতে প্রাপ্তচেতন হইয়া নারদকে কহিলেন যে 'সতীকে আমি দেখিতে পাইতেছি'। 'সতী এক্ষণে কোথায়?' এই কথা নারদ জিজ্ঞাসা করিলে, মহাদেব মহাকাশমধ্যে সিংহ কন্যা প্রভৃতি দশটি রাশির স্থানে দশটি মহাপুরী দশমহাবিদ্যা নামে দেখাইয়া দিলেন, এবং সেই প্রসঙ্গে তন্ত্রকথার অনেক রহস্য নারদকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। ওরূপ নিগূঢ় তত্ত্ব রহস্যের উদ্‌ভেদ করিয়া পাঠকগণকে বুঝান আমাদের এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। অতএব আমরা সে বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম। বৃত্রসংহার, ছায়াময়ী, ও দশ মহাবিদ্যা এই তিন খানি পুস্তক পাঠ করিয়া হেমবাবুকে 'আন্তরীক্ষ কবি' বলিতে আমাদের ইচ্ছা হইতেছে। কারণ, দেখা যাইতেছে যে, তিনি পার্থিব পদার্থ অপেক্ষা অন্তরীক্ষস্থিত পদার্থের বর্ণন করিতে অধিক ভাল বাসেন;—স্বর্গ, সুরপুরী, সুমেরু, বিদ্যুৎ, বজ্র, গ্রহগণ, নক্ষত্রমণ্ডল, রাশিচক্র স্থান প্রভৃতির বর্ণনা করা এবং তন্মধ্যে কল্পনাপ্রসূত নানাবিধ নিগূঢ় তাৎপর্য্যের স্থাপন ও ব্যাখ্যা করা তাহার নিদর্শন। হেমবাবু ইংরেজিতে সুশিক্ষিত উচ্চাশয়-সম্পন্ন লোক; অতএব তাঁহার কবিতা সকল বিমলরুচিসম্পন্ন নব্য সম্প্রদায়ের প্রীতিকর হইবে, তাহার উল্লেখ করাই বাহুল্য।

দশমহাবিদ্যায় প্রকাশিত একটি নূতন ছন্দের কিয়দংশ নিম্নভাগে উদ্ধৃত হইল—

"রে সতি, অরে সতি! কান্দিল পশুপতি, পাগর শিব প্রমথেশ॥
সেহ যোগ সাধন, কি হেতু ঘুচাইলি, ভিক্ষুকে বসাইলি ঘরে।
কি হেতু তেয়াগিলি, কেনই সমাপিলি, সে সাধ এত দিন পরে॥
রে সতি রে সতি! কান্দিল পশুপতি, পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগমগন হর, তাপস যত দিন, ততদিন না ছিল ক্লেশ॥"

বীরবাহু কাব্য ও কবিতাবলী—এই নামে হেমবাবুর রচিত আরও দুই খানি পদ্য গ্রন্থ আছে। প্রথমখানি ইতিবৃত্ত অবলম্বনে রচিত ও প্রণালী-বদ্ধ; দ্বিতীয় খানি পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার সংগ্রহ। হেমবাবুর কবিত্ব ও কল্পনা শক্তি এ দুই পুস্তকেও যথেষ্ট পরিমাণেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ।

ইনি কলিকাতা যোড়াসাকোর প্রসিদ্ধ কায়স্থ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ স্যার টমাস রম্‌বোল্ড ও মিঃ মিড্‌লটনের নিকট মুরশিদাবাদে ও পাটনায় দেওয়ানি করিতেন। দেওয়ান শান্তিরাম নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, তিনি ৺কাশীধামে শিব স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুই পুত্র প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ। জয়কৃষ্ণের পুত্র নন্দলাল—তিনিই ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের জনক।

কালীপ্রসন্ন সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরেজি তিন ভাষাতেই সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিপুল ব্যয়ে ও বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে তিনি মূল সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন এবং উহা বিনা মূল্যে বিতরণ করেন। এই অনুবাদ কার্য্যে আট বৎসরকাল (১৭৮০-১৭৮৮ শক) লাগিয়াছিল। এই কার্য্যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে ও অপরিমিত অর্থব্যয়ে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। মহাভারতের অনুবাদ জন্য তাঁহাকে এসিয়াটিক সোসাইটির মুদ্রিত পুস্তক, শোভাবাজার রাজবাটীর হস্তলিখিত পুস্তক, ৺আশুতোষ দেব ও মহারাজ

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুস্তকাগারস্থিত হস্তলিখিত কতকগুলি প্রাচীন পুস্তক অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কাশী হইতে তাঁহার প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ একখানি প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতেও বিশেষ উপকার হইয়াছিল। মহাভারতের ব্যাসকূটের সন্দেহভঞ্জনার্থ সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও তথাকার অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির সাহায্যপ্রাপ্ত হন। এই সুবৃহৎ কার্য্যসমাপন জন্য বহু পণ্ডিত নিযুক্ত হন, তন্মধ্যে চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্য, অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সমধিক পরিশ্রম করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং অনুবাদকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন।

ভারতানুবাদের উপসংহারে, সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"হিন্দু সমাজের শিরোভূষণস্বরূপ সুবিখ্যাত 'শব্দ কল্পদ্রুম' গ্রন্থকার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে আমাকে প্রার্থনাধিক সম্মানিত ও উপকৃত করিয়াছেন। রাজা বাহাদুর প্রতিদিন সায়ংকালে আমার অনুবাদিত গ্রন্থের আনুপূর্ব্বিক পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে অনুবাদবিষয়ক বিবিধ সৎপরামর্শ দ্বারা আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি বিখ্যাত হিন্দু দলপতিরা আমার নির্দ্দিষ্ট পাঠক ছিলেন"।

বর্ত্তমান কালে প্রাঞ্জল ও সরল অনুবাদে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতই আদর্শরূপে পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইয়া থাকে। ইহার 'হুতোম পেচার নক্সা' বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব সামগ্রী। ইহা পাঠে কলিকাতার তৎকালীন বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ অবস্থায় সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। নক্সার ভাষা অতি সুন্দর। লোকে সাধারণতঃ যেরূপ চলিতশব্দ ব্যবহার করে, ইহা সেইরূপ ভাষাভেই রচিত। 'হুতোম' তখনকার সকল সমাজের একটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গকাব্য, গদ্যে লিখিত।

মাইকেল যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন, কালীপ্রসন্নসিংহই তাহা প্রথমে 'হুতোম পেঁচায়' ব্যবহার করিয়াছিলেন। হুতোমে উৎসর্গটি এইরূপ :—

'হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে
রহস্য রসে রঙ্গে, চিত্রিনু চরিত্র,
দেবী সরস্বতী বরে। কৃপাচক্ষে হের
একবার; শেষে বিবেচনা মতে যার
যা অধিক আছে, তিরস্কার কিম্বা
পুরস্কার, দিও তাহা মোরে,
বহুমানে লব শির গতি।"

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

১২৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা নিমতলা পল্লীতে বিহারিলাল জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজে ইঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। বাল্যকাল হইতেই ইনি কবিতা রচনা করিতেন, তাহারই ফলে তাঁহার 'বঙ্গসুন্দরী' 'সারদা মঙ্গল' 'সাধের আসন' 'নিসর্গ সন্দর্শন' 'বন্ধুবিয়োগ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। ইংরাজ কবি Blake যেমন ইংলণ্ডে একটা নূতন সুরে নূতন ঝঙ্কারে তাঁহার বীণা বাজাইয়াছিলেন, আমাদের মধ্যে বিহারিলালও তদ্রূপ একটা অপরিচিত-পূর্ব্ব মনোমোহন-নবীনতায় তাঁহার সমসাময়িক কাব্যসাহিত্য অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। স্বচ্ছতরল সরিতের মত তাঁহার ভাষার সহজ হিল্লোল আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে।

"নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুল-হার!
মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,

সমুখে সে মুখ-শশী জাগে অনিবার!
কি জানি কি ঘুম ঘোরে,
কি চোকে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতেরে পারিব না আর!
তবুও ভুলিতে হবে,
কি লয়ে পরাণ রবে,
কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাই বারে বার!
কুসুম-কানন মন
কেন রে বিজন বন,
এমন পূর্ণিমা-নিশি যেন অন্ধকার!
হে চন্দ্রমা, কার দুখে
কাঁদিছ বিষণ্ণ মুখে!
অয়ি দিগঙ্গনে কেন কর হাহাকার!
হয় তো হলনা দেখা,
এ লেখাই শেষ লেখা,
অন্তিম কুসুমাঞ্জলি স্নেহ-উপহার,—
ধর ধর স্নেহ-উপহার!

সারদা মঙ্গলই ইঁহার সর্ব্বপ্রধান কাব্য। এই কাব্যের আলোচনা করিতে হইলে কবির মনোভাবের মূলমন্ত্র কি অর্থাৎ কবি কি ভাবে তাঁহার সারদার আরাধনা করিয়াছেন তাহা বুঝা আবশ্যক। এই মূলমন্ত্রটি বুঝিতে পারিলেই কাব্যটি সুগভীর ভাব মাহাত্ম্যের মধ্যেও অতিশয় সরল ও স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীত হইবে। ইঁহার ভাষা সর্ব্বত্র প্রায় সরল, স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহিণী; কিন্তু ইহার ভাব-সম্পৎ তত সহজবোধ্য নহে। তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে। মানুষ সঙ্গী ব্যতীত একাকী থাকিতে পারে না। জগতের সম্বন্ধে যাঁহারা সঙ্গী তাঁহারা চিরস্থায়ী নহেন। তাই সাধক বিশ্বনিয়ন্তা আদিপুরুষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ব্যস্ত হন। জগতে মানুষ যে সকল

সম্বন্ধে মানুষের সহিত সম্বন্ধ তাহাই সে ভাল বুঝে, তাই ভগবানকে আপনার করিতেও সেই সম্বন্ধের কোনও একটির মধ্যে আনিয়া ফেলে। বৈষ্ণবেরা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে ভগবৎসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তন্ত্রে মাতৃ, কন্যা ও পত্নীভাবে সাধনের ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণবের মধুর ভাবের ভজনে নিজের পুরুষাভিমান দূর করিতে হইবে, নিজেকে স্ত্রীকে হইতে হইবে। কিন্তু নিজের পুরুষভাব রক্ষা করিয়াও মধুর-রস আস্বাদ করিবার এক উপায় সাধকগণ কেহ কেহ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই সাধনাই পত্নীভাবে ইষ্টদেবীলাভ। কবিও তাঁহার ইষ্টদেবী সারদাকে পত্নীরূপে ভজনা করিয়াছেন এবং প্রাণ-মাতোয়ারা ললিত স্বচ্ছন্দে ভাব-তরঙ্গের উল্লাস-কল্লোলে আত্মহারা হইয়া কখন আগ্রহ, কখন মিলন, কখন বিরহ, কখন উৎকণ্ঠার মোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। স্থানে স্থানে গ্রাম্যতা দোষ দুষ্ট হইলেও সাধক কবির প্রাণের ভাব, সহজ ভাষায়, সহজ উপমাতেই হৃদয় স্পর্শী।

কবি হিমালয়ের বিরাট ভাব বর্ণনায় বলিয়াছেন—

"পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে ;
সমুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।

* * * * *

ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে, বুকে খেলা করে ধেয়ে,
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে।
জ্বলন্ত-অনল-ছবি,
ধ্বক্ ধ্বক্ করে রবি,
কিরণ জ্বলন-জ্বালা মালা শোভে গলে॥"

'দেবরাণী' 'মায়াদেবী' প্রভৃতি কবির আরও কয়েকটি কবিতা আছে, কিন্তু

'সারদা মঙ্গল'ই কবির অমর কীর্ত্তি। ঐ গ্রন্থ-পাঠে প্রীত হইয়া কোন সম্ভ্রান্ত সীমন্তিনী 'সাধের আসন' নাম দিয়া একখানি স্বহস্তরচিত আসন কবিকে উপহার দেন এবং তাহাতে 'সারদা মঙ্গল' হইতে "হে যোগেন্দ্র যোগাসনে, ঢুলু ঢুলু ঢুনয়নে, বিভোর বিহ্বলমনে কাঁহারে ধেয়াও" এই শ্লোকার্দ্ধ সুন্দর অক্ষরে বুনিয়া দেন। ইহারই উত্তরে সারদামঙ্গলের উপসংহাররূপে কবি 'সাধের আসন' নামক কাব্য লিখেন। এটি ততদূর সফল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কবির ভাবে অস্পষ্টতা ও অসংলগ্নতা দোষ দৃষ্ট হয়। তাঁহার ভাষায় স্থানে স্থানেও যতিভঙ্গ ও গ্রাম্যতা দোষ আছে। 'দেদার' 'চুলবুলে' 'কিবে', 'গোরৈ', 'আয়া' 'ঢুমিনিটে' 'ঢুনিয়ায়' ইত্যাদি অপ্রচলিত শব্দের পরিবর্ত্তে প্রচলিত শব্দের প্রয়োগ করিলেই ভাল হইত। 'সাধের আসনে' নন্দন কাননে যেখানে কবি ঘুমন্ত সারদাকে 'উঠ প্রেয়সী আমার' সম্বোধনে জাগাইতেছেন, সেখানটির মত সরল বর্ণনা বাঙ্গালা ভাষায় বোধ হয় খুব বিরল।

সুরেন্দ্রনাথ—যশোহর জেলার অন্তর্গত জগন্নাথপুর গ্রামে ১২৪৪ সালের ২৫শে ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই পিতৃহীন হওয়ায় ও উপার্জ্জনক্ষম দ্বিতীয় ব্যক্তি সংসারে না থাকায় সাতবৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আইসেন এবং ১২৫৫ সালে ফ্রিচর্চ্চ ইনিষ্টিটিউসনে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু লেখা পড়া বেশী হয় নাই। ১২৬৬ সালে ইনি অপস্মার রোগগ্রস্ত হন। ১২৮৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি মহাভারতের 'কিরাতার্জ্জুনীয়', ইংরাজি কবি পোপের 'ইলাইসা এবিলার্ড' গোল্ডস্মীথের 'ট্রাভ্লার', মুরের 'আইরিস্ মেলডির' কয়েকস্তবক পদ্যে অনুবাদ করেন।

১২৭৮ সালে বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য তিনি মুঙ্গের যাত্রা করেন এবং পীরপাহাড়ে অবস্থান করেন। এই বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশেই তাঁহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কাব্য 'মহিলা' রচিত হয়। মহিলা কাব্যের অবতরণিকায় সুরেন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন :—

"গাবো গীত খুলি' হৃদিদ্বার
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার।"

আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া একথা বলিতে পারি যে 'মহিলার' কবি এই 'সত্য' পালনে

সর্ব্বতোভাবে সফল-কাম হইয়াছেন। বাঙ্গালীর হৃদয়ে ও বাঙলার আকাশে এই মন্ত্রগীতি চিরদিন প্রতিধ্বনিত থাকিবে।

"যে প্রগাঢ় কাব্য পড়ি আননে তোমার
বুঝাইতে ব্যগ্র হয় মন
যুক্ত বাক্য যোগাতে না শক্তি রসনায়
হৃদে ক্ষোভ মূকের স্বপন।"

'মহিলা'র প্রথম অংশে অবতরণিকা ও মাতা এই দুইটি ভাগ আছে। 'মহিলা' কাব্যের মাতৃস্তুতি আমাদের অন্তরাত্মাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। কবির আন্তরিক প্রগাঢ় মাতৃভক্তিই এই কাব্যের জননীস্বরূপা।

"জনন, পালন, পুন শোধন, তোষণ,
জননী এ সকল কারণ ;—
যাঁর প্রেম-সিন্ধুপরে, মায়ার তরঙ্গ ভরে,
বিশ্ব-বিম্ব বিহরে লীলায় !
প্রসীদ, প্রসন্নমনা জননী আমার !"

ইহার দ্বিতীয় অংশ জায়া বর্ণনায় পূর্ণ। এই অংশ ঐ সালের ১০ই ফাল্গুন বাগবাজারে লিখিত হয়। আলোচ্য কবিদ্বয় সমসাময়িক এবং তাঁহারা 'উভয়েই এক ভাবের ভাবুক, এক পথের পথিক, এক উপাস্যের উপাসক, একই লক্ষ্য-যুক্ত এবং একই প্রাণে অনুপ্রাণিত" ছিলেন।

কবিদ্বয় তাঁহাদের সাধ্যবস্তু নারীজাতিকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন এবং কিরূপ উচ্চাসন প্রদান করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

বিহারিলাল—

জগতের তুমি জীবিতরূপিণী—
জগতের হিতে সতত রতা
পুণ্য তপোবন সরলা হরিণী,—
বিজনকানন কুসুমলতা !—

প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের সাগর,
করুণানিলয়, দয়ার নদী,
হ'ত মরুময় সব চরাচর
না থাকিতে তুমি জগতে যদি ।

সুরেন্দ্রনাথ—

বাক্যে গুণ কি বলিব ললনা তোমার
ভাবিয়া না হৃদে পায় পার,
হেন বিজ্ঞ কেবা, যে হইবে টীকাকার
বিধির বিচিত্র কবিতার ?
তুমি লক্ষ্মী নিলয়ের,
বাণী কাব্য মানসের,
ভ্রূবিলাসী ধীমূর্ত্তি দুর্গার,
রাসরসময়ী রাধা প্রেমিক আত্মার ।
সবিলাস বিগ্রহ মানস সুষমার,
আনন্দের প্রতিমা আমার,
সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার,
মুগ্ধমুখী মুরতি মায়ার,
যত কাম্য হৃদয়ের,
সংগ্রহ সে সকলের,—
কি বুঝাব ভাব রমণীর ?
মণিমন্ত্র মহৌষধি সংসার ফণীর ।

সুরেন্দ্রনাথ—

বিষয় মদিরা পানে মত্ত চিত যার
তারে কি পারিব বুঝাইতে ?—
ধাতার করুণা মর্ত্তে নারী অবতার
নর হৃদি বেদনা বারিতে ;

তার মনে আছে স্থির,
কাম-পিপাসার নীর,
নারীর কি প্রয়োজন আর !—
ভোগের পদার্থ নারী গরিমা কি তার !
হে বর্ব্বর নর ! গতি কি হ'তো তোমার,
বিহনে অঙ্গনা অবতার !
কে গাঁথিত প্রেম সূত্রে সমাজের হার,—
পিতা, মাতা, কুমারী, কুমার !
দয়া ধর্ম্ম শিখাইয়া,
কোমল করিয়া হিয়া,
কে করিত সভ্যতা স্থাপনা ;—
কে পুরাতো স্বর্গচ্যুত আত্মার কামনা !

* * *

সেই দেশ সভ্য, যথা ললনা পূজিতা,
কাব্য শ্রেষ্ঠ, নারী-বর্ণনায়,
সেই গৃহ, হৃদে যার নারী বিহরিতা,
পরিবার, নারী তুষ্টা যায় ;
অধ্যাত্ম বিদ্যার সার,
রীতিজ্ঞান ললনার,
নারী কর্ম্ম ধর্ম্ম এ সংসারে,
সেই ধন্য পুরুষ, আদরে নারী যারে।

বিহারীলাল— হেন ধরাধাম থাকিতে সম্মুখে
সুরলোকে লোকে কেন রে ধায়।
নরে কি অমরে আছে মনোসুখে,
যদি কেহ মোরে সুধাতে চায়।—
অবশ্য বলিব নারীর মতন
সুখশান্তিময়ী অমৃতলতা,

নাই যেই স্থানে নহে সে এমন,
শচী পারিজাত কপোলকথা!
এ মর্ত্ত্যভুবন কমল কাননে
নারী সরস্বতী বিরাজ করে!
কবে সমাদরে, সদানন্দ মনে,
পূজিতে তাঁহারে শিখিবে নরে।

নবীন চন্দ্র সেন।

১৭৬৮ শকের (১৮৪৬ খৃঃ অব্দে) ২৯ শে মাঘ চট্টগ্রাম জেলায় রাউজান থানার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে নবীন চন্দ্রের জন্ম হয়। নবীন চন্দ্রের পিতা ৺ গোপী মোহন রায় * চট্টগ্রাম জজ আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন, পরে মুন্সেফ হন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন, সুতরাং মুন্সেফি কার্য্যের আয়ে তাঁহার ব্যয় সংকুলান না হওয়ায় তিনি ঐ কার্য্য ত্যাগ করিয়া চট্টগ্রামের জজ আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। এই স্থানের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় নবীনচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। বাল্যে তিনি বড়ই দুরন্ত ছিলেন, তাঁহার দুষ্টামিতে তাঁহার সহপাঠিগণ এমন কি তাঁহার শিক্ষকগণ পর্য্যন্তও অস্থির হইয়া উঠিতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ পাইতে থাকে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে নবীন চন্দ্র চট্টগ্রামের স্কুল হইতে প্রবেশিকাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আইসেন। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ্, এ, পাস করেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ ১৮৬৭ সালে বি, এ, পরীক্ষার তিন মাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। এই সময় হইতেই একটি বৃহৎ সংসারের ভার তাঁহার উপর পড়ে। পর বৎসর তিনি বি, এ, পাস করেন এবং কয়েক মাসের

* ইঁহাদের বংশের উপাধি রায়। কবি তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন:—"রায়" সম্মান সূচক উপাধি বলিয়া আমরা কেহ কেহ নিজ নামে তাহা ব্যবহার না করিয়া আপনাদের জাতীয় উপাধি "সেন" ব্যবহার করিতেছি।" আমার জীবন, ১ম ভাগ, ৪ পৃষ্ঠা।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

মধ্যে প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর নানা স্থানে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৩১ শকে (১৯০৯ খৃঃ অব্দের ২৩ শে জানুয়ারি) চট্টগ্রামের স্বীয় বাস ভবনে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিয়াছে। বাল্যকাল হইতেই তিনি কবিতা প্রিয় ছিলেন। পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি নানাবিষয়ে কবিতা লিখিয়া অনেক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন। নিম্ন লিখিত কাব্যগুলি তাঁহার রচিত।

(১) অবকাশ রঞ্জিনী ১ম ভাগ। (২) অবকাশ রঞ্জিনী ২য় ভাগ। (৩) পলাশীর যুদ্ধ (৪) রঙ্গমতী (৫) রৈবতক (৬) কুরুক্ষেত্র (৭) প্রভাস (৮) অমিতাভ। (৯) ভানুমতী। (১০) গীতা। (১১) চণ্ডী (১২) খৃষ্ট (১৩) প্রবাসের পত্র। 'আমার জীবন' নামক তাঁহার আত্ম-জীবনীর প্রথম খণ্ড তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার শৈশব ও কৈশোর জীবনের ঘটনাবলী বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

অবকাশ রঞ্জিনী—কবির প্রথম বয়সের শোক ও বিষাদের কাতরতা ও নব-পরিণয়ের মোহ প্রভৃতি লইয়া রচিত। **পলাশীর যুদ্ধ**—বীরত্ব, ওজস্বিতা ও করুণরসে পূর্ণ এবং সবিশেষ কবিত্বের পরিচায়ক। এক কথায় পলাশীর যুদ্ধই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। **রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, ও প্রভাস**—সুভদ্রার পরিণয়, উত্তরার বৈধব্য ও শ্রীকৃষ্ণের লীলাবসান লইয়া রচিত। তাঁহার সুভদ্রা, সুলোচনা, উত্তরা, রুক্মিণী ও সত্যভামা—ভক্তি, স্নেহ, সরলতা, বিনয়, ও অভিমানপূর্ণ ভালবাসার জীবন্তমূর্ত্তি। তাঁহার অর্জ্জুন, কৃষ্ণ ও ব্যাসদেব শৌর্য্য, মহত্ত্ব ও জ্ঞানের অবতার।

'অমিতাভে' বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত ঘটনা সুললিত ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। কবি এই কাব্যে যে সাম্যবাদের চারুচিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, মহানির্ব্বাণ যাহার পরিসমাপ্তি,—সেই সাম্যবাদ, কবি সরস কৃষ্ণ-প্রেমের মধুরভাবে সিক্ত করিয়া তাঁহার কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসে জনসমাজে প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দুর পুরাণ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া, তাহা হইতে অলৌকিক ঘটনাবলী উঠাইয়া দিয়া এবং ইচ্ছামত উহাকে পরিবর্ত্তিত ও পাশ্চাত্য

সাজে সজ্জিত করিয়া কবি এক অভিনব ইতিবৃত্তের অবতারণা করিয়াছেন। ভৃগুপদ-চিহ্নধারী, গো ব্রাহ্মণ-হিতে রত শ্রীকৃষ্ণ রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণের পাদধৌত করিবার ভার গ্রহণ করেন, কিন্তু কবি তাঁহার মুখ দিয়া—

"দেখ ধনঞ্জয়!
ব্রাহ্মণের অত্যাচার কথায় কথায়
অভিশাপ; অভিমান অঙ্গের ভূষণ,"

প্রভৃতি বলাইয়া ব্রাহ্মণের "বিষদন্ত উৎপাটনের" যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা তাঁহার পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফল। রৈবতক কাব্যের "সোঽহং" শীর্ষক দ্বাদশসর্গের ব্যাসদেব ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনে জাতিভেদ সম্বন্ধে আলোচনাও ঐ শিক্ষার ফল। কবির মৃত্যুর পর শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার অসম্পূর্ণ 'অমৃতাভ' নামে চৈতন্য চরিত প্রকাশিত করিয়াছেন।

রামদাস সেন।

মুরসিদাবাদ বহরমপুরে বঙ্গজ কায়স্থকুলে ১২৫২ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ (খৃঃ ১৮৪৫, ১০ই ডিসেম্বর) রামদাস সেনের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম লালমোহন সেন। রামদাসবাবু জমিদার-সন্তান। তিন বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে, তিনি স্নেহময়ী জননী প্রভৃতির যত্নে লালিতপালিত হন। কিছুকাল বাড়ীতেই বাঙ্গালা ও ইংরাজী কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া পরে বহরমপুর কলেজে ভর্ত্তি হন। ভূগোল, ইতিহাস ও কবিতা পাঠে তিনি সমধিক আনন্দ পাইতেন, গণিত তাঁহার ভাল লাগিত না। সুকুমার বয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। 'প্রভাকর' সংবাদপত্রে তিনি সময়ে সময়ে কবিতা লিখিতেন, পরে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

বাল্যকাল হইতেই রামদাস বাবু পুস্তক পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন। বাঙ্গালা ইংরাজি সকল পুস্তকই তিনি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন এবং কোন নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইলেই তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া নিজ পুস্তকাগারে রাখিতেন। ইহারই ফলে বহরমপুরে তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠা। স্বর্গীয় গ্রন্থকারের সহিত রামদাস বাবুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি যৎকালে

ডাক্তার রামদাস সেন।

Printed by K. V. Seyne & Bros.
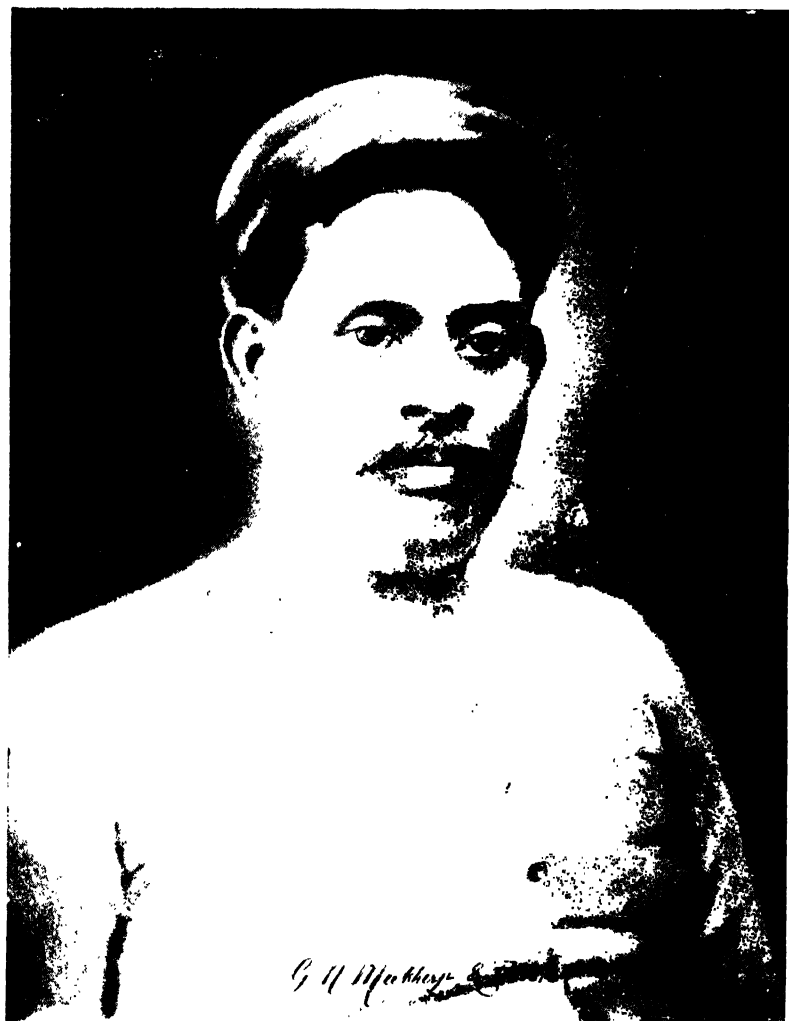
বহরমপুর কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক ছিলেন তখন রামদাস বাবু তাঁহার ছাত্র ছিলেন এবং রামদাস বাবুর ঐকান্তিক যত্নে ও আগ্রহে বহরমপুরে এই পুস্তকের জন্ম। এ বিষয়ে গ্রন্থকার ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল:—"এ স্থলে আমার প্রিয়তম ছাত্র বহরমপুর নিবাসী পরম ক্ষেমাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেনের নাম পৃথক্ ভাবে উল্লেখ না করা আমার পক্ষে অনুচিত কার্য্য করা হয়। রামদাস ধনিসন্তান ও অল্পবয়স্ক পুরুষ, কিন্তু ধন ও বয়সের অল্পতা একত্র সমবেত হইলে সচরাচর যে সকল দোষের সংঘটন হয়, রামদাসে সে সকলের কিছুমাত্র নাই। রামদাস অতি বিনয়ী নিরহঙ্কার, প্রিয়ভাষী ও সদনুষ্ঠান-রত। বিদ্যানুশীলনই তাঁহার একমাত্র উপজীব্য। তিনি এ পর্য্যন্ত 'বিলাপতরঙ্গ', 'কবিতা লহরী' ও 'কবিতা কলাপ' নামে তিন খানি পদ্যপুস্তক রচনা করিয়াছেন এবং সর্ব্বদাই প্রধান প্রধান সাময়িক পত্রে স্বরচিত প্রবন্ধ সকল প্রকাশ করিতেছেন। তিনি নিজ ভবনে একটি উৎকৃষ্ট পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা যে সকল পুস্তক ক্রয় করিতে পাওয়া যায় সে সকল পুস্তকই প্রায় ঐ পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। আমি এই পুস্তকের রচনা সময়ে আবশ্যক বোধে যখন যে বাঙ্গালা পুস্তক দেখিতে চাহিয়াছি, রামদাস বাবু আহ্লাদ ও আগ্রহ সহকারে তখনই সেই পুস্তক আমাকে প্রদান করিয়াছেন। অধিক কি রামদাস বাবুর ঐ পুস্তকালয় নিকটে না থাকিলে বহরমপুরে থাকিয়া এই পুস্তক রচনা করা আমার পক্ষে কতদূর কঠিন হইত তাহা বলিতে পারি না"। বিদ্যালয় ত্যাগ করার পরও রামদাস বাবু পাঠে বিরত হন নাই এবং 'বঙ্গদর্শন' 'নব-জীবন' 'নব্যভারত' 'চারুবার্ত্তা' ও 'এণ্টি কোয়ারি' নামক মাসিক পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উহাই পরে 'ঐতিহাসিকরহস্য', 'ভারতরহস্য' ও 'রত্ন রহস্য' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক রহস্যে—ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয় আলোচিত এবং ভারত রহস্যে—প্রাচীন আর্য্য জাতির সমরপ্রণালী, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সমালোচিত হইয়াছে। রত্নরহস্যে—গজমুক্তা, ফণিমুক্তা, প্রবাল প্রভৃতি রত্নের স্থূল

স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি গভীর গবেষণামূলক এবং পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। অতঃপর তিনি ফ্লরেন্স (Florence) নগর হইতে সম্মান সূচক 'ডাক্তার' উপাধি প্রাপ্ত হন। "বুদ্ধদেব" নামক আরও একখানি গ্রন্থ তিনি মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত মণি মোহন সেন তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। নদীয়া জেলার হাটবোয়ালিয়া গ্রামে জমিদারী দেখিতে গিয়া সন্ন্যাসরোগে ১২৯৪ সালের ৩ রা ভাদ্র (১৮৮৭ সালের ১ লা সেপ্টেম্বর) তাঁহার মৃত্যু হয়। বহরমপুর কলেজের উত্তর পশ্চিম দিকে গঙ্গার ধারে তাঁহার প্রস্তরময়ীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

রজনীকান্ত গুপ্ত।

১৭৭১ শকে (১৮৪৯খৃঃ অব্দে) ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে বৈদ্যবংশে রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺কমলাকান্ত গুপ্ত। কমলাকান্তের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। রজনীকান্ত সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। গ্রাম্য বিদ্যালয়েই তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। ৭।৮ বৎসর বয়সে তিনি কঠিন জ্বর রোগে আক্রান্ত হন, সেই হেতু শ্রবণশক্তি জন্মের মত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তাঁহার শিক্ষার অনেকটা অন্তরায় ঘটে। এই অবস্থাতেও তিনি যথাকালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন এবং মাসিক ৪৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন।

পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি 'জয়দেব চরিত' প্রণয়ন করেন। অভিভাবকদের ইচ্ছা ও অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন না করিয়া আজীবন সাহিত্য সেবা করিয়া গিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' তাঁহার প্রধানকীর্ত্তি। ভাষা, ভাব, রচনাপ্রণালী ও ঐতিহাসিক বিবরণ প্রভৃতির পর্য্যালোচনা করিলে পুস্তক খানিকে বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারের একটি অমূল্যরত্ন বলিতে হয়। এই

৺ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ।

Printed by K. V. Seyne & Bros.

গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে তিনি গ্রন্থখানি শেষ করিয়া যাইতে পারিয়াছেন। এই গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি যেরূপ পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অর্থব্যয় করেন তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস সম্বন্ধে এমন কোন পুস্তক বা সরকারি কাগজপত্র নাই যাহা তিনি সংগ্রহ করেন নাই। 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' কোনও পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে, উহা একখানি মৌলিকগ্রন্থ। এদ্ব্যতীত তিনি আর্য্যকীর্ত্তি, নবভারত, ভারত-প্রসঙ্গ, ভীষ্মচরিত, বীরমহিমা, প্রতিভা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশই স্কুলপাঠ্য। ১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠার সময় ইনি লিওটার্ড সাহেব ও ৺ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহকারিতায় পরিষৎ-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৩০৭ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ইহার পরলোক হইয়াছে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু।

উদ্যম ও বুদ্ধি-কৌশলে ব্যক্তিমাত্রেই যে জীবনে উন্নতি করিতে পারেন, যোগেন্দ্রচন্দ্রের জীবনী তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যোগেন্দ্রের ন্যায় কর্ম্মঠ ও উদ্যমশীল ব্যক্তি প্রকৃতই অতি বিরল। ব্যবসায়-বুদ্ধি তাঁহার অতীব তীক্ষ্ণ ছিল এবং এই গুণাবলীই তাঁহার ভাগ্যোন্নতির মূলমন্ত্র। ১২৬১ সালের ১৬ই পৌষ বর্দ্ধমান জেলার ইলসারা গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে যোগেন্দ্রের জন্ম হয়; তাঁহার পৈতৃক নিবাস ঐ জেলার অন্তঃপাতী বেড়্ গ্রাম।

কিছুদিন গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়িয়া আট বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি হুগলী ব্রাঞ্চস্কুলে প্রবিষ্ট হন অতঃপর হুগলী কলেজে এফ, এ ক্লাস অবধি অধ্যয়ন করিয়া ভবিষ্যজী নর পথ নির্ব্বাচনে সযত্ন হন এবং 'সাধারণী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন; উহারই ফলে ১২৮৮ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ

কলিকাতায় প্রথম 'বঙ্গবাসী' প্রচারিত হয়। যোগেন্দ্রচন্দ্রের যত্নে ও উদ্যমে, রচনা ও লিপিচাতুর্য্যে 'বঙ্গবাসী' অচিরকালমধ্যেই তদানীন্তন শীর্ণ ও অল্পায়ুঃ সংবাদপত্রদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সংবাদপত্রের জন্মস্থান ইউরোপ; ইউরোপীয় আদর্শে ও দেশীয় ভাবের অদ্ভুত সমাবেশে 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের ইতিহাসে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

'সহবাস সম্মতি' আইনের আন্দোলনের পর ১২৯৭ সালের 'বঙ্গবাসীতে' গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে যোগেন্দ্রচন্দ্র অভিযুক্ত হন। পরে গবর্ণমেণ্ট ঐ অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্রকে অব্যাহতি দেন। তিনি 'দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একখানি দৈনিক পত্রিকা দশ বৎসরকাল প্রকাশ করেন। তাঁহার 'হিন্দী' বঙ্গবাসীরও যথেষ্ট প্রচার আছে।

যোগেন্দ্রচন্দ্র সংবাদপত্রের সঙ্গে যে বিরাট উপহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার ফলে বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে আজ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ বিরাজ করিতেছে। তিনি লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ সমূহের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া ধর্ম্ম ও সাহিত্যানুরাগ সম্বর্দ্ধন করেন। শাস্ত্রগ্রন্থগুলির মূলসমেত অনুবাদ প্রকাশ করিয়া তিনি জন-সাধারণের প্রভূত হিতসাধন করিয়াছেন।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রণীত 'মডেল ভগিনী' 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' 'নেড়া হরিদাস' 'চিনিবাস চরিতামৃত' 'বাঙ্গালী চরিত' 'মহীরাবণের আত্মকথা' 'কালাচাঁদ' প্রভৃতি পুস্তকে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা দিকের যথেষ্ট পুষ্টি সাধন হইয়াছে। তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে তিনি নাম প্রকাশ করেন নাই, তাঁহার লোকান্তরের পর গ্রন্থে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইতেছে। এই পুস্তকগুলির ভাষার একটি বিশেষ নূতনত্ব আছে; ভাষা শুধু যে আলোচ্য বিষয়ের উপযোগী তাহা নহে; ইহার বিশেষ কোন আড়ম্বর নাই, অথচ উহা এরূপ হৃদয়স্পর্শী যে পাঠক মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। দুই একটি চিত্র অতিরঞ্জিত হইলেও উহা দোষাবহ নহে, কেননা পুস্তকগুলির

উদ্দেশ্য লোক-শিক্ষা। যোগেন্দ্রচন্দ্রের ব্যঙ্গ যেরূপ তীব্রমধুর রচনাও তেমনি গুরুগম্ভীর; এতদুভয়ের অপূর্ব্ব সমাবেশে তাঁহার উপন্যাসগুলি একপ্রকার আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রদায় বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইলেও তাঁহার উপন্যাসের প্রভাব সম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ নহে। উচ্চ মনোবৃত্তি অর্থাৎ দয়া, স্নেহ, ক্ষমা, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদির উন্মেষ ও বিকাশে কাব্য ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি; যোগেন্দ্রচন্দ্রের চরিত্র চিত্রাঙ্কণেও ঐরূপ উদার প্রকৃতি, সদাশয়, কৃতজ্ঞ ও ক্ষমাশীল ব্যক্তির অভাব নাই, আবার অপর দিকে 'বকধার্ম্মিক' ভণ্ডেরও অপ্রতুল নাই। যখন চরিত্রাঙ্কণে উচ্চ প্রবৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিপুষ্টি দেখা যায়, তখন সাহিত্য জগতে তাঁহার উপন্যাস-গুলির মূল্য আছে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

স্বগ্রামের উন্নতিকল্পে তিনি একান্ত যত্নবান্ ছিলেন। তিনি গ্রামে ডাকঘর, বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন এবং হাট বসাইয়া ও পুষ্করিণী খনন করাইয়া গ্রামবাসীদের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি অসাধারণ কার্য্যকুশল ছিলেন। কর্ম্মচারী-মুখরিত বিরাট বঙ্গবাসী অফিসের যাবতীয় কার্য্যের উপর তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং তাঁহারই সুপরিচালনায় সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইত। অধস্তনকর্ম্মচারী-দিগের প্রতি তিনি স্নেহশীল ও দয়াবান্ ছিলেন। ১৩১২ সালের ২রা ভাদ্র তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্যপুত্র শ্রীযুত বরদাপ্রসাদ পিতৃকীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে বিশেষভাবে যত্নবান্ আছেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত।

রমেশচন্দ্র কলিকাতার রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্তবংশে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ঈশানচন্দ্র দত্ত লর্ড বেণ্টিকের আমলে এক-জন ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। খুল্লপিতামহ রসময় দত্ত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং ঐ সময়ের ছোট আদালতের জজ ছিলেন। কুমারী

৺তরুবালা দত্ত (যিনি ইংরাজীতে কাব্য লিখিয়া ইংরাজসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন) রমেশচন্দ্রের পিতৃব্য কন্যা। শৈশবে পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় রমেশচন্দ্র পিতৃব্য শশিচন্দ্র দত্তের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে রমেশচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হন, এবং এফ্, এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ৩রা মার্চ্চ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গুপ্তের সমভিব্যাহারে বিলাত যাত্রা করেন এবং তৎপর বৎসর তিনজনই 'সিবিল সারভিস' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রমেশচন্দ্র সংস্কৃতে সর্ব্বপ্রথম, ইংরাজিসাহিত্যে দ্বিতীয় এবং পরীক্ষায় গুণানুসারে তৃতীয় হইয়াছিলেন।

১৮৭১ হইতে ১৮৮২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় শাসন বিভাগে উচ্চপদ সমূহে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইনি বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনরের পদে উন্নীত হন। এ দেশীয়ের এই পদে নিয়োগ ইহাই সর্ব্বপ্রথম। এই রাজকার্য্য সম্পাদনকালে তিনি দেশের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যসাধন করিয়াছেন। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। যখন সরকারি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজিতে লিখিত। বঙ্কিম বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। বঙ্কিম বাবুর প্ররোচনায় তিনি বাঙ্গালা লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে ১৮৭৪ হইতে ১৮৮০ খৃঃঅব্দ মধ্যে তাঁহার চারিখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস, 'বঙ্গবিজেতা', 'মাধবীকঙ্কণ', 'জীবনপ্রভাত' ও 'জীবনসন্ধ্যা' প্রকাশিত হয়। গ্রন্থোক্ত ঘটনাবলী এরূপভাবে বিন্যস্ত যে পড়িতে আরম্ভ করিলে আগ্রহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহার 'জেলেখা' ও ভীলবালিকার চিত্র মনোমুগ্ধকর। উপন্যাসগুলিতে গ্রন্থকারের মানব চরিত্রের অভিজ্ঞতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষা বা শব্দসংযোগে বিশেষ লালিত্য, মাধুর্য্য বা পারিপাট্য না থাকিলেও ঘটনাবৈচিত্রে, চরিত্র ও নৈতিকবলে পুস্তকগুলি জনসমাজে বিশেষ আদর ও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা পূ ও বিশিষ্ট ইতিহাস-জ্ঞান তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রতিভাত হয়। নবীন বাবুর

ন্যায় তিনি ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা না করিয়া সময়োপযোগী ও স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত করায় উহা সহজ ভাষা ও বর্ণনার গুণে মনোজ্ঞ হইয়াছে। তিনি 'ঋক্‌বেদ সংহিতা'র বঙ্গানুবাদ করেন। 'সংসার' ও 'সমাজ' নামক আরও দুইখানি সামাজিক উপন্যাস তাঁহার শেষ বয়সে রচিত। ঐ দুই পুস্তকে তিনি বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহপ্রথা প্রচলন প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। উপন্যাস দুইখানি উল্লিখিতভাবে রচিত হইলেও গ্রন্থকার উহাতে স্বাভাবিক ঘটনা পরম্পরার এরূপ সুন্দর সমাবেশ করিয়াছেন যে, তৎপাঠে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদেরও ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই। রমেশচন্দ্র রাজনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য, ব্যবহারশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

বাঙ্গালা সাময়িক পুস্তিকা ও বাঙ্গালা সংবাদপত্র।

সাময়িক পুস্তিকা ও সংবাদপত্রে জনসাধারণের যেরূপ ভাষাচর্চ্চা হয়, অন্যরূপ পুস্তকদ্বারা বোধ হয় সেরূপ হয় না। ঐ সকল পুস্তিকা ও পত্র সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়, সুতরাং পূর্ব্ববারের পত্রে লিখিত বিষয় সকল পাঠ করিয়া, পর বারের পত্রে আবার কি নূতন বিষয় প্রকটিত হয়, তাহা জানিবার জন্য সহজেই পাঠকের মনে কৌতূহল জন্মে। সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানপ্রদ বিষয়ের কিয়দংশ কোন পত্রে পাঠ করিয়া আনন্দ জন্মিলে তাহার অবশিষ্ট পাঠ না করিয়া থাকা যায় না; মধ্যে বিশ্রাম পাওয়া যায় এজন্য কৌতূহল আরও একটু উদ্দীপ্ত হয়। সামাজিক ব্যবস্থার দোষগুণের উল্লেখ, রাজনীতিবিষয়ে বাদানুবাদ, ব্যক্তি বিশেষের উদারচরিত্র ও বিশাল কীর্ত্তির কীর্ত্তন, প্রধান পদস্থ পুরুষদিগের ন্যায়-অন্যায় ব্যবহারের উল্লেখ, এক স্থানে বসিয়া নানাদেশীয় নানাপ্রদেশীয় নানাবিধ ঘটনার সংবাদলাভ ইত্যাদি বিষয় সকল কাহার প্রীতিকর না হয়? সভ্যজন পদমাত্রেই সংবাদপত্র সাধারণের মুখস্বরূপ হয়—কারণ কোন বিবেচ্য

বিষয় উপস্থিত হইলে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত মতই লোকে প্রায় অবলম্বন করিয়া থাকে, এবং সেই সেই মতকে আপন আপন মত বলিয়া প্রচার করিতে সঙ্কুচিত হয় না;—ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকটিত হইলে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের তুমুল বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। ফলতঃ রাজ-পুরুষেরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংবাদপত্রে প্রকাশিত মতকেই প্রজাগণের সাধারণ মত বিবেচনা করিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন। দেশবিশেষে বিখ্যাত সংবাদ-পত্রই রাজ্যতন্ত্র পরিচালনের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া থাকে। 'টাইম্‌স' নামক সংবাদ-পত্রকেই অনেকে ইংলণ্ডের রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ফলতঃ যে কোন দেশের হউক না কেন, তদ্দেশের সংবাদপত্রের সংখ্যা দেখিলেই দেশীয় লোকের মনের ভাব ও জাতীয়ভাষার প্রতি অনুরাগ অনেক দূর বুঝিতে পারা যায়।

এই সংবাদপত্র ইংরেজ বাহাদুরদিগের আগমনের পূর্ব্বে যে, এ দেশে এক-বারে ছিল না, তাহা বলা যাইতে পারে না। যে হেতু মুসলমানদিগের রাজ্য-কালে—বিশেষতঃ আরঙ্গ্‌জেবের অধিকার সময়ে ইতিহাসমধ্যে সংবাদপত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, ঐ সংবাদপত্র মুদ্রিত হইত না—হস্তলিখিত থাকিত। যাহা হউক, আমরা এস্থলে প্রথমে সাময়িক পুস্তিকা ও পরে সংবাদপত্রের বিষয়ে উল্লেখ করিব—১৮১৬ খৃঃ অব্দে, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যনামা এক ব্যক্তি 'বেঙ্গল গেজেট' নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; উহাতে বিদ্যাসুন্দর, বেতাল পঁচিশ প্রভৃতি কাব্য সকল প্রতিকৃতিসহ মুদ্রিত হইত। ইহার পরেই ১৮১৮ খৃঃ অব্দে পাদরী মার্সমান সাহেব শ্রীরামপুর হইতে 'দিগ্দর্শন' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া-ছিলেন;—উহাতে সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সকল লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ পত্র প্রথম সংখ্যার অধিক প্রকাশিত হয় নাই। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে 'গস্পেল ম্যাগাজিন' নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়; ইহাতে খৃষ্টধর্ম্মসম্পর্কীয় প্রবন্ধই অধিক থাকিত। ১৮২১ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মণিক ম্যাগাজিন্' নামে ইংরেজি ও বাঙ্গালায় এক পত্রিকা প্রকাশ করেন—ইহাতে মিসনরিদিগের সহিত বিচার ও বেদান্তমত সংস্থাপিত হইত। এইরূপে

আরম্ভ করিয়া অনেকানেক সাময়িকপুস্তিকা গ্রীষ্মকালোদিত পতঙ্গপুঞ্জের ন্যায় জন্মলাভের কিয়ৎকাল পরেই অন্তর্ধান করিয়াছে। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ অক্ষয়-কুমার দত্ত 'বিদ্যাদর্শন' প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহার পর বৎসরেই তিনি যে 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হওয়ায় 'বিদ্যাদর্শন' সম্পাদন কার্য্য পরিত্যাগ করেন। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে আন্দুল নিবাসী রাজনারায়ণ মিত্র 'কায়স্থ-কিরণ' নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—উহাতে পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থেরাও যে যজ্ঞোপবীতধারণের যোগ্য, তদ্বিষয় প্রতিপাদিত হইত। কিন্তু ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'মুক্তাবলী' নাম্নী পত্রিকা দ্বারা 'কায়স্থকিরণের' মত খণ্ডিত হইয়াছিল।

আমরা নিম্নে দ্বিসাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্রিকাগুলিকে সংবাদপত্র নাম দিয়া ও মাসিক, দ্বৈমাসিক, ত্রৈমাসিক পত্রিকাগুলিকে মাসিক পত্রিকা নামে অভিহিত করিয়া অদ্যাবধি প্রচলিত পত্রিকাগুলির যথাসম্ভব সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

সংবাদ পত্র।

১৮১৬	বেঙ্গল গেজেট	গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ইহাই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম সংবাদ পত্র।
১৮১৮ ২৩ মে	সমাচার-দর্পণ	পাদরী জন ক্লার্ক মার্শমান
১৮১৯	সংবাদ-কৌমুদী	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাম মোহন রায়
১৮২২	সমাচার-চন্দ্রিকা	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা সপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত হইত। সাহেব মহলে ইহা কলিকাতার Times নামে খ্যাত ছিল। ইহা পরে 'দৈনি-কের' সহিত মিলিত হয়।

১৮২৩	তিমির নাশক	কৃষ্ণমোহন দাস
১৮২৫	বঙ্গদূত	Salt Board এর দাওয়ান নীলরতন হালদার ১৮৩৯ সালে বন্ধ হয়।
১২৩৭	সংবাদ-সুধাকর	প্রেমচাঁদ রায়
১২৩৭ (১৮৩০)	সংবাদ-প্রভাকর	(১) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (২) রামচন্দ্র গুপ্ত (৩) গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহা প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল, পরে দৈনিক হয়।
১২৩৮	অনুবাদিকা	ইহা Reformer নামক তৎকালীন ইংরেজি পত্রের বঙ্গানুবাদ।
১৮৩১	সভারাজেন্দ্র	মৌলবী আলি মোল্লা ইহা পারস্য ও বাঙ্গালা ভাষায় বাহির হইত।
১৮৩১	সুখকর	অপ্রকাশিত
১২৩৮ (১৮৩১)	জ্ঞানাণ্বেষণ	হিন্দু কলেজের ছাত্র রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ইহা ইংরেজি ও বাঙ্গালা ভাষায় নয় বৎসর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করে।
১৮৩১	রত্নাকর	ব্রজমোহন সিংহ ১বৎসর চলিয়াছিল।
১৮৩১	সার-সংগ্রহ	বেণীমাধব দে ১বৎসর চলিয়াছিল, ইহাতে বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সার সঙ্কলিত থাকিত।

১৮৩২	রত্নাবলী	জগন্নাথ মল্লিক ৪বৎসর চলিয়া ছিল।
১২৩৮	সংবাদ-রত্নাকর	রাধানাথ পাল।
১৮৩৫	সত্যবাদী	অপ্রকাশিত ইং—বঙ্গ
১২৪২ (১৮৩৫)	সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়	(১) হরচন্দ্র বান্দ্যোপাধ্যায় (২বৎসর) (২) উদয়চরণ আঢ্য (৩) অদ্বৈতচরণ আঢ্য ১৮৭৩খৃঃ পর্য্যন্ত (৪) গোবিন্দ চরণ আঢ্য প্রথমে পাক্ষিক। ১২৪৮বঙ্গাব্দে সপ্তাহে ৩বার প্রকাশিত হইত। ১২৫২ বঙ্গাব্দে দৈনিক হয়। এই সংবাদ পত্রে তৎকালীন সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ের আলোচনা হইত।
১২৪৩ (১৮৫৩)	সংবাদ-সুধাসিন্দু	কালীশঙ্কর দত্ত এক বৎসর চলে।
১৮৩৭	দিবাকর	গঙ্গাচরণ বসু
১২৪৪ (১৮৩৮)	সংবাদ-সৌদামিনী	কালীচরণ দত্ত ইং—বঙ্গ
১২৪৪ (১৮৩৮)	সংবাদ-গুণাকর	হিন্দু কলেজের ছাত্র গিরিশ চন্দ্র বসু
১২৪৫ (১৮৩৮)	সংবাদ-মৃত্যুঞ্জয়	পার্ব্বতীচরণ দাস ইহার প্রায় সকল অংশই পদ্যে লিখিত হইত।
১২৪৫ (১৮৩৮)	সংবাদ-অরুণোদয়	রাজ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ছয়মাস মাত্র চলিয়াছিল।

১২৪৫ (১৮৩৯)	রসরাজ	রাজনারায়ণ সেন ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ইহা সপ্তাহে দুইবার বাহির হইত। ভোলানাথ সেন এই পত্রের প্রতিষ্ঠাতা। ইহা ১৮৫৬ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। 'রসরাজ' অনেক দিন 'প্রভাকরের' সহিত অশ্লীল কবিতাযুদ্ধে নিরত ছিল। ইহার দুইজন সম্পাদককেই কারাবাস করিতে হইয়াছিল।
	অরুণোদয়	রেভারেণ্ড লালবিহারী দে.
১৮৩৯	বঙ্গদূত	রাজনারায়ণ সেন প্রতি রবিবারে প্রকাশিত হইত।
১২৪৫ (১৮৩৯)	সংবাদ-ভাস্কর	(১) শ্রীনাথ রায় (২) গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (৩) ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য ইহা সপ্তাহে ৩ বার করিয়া বাহির হইত।
১৮৪০ ১লা জুলাই	Bengal Government Gazette	(১) জনক্লার্ক মার্শম্যান (২) J. Robinson (৩) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (৪) চন্দ্রনাথ বসু ইং—বঙ্গ
১২৪৭	মুর্শিদাবাদ পত্রিকা	রাজা কৃষ্ণনাথ রায় তাঁহার প্রজাগণের উন্নতির জন্য ইহা বাহির করেন। মফঃস্বলের ইহাই প্রথম সংবাদপত্র।
১২৪৫ (১৮৪০)	জ্ঞানদীপিকা	ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়

১৮৪০	সংবাদ-সুজনরঞ্জন	গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত ইহা সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হইত। 'রসরাজের' কুৎসা হইতে জনসাধারণকে বাঁচাইবার জন্যই ইহার অবতারণা।
১২৪৯	ভারতবন্ধু	শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৪১	নিশাকর	নীলকমল দাস
১৮৪২	Bengal spectator	রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র ইং—বঙ্গ। অত্যধিক ব্যয় হওয়ায় ইহা ২ বৎসর পরে উঠিয়া যায়।
১২৪৯	ভৃঙ্গদূত	নীলকমল দাস
১৮৪৪	রাজরাণী	গঙ্গানারায়ণ বসু
১৮৪৪	সরোবর-সরোজিনী	অপ্রকাশিত
১৮৪৬	জ্ঞানদীপক	মৌলবী আলি ইং—বঙ্গ-হিন্দী-পারসী।
১৮৪৬	মার্ত্তণ্ড	অপ্রকাশিত
১৮৪৬	জ্ঞানদর্পণ	উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য
১৮৪৬	পাষণ্ডপীড়ন	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কাঁচড়াপাড়ায় স্থাপিত সভার মুখপত্র।
১৮৪৭	জ্ঞানসঞ্চারিণী	অপ্রকাশিত
১৮৪৭	হিন্দুবন্ধু	উমাচরণ ভদ্র ইহা খৃষ্টধর্ম্মের বিপক্ষাচরণে নিযুক্ত ছিল।
১৮৪৭	রঙ্গপুরবার্ত্তাবহ	নীলরত্ন মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুরের জমীদার কালীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের আনুকূল্যে প্রকাশিত হইত।

১৮৪৭	আক্কেলগুড়ুম	ব্রজনাথ ইং—বঙ্গ। 'ভাস্করের' বিরুদ্ধে এবং 'প্রভাকরের' পক্ষে লিখিত হইত। ইহার পরমায়ু চারি মাস।
১৮৪৭	দিগ্বিজয়	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়।
১৮৪৭	কাব্যরত্নাকর	উমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যঙ্গই ইহার উদ্দেশ্য। ইহা সপ্তাহে দুইবার করিয়া বাহির হইত।
১২৫৩ (১৮৪৭)	জ্ঞানাঞ্জন	চৈতন্যচরণ অধিকারী ইং—বঙ্গ।
১৮৪৭	সাধুরঞ্জন	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
১৮৪৭	সুজনবন্ধু	নবীনচন্দ্র দে
১৮৪৭	মনোরঞ্জন	গোপালচন্দ্র দে
১৮৪৮	জ্ঞানরত্নাকর	বিশ্বম্ভর ঘোষ
১৮৪৮	সংবাদ দিনমণি	গোপালচন্দ্র দে
১৮৪৮	রত্নবর্ষণ	মাধবচন্দ্র ঘোষ (ভবানীপুর)
১৮৪৮	সংবাদ রসসাগর	রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় খিদিরপুর।
১৮৪৮	জ্ঞানচন্দ্রোদয়	রাধানাথ বসু
১৮৪৮	সংবাদ অরুণোদয়	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৪৮	ভৃঙ্গদূত	অপ্রকাশিত
১৮৪৮	বারাণসী চন্দ্রোদয়	উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য দুই বৎসর চলে।
১২৫৬	রসমুদ্গর	ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
১২৫৬	রসরাজ	অপ্রকাশিত
১২৫৬	মহাজন দর্পণ	জয়কালী বসু

(১৮৪৯)		বাঙ্গালায় বাণিজ্য বিষয়ক প্রথম পত্র।
১৮৪৯	সত্যধর্ম্ম	অপ্রকাশিত
১৮৪৯	কাশিকা	গোবিন্দচন্দ্র দে কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের পত্র। প্রথম সংখ্যার অধিক বাহির হয় নাই।
১৮৪৯	ভৈরবদণ্ড	উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য বারাণসী হইতে প্রকাশিত। 'রস-মুদ্গরের' সঙ্গে ইহার তুমুল যুদ্ধ চলিত।
১৮৪৯	বারাণসী চন্দ্রোদয়	উমাকান্ত ভট্টাচার্য্য
১৮৪৯	সুজনবন্ধু	নবীনচন্দ্র দে
১৮৪৯	কৌস্তুভকিরণ	মহেশচন্দ্র ঘোষ
১৮৪৯	জ্ঞানচন্দ্রোদয়	অপ্রকাশিত
১৮৫০	সর্ব্বশুভকরী	মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এক বৎসর চলিয়াছিল।
১৮৫০	সত্যপ্রদীপ	Mr. Townsend.
১৮৫০	সংবাদসুধাংশু	পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এক বৎসর চলে।
১৮৫০	বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়	রামতারণ ভট্টাচার্য্য এক বৎসর চলিয়াছিল।
১৮৫০	বর্দ্ধমান সংবাদ	বর্দ্ধমানরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত
১৮৫১	জ্ঞানোদয়	কোন্নগর নিবাসী চন্দ্রশেখর
১৮৫১	জ্ঞানদর্শন	শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় বারানসীধাম হইতে ১বৎসর চলে, ইহা লিথোগ্রাফিক প্রেসে মুদ্রিত হইত।
১৮৫৪	সুধাবর্ষণ	দৈনিক। বাঙ্গালা ভাষায় বাণিজ্য-বিষয়ক পত্র।

১২৫৪	মনোরঞ্জন	গোপাল চন্দ্র রায়।
১৮৫৪	বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা	অপ্রকাশিত
১২৫৫	মুক্তাবলী	কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য
১৮৫৬	এডুকেশন গেজেট	(১) সি, স্মিথ (২) প্যারীচরণ সরকার (১৮৬৭ পর্য্যন্ত) (৩) ভূদেব মুখো-পাধ্যায় (১৮৬৭—)
১২৫৬	রসরত্নাকর	যদুনাথ পাল
১২৫৬	রসমুদ্গর	ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৫৬	বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী	বর্দ্ধমান মহারাজের ব্যয়ে প্রকাশিত।
১২৫৭	সর্ব্বশুভকরী	মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার
১২৫৮	জ্ঞানোদয়	চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
১৮৫৮ ১৭৮০ শক	সোমপ্রকাশ	(১) দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৫৮—১৮৮৬) (২) কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
১২৫৮	কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা	কাশীদাস মিত্র
১৮৬৭	অমৃতবাজার পত্রিকা	শিশির কুমার ঘোষ যশোহরের অন্তঃপাতী অমৃতবাজার নামক গ্রাম হইতে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হয়। প্রথমতঃ কেবল বঙ্গভাষায় পরে বাগবাজার হইতে ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় ভাষায় বাহির হয়। ১৮৭৮খৃঃ কেবল ইংরাজীতে বাহির হয়। এক্ষণে প্রাত্যহিক।
১২৬৭	ঢাকাপ্রকাশ	(১) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (২) গোবিন্দ প্রসাদ রায় (৩) গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী

১২৭০	সচিত্র ভারত সংবাদ	শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত (পাক্ষিক)
১৮৬৯	অবলাবান্ধব	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইহা ফরিদপুর জেলা লোনসিংহ নামক গ্রাম হইতে পক্ষান্তে বাহির হইত। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া পাঁচ বৎসরের পর বন্ধ হইয়া যায়।
১৮৭০ (১৭৯৩ শক)	সাহিত্য-মুকুর	অপ্রকাশিত
১২৭১	হিন্দুহিতৈষী	(১) কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র (১২৭১—৮৪) (২) আনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত ঢাকা হইতে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভার মুখপত্ররূপ প্রকাশিত হইত।
১২৭২	হিন্দুরঞ্জিকা	অপ্রকাশিত
১২৭৪	অবোধবন্ধু	অপ্রকাশিত
১৮৭৬	শ্রীহট্টপ্রকাশ	অপ্রকাশিত
১৮৭৮	আনন্দবাজার পত্রিকা	হেমন্ত কুমার ঘোষ লর্ড লিটনের মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষেধ-বিধি প্রচলিত হইলে এই পত্র অমৃতবাজা-রের স্থান অধিকার করে।
১২৭৬—১৮৮৩	সারস্বত পত্র	(১) রাজবিহারী দাস (২) উমেশ চন্দ্র বসু ঢাকা হইতে প্রকাশিত।
১২৭৭	বঙ্গবন্ধু	পাক্ষিক
১২৭৭	সাহিত্য-মঞ্জরী	পাক্ষিক
১২৮০	সাধারণী	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
১২৮২	ভারত মিহির	অনাথবন্ধু গুহ ময়মনসিংহ হইতে এই পত্র প্রকাশিত হয়।

১২৮৪	বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী	অপ্রকাশিত
১২৮৫	নববিভাকর	গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা শেষে সাধারণীর সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।
১২৮৮—(১৮৮১)	বঙ্গবাসী	যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু, কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৮৮—(১৮৮১)	সুরভি	যোগেন্দ্রনাথ বসু জ্ঞানেন্দ্র লাল রায়ের 'পতাকা' যোগ দিয়া ইহা 'সুরভি ও পতাকা' নামে পরে বাহির হয়। অতঃপর উভয়ের লোপে 'হিতবাদী'র জন্ম।
১২৮৯	সঞ্জীবনী	(১) দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২) কৃষ্ণকুমার মিত্র (৩) শিবনাথ শাস্ত্রী
১৮৮৩	বন্ধু	পাক্ষিক
১২৯০ (১৮৮৩)	সময়	জ্ঞানেন্দ্র নাথ দাস
১২৯২	বঙ্গবন্ধু	বরদা চরণ বসু ঢাকা হইতে প্রকাশিত
১২৯৭	বঙ্গনিবাসী	(১) মহেশ চন্দ্র পাল (২) উপেন্দ্র কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) ব্যোমকেশ মুস্তফী (৪) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (৫) দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় পরে 'সচিত্র ভারত সংবাদ' বঙ্গনিবাসীর সহিত মিলিত হইয়া যায়।

১২৯৭	সুহৃদ্	পাক্ষিক
১২৯৭	হিতবাদী	(১) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য (২) যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথ নাথ মিত্র (৩) কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (৪) (৫) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৯৯	বরিশাল হিতৈষী	অপ্রকাশিত
১৩০০	বিক্রমপুর	রজনী কান্ত লৌহজঙ্গ গ্রাম হইতে বাবু রাধাবিনোদ পাল চৌধুরী দ্বারা বিক্রমপুরের মুখপত্র স্বরূপ প্রকাশিত হইত। পরে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।
১৩০০	হিতৈষী	কালীচরণ মিত্র
১৩০০	চারুমিহির	অপ্রকাশিত
১৩০৫	উদ্বোধন	রামকৃষ্ণ মিশন (ত্রিগুণাতীতানন্দ)
১৩১১	সুরভি	পাক্ষিক
১৩১৩	স্বরাজ	অপ্রকাশিত
ফাল্গুন		সচিত্র সাপ্তাহিক
১৩১৫	স্বদেশ	অপ্রকাশিত
১৩১৬	কর্ম্মযোগিন্	সমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়
১৩১৭	গৌড়দূত	অপ্রকাশিত

কতকগুলি সংবাদ-পত্রের প্রথম প্রকাশের সময় আমরা জানিতে পারি নাই। সুতরাং সেইগুলির একটী বর্ণানুক্রমিক সূচীমাত্র নিম্নে লিখিত হইল :—

অবকাশরঞ্জিকা	অপ্রকাশিত
অপূর্ব্ব পঞ্চামৃৎ	অপ্রকাশিত
আলোক	অপ্রকাশিত

আর্য্যদর্পণ	অপ্রকাশিত
আর্য্যসুহৃদ্	অপ্রকাশিত
আর্য্যোদয়	অপ্রকাশিত
কান্দীপত্রিকা	অপ্রকাশিত
কবি	অপ্রকাশিত
কাব্যপ্রকাশ	ঢাকা হইতে প্রকাশিত
কালভৈরব	অপ্রকাশিত
কাশীপুর-নিবাসী	বরিশাল হইতে প্রকাশিত
কুমারীপত্রিকা	অপ্রকাশিত
কুশদহ	অপ্রকাশিত
গরিব	কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য
গোয়ালপাড়া হিতসাধিনী	অপ্রকাশিত
গ্রামদূত	বাখরগঞ্জ হইতে প্রকাশিত
গ্রামবাসী	রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত
গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা	হরিনাথ মজুমদার
চারুবার্ত্তা	অদ্বৈতচরণ বসু, দীনেশচরণ বসু
চারুনিহির	ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত
চিত্তরঞ্জিকা	ঢাকা হইতে প্রকাশিত
চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ	চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত
জগদ্দীপ	অপ্রকাশিত
জগদ্বাসী	অপ্রকাশিত
জ্ঞানবিকাশিনী	পাবনা চাটমোহর হইতে প্রকাশিত
জ্ঞানপ্রদায়িনী	বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
ঢাকা গেজেট	শশিভূষণ সেন
ঢাকা দর্পণ	অপ্রকাশিত
ঢাকা দর্শক	তারিণীচরণ বসু

ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ	অপ্রকাশিত
ত্রিপুরাপ্রকাশ	অপ্রকাশিত
দর্শক	পূর্ণচন্দ্র পাঠক চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত
দুর্লভ সমাচার	অপ্রকাশিত
দ্বিজরাজ	গোঁসাইদাস গুপ্ত
দূত	অপ্রকাশিত
দৈনিক	ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত
দৈনিকবার্ত্তা	অপ্রকাশিত
ধূমকেতু	কালীকিশোর কাহালী
ধূমকেতু	চন্দননগর হইতে প্রকাশিত
ধর্ম্মবিষয়ক প্রতিবাদ	কালীঘাট হইতে প্রকাশিত
নবমেদিনী	মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত
নবযুগ	দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি
নবশক্তি	মনোরঞ্জন গুহ
নদীয়াবাসী	অপ্রকাশিত
নগেন্দ্রবিনোদিনী	অপ্রকাশিত
নায়ক	পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
নিবেদন	পাক্ষিক
পতাকা	জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়
পথ্যপ্রদান	অপ্রকাশিত
পরিদর্শক	শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত
পূর্ব্ববঙ্গবাসী	চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত
প্রজাবন্ধু	চন্দননগর হইতে প্রকাশিত
প্রতিধ্বনি	অপ্রকাশিত
প্রতিকার	বহরমপুর হইতে প্রকাশিত

প্রকৃতি	অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রতিবাসী	অপ্রকাশিত
পল্লীবাসী	অপ্রকাশিত
প্রভাতী	রাজমোহন মুখোপাধ্যায়
প্রভাতসমীর	দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রয়াগদূত	অপ্রকাশিত
ফরিদপুরহিতৈষী	অপ্রকাশিত
বঙ্গবিজ্ঞাপনী	মিত্র কোম্পানী
	গোপালচন্দ্র মিত্র
বরিশাল বার্ত্তাবহ	অপ্রকাশিত
বালাবোধিনী	অপ্রকাশিত
বালারঞ্জিকা	বরিশাল হইতে প্রকাশিত
বালকবন্ধু	অপ্রকাশিত
বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়	অপ্রকাশিত
বাঁকুড়াদর্পণ	অপ্রকাশিত
বন্ধু	চারুচন্দ্র দত্ত
বাঙ্গালা এক্সচেঞ্জ গেজেট	চন্দ্রকিশোর রায়
বিশ্বদর্শন	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিজ্ঞাপনী	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
বিজলী	অপ্রকাশিত
বরাহনগর সমাচার	শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভেরি	অপ্রকাশিত
ভেরি ও কুশদহ	অপ্রকাশিত
ভারতবাসী	হরিদাস গড়গড়ি এম, এ,
ভারতসংস্কারক	কালীনাথ দত্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ,
ভারতহিতৈষী	অপ্রকাশিত

ভারত দর্পণ	তারকচন্দ্র বিষ্ণু
ভারত বন্ধু	শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারত রঞ্জন	মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত
(সচিত্র) ভারত সংবাদ	ব্যোমকেশ মুস্তফী ইহা পরে বঙ্গনিবাসীর সহিত মিশিয়া যায়।
ভারতীয় মন্ত্রমন্দির	রাজঋষি সিদ্ধেশ্বর
মিহির	অপ্রকাশিত
মুসলমান বন্ধু	অপ্রকাশিত
মেদিনী	মেদিনীপুর হইতে প্রকাশিত
মুর্শিদাবাদ হিতৈষী	বনওয়ারীলাল গোস্বামী
রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ	কাকিনিয়া হইতে প্রকাশিত
রাজসাহী সমাচার	অপ্রকাশিত
শ্রীমন্তসদাগর	অপ্রকাশিত
শক্তি	ঢাকা হইতে প্রকাশিত
শান্তি	অপ্রকাশিত
শিল্প ও কৃষিপত্রিকা	তাহেরপুর হইতে প্রকাশিত
শুভকরী	অপ্রকাশিত
শুভ সাধনী	কালীপ্রসন্ন ঘোষ
সহচর	বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়
সম্মিলনী	উমেশচন্দ্র গুপ্ত
সঞ্জয়	ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত
সহযোগী	অপ্রকাশিত
সর্ব্বরসরঙ্গিণী	অপ্রকাশিত
সমালোচক	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সমাজ দর্পণ	যশোদানন্দন সরকার
সংশোধিনী	চট্টোগ্রাম হইতে প্রকাশিত
সাহস	চন্দ্রশেখর সেন প্রয়াগ হইতে প্রকাশিত
স্বাস্থ্য তত্ত্ব	অপ্রকাশিত
সুনীতি সংবাদ	অপ্রকাশিত
সুধাপান	অপ্রকাশিত
সুলভ সমাচার	কেশবচন্দ্র সেন
সুলভ দৈনিক	কালীপদ মুখোপাধ্যায়
সুধাকর	আবদুর রহিম
সুধাসিন্ধু	অপ্রকাশিত
সুলভ সংবাদ	ঐ
সৌদামিনী	ঐ
হালিসহর পত্রিকা	ঐ
হালিসহর প্রকাশিকা	ঐ
হাবড়া হিতৈষী	ঐ
হাবড়া হিতকরী	ঐ
হিন্দু রঞ্জিকা	বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে প্রকাশিত
হিতসাধনী	বরিশাল হইতে প্রকাশিত
হিতকরী	হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়
হরিভক্তি প্রদায়িনী	প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী

মাসিক পত্র।

১৭৭৬ শক	বিবিধার্থ সংগ্রহ	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
১২৬০ শ্রাবণ	সুলভ পত্রিকা	দ্বারিকানাথ রায়।
১২৬২	বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা পত্রিকা	অপ্রকাশিত
১২৬৮ মাঘ	রহস্য-সন্দর্ভ	ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র।
১২৭০ ভাদ্র	বামাবোধিনী পত্রিকা	উমেশচন্দ্র দত্ত।
১৭৮৬ শক	সত্যান্বেষণ	জগন্মোহন তর্কালঙ্কার।
১৭৮৭ শক (১২৭১) শ্রাবণ	সত্যজ্ঞানপ্রদায়িনী (ত্রৈমাসিক)	অপ্রকাশিত
১২৭৩	নবপ্রবন্ধ	অপ্রকাশিত
১২৭৪	অবোধবন্ধু	অপ্রকাশিত
১২৭৫ ফাল্গুন	জ্ঞানরত্ন	অপ্রকাশিত
১৭৯২ শক	মাসিক প্রকাশিকা	রাজকৃষ্ণ শর্ম্মা।
১২৭৭	মিত্রপ্রকাশ	হরিশ্চন্দ্র মিত্র।
১২৭৭ অগ্র-,	বিদূষক	অপ্রকাশিত
১২৭৮বৈশাখ	চিকিৎসা দর্পণ	ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।
১২৭৮ মাঘ	বিশ্বদর্পণ	গিরিশচন্দ্র মজুমদার।
১৮৭২বৈশাখ	বঙ্গদর্শন	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১২৮৭ সাল হইতে সঞ্জীব বাবু ইহার সম্পাদক হন। ১২৯০ সালে ইহা বন্ধ হয়। নবপর্য্যায় ১৩০৮ বৈশাখ, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার প্রকাশক।
১২৭৯ শ্রাবণ	বঙ্গ-সুহৃদ্	অপ্রকাশিত
১২৭৯ আশ্বিন	জ্ঞানাঙ্কুর	শ্রীকৃষ্ণ দাস।
১২৭৯	খৃষ্টীয় বান্ধব	ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন ফণ্ড (প্রকাশক)

১৮৭৩	অবকাশ সহচরী	অপ্রকাশিত
১২৮০	বসন্তক	অপ্রকাশিত
১২৮০ ভাদ্র	অবকাশ তোষিনী	ভুবনমোহন (প্রকাশক) রায় চেতলা হইতে প্রকাশিত।
১২৮০কার্ত্তিক	পূর্ণশশী	অপ্রকাশিত
১২৮০	কাঁচড়াপাড়া প্রকাশিকা	অপ্রকাশিত
১৭৯৬ শক	সমদর্শী	কেদারনাথ রায় (প্রকাশক)।
১২৮১	বান্ধব	কালীপ্রসন্ন ঘোষ ঢাকা ১১ বৎসর প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল নবপর্য্যায় ১৩০৮
১২৮১	আর্য্য দর্শন	যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ।
১২৮১	মধ্যস্থ	অপ্রকাশিত
১২৮১ শ্রাবণ	কুমুদিনী	যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (প্রকাশক) কাঁকশোয়ালী চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত।
১২৮১	দর্শক (সাপ্তাহিক)	অবিনাশ চন্দ্র নিয়োগী
১২৮২	প্রতিবিম্ব	রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ
১২৮২	বিনোদিনী	অপ্রকাশিত
১২৮২	মধুমক্ষিকা	গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত।
১২৮২	অনুবীক্ষণ	অপ্রকাশিত
১২৮৩	ভারত-সুহৃদ্	প্রতাপ চন্দ্র চৌধুরী ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত।
১২৮৩	আদর্শ	মদনমোহন মিত্র
১২৮৩	মিত্রোদয়	হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়
১২৮৪	পরিচারিকা	আর্য্যনারী সমাজ, রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য প্রকাশক।

১২৮৪	ভারতী	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১২৮৪—৯০)
		স্বর্ণকুমারী দেবী (১২৯০—৯২)
		ভারতী ও বালক (১২৯৩—১৩০১)
		হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী (১৩০২ —১৩০৫)
		সরলা দেবী (১৩০৬—১৩১৪)
		স্বর্ণকুমারী দেবী (১৩১৫—)
১২৮৪	সমাজ রঞ্জন	ফকির চাঁদ বসুদেব
১২৮৫	প্রকৃতিরঞ্জন	সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল
১২৮৫	বীণা	রাজকৃষ্ণ রায়
১২৮৫	রজনী	রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়
		ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত।
১২৮৫	কৃষিতত্ত্ব	নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়
মাঘ		পাকপাড়া হইতে প্রকাশিত।
১৮৭৯	জ্যোতিরিঙ্গন	মিশন সোসাইটী
১২৮৬	মাসিক-সমালোচক	চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
		বহরমপুর হইতে প্রকাশিত।
১২৮৬	বালক-বন্ধু	রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য (প্রকাশক)
১২৮৬	পঞ্চানন্দ	অপ্রকাশিত
১২৮৭	উপহার	রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ (প্রকাশক)
১২৮৭	কল্পনা	বি, কে মজুমদার, ডি, এন্ গোস্বামী
১২৮৭	আদরিণী	তারকনাথ বিশ্বাস
১২৮৮	রসিক রাজ	হরিদাস সেন (প্রকাশক)
১২৮৮	প্রতিভা	অনুকুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (প্রকাশক)
১৮৮২	বঙ্গবন্ধু	অপ্রকাশিত

১২৮৮	তারা	অন্নদা প্রসাদ দত্ত, তারাপদ চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নাকর (শিঙ্গাস্থলপুর হইতে প্রকাশিত) ইলছোবা মণ্ডলাই পোষ্ট।
১২৮৮	আচার্য্য	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (সহঃ সম্পাদক)
১২৮৮	চিত্তরঞ্জিনী (দ্বৈমাসিক ঋতুপত্রিকা)	রাজেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র
১৮৮২	বঙ্গমহিলা	অপ্রকাশিত
১২৮৯	প্রবাহ	দামোদর মুখোপাধ্যায়
১২৮৯	গোপাল ভাঁড়	অপ্রকাশিত
১২৮৯	বিজ্ঞান দর্পণ	রামেশ্বর পাঁড়ে
১২৮৯	মুকুলমালা	কেদারনাথ ঘোষাল চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।
১৮৮৩	সখা	শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ
১২৯০	সহচরী	বীরেশ্বর পাঁড়ে
১২৯০	নব্যভারত	দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী
১২৯০	ব্যবসায়ী	শ্রীনাথ দত্ত
১২৯০	পাকপ্রণালী	বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়
১২৯০	নন্দিকেশ্বর	সত্যচরণ গুপ্ত এণ্ড সনস্ (প্রকাশক)
১২৯০	কলিকাতার নিগূঢ় তত্ত্ব	রামদাস দেব
১২৯০	চসমা	জীবনকৃষ্ণ সেন
১২৯০	সজ্জন তোষিনী	কেদারনাথ দত্ত
১২৯১	চিকিৎসা সম্মিলনী	কবিরাজ অবিনাশ চন্দ্র কবিরত্ন
১২৯১	আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনী	কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি
১২৯১	জাহ্নবী	বীরেশ্বর পাঁড়ে
১২৯১	প্রচার	রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১২৯১	আলোচনা	যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১২৯১	নব জীবন	অক্ষয় চন্দ্র সরকার
১২৯২	কৃষি গেজেট	অপ্রকাশিত
১৮৯২	মিনার	অপ্রকাশিত
১২৯২	নবনলিনী	সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
১২৯২	ভারত শ্রমজীবী	শশীভূষণ বিশ্বাস
১২৯২	মহাবিদ্যা	কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য ঢাকা, পটুয়াটুলি হইতে প্রকাশিত।
১২৯৩	বেদব্যাস	ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১২৯৩	কামনা	অপ্রকাশিত
১২৯৩	বৈষয়িক তত্ত্ব	বৈকুণ্ঠনাথ রায় (প্রকাশক)
১২৯৩	দিনাজপুর পত্রিকা	বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য দিনাজপুর হইতে প্রকাশিত।
১২৯৩	পল্লীপ্রকাশ	যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়
১২৯৩	বঙ্গ-রবি	কেশব চন্দ্র বন্দ্যোপাধায়
১২৯৩	কারিকর-দর্পণ	বিহারীলাল ঘোষ
১২৯৪	কর্ণধার	হারাণচন্দ্র রক্ষিত
১২৯৪	বীণাপাণি	শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১২৯৪ বৈশাখ	চিকিৎসা দর্শন	রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় সুবর্ণপুর, নদীয়া হইতে প্রকাশিত।
১২৯৪	দীপিকা	প্যারীমোহন হালদার প্রকাশক
১২৯৪	বিবিধার্থ দীপিকা	অপ্রকাশিত
১২৯৪	সম্মিলনী	মুন্সি গোলাম কাদের মাগুরা হইতে প্রকাশিত।
১২৯৪	সংসার-দর্পণ	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ চন্দ্র দে, দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রকাশিত।

১২৯৪	বিভা	চারু চন্দ্র ঘোষ
১২৯৪	অনুসন্ধান (পাক্ষিক)	দুর্গাদাস লাহিড়ী
১২৯৫	জোনাকি	লাখ্যোবর শর্ম্মা, গৌহাটী
১২৯৫	ভারত	অপ্রকাশিত
১২৯৫	ধন্বন্তরী	সতী প্রসাদ সেনগুপ্ত
	১৩০৪	কুঞ্জবিহারী কাব্যতীর্থ
৪০৪ চৈঃঅঃ	যুগধর্ম্ম	হরিদাস গোস্বামী, শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত।
১২৯৫	মালঞ্চ	ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়
১২৯৫	পরীক্ষা	হৃদয় নাথ মৈত্র ও বৈদ্যনাথ বিদ্যানিধি
১২৯৫	আর্য্য-প্রতিভা	বৈষ্ণব চরণ বসাক (প্রকাশক)
১৩৯৬	নূতন প্রকরণ	অপ্রকাশিত
১২৯৬	সুকথা	দুর্গাদাস গুপ্ত
		কোচবিহার হইতে প্রকাশিত।
১২৯৬	যমুনা	হরিহর চট্টোপাধ্যায়
১২৯৬	সাহিত্য কল্পদ্রুম	সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি
১২৯৬	সবিতা	যোগীন্দ্র নারায়ণ সিংহ
		উত্তর পাড়া হইতে প্রকাশিত।
১২৯৬	পুষ্পহার	উমেশচন্দ্র বৈতালিক
১২৯৬	প্রজাপতি	বিজয়কৃষ্ণ রায়
১২৯৬	দারিদ্র-রঞ্জন	রাধানাথ মিত্র (কার্য্যাধ্যক্ষ)
১২৯৬	নব যুবক	উমেশ চন্দ্র দে, টাঙ্গাইল
১২৯৬	সঙ্গিনী	রাধিকাপ্রসাদ দত্ত
১৮৯০	শ্রীহট্ট সুহৃদ	কৈলাস চন্দ্র বিশ্বাস
		শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত।

১২৯৭	প্রতিমা	বামদেব দত্ত
১২৯৭	মজলিস্	দুর্গাদাস দে (প্রকাশক)
১২৯৭	সাহিত্য	সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি
১২৯৭	আর্য্য কায়স্থ	দেব কিশোরীমোহন ঘোষ বর্ম্ম খিদিরপুর হইতে প্রকাশিত।
১২৯৭	সমালোচক	সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
১২৯৭	অরুণোদয় পত্রিকা	রসিক মোহন চট্টোপাধ্যায়
৪০৬গৌঃঅঃ	শ্রীচৈতন্য মত-বোধিনী	রাধিকাপ্রসাদ ভগবৎ রত্নাকর শ্রীগোবিন্দের ঘেরা বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত।
১২৯৭	জন্মভূমি	১৩০৩—০৪ বঙ্গবাসী প্রেস
১৩০৭	ঐ	নবমবর্ষ ১৩০৭—০৮ নরেন্দ্র নাথ দত্ত
১৮৯১	ভিষকদর্পণ	গিরিশ চন্দ্র বাগ্‌চী
১২৯৮	চিকিৎসক	ডাঃ বিনোদ বিহারী রায়
১২৯৮	আশা	মথুরা মোহন গঙ্গোপাধ্যায় (প্রকাশক)
১২৯৮	উগ্রক্ষত্রিয় প্রতিনিধি	শ্রীশচন্দ্র ঝা
১২৯৮	জমিদারী পঞ্চায়ৎ	যোগেন্দ্র নাথ বসু এম্ এ, বি এল্
১২৯৮	সাহিত্য ও বিজ্ঞান	যোগেশ চন্দ্র মিত্র
১২৯৮	ইস্‌লাম প্রচারক	মহম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ
১২৯৮	সংসার চিন্তা	অপ্রকাশিত
১২৯৮	সেবক	পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী, ঢাকা হইতে প্রকাশিত।
১২৯৮	যোগ সাধন	নৃসিংহ চন্দ্র ভড়
১২৯৮	সাধনা	(১) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০১—০২ (২) রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর
১২৯৮	মোহিনী	কেদারনাথ মিত্র

১২৯৮	মিহির	সেখ আবদর রহিম
১২৯৯	প্রতিভা	বিধুভূষণ ঘোষ (প্রকাশক)
১২৯৯	রঙ্গভূমি	বিত্থারত্ন কোম্পানি (প্রকাশক)
১২৯৯ ১ম	দাসী	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
	১৮৯৩ ২য় বর্ষ হইতে ১৮৯৬ ৫ম	ঐ
	১৮৯৭	গোবিন্দ চন্দ্র গুহ
	১৮৯৮	মহেন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক
১২৯৯	শ্যামচাঁদ	জে, দেব
১২৯৯	অনুশীলন	কুঞ্জলাল রায় (কার্য্যাধ্যক্ষ)
১২৯৯	সুচিন্তা	অপ্রকাশিত
১৩০০	পূর্ণিমা	ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়, হুগলী বাঁশবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত।
১৩০০	কল্প	রাখাল চন্দ্র সেন এল্ এম্ এস্ ও দুর্গানাথ কাব্যরত্ন
১৩০০	নববিধান	অপ্রকাশিত
১৩০০	তত্ত্ববোধ	শ্রীগুরুনাথ কবিরত্ন
১৩০০	চিকিৎসাতত্ত্ব বিজ্ঞান ও সমীরণ	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
১৩০০	সৎসঙ্গ	সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩০০	সাথী	সতীশ চন্দ্র সেন
১৩০০	সমীরণ	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
১৩০০	পুরোহিত	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
১৩০০	বীণাপাণি	রাম গোপাল সেন গুপ্ত
১৩০০	বিকাশ	মন্মথনাথ ঘোষ ও রসিক মোহন চক্রবর্ত্তী

১৩০০	তৃপ্তি	কালীচরণ মৈত্র
১৩০০	ঊষা	নবচন্দ্র দত্ত (ত্রিপুরা)
১৩০১	বাসনা	জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশক (চুঁচুড়া)
১৩০১	নব্য বঙ্গদর্শন	চন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী
১৩০১	জ্যোতিঃ	শ্রীঅধর চন্দ্র বসু (প্রকাশক)
১৩০১	পুরোহিত ও অনুশীলন	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
১৩০১	সুহৃদ্‌	ইডেন হিন্দু হোষ্টেল
১৩০১	সরস্বতী	রসিক মোহন চক্রবর্ত্তী নবাবগঞ্জ হইতে প্রকাশিত।
১৩০১	সখা ও সাথী	সতীশ চন্দ্র সেন (প্রকাশক)
১৩০১	জ্যোৎস্না	শ্রীরমণী মোহন মল্লিক
১৩০১	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা	(১) রজনী কান্ত গুপ্ত (২) নগেন্দ্র নাথ বসু (৩) রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী (৪) নগেন্দ্র নাথ বসু
১৩০১	প্রভা	পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
১৩০১	কৃষিতত্ত্ব ও ভারত বন্ধু	এন, সাহা এণ্ড কোং
১৩০১	জ্যোৎস্নাহার	প্রসাদ দাস গঙ্গোপাধ্যায় ও সত্য চরণ মুখোপাধ্যায় কার্য্যাধ্যক্ষ (চুঁচুড়া চৌমাথা হইতে প্রকাশিত)
১৩০১	আভা	মহেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় রংপুর হইতে প্রকাশিত।
১৩০১	বেদ	অপ্রকাশিত
১৩০২	ভারত ভূমি	বসন্ত কুমার চক্রবর্ত্তী
১৩০২	আশা	সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন কুণ্ডু প্রকাশক

১৩০২	মুকুল	শিবনাথ শাস্ত্রী
১৩০২	সৌরভ	গিরিশ চন্দ্র ঘোষ
১৩০২	মহিলা	অপ্রকাশিত
১৩০২	মোহিনী	বিমলাচরণ রায় চৌধুরী
১৩০২	বঙ্গ জীবন	তারিণী চরণ সেন
১৩০২	আর্য্য সুহৃদ্ পত্রিকা	আর্য্য সুহৃদ্‌সমিতি সম্পাদক, প্রকাশক।
১৩০৩	পারিজাত	রসিক মোহন চক্রবর্ত্তী (রংপুর)
১৩০৩	সমাজ ও সাহিত্য	গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় গরিবপুর হইতে প্রকাশিত
১৩০৩	গান ও গল্প	বঙ্কুবিহারী দাস হরিনগর, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত।
১৩০৩	প্রতিনিধি	অপ্রকাশিত
১৩০৩	ব্রহ্মতত্ত্ব	সীতানাথ দত্ত
১৩০৩	অদৃষ্ট	রমণ কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
১৩০৩	বিবেক	কামিখ্যা নাথ মুখোপাধ্যায়
১৩০৩	আয়ুর্ব্বেদ	কবিরাজ এণ্ড কোং
১৩০৩	শ্রীসনাতনী	কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী (প্রকাশক)
১৩০৩	কান্তি	মহেন্দ্র নাথ মাইতি বি, এ, কার্য্যাধ্যক্ষ কাঁথি হইতে প্রকাশিত।
১৩০৩	বসুমতী (সাপ্তাহিক)*	(১) ব্যোমকেশ মুস্তফী, (২) কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রকিশোর রায়, গুণ-সাগর (৩) অম্বিকাচরণ গুপ্ত, (৪) পাঁচ-কড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (৫) জলধর সেন (৬) দীনেন্দ্র কুমার রায় (৭) সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি
১৩০৩	সাবিত্রী	রাম যাদব বাগচী

* ভ্রমক্রমে সংবাদ পত্র মধ্যে বিনিবিষ্ট হয় নাই।

৪১২ চৈঃ অঃ	সনাতন ধর্ম্মকণা	কালী কুমার দত্ত (চুঁচুড়া)
১৮৯৭ (১৩০৪)	শিল্প পুষ্পাঞ্জলি	শরৎ চন্দ্র দেব ও অমৃত লাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩০৪	উৎসাহ	নরেন্দ্র নাথ রায় (প্রকাশক) রাজসাহী হইতে প্রকাশিত।
১৩০৪	উদ্দীপনা	মন্মথ নাথ চট্টোপাধ্যায় (প্রকাশক)
১৩০৪	তত্ত্বমঞ্জরী	রামকৃষ্ণ মিশন
১৩০৪	পন্থা	(১) কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলাল গোস্বামী (২) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মন্মথ নাথ বসু
১৩০৪	ঊষা	শরচ্চন্দ্র মিত্র বঙ্গনগর ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত
১৩০৪	বীণাবাদিনী	জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর
১৩০৪	নবীন লেখক	অপ্রকাশিত
১৩০৪	পুণ্য	প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী
১৩০৪	স্বাস্থ্য	দুর্গাদাস গুপ্ত
১৩০৪	প্রদীপ	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম এ, ১৩০৮ সাল হইতে বিহারি লাল চক্রবর্ত্তী
১৩০৪	শিক্ষা	বিপিন বিহারী চট্টোপাধ্যায় (প্রকাশক) হুগলী হইতে প্রকাশিত।
১৩০৪	মালা	অপ্রকাশিত
১৩০৪	অন্তঃপুর	(১) বনলতা দেবী (১৩০৭ পৌষ) (২) হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী ১৩০৭ মাঘ —১৩১১) (৩) সুখতারা দত্ত (১৩১২)
১৩০৪	অবোধ বোধিনী পত্রিকা	শরচ্চন্দ্র দেব

১৩০৫	জননী	প্রসাদ দাস গাঙ্গুলী (প্রকাশক) চুঁচুড়া চৌমাথা।
১৮৯৯	প্রয়াস	সাহিত্য-সেবক সমিতি (প্রকাশক)
১৮৯৯	সেবিকা	মহেন্দ্র নাথ তত্ত্বনিধি ডায়মণ্ড-হারবার হইতে প্রকাশিত।
১৮৯৯	কমলা	মন্মথ নাথ মিত্র বি এ, এফ আর্ এইচ্ এস্ (কাশীপুর হইতে প্রকাশিত)
১৩০৫	অঞ্জলি	রাজেশ্বর গুপ্ত চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত।
১৩০৫	প্রসূন	ভূতনাথ সেন
১৩০৫	নির্ম্মাল্য	রাজেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
১৩০৫	উদ্দীপনা	নারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায়
১৩০৫	কোহিনুর	এস কে এম মহম্মদ রওসন আলি
১৩০৫	ঋষি	কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ কবিভূষণ
১৩০৫	প্রচারক	মমুমিয়া
১৩০৫	কোকিল	নিশিকান্ত ঘোষ হাবড়া হইতে প্রকাশিত।
১৩০৬	মুকুর ও মেডিক্যাল জারন্যাল	কেনারাম মুখোপাধ্যায়
১৩০৬	শ্রীচৈতন্য পত্রিকা	সুশীল কৃষ্ণ গোস্বামী
১৩০৬	শ্রীগৌড়েশ্বর বৈষ্ণব	ললিত মোহন গোস্বামী
১৩০৬	আলো	শ্রী নঃ
১৩০৬	ছাত্র	কতিপয় ছাত্র
১৩০৬	বীরভূমি	নীল রতন মুখোপাধ্যায়
১৩০৬	সদানন্দ	হরিহর নন্দী (প্রকাশক) ঢাকা হইতে প্রকাশিত

১৩০৬	বিংশ-শতাব্দী	হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
১৩০৬	কৃষিতত্ত্ব (নবপর্য্যায়)	নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় পাকপাড়া হইতে প্রকাশিত।
১৩০৭	প্রকৃতি	কে, সি, দেব (প্রকাশক)
১৩০৭	ব্রহ্মবাদী	সত্যানন্দ দাস বি, এ,
১৩০৭	জ্যোৎস্না	বরদাপ্রসাদ বসু পাবনা হইতে প্রকাশিত
১৩০৭	ছায়া	অপ্রকাশিত
১৩০৭	লহরী	মোজাম্মেল হক
১৩০৭	সনাতনী	যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় (প্রকাশক)
১৩০৭	সাহিত্য-সংহিতা	সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত। নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, সুবল চন্দ্র মিত্র, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১৩০৭	স্বাধীন জীবিকা	প্রতুল চন্দ্র সোম
১৩০৭	সর্ব্বধর্ম্ম রক্ষিণী	ক্ষীরোদ চন্দ্র মিত্র (প্রকাশক)
১৩০৭	শোভা	(১) রায় রাজ কৃষ্ণ তন্ত্রবাগীশ (২) ভবতারণ বিদ্যারত্ন
১৩০৬	ইস্‌লাম	আবদর রসিদ (ম্যানেজার)
১৩০৭	আরতি	উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সারদা চরণ ঘোষ ১৩১০ ভাদ্র পর্য্যন্ত, উপেন্দ্র চন্দ্র রায় ১৩১১ মাঘ হইতে ১৩১৩ চৈত্র পর্য্যন্ত ; যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ১৩১৫
১৩০৭	শিল্প ও সাহিত্য	অপ্রকাশিত
১৩০৭	ত্রিস্রোতা	শশি কুমার নিয়োগী ও ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী, জলপাইগুড়ি হইতে প্রকাশিত

১৩০৭	সনাতনী ও ছায়া	যোগেন্দ্রলাল দেব
১৩০৭	অনুশীলন বা কালচার (Culture)	Literary club Raj Ch. College (Barisal).
১৩০৭	জগদ্ধাত্রী	রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়
১৩০৭	রত্নাকর	গুরুনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন
১৩০৭	বৈষ্ণব-পত্রিকা	শ্যামলাল গোস্বামী (প্রকাশক)
১৩০৭	বিশ্বজননী	যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১৩০৭	বাসনা	মৃণাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খড়দহ)
১৩০৭	নবপ্রভা	জ্ঞানেন্দ্র লাল রায়
১৩০৭	মহাজন বন্ধু	রাজকৃষ্ণ পাল
১৩০৭	শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ পত্রিকা	যতীন্দ্রনাথ মিত্র
১৯০১	সরল হোমিও প্যাথি	বিপিন বিহারী চট্টোপাধ্যায় (১৯০১—০৭) অমূল্যকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯০৮) নৃপেন্দ্র নাথ সেট (১৯০৯) ও অমূল্য কুমার মুখোপাধ্যায়
১৯০১	নব্য-বঙ্গ	আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও পাঁচ কড়ি রায়
১৩০৮	প্রবাসী	রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ
১৩০৮	শ্রীশ্রীগৌড়ভূমি	অপ্রকাশিত
১৩০৮	ভাস্কর	সত্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩০৮	কৃষক (মাসিক)	মন্মথনাথ মিত্র এফ আর এইচ্ এস্
১৩০৮	আর্য্য-ধর্ম্ম	চণ্ডীচরণ ন্যায়রত্ন
১৩০৮	ঊষা	কান্তিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কালনা বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত।
১৩০৮	বসুধা	সত্যলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ তন্ত্রবাগীশ, অন্নদা প্রসাদ ঘোষাল।

১৩০৮	কল্যাণী	বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় (প্রকাশক)
১৩০৮	সতী	অপ্রকাশিত
১৩০৮	সঙ্গীত প্রকাশিকা	জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর
১৩০৮	সুধা	কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত
১৩০৮	জ্ঞানদায়িনী	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী দক্ষিণ সিতি ৺শীতলাতলা পোঃ কাশি- পুর হইতে প্রকাশিত।
১৯০২	শিবপুর কলেজ পত্রিকা	অপ্রকাশিত
৪১৭ গৌঃ অঃ	শ্রীশ্রীগৌড় বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা	মৃণালকান্তি ঘোষ (কার্য্যাধ্যক্ষ)
১১০৯	তাম্বুলি সমাজ	রামসত্য মুখোপাধ্যায় ও শরচ্চন্দ্র দত্ত রাজকৃষ্ণ পাল ও যোগেন্দ্রনাথ সিংহ ১৩১৪ হইতে (বহরমপুর হইতে প্রকাশিত)
১৩০৯	সমালোচনী	শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
১৩০৯	আশা	মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নওয়াখালি হইতে প্রকাশিত।
১৩০৯	আশা	হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ বি, এল্, (বারাসাত হইতে প্রকাশিত)
১৩০৯	অতিথি	প্রমথনাথ রায় (প্রকাশক) ঢাকা হইতে প্রকাশিত।
১৩০৯	গুরুদর্পণ	মন্মথনাথ গোস্বামী বোধখানা (যশোহর) হইতে প্রকাশিত
১৩০৯	কায়স্থ পত্রিকা	নগেন্দ্রনাথ বসু
১৩০৯	অভিষেক	বিভূতি শেখর মুখোপাধ্যায়

১৩০৯	প্রীতি	বিপিন কৃষ্ণ কুমার
১৩১০	যমুনা	সতীশ চন্দ্র মিত্র
১৩১০	নবনূর	মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলি
১৩১০	সোপান	শরচ্চন্দ্র সিংহ (প্রকাশিত) বীরভূম হইতে প্রকাশিত।
১৩১০	চিকিৎসা সম্মিলনী (নবপর্য্যায়)	অপ্রকাশিত
১৩১০	বৈষ্ণব-সন্দর্ভ	শ্যামলাল গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত।
১৩১০	বার্ত্তা	কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস
১৩১০	কমলা	জি, সি, বসু এণ্ড কোং (প্রকাশক)
১৩১০	সমাজ-দর্পণ	সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৩১০	সর্ব্বজন-সুহৃদ	অপ্রকাশিত
১৩১০	জননী	জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার (প্রকাশক)
১৩১০	ভূবৃত্তান্ত প্রকাশিকা	মধুসূদন চক্রবর্ত্তী
১৩১০	অর্চ্চনা	জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ ১৩১৫ কেশব চন্দ্র গুপ্ত এম,এ, বি,এল,
১৩১১	নববিকাশ	হরকুমার সাহা (ঢাকা)
১৩১১	অবসর	নবকুমার দত্ত
১৩১১	উষা	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (প্রকাশক)
১৯০৪	ভুবন মোহিনী বীণা	ডি, পি, বিশ্বাস, ঢাকা হইতে প্রকাশিত
১৩১১	যোগী সখা	অধর চন্দ্র নাথ
১৩১১	বঙ্গরত্ন	অপ্রকাশিত
১৩১১	জাহ্নবী	শ্রীনলিনী রঞ্জন পণ্ডিত ১৩১৩ শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

১৩১১	চন্দ্রমা	হরেন্দ্র চন্দ্র সিংহ কাঁদি মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত।
১৩১১	ঐতিহাসিক চিত্র	নিখিলনাথ রায়
১৩১১	আর্য্য প্রতিভা	অশ্বিনী কুমার সেন গুপ্ত
১৩১১	উপাসনা	চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় কাসিম বাজার হইতে প্রকাশিত।
১৩১১	পথিক	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১৩১১	বঙ্গীয় বণিক	নিকুঞ্জ বিহারী দাস
১৩১১	শ্রীশ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী	মধুসূদন অধিকারী ১ম ৩ বৎসর ত্রৈ- মাসিক ১৩১৫ হইতে মাসিক হয়।
১৩১১	চিকিৎসক ও সমালোচক	সত্যকৃষ্ণ রায়
১৩১১	সুমতি	অবিনাশ চন্দ্র দত্ত
১৩১২	বৌদ্ধ পত্রিকা	সর্ব্বানন্দ বড়ুয়া
১৩১২	বঙ্গলক্ষ্মী	হরিদাস মিত্র বি, এল্
১৩১২	প্রতিভা	কুঞ্জ বিহারী বসু
১৩১২	গন্ধ বণিক	অবিনাশ চন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল্
১৩১২	ইন্দিরা	বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় কালীঘাট হইতে প্রকাশিত।
১৩১২	ভারত মহিলা	সরযূবালা দত্ত ঢাকা হইতে প্রকাশিত।
১৩১২	স্বদেশী	নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ
১৩১২	অঙ্কুর	কালীবর বেদান্তবাগীশ
১৩১২	বাণী	অমূল্য চরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
১৩১৩	বঙ্গভাষা	কুমার সুরেন্দ্র চন্দ্র দেব বর্ম্মা
১৩১৩	উৎসব	রামদয়াল মজুমদার এম্, এ কাশী হইতে প্রকাশিত।

১৩১৩	আয়ুর্ব্বেদ পত্রিকা	নলিনীকান্ত সাংখ্যতীর্থ
১৩১৩	ভাণ্ডার	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩১৩	শীতলা পত্রিকা	শীতল প্রসাদ ঘোষ
১৩১৩	শৈবী	শিব চন্দ্র বিদ্যার্ণব কুমারখালি হইতে প্রকাশিত।
১৩১৩	সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ত্রৈমাসিক	রঙ্গপুর শাখা হইতে প্রকাশিত।
১৩১৩	কণিকা	ভূপেশ নাথ ভট্টাচার্য্য (প্রকাশক)
১৩১৩	মঙ্গলা	অশ্বিনী কুমার শর্ম্মা শিলেট হইতে প্রকাশিত।
১৯০৭	কাজের লোক	অপ্রকাশিত
১৩১৪	বেদান্ত-দর্পণ	সারদা নাথ দত্ত
১৩১৪	চিন্তা	অম্বিকা চরণ গুপ্ত
১৩১৪	আর্য্যভূমি	প্রিয়দর্শন হালদার
১৩১৪	পল্লীচিত্র	বিধুভূষণ বসু
১৩১৪	সুব্রাহ্মণ	অপ্রকাশিত
১৩১৪	ছাত্র-সখা	মন্মথ মোহন বসু
১৩১৪	বাল্য-সখা	পূর্ণচন্দ্র রায়
১৩১৫	বাসনা	সেখ ফজলল করিম কাঁকিনা, রঙ্গপুর।
১৩১৫	আর্য্য-বিভূতি	বিপিন বিহারী ঘটক
১৩১৫	আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা	কালীপ্রসন্ন সরকার বর্ম্মা বি, এ,
১৩১৫	সত্যপ্রকাশ	হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩১৫	সারথী	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
১৩১৫	মালঞ্চ	অপ্রকাশিত
১৩১৫	আর্য্যদর্পণ	স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী

১৩১৫	অনুশীলন	নবকুমার দত্ত
১৩১৫-১৬	মানসী	ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবরতন মিত্র।
১৩১৫	জগজ্জ্যোতিঃ	গুণালঙ্কার মহাস্থবির।
১৩১৬	দেবালয়	অপ্রকাশিত
১৩১৬	তিলিবান্ধব	ঐ
১৩১৬	মৃণ্ময়ী	ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ।
১৩১৬	শান্তিকণা	পূর্ণচন্দ্র সাহা প্রকাশক (ঢাকা হইতে প্রকাশিত)
১৩১৬	অলৌকিক রহস্য	ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
১৩১৬	ইউনাইটেড্ ট্রেড্ গেজেট্	নারায়ণ কৃষ্ণ গোস্বামী

ব্যাকরণ।

আদ্য ও মধ্যকালে কেহ বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করেন নাই—ইদানীন্তন-কালে বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, ১৭০০ শকে [১৭৭৮ খৃঃ অব্দে] হ্যালহেড্ নামক একজন ইংরেজ সিবিলিয়ান সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। হ্যালহেড বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে ঐ ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। হ্যালহেড্ সাহেবের পর কেরি সাহেব, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য, হটন্ সাহেব, রামমোহন রায়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ, ব্রজকিশোর গুপ্ত, কীথ সাহেব, ক্ষেত্রমোহন, নন্দকুমার বিদ্যারত্ন, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, শ্যামাচরণ সরকার, ওয়েঙ্গার সাহেব প্রভৃতি অনেকানেক মহাশয় বাঙ্গালা ব্যাকরণ * রচনা করিয়াছেন। ঐ সকল ব্যাকরণের মধ্যে

* বিশেষ দর্শনেচ্ছুগণ 'বিশ্বকোষ' অভিধানের 'বাঙ্গালা সাহিত্য (ব্যাকরণ)' প্রকরণ দেখিবেন।

কয়েকখানি ইংরেজির অনুকৃতি, কয়েকখানি সংস্কৃত মুগ্ধবোধের অবিকল অনুবাদ এবং কোন কোন খানি নিতান্ত অপভাষা-শব্দ সকলেরও সাধন প্রক্রিয়া-সমন্বিত; সুতরাং ইহাদের কোনখানিই সর্ব্ববিধ লোকের অনুমোদিত হয় নাই।

ইহার পরে লোহারাম শিরোরত্ন ও শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ এক এক বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। এক্ষণে আরও অনেকগুলি ঐরূপ বাঙ্গালা ব্যাকরণ বিরচিত হইয়াছে—তন্মধ্যে আমরা কতকগুলির উল্লেখ করিলাম—নীলমণি মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'বোধসার' ও 'নববোধব্যাকরণ,' 'বাঙ্গালাবোধ ব্যাকরণ,' মথুরানাথ তর্করত্নের 'ব্যাকরণচন্দ্রিকা,' জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'ব্যাকরণ প্রবেশ,' কেদারনাথ তর্করত্নের 'বাকরণমঞ্জরী,' দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'ভূষণসার ব্যাকরণ,' জয়গোপাল গোস্বামীর 'লঘুব্যাকরণ,' লোহারাম শিরোরত্ন রচিত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ,' শশিভূষণ তর্করত্নের সংস্কৃতশিক্ষোপযোগী বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বিষ্ণুচরণ নন্দিকৃত 'বিষ্ণুসারব্যাকরণ,' 'সরলব্যাকরণ,' রাজকুমার সর্ব্বাধিকারি-রচিত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ,' যশোদানন্দন সরকারের 'সঞ্জীবনী' এবং কালী-প্রসন্ন বিদ্যারত্ন প্রণীত 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'। এই সকল ব্যাকরণের কোন কোন খানির শেষভাগে বাঙ্গালা ছন্দ ও বাঙ্গালা অলঙ্কার সকলও বিনিবেশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই সকল ব্যাকরণ বিদ্যালয়ে পঠিত হইয়া থাকে।

ছন্দ।

আদ্য ও মধ্যকালে পয়ার, ত্রিপদী, মধ্যে মধ্যে একাবলী, দিগক্ষরা, ভঙ্গ পয়ার, মালঝাঁপ, দীর্ঘ লঘু ও ভঙ্গ ত্রিপদী এবং চতুষ্পদী—এই কয়েকটি-মাত্র ছন্দ সচরাচর ব্যবহৃত হইত। মধ্যকালের শেষে কবিরঞ্জন কতকগুলি নূতনবিধ ছন্দ প্রবর্ত্তিত করেন। তৎপরে রায়গুণাকর—অনন্তর তর্কালঙ্কার এবং তাঁহার পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অনেক ছন্দের বাঙ্গালায় অবতারণা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ঈশ্বরগুপ্ত ভিন্ন অপর সকলেরই প্রবর্ত্তিত নূতন ছন্দসকল সংস্কৃত-

মূলক। তৎপরে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন কবি ইংরেজি ছন্দোবিশেষের অনুকরণে কয়েক প্রকার নূতন ছন্দের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইঁহাদের উদ্ভাবিত ছন্দ সকলে ১ম ও ৩য় পঙ্‌ক্তিতে এবং ২য় ও ৪র্থ পঙ্‌ক্তিতে মিল—ইত্যাদিরূপ মিত্রাক্ষরতাসম্পৃক্ত কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য এবং পয়ার ও ত্রিপদীর একত্রীকরণ ভিন্ন অপর কোন চমৎকারিতা অনুভূত হয় না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত পয়ারের অন্ত্যবর্ণের মিল উঠাইয়া দিয়া অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দসৃষ্টির যশোলাভ করিয়াছেন, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দের অনুকৃতি ভিন্ন যে সকল নূতন ছন্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে, তৎসমস্তই প্রায় পয়ার ও ত্রিপদীর রূপান্তরমাত্র—অর্থাৎ পয়ারের আদি ও অন্তে ২।১ অক্ষর বাড়াইয়া বা কমাইয়া কোন স্থলে বা পয়ার ও ত্রিপদীকে মিশ্রিত করিয়া তাহাদের নিবন্ধন হইয়াছে। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অক্ষরের ঐরূপ ন্যূনাধিক্য করায়, বা পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতিকে মিশ্রিত করায়, স্থল বিশেষে ছন্দের বিলক্ষণ মধুরতা জন্মিয়াছে। ফলতঃ সংস্কৃতের অনুকরণ ও পয়ারাদির রূপান্তর করণ দ্বারা এক্ষণে বাঙ্গালায় অনেকবিধ ছন্দ প্রচলিত হইয়াছে। লালমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'কাব্যনির্ণয়' নামক পুস্তকে একটি ছন্দঃপরিচ্ছেদ নিবিষ্ট হইয়াছে। উহাতে তিনি পর্য্যায়-সম, পর্য্যায় ও শেষসম, অর্দ্ধসম, পর্য্যায়বিষম, পয়ার, ভঙ্গ-পয়ার, রঙ্গিল পয়ার, দীর্ঘ-লঘু, তরল-ভঙ্গ ও হীন-পদ ত্রিপদী, দীর্ঘ-লঘু অধিকপদ চতুষ্পদী, মালঝাঁপ, একাবলী, দীর্ঘ ও লঘু ললিত, কুসুমমালিকা, মালতী, তূণক, দিগক্ষরা, তরল পয়ার, অমিত্রাক্ষর, পজ্‌ঝটিকা, গজগতি, দ্রুতগতি, তোটক, ভুজঙ্গপ্রয়াত, অনুষ্টুপ, রুচিরা, ক্রৌঞ্চপদা, সোমরাজী, চম্পক ও বিশাখ এই ৩৭ প্রকার ছন্দের উদাহরণসহ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে সকল এস্থলে বিশেষরূপে উল্লেখ করা বাহুল্য।

কবিরঞ্জন, রায়গুণাকর ও তর্কালঙ্কার যে কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালায় গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্ভিন্ন ইন্দ্রবজ্রা, বসন্ততিলক, মালিনী ও শার্দ্দূলবিক্রীড়িত প্রভৃতি অপর সংস্কৃত ছন্দের বাঙ্গালায় অবতারণা করিতে অনেকে চেষ্টা

করিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের বোধ হয় কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সংস্কৃত 'ক্ষুদ্র' ছন্দ সকল বাঙ্গালার উপযোগী হয়—'দীর্ঘ' ছন্দ উপযোগী হয় না।

আগুকালের শেষভাগে আমরা পয়ার ও ত্রিপদীর লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু তৎকাল-প্রচলিত পয়ারাদি অপেক্ষা এক্ষণকার পয়ারাদি অনেক বিশুদ্ধ হইয়াছে। পদের মধ্যে যতি না পড়িলে, এবং প্রতি অর্দ্ধেক উপান্তিম স্বর ও অন্তিম হল্‌বর্ণ এ উভয়ের মিল থাকিলে তাহাকে বিশুদ্ধ পয়ার বলা যায়। প্রাচীনকালের পয়ারে অন্তিম হলের মিল প্রায় থাকিত, উপান্তিম স্বরের মিল সর্ব্বত্র থাকিত না। ত্রিপদীও এইরূপ। বাহুল্যভয়ে যতিভঙ্গের উদাহরণ না দিয়া পয়ারস্থ মিলের দুইটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

> সত্য কথা সদা কবে হ'য়ে সাবধান।
> মিথ্যাবাদী যথা তথা হয় হতমান॥

এস্থলে 'ধান'—'মান' ইহাদের মিল বিশুদ্ধ হইয়াছে—কিন্তু

> খোঁড়াকে বলিয়া খোঁড়া কাণা জনে কাণা।
> কদাপি তাদের মনে দিওনা বেদনা॥

এস্থলে 'কাণা' 'দনা' এ মিল তত বিশুদ্ধ হয় নাই—দনার পরিবর্ত্তে 'দানা' হইলে উত্তম বিশুদ্ধ হইত।

চলিত পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েক প্রকার ছন্দ আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে—আমরা তাহার কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম—পাঠকগণ সন্ধান করিয়া দেখিবেন, এইরূপ ছন্দোবদ্ধ কত শ্লোক দেশমধ্যে স্ত্রীসমাজে প্রচলিত আছে।—

> "আয় রৌদ্র হেনে। ছাগল দেব মেনে॥"১॥ ইত্যাদি
> "শুশুনী কলমী ন ন করে। রাজার বেটা পক্ষী মারে॥
> মারণ পক্ষী সুখের বিল। সোণার কৌটা রূপার খিল॥
> খিল খুল্‌তে হাতে ছড়। আমার ভাই বাপ লক্ষেশ্বর" ॥ ২ ॥

"শর শর শর। আমার ভাই গাঁয়ের বর॥ •
বর বর ডাক পড়ে। গুও গাছে গুও ফলে॥
আমার ভাই চিবুয়ে ফেলে, অন্য লোকের ভাই কুড়ুয়ে খায়॥" ৩॥
"শিল শিলেটন্ শিলে বাটন শিলা আছে ঘরে।
স্বর্গে থেকে মহাদেব বলে গৌরী কি বত্ত করে॥
আশ নাড়ন পাশ নাড়ন তোলা গঙ্গাজল।
এই পেয়ে তুষ্ট হলেন ভোলা মহেশ্বর॥ ৪॥ ইত্যাদি

অলঙ্কার।

বাঙ্গালা ভাষা অতি দুঃখিনী। ইহার নিজের কিছুমাত্র অলঙ্কার নাই। যাহা দুই চারি খানি ইহার গাত্রে দেখা যায়, তাহা মাতামহীর (সংস্কৃতভাষার) নিকট প্রাপ্ত। বাঙ্গালা যখন বালিকা ছিল, তখন মাতামহীর ভারী ভারী মোটা মোটা যে সকল অলঙ্কার (অনুপ্রাস, উপমা, রূপকাদি) তাহাই লইয়া সন্তুষ্ট ছিল—এখন যুবতী হইয়াছে, এখন আর সে সকল পুরাতন মোটা অলঙ্কারে উহার মন উঠে না—এখন জড়াও অলঙ্কারের (প্রতিবস্তূপমা, নিদর্শনা, সমাসোক্তি প্রভৃতির) প্রতি লোভ হইয়াছে, এবং ছলে বলে কৌশলে এক এক খানি করিয়া বৃদ্ধার অনেক অলঙ্কারই আত্মসাৎ করিতেছে। কামিনীগণের অলঙ্কার পরিবার সাধ পাঠকদিগের অবিদিত নাই। 'মল' বলিয়া দশ সের রূপার বেড়ী দিলেও মনের সুখে পরিবেন; কাণ ছিঁড়িয়া যায়—তবু সোণা পরিবেন—শেষে না হয় সোণার কাণ গড়াইবেন! ভাগ্যবন্ত গৃহের অনেক গৃহিণী অলঙ্কার-ভরে চলিতে পারে না—ভাল দেখায় না, তবু অলঙ্কারে সাজিয়া 'আহ্লাদে পুতুল' হইয়া বসিয়া থাকিবেন! বুড়া আয়ীর গায়ের সমস্ত অলঙ্কার বাঙ্গালার গাএ সাজিবে না—জবড়্জঙ্গী হইবে—ইহা বাঙ্গালা বোঝে না, তাহা নহে; তবু যে, সে অলঙ্কারের ঝুড়ি মাথায় করিতে চাহে, সে তাহার জাতির গুণ!

আদ্য ও মধ্যকালে অনুপ্রাস, উপমা, রূপক প্রভৃতি কয়েকটি মাত্র অলঙ্কার বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইত, এক্ষণে ক্রমে অনেকগুলি সংস্কৃত অলঙ্কার ইহাতে গৃহীত হইতেছে। এখন অনেকে বাঙ্গালা ব্যাকরণের শেষে একটা অলঙ্কার পরিচ্ছেদ বিনিবিষ্ট করিতেছেন। অলঙ্কার-বিষয়ে দুই এক খানা পৃথক্ গ্রন্থও প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ব্বোলিখিত 'কাব্যনির্ণয়' নামক পুস্তকে শ্লেষ, অনুপ্রাস যমক, ভাষাসম, পুনরুক্তবদাভাস, উপমা, রূপক, ভ্রান্তিমান্, অসঙ্গতি, উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক, অর্থান্তরন্যাস, স্বভাবোক্তি, অতিশয়োক্তি, বিরোধ, নিদর্শনা, ব্যাঘাত, কাব্যলিঙ্গ, পর্য্যায়োক্ত, অপহ্নুতি, পরিবৃত্তি. ব্যাজস্তুতি, সমাসোক্তি, প্রতিবস্তূপমা, তুল্যযোগিতা, দৃষ্টান্ত, বিভাবনা, সন্দেহ, অপ্রস্তুত প্রশংসা, বিশেষোক্তি প্রভৃতি অনেকগুলি অলঙ্কার সলক্ষণ উদাহরণসহ উল্লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃতেই এই সকল অলঙ্কারের অনেকগুলি বিশেষ বৈচিত্র্যাধায়ক নহে—বাঙ্গালার কথা সুদূর পরাহত।

ভাষা।

আদ্য, মধ্য ও ইদানীন্তনকালে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল এবং ক্রমে তাহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, তাহা তত্তৎকাল-রচিত গ্রন্থচয়ের সমালোচনাবসরেই উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ ভাষার সহিত ভাষান্তরের মিশ্রণ কোথায় কিরূপ হইয়াছে, সে কথা সর্ব্বস্থলে বলা হয় নাই, এক্ষণে সংক্ষেপে তদ্বিষয়েই কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।—আদ্যকালের ভাষায় হিন্দী বল—ব্রজভাষা বল—প্রাকৃত বল—অপর ভাষা বল—যাহা কিছু মিশ্রিত ছিল, তাহা পূর্ব্বে এক প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ঐ সময়ে ইহার মধ্যে আরবী, পারসী, ইংরেজী প্রভৃতি কোন বিদেশীয় ভাষা লব্ধ প্রবেশ হয় নাই; কারণ তৎকালে কোন বিদেশীয় জাতি বহুলরূপে দেশমধ্যে অবস্থান করেন নাই। কিন্তু মধ্যকালীন ভাষার যে সকল উদাহরণ এই গ্রন্থেই পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, তৎপাঠে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইবে যে,

মুসলমানদিগের আধিপত্যের চিহ্নস্বরূপ তৎকালীন বাঙ্গালার মধ্যে আরবী, পারসী, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষার প্রচুর শব্দের বহুল মিশ্রণ হইয়া গিয়াছে—এত মিশ্রণ যে, আমরা উহাদের অনেক শব্দকে ভিন্নভাষার শব্দ বলিয়া বুঝিতেই পারি না। বর্ত্তমানকালে আবার ইংরেজ বাহাদুরদিগের রাজত্বনিবন্ধন দিন দিন ভূরিভূরি ইংরেজি শব্দ বাঙ্গালার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে। সুতরাং এক্ষণে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, প্রাকৃত, আরবী, পারসী, ইংরেজী প্রভৃতি কত ভাষায় মিশ্রিত হইয়া যে, কিরূপ খেচরী হইতেছে, তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণ বুঝিতেই পারিতেছেন।

কথোপকথনে চলিত ভাষা কিংবা সংস্কৃতগর্ভক ভাষা এখন পুস্তকাদিতে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে এক্ষণে যে বিচার উঠিয়াছে, পূর্ব্বে একস্থলে তাহার যথামতি মীমাংসা করা গিয়াছে। অতএব তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এক্ষণে ভাষার রচনা প্রণালী লইয়া ২।৪টি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে—বাঙ্গালা ভাষার রচনা প্রণালী শিক্ষার্থ 'রচনাবলী' প্রভৃতি ২।১ খানি পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে, অতএব তৎপাঠে ঐ বিষয়ের সবিশেষ জ্ঞানলাভ হওয়া সম্ভব। আমরা সে সকল বিষয়ে অধিক হস্তক্ষেপ করিব না, স্থূলরূপে কেবল এই কথা বলিব যে, বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা; ইহার রচনা প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য পুস্তকগত নিয়মাবলী অভ্যাস করিতে হয় না; এ পর্য্যন্ত যে সকল মহাশয় বাঙ্গালা রচনা করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহাদের কেহই ঐরূপ পুস্তক অধ্যয়ন করেন নাই। অশ্লীল, দুশ্রব, দুর্ব্বোধ ও ব্যাকরণ দুষ্ট না হয়, এইরূপ বুঝিয়া বাক্যবিন্যাস করিতে পারিলেই উৎকৃষ্ট রচয়িতৃমধ্যে গণ্য হইতে পারা যায়। ফলকথা বাঙ্গালা রচনা করিতে হইলে—"বাক্যমধ্যে প্রথমে কর্ত্তা, শেষে ক্রিয়া ও মধ্যভাগে কর্ম্ম, করণ প্রভৃতি অপরাপর কারক ও অসমাপিকা ক্রিয়া পদাদি বসাইতে হইবে। সংখ্যাবাচক ও বিশেষণ পদসকল বিশেষ্যের পূর্ব্বেই বসিবে।—বিশেষণ যদি বিধেয় অর্থাৎ প্রধানরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে বিশেষ্যের পরে বসিবে, যথা নন্দ বড় মূর্খ; এখানে মূর্খ পদ বিশেষণ হইলেও বিশেষ্যের পরে বসিয়াছে।—বিশেষণ, বিশেষ্যের সমলিঙ্গ হয়, পুংলিঙ্গ ও ক্লীব-লিঙ্গে বিশেষণের রূপভেদ হয় না, যথা সুন্দর ফল বা সুন্দর পুরুষ। স্ত্রীলিঙ্গে

বিশেষণের রূপভেদ হয়, যথা সুন্দরী নারী। যেখানে বিশেষণ পদ স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত করিলে দুশ্রব হয় বা বক্তার পাণ্ডিত্য প্রকাশ দেখায়, সেখানে তাহাদিগকে অমনি বিন্যস্ত করাই সৎপরামর্শ; ক্ষুদ্র নৌকা বা মেঘাচ্ছন্না রজনী ইত্যাদি না বলিয়া ক্ষুদ্র নৌকা বা মেঘাচ্ছন্ন রজনী ইত্যাদি বলাই ভাল। কিন্তু যেখানে বিশেষণ পদ এরূপ যে, তাহাকে স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত না করিলে সে পদ পুংলিঙ্গের মত হইয়া পড়ে, সেখানে সে সকলকে অবশ্যই স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত করিতে হইবে;—যথা গতিশালী নৌকা ও জ্যোৎস্নাবান্ রজনী ইত্যাদি না বলিয়া গতিশালিনী নৌকা ও জ্যোৎস্নাবতী রজনী ইত্যাদি বলিতেই হইবে। বাঙ্গালা রচনায় এই নিয়মের প্রতি কিছু বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, নচেৎ অনেক স্থলে ভ্রম হইয়া পড়ে—ইত্যাদি প্রকারে নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে হইবে," এবম্বিধ বাক্যবিন্যাস ও নিয়ম নির্দ্দেশপূর্ব্বক গ্রন্থবাহুল্য করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে, এই জন্য সে বিষয়ে নিরস্ত থাকিয়া বাঙ্গালা রচনায় বা বাঙ্গালা কথোপকথনে শব্দগত যে সকল সাধারণ ভ্রম আছে—এমন কি, বিশেষ বিজ্ঞলোকেরাও কখন কখন অজ্ঞাতভাবে যে সকল ভ্রমে পতিত হয়েন, এখন তাদৃশ কতিপয় ভ্রমের উল্লেখ করিয়াই এ প্রকরণ পরিত্যাগ করিব। সে সকল ভ্রম এই———

(১) "অত্র আদালতের বিচারে"—বিশেষ্য ও বিশেষণপদের সম-বিভক্তিকত্ব হওয়া চাই; এস্থলে 'আদালতের' এই বিশেষ্যপদ সম্বন্ধবোধক ষষ্ঠ্যন্ত এবং 'অত্র' এই সর্ব্বনাম বিশেষণপদ অধিকরণবোধক সপ্তম্যন্ত; সুতরাং ইহাদের পরস্পর অন্বয় হইতে পারে না—'অত্র আদালতে'—বলিলে চলিত। (২) "অধীনী"—ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অধীনা হয়। (৩) "অলস"—ইহা বিশেষণ শব্দ; কিন্তু অনেকে ইহাকে বিশেষ্যবোধে প্রয়োগ করেন—যথা 'তাহার অলস নাই,' এস্থলে 'আলস্য নাই' হইবে। (৪) "আগত দিনে যাইব"—আ পূর্ব্বক গম ধাতুর উত্তর অতীতকালে ত প্রত্যয় করিয়া 'আগত' পদ সিদ্ধ হইয়াছে; উহার অর্থ যাহা আসিয়াছে—যাহা আসিবে—নহে; কিন্তু যে দিন পরে আসিবে সেইদিনে যাইব, এই অর্থে উহা প্রযুক্ত হয়, সুতরাং সে প্রয়োগ অশুদ্ধ; ঐ অর্থে 'আগামী দিনে যাইব' এইরূপ বলা কর্ত্তব্য। (৫) "কায়া"—কায় শব্দ

অকারান্ত পুংলিঙ্গ—আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ নহে। (৬) "একথা গ্রাহ্যযোগ্য নহে" —'গ্রাহ্য' এই পদের অর্থ গ্রহণযোগ্য, অতএব তৎসহ আবার 'যোগ্য' পদের প্রয়োগ অনাবশ্যক; 'একথা গ্রাহ্য নহে'—এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হয়। (৭) "চন্দ্রিমা"—চন্দ্রিকা—চন্দ্রকিরণ—জ্যোৎস্না—এই অর্থে অনেকে চন্দ্রিমা শব্দ প্রয়োগ করেন, কিন্তু "চন্দ্রিমা" এরূপ শব্দই নাই। (৮) "তৎকালীন সে ছিল না"—'তৎকালীন' এই পদ বিশেষণ, উহা বিশেষ্যসাপেক্ষ, কিন্তু উক্তরূপ বাক্যে উহার বিশেষ্য কিছু থাকে না, 'তৎকালে সে ছিল না, এই বলা উচিত। (৯) "দারাসুত নাই"—অনেকের বোধ আছে যে 'দারা' শব্দে পত্নী বুঝায়, উহা আকারান্ত ও স্ত্রীলিঙ্গ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; 'দার' এই অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের অর্থ পত্নী—দারপরিগ্রহ, কৃতদার ইত্যাদি প্রয়োগে উহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। (১০) "দাসী—দাস্যাঃ"—আদালতসম্পৃক্ত অনেক লোকেরই সংস্কার এই যে, শূদ্রজাতীয় স্ত্রীলোকের নামের পর 'দাসী' পদ থাকিলে তাহাকে সধবা এবং 'দাস্যাঃ' পদ থাকিলে তাহাকে বিধবা বুঝিতে হইবে; কিন্তু ইহা যে কিরূপ ভ্রম, তাহা অতি অল্পমাত্রও সংস্কৃত বোধ যাঁহাদের আছে, তাঁহারাও অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। দাসীপদ কর্ত্তৃকারকবোধক প্রথমান্ত এবং দাস্যাঃ পদ সম্বন্ধবোধক ষষ্ঠ্যন্ত; এতদ্ভিন্ন ঐ উভয়পদের অর্থগত আর কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। যদি দাসী বলিলে 'সধবা' বুঝায়, তবে দাস্যাঃ বলিলে 'সধবা' ভিন্ন আর কিছুই বুঝাইবে না। "দেবী—দেব্যাঃ" "শ্রীমতী—শ্রীমত্যাঃ" ইত্যাদি স্থলেও অনেকের ঐরূপ ভ্রম আছে। (১১) "নিরাকরণ"—নির্ণয়রূপ অর্থবোধার্থ অনেকে নিরাকরণ শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন; যথা 'এবিষয়ের এখনও নিরাকরণ হয় নাই' কিন্তু নিরাকরণ শব্দে নির্ণয়—মীমাংসা—বুঝায় না, উহার অর্থ দূরীকরণ—প্রত্যাখ্যান। বোধ হয়, "সংশয় নিরাকরণ" শব্দে সন্দেহভঞ্জন—মীমাংসা—বুঝায়,—তাহা হইতেই ঐ ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। (১২) "নিশি"—অনেক বিজ্ঞলোকেও 'নিশির শিশির পড়ে' ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়াছেন। সংস্কৃত নিশা শব্দের সপ্তমীর এক বচনে 'নিশি' পদ সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু 'নিশি' এরূপ শব্দ কুত্রাপি নাই; সুতরাং উহার ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'নিশির'

এরূপ সম্বন্ধপদ হইতে পারে না। (১৩) "মনান্তর"—মনঃ+অন্তর—এই দুই পদের সন্ধি হইলে মনোন্তর হয়—মনান্তর হয় না, অতএব মনান্তর শব্দ অসাধু। (১৪) "যদ্যপিও"—সংস্কৃত অপি শব্দের বাঙ্গালা অর্থ 'ও' সুতরাং যদ্যপি শব্দের অর্থ যদিও, অতএব ঐ 'যদ্যপি'র উত্তর আবার 'ও' দেওয়া কেবল পুনরুক্তি। 'যদ্যপিও'র ন্যায় 'তথাপিও' ভ্রান্ত-প্রয়োগ। (১৫) "যদ্যপি স্যাৎ সে ভাল হয়"—যদ্যপিস্যাৎ একবারে অব্যয়পদ নহে, "যদ্যপি" অব্যয়—'স্যাৎ' সংস্কৃত ক্রিয়াপদ—উহার অর্থ 'হয়' অতএব যদ্যপিস্যাৎ সে ভাল হয়—এই বাক্যকে অন্যরূপে বলিতে গেলে—যদ্যপি হয় সে ভাল হয়—এইরূপ হইয়া পড়ে। অতএব বাঙ্গালায় 'যদ্যপিস্যাৎ' না বলিয়া 'যদ্যপি' বলাই বিধেয়। (১৬) 'সতীত্ব'—এই শব্দটি এক্ষণে বাঙ্গালায় বহুল প্রচলিত, কিন্তু ব্যাকরণানুসারে ইহা সাধুশব্দ নহে। সৎশব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সতী হয়, তাহার উত্তর ভাবার্থে ত্ব প্রত্যয় করিলে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ঐ ত্ব পরেতে পূর্ব্বস্থিত স্ত্রীপ্রত্যয় ঈকারের লোপ হইয়া 'সত্ব' পদ হইয়া পড়ে; কিন্তু তাহাও শুনিতে ভাল লাগে না, এইজন্য চতুরেরা 'সত্ব' 'সতীত্ব' এ উভয়েরই পরিহার করিয়া সতীভাব, সতীধর্ম্ম, পাতিব্রত্য ইত্যাদি শব্দদ্বারা ঐ অর্থের প্রকাশ করিয়া থাকেন। (১৭) 'সবিনয়-পূর্ব্বক নিবেদন'—এই বাক্য এরূপে না বলিয়া 'সবিনয় নিবেদন' বা 'বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন' এই বলাই কর্ত্তব্য; কারণ সবিনয় ও বিনয়পূর্ব্বক বহুব্রীহিসমাসনিষ্পন্ন এই দুইটী পদ 'নিবেদন' এই পদের বিশেষণ হইতে পারে, সবিনয়পূর্ব্বক—ইহা কোনরূপে বিশেষণ হইতে পারে না; উহার সমাস ও অর্থসঙ্গতি হয় না। (১৮) "সন্তানসন্ততি"—অনেকের বোধ আছে, সন্তান শব্দের অর্থ পুত্র এবং সন্ততি শব্দের অর্থ কন্যা; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে—ঐ দুই শব্দেরই অর্থ পুত্র ও কন্যা উভয়। সংপূর্ব্বক তন ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ "সন্তান" শব্দটি পুংলিঙ্গ এবং ক্তি প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ "সন্ততি" শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ, সুতরাং ঐ শব্দদ্বয়ের লিঙ্গগত ভেদ ভিন্ন অর্থগত কোন ভেদ নাই। (১৯) 'সাক্ষী'—এইটি বিশেষণ বা ধর্ম্মিপদ—ধর্ম্মপদ নহে; এজন্য 'তিনি ইহাতে সাক্ষী আছেন, এরূপ বলা যায়, কিন্তু 'তাঁহাকে সাক্ষী দিতে হইবে' এরূপ বলা যাইতে পারে

না। ধর্ম্মপদ করিতে হইলে উহার উত্তর ভাবার্থ প্রত্যয় করিয়া সাক্ষিত্ব বা সাক্ষ্য করিতে হয়, যথা, তোমাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে ইত্যাদি। (২০) "সৌজন্যতা"—সুজন শব্দের উত্তর ভাবার্থে ষ্ণ্য প্রত্যয় করিয়া সৌজন্য হয়, উহার অর্থ সুজনতা; অতএব ঐ সৌজন্য শব্দের উত্তর আবার ভাবার্থে তা প্রত্যয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই—সৌজন্য বা সুজনতা, ইহার অন্যতর বলিলেই বক্তার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবে। বাহুল্যতা, গৌরবতা, লাঘবতা, দারিদ্রতা, সৌন্দর্য্যতা, স্থৈর্য্যতা ইত্যাদি পদও ঐরূপ। (২১) "সৃজন"—এই শব্দটী এত প্রচলিত যে, ইহাকে অশুদ্ধ বলিতে সঙ্কুচিত হইতে হয়। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, সৃজ্ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিলে কোনরূপেই 'সৃজন' পদ সিদ্ধ হয় না—'সর্জ্জন' হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা অব্যবহার-নিবন্ধন ভাল শুনায় না। যাহা হউক, যখন সৃজন পদ অসিদ্ধই হইতেছে, তখন উহা প্রচলিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে—বরং সৃজন ও সর্জ্জন উভয়েরই পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক সৃষ্টি প্রভৃতি শব্দদ্বারা তৎস্থান পূরণ করা কর্ত্তব্য, অতএব "সৃজন করেছ তুমি করিছ পালন" ইত্যাদি না বলিয়া "করিয়াছ সৃষ্টি তুমি করিছ পালন" ইত্যাদিরূপ বলাই ভাল। (২২) "সন্মত"—সং+মত এই দুই শব্দের সন্ধিতে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে ং অনুস্বার স্থানে ম্ হইয়া সম্মত হয়—সন্মত হয় না। সন্মতি ও সন্মান এইরূপ অশুদ্ধ। (২৩) "সিঞ্চন"—এই পদ ব্যাকরণে সিদ্ধ হয় না—সেচন হয়। (২৪) 'জন্মিল' এই অর্থে অনেকে 'জন্মাইল' পদ ব্যবহার করেন, তাহা অশুদ্ধ। (২৫) কেহ কেহ "মস্তকোন্নত করিল" এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা ভাল হয় না। "মস্তক উন্নত" এই দুই পদ পৃথক্ রাখাই কর্ত্তব্য। (২৬) কোন কোন ব্যক্তি "সোৎসুক-চিত্তে" এইরূপ প্রয়োগ করেন,—তাহা অসাধু। যে হেতু উৎসুক শব্দই বিশেষণ, তৎপূর্ব্বে আবার স যোগ করিবার প্রয়োজন নাই।

উক্তরূপ যে সকল অসাধু প্রয়োগের কথা উল্লিখিত হইল, গবর্ণমেণ্টের আদালত সকলেই ইহাদের সমধিক প্রচলন; অতএব তথাকার কৃতবিদ্য মহাশয়েরা যত্নবান্ না হইলে এ সকলের সংশোধনের উপায় নাই। এস্থলে ইহাও

বক্তব্য যে, আমাদের প্রদর্শিত অসাধু প্রয়োগ সকল কুশাগ্রমতি বৈয়াকরণেরা ব্যাকরণের কূটতাসাহায্যে সাধু করিতে না পারেন এমত নহে, কিন্তু চলিত ভাষায় ব্যাকরণের কূটতাযোজনা করিয়া অনার্ষ অপপ্রয়োগ রক্ষা করা আমাদিগের অভিমত নহে। এইজন্যই আমরা ঐ সকলকে অসাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।

পরিশিষ্ট।

(ক)

জীবিত ও মৃত কতিপয় গ্রন্থকারের নাম ও গ্রন্থপরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল। বাহুল্যভয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল না।

অ।

কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বড়াল—'কনকাঞ্জলি' ও 'প্রদীপ' 'ভুল' প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা। তদ্ভিন্ন অনেক মাসিক পত্রিকায় ইনি লিখিয়া থাকেন।

রাজসাহী নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় বি, এল্—'সিরাজ উদ্দৌলা' 'সীতারাম রায়' 'মীরকাশিম' 'রাণী ভবানী' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়া ইতিবৃত্তের আলোচনায় যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।

চুঁচুড়া কদমতলা নিবাসী শ্রীযুত অক্ষয় চন্দ্র সরকার বি, এল্,—বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও সমালোচক। ইঁহার 'গোচারণের মাঠ' যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত ও কাব্যাংশে সুন্দর। বঙ্কিম বাবুর আমলের বঙ্গদর্শনের ইনি একজন প্রধান লেখক। 'কমলা কান্তের দপ্তরে' 'চন্দ্রালোকে' প্রবন্ধটি ইঁহারই লেখনী-প্রসূত। তদ্ভিন্ন ইঁহার সম্পাদিত 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' পত্রিকায় ইঁহার লিখিত গবেষণা-পূর্ণ বহুপ্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

হুগলী জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গামোড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ গুপ্ত—'মহারাণী ভিক্টোরিয়া' 'পুরাণ কাগজ' 'জয়কৃষ্ণ চরিত' প্রভৃতি রচয়িতা। সম্প্রতি 'হুগলীর ইতিহাস' নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

কলিকাতা কম্বুলিয়াটোলার শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু—সুপ্রসিদ্ধ ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতৃ-গণের অন্যতম। ইনি 'বিবাহ বিভ্রাট' 'কালাপাণি' 'একাকার' 'সাবাস আটাশ' 'তাজ্জব ব্যাপার' 'রাজা বাহাদুর' 'কৃপণের ধন' প্রভৃতি কয়েকখানি সামাজিক প্রহসন রচনা করিয়া সাহিত্য জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত 'হীরকচূর্ণ' 'তরুবালা' 'বিজয় বসন্ত' প্রভৃতি নাটকগুলিও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সামাজিক চিত্র অঙ্কনে ইনি সুনিপুণ। ইঁহার রসিকতা বড় স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী।

শ্রীযুত অবিনাশ চন্দ্র দাস এম, এ, বি, এল্, 'পলাশ বন' ও 'সীতা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। 'পলাশবন' উপন্যাসখানি অতি মনোরম।

বরিশাল নিবাসী স্বনাম খ্যাত শ্রীযুত অশ্বিনী কুমার দত্ত—'ভক্তিযোগ' ও 'প্রেম' রচয়িতা।। 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থখানি ভক্তি ও তাহার সাধন বিষয়ক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ।

কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী —'চৈতন্যভাগবত' 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল' 'শ্রীলঘু-ভাগবতামৃত' প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থের সটীক সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। চৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থে প্রাচীন স্থান সমূহের বর্ত্তমান নাম ও পরিচয় এবং অপ্রচলিত বহু শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অধিকার আছে। ইনি উৎকলবাসী ভক্ত চরিত্র লইয়া বাঙ্গালায় 'ভক্তের জয়' নামে একখানি উপাদেয় ভক্তজীবনী সঙ্কলন করিয়াছেন।

আ।

ঢাকা বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রাম নিবাসী ৺আনন্দ চন্দ্র মিত্র—'মিত্রকাব্য' 'হেলেনাকাব্য' 'প্রেমানন্দ' 'ভারতমঙ্গল' 'প্রবন্ধ সার' 'মাতৃ-মঙ্গল' 'ভিক্টোরিয়া গীতিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

৺আনন্দ চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—ইনি অদ্বৈত চরণ আঢ্যের তত্ত্বাবধানে ৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের সহকারিতায় সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

ই।

বর্দ্ধমান গঙ্গাটিকুরি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত ইন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল,—'ভারত উদ্ধার' (ব্যঙ্গকাব্য), 'কল্পতরু' 'ক্ষুদিরাম' (উপন্যাস) 'পাঁচুঠাকুর' 'পঞ্চানন্দ' প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। হাস্যপরিহাসোদ্দীপক রচনায় এবং ব্যঙ্গকাব্যে ইনি বিশেষ পারদর্শী। বাঙ্গালা-ভাষায় বর্ণমালা ও ব্যাকরণ সংস্কার-মূলক গবেষণায় ইনি এক্ষণে ব্যাপৃত আছেন।

ডাঃ শ্রীযুত ইন্দুমাধব মল্লিক—এম, এ, এম,ডি 'চীনভ্রমণ ও বিলাত ভ্রমণ' প্রণয়ন করিয়াছেন।

ঈ।

৺ঈশান চন্দ্র বসু—'নারীনীতি' 'হিন্দুধর্ম্মনীতি' 'নীতিপ্রভা' প্রভৃতি নারীপাঠ্য গ্রন্থরচনা করিয়াছেন।

কলিকাতা খিদিরপুর নিবাসী ৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(১২৬২—১৩০৪)—'যোগেশ' (কাব্য) ও 'সুধাময়ী' (উপন্যাস) রচয়িতা। যোগেশ কাব্যে হতাশ প্রণয়ের চিত্র সুনিপুণ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে যতগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য আছে 'যোগেশ' কাব্য তাহাদের অন্যতম।

উ।

উপেন্দ্রনাথ দাস—'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' 'শরৎ সরোজিনী' 'দাদা ও আমি' নাটকাবলী রচনা করিয়াছেন।

উমেশ চন্দ্র বটব্যাল—(১২৫৯—১৩০৫)— 'সাংখ্যদর্শন' 'বেদপ্রকাশিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। অনেক সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইত। বৈদিক সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল।

ক।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভরাকর গ্রাম নিবাসী রায় শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন ঘোষ, বিদ্যাসাগর, সি, আই, ই, 'নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব' 'প্রভাত চিন্তা' 'নিভৃত চিন্তা' 'নিশীথ চিন্তা' 'ভ্রান্তি বিনোদ' 'ভক্তির জয়' 'মা না মহাশক্তি' 'জানকীর অগ্নিপরীক্ষা' 'ছায়া দর্শন' প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ইনি 'বান্ধব' নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছেন। ইনি বঙ্গভাষার একজন চিন্তাশীল ও খ্যাতনামা লেখক।

শ্রীমতী কামিনী রায় বি, এ, 'আলো ও ছায়া' 'পৌরাণিকী' 'নির্ম্মাল্য' 'গুঞ্জন' 'ধর্ম্মপুত্র'(কাউণ্ট টলষ্টয়) প্রভৃতি রচয়িত্রী। ইনি প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক চণ্ডী সেনের কন্যা।

শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র, সরস্বতী বি, এ,— 'শিখের বলিদান' 'মেরী কার্পেণ্টার' প্রভৃতি রচয়িত্রী। ইনি সঞ্জীবনী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কুমার মিত্রের কন্যা এবং 'সুপ্রভাত' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা।

নদীয়া জেলার রাণাঘাট নিবাসী কালীময় ঘটক—'চরিতাষ্টক' (১ম ও ২য় ভাগ), 'ছিন্নমস্তা' 'শর্ব্বাণী' 'কৃষিশিক্ষা' 'কৃষিপ্রবেশ' 'সুরেন্দ্র জীবনী' 'মিত্র বিলাপ' 'মেলা' 'আমি' প্রভৃতি রচয়িতা। 'চরিতাষ্টক' পুস্তক খানি সাধারণ্যে সমাদৃত।

অম্বিকা কাল্না নিবাসী কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন—বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দুইখণ্ড বাঙ্গালা ব্যাকরণ 'কাব্যোদ্যান' (১ম ও ২য় ভাগ) 'পত্র কৌমুদী' 'কৌতুক কথা' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার কয়েকখানি অনেক বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে অধীত হইয়া থাকে।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—'মিঠে কড়া' 'ডিটেকটিভ গল্প' (১ম ও ২য় ভাগ), 'স্বদেশ সঙ্গীত' প্রভৃতি রচয়িতা। ইনি মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদাবলীর একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তিতে ইনি পটু ছিলেন।

শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—'বাঙ্গালার ইতিহাস' (নবাবী আমল), 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। বাঙ্গালার ইতিহাস অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের মুসলমান শাসনের একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস।

শ্রীযুত কালীবর বেদান্তবাগীশ—'পাতঞ্জল দর্শন' 'বেদান্তসার' 'সাংখ্যদর্শন' প্রভৃতি গ্রন্থের সরল বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ইঁহার 'পরলোক রহস্য' গ্রন্থে বহুবিধ বৈদিক প্রমাণ ও ঘটনা দ্বারা পরলোকের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

অম্বিকা কাল্নানিবাসী কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়—'কবিতা কুসুমাঞ্জলি' 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ নিবাসী শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র—'মহম্মদ চরিত' 'বুদ্ধ চরিত' 'ভিক্টোরিয়া চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

খুলনার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রাম নিবাসী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—'সম্ভাবশতক' 'মোহভোগ' 'কৈবল্যতত্ত্ব' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার 'সদ্ভাবশতক' পারস্ত কবি হাফেজকে আদর্শ করিয়া লিখিত, কিন্তু উহা হাফেজের হীন অনুকরণ নহে। সদ্ভাবশতকে গ্রন্থকারের ভাবুকতা ও কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

হাওড়ার অন্তর্গত বালীগ্রাম নিবাসী কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল—'পন্থা' নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকার প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক। ইঁহার গভীর গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধাবলী বহু মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক।

কলিকাতা নিবাসী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (রেভারেণ্ড কে, এম, বানার্জ্জি, ডি, এল)—এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গালিন্সিস্ 'স্ত্রী শিক্ষা' 'ষড়দর্শন সংবাদ' প্রভৃতি অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইঁহার ভাষা কিঞ্চিৎ ইংরেজিগন্ধি এবং প্রায় সকল গ্রন্থই খৃষ্টান ধর্ম্মের পক্ষপাতী, তথাপি ইঁহার গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়।

কলিকাতায় কৃতনিবাস কেশব চন্দ্র সেন—'বিধান ভারত' 'নবসংহিতা' 'জীবনবেদ' 'সেবকের নিবেদন' প্রভৃতির রচয়িতা। এতদ্ভিন্ন ইনি 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় ও 'সুলভ সমাচার' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশক। বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁহারা এ পর্য্যন্ত বাগ্মিতায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন কেশবচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে প্রধান।

কৃষ্ণনগর নিবাসী কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় (দেওয়ান)—'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত' 'গীত-মঞ্জরী' 'আত্মজীবন চরিত' প্রভৃতিগ্রন্থ রচয়িতা। ক্ষিতীশবংশাবলীতে কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে।

কৈলাশ চন্দ্র ঘোষ—'বাঙ্গালা সাহিত্য' নামে বঙ্গ-সাহিত্যের একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন।

কৈলাস চন্দ্র সিংহ—'রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস' 'স্বাধীনতার ইতিহাস' 'সেনরাজগণ' প্রভ তি রচনা করিয়াছেন।

শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুত করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রসাদী' 'ঝরাফুল' প্রভৃতি গীতিকাব্যের প্রণেতা। কবিতা গুলি সরস, সরল ও মনোহর।

শ্রীযুত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী এম, এ—'মানব প্রকৃতি' (১ম ও ২য় খণ্ড) 'আদর্শগৃহী' 'নারীধর্ম্ম' 'বনফুল' প্রভৃতির রচয়িতা। তদ্ভিন্ন 'ভারতী' 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় ইহার সুললিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ—'ফুলশয্যা' 'কবিকাননিকা' 'আলিবাবা' 'জুলিয়া' 'বেদৌরা' 'প্রতাপাদিত্য' 'রঞ্জাবতী' 'নারায়ণী' (উপন্যাস) 'উলুপী' 'নন্দকুমার' 'চাঁদবিবি' 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' 'অশোক' 'বাসন্তী' প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

কলিকাতায় কৃত নিবাস ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য—'জরিপ ও পরিমিতি' 'নবশিশু বোধ' 'কবিতা সংগ্রহ' 'শুভঙ্করী' প্রভৃতি রচয়িতা। গণিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং ভাষায়ও তাঁহার অধিকার কম ছিল না; সেই হেতু তাঁহার গণিত পুস্তকগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় ভাষার গুণে সহজেই বোধগম্য হয়।

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী (মৃত্যু ১৩০৯ মাঘ)—'মধুযামিনী বা হিঙ্গনা' 'কৃষ্ণা' 'চন্দ্রনাথ' প্রভৃতি উপন্যাস রচয়িতা। এতদ্ভিন্ন বহু সাময়িক পত্রে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণামূলক ইঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। French Academy'র অনুকরণে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা নিমিত্ত Bengal Academy of Literature নামক সভা প্রতিষ্ঠা ইঁহার দ্বারা প্রথম হয়। এই সভাই পরিশেষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত, 'বিদ্যারত্ন—শিক্ষা ও উপদেশ' নামক স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থ এবং 'মদনমোহন' নামক উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। সংবাদ পত্রেই ইনি জীবনপাত করিয়াছেন।

গ।

চুঁচুড়া কদমতলা নিবাসী গঙ্গাচরণ সরকার—'ঋতুবর্ণন' 'বঙ্গ-সাহিত্য ও 'বঙ্গভাষা' হিন্দুধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা' প্রভৃতি প্রণেতা। সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ইঁহারই পুত্র।

কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্, বি, ডাক্তার, (জন্ম ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৩৬, 'মৃত্যু ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৮৯)—'চিকিৎসা প্রকরণ এবং চিকিৎসাতত্ত্ব' (১৮৫৯, ১ম ও ২য় খণ্ড), 'শারীর বিদ্যা' (Anatomy) মাতৃশিক্ষা (Advice to mother) প্রভৃতি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 'চিকিৎসা প্রকরণ' চিকিৎসা বিষয়ে একটি সুবৃহৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ। ইহা প্রধানতঃ সুবিখ্যাত ডাক্তার ট্যানার সাহেবের 'প্র্যাক্‌টিস অব মেডিসিন' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থকার পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ সমূহের (medical terminology) সরল ও যথাযথ বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গ-ভাষার পুষ্টি-সাধন এবং উহার একটি প্রধান অভাব মোচন করিয়া শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় রচিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী তাঁহারই পথানুসরণে রচিত হইয়া আসিতেছে। স্বকীয় ব্যবসায়ে ইঁহার যথেষ্ট প্রসার প্রতিপত্তি সত্ত্বেও ইনি মূল রামায়ণের আদি হইতে সুন্দরা কাণ্ডের সুন্দর পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। বঙ্গের গৌরব স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীযুত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, এম্, এ, ডি, এল্, ডি, এস্, সি, এফ, আর, এ, এস, এফ, আর, এস, ই ইঁহারই পুত্র।

গিরিজা প্রসন্ন রায় চৌধুরী—'গৃহলক্ষ্মী' (১ম ও ২য় ভাগ), 'দম্পতীর পত্রালাপ' ও

'বঙ্কিম চন্দ্র' (তিনভাগ) প্রণয়ন করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থে বঙ্কিম বাবুর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির চরিত্র সমালোচনা আছে।

কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রসিদ্ধ নাটককার। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ধর্ম্মমূলক, সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ে অন্যূন সার্দ্ধশত গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। ইঁহার রচিত নাটক (নলদময়ন্তী, পাণ্ডব গৌরব, জনা, দক্ষযজ্ঞ প্রভৃতি), ঐতিহাসিক নাটক (সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতি), ধর্ম্মমূলক নাটক (বিল্ব মঙ্গল, করমেতী বাই, পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি) সামাজিক নাটক (বলিদান, প্রফুল্ল, হারানিধি, ইত্যাদি) ক্ষুদ্রগীতি নাট্য (স্বপ্নের ফুল, মলিনা বিকাশ, মায়াতরু, মনের মতন প্রভৃতি), প্রহসন (আলাদীন, বড়দিনের বক্‌সিস্, সভ্যতার পাণ্ডা তোট মঙ্গল প্রভৃতি) রচনাগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বুদ্ধদেব, চৈতন্যলীলা, সীতার বনবাস, কালাপাহাড়, শঙ্করাচার্য্য, বিষাদ, আবু হোসেন প্রভৃতি গ্রন্থগুলি নাট্য জগতে বিশেষ আদৃত। গিরিশ বাবুর অধিকাংশ নাটকে একটী অভূতপূর্ব্ব কল্পিত চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। এইরূপ চরিত্রগুলি তাঁহার নাটকীয় জ্ঞানের ও চরিত্র চিত্রণ-পটুতার বিশেষ পরিচায়ক; দৃষ্টান্তস্বরূপ বিল্ব মঙ্গলের পাগলিনী, জনার বিদূষক, মুকুল মুঞ্জরার বরুণ চাঁদ, আনন্দ রহোর বেতাল, বলিদানের জোবি পাগলিনী প্রভৃতি চরিত্রগুলি উল্লেখ যোগ্য। অমর কবি সেক্‌স্‌পিয়রের শ্রেষ্ঠ নাটক ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদ গিরিশবাবু যেরূপ সফলতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন সেরূপ কোন ভাষার অনুবাদ সাহিত্যে আছে কি না সন্দেহ।

গিরিশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন—দশকুমার চরিতের বঙ্গানুবাদ ও 'শব্দসার' অভিধান সঙ্কলন করিয়াছেন।

শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী—'অশ্রুকণা' 'আভাষ' 'সন্ন্যাসিনী বা মীরা বাই' 'শিখা' 'স্বদেশিনী' 'সিন্ধুগাথা' প্রভৃতি রচয়িত্রী। স্ত্রীকবিদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে।

নদীয়া জেলার গরিবপুর নিবাসী শ্রীযুত গিরিজা নাথ মুখোপাধ্যায়—'পরিমল' 'বেলা' প্রভৃতি কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গা নিবাসী স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ, ডি,এল, পি,এইচ, ডি, 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' নামক দর্শনমূলক একখানি উপাদেয় পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ আছে এবং ইহার উন্নতিকল্পে তিনি সর্ব্বদাই যত্নবান্।

ঢাকা নিবাসী গোবিন্দ চন্দ্র রায়—'যমুনা লহরী' 'জাতীয় সঙ্গীত' 'গীতি কবিতা' (৪খণ্ড) রচয়িতা। ইঁহার রচিত "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা তট শালিনী যমুনে ও' এবং 'কত কাল পরে বল ভারত রে' শীর্ষক সঙ্গীত দুইটি বিখ্যাত।

চ।

৺চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ—কালিদাস কৃত সংস্কৃত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

ময়মনসিংহের সেরপুর গ্রাম নিবাসী ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার—'শিক্ষা' 'সত্যবতী চম্পূ' প্রভৃতি বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছেন। শ্রীযুত শ্রীগোপাল বসু মল্লিক দত্ত বৃত্তি পাইয়া ইনি পাঁচ বৎসর কাল যাবৎ বেদান্ত আদি বিষয়ে যে সকল বক্তৃতা দেন তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। বক্তৃতাগুলি বাঙ্গালা ভাষার অক্ষয় সম্পদ্। তর্কালঙ্কার মহাশয় শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

শ্রীযুত চণ্ডী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—'মা ও ছেলে' 'কমলকুমার' 'মনোরমার গৃহ' প্রভৃতির রচয়িতা। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি সুবিস্তৃত জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন।

৺চণ্ডী চরণ সেন—'মহারাজ নন্দকুমার' 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' 'অযোধ্যার বেগম' 'ঝান্সীর রাণী' 'টমু কাকার কুটীর' 'এই কি রামের অযোধ্যা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি একজন সুলেখক এবং ইঁহার ভাষা ওজস্বিনী।

হুগলী জেলার কৈকালা গ্রামনিবাসী—শ্রীযুত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল—'শকুন্তলাতত্ত্ব' 'ত্রিধারা' 'ফুল ও ফল' 'হিন্দুত্ব', 'সংযম-শিক্ষা' 'সাবিত্রীতত্ত্ব' 'কঃ পন্থাঃ' 'বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিকৃতি' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালা ভাষার একজন খ্যাতনামা লেখক ও সমালোচক। ইংরাজিতে সুপণ্ডিত হইলেও ইঁহার লেখায় ইংরাজি ভাবাদির গন্ধমাত্র নাই।

শ্রীযুত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল—'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' 'স্ত্রী চরিত্র' 'কুন্তলতার মনের কথা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহার 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম' সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত।

শ্রীযুত চন্দ্রশেখর কর বি, এ—'সৎকথা' 'ছ'আনাজ' 'সুরবালা' 'পাপের পরিণাম' 'অনাথ বালক' প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার 'অনাথ বালক' নামক উপন্যাসটি বহুজন-প্রশংসিত।

শ্রীযুত চন্দ্রশেখর সেন (ব্যারিষ্টার)—'ভূ-প্রদক্ষিণ' নামক নানা দেশের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত-মূলক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা (ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল)—'গীতরত্নাবলী' 'বিংশ শতাব্দী' 'গরলে অমৃত' 'ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা' 'ইহকাল পরকাল' 'কেশব চরিত' প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন।

জ।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর নিবাসী ৺জগদীশ্বর গুপ্ত—'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' (৩খণ্ড) 'শ্রীচৈতন্য লীলামৃত' প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থের সটীক সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

ঢাকা পাণকুণ্ড গ্রাম নিবাসী ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র—'বান্ধব' 'অনুসন্ধান' প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্রে ইঁহার গবেষণাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহার 'ছুচ্ছুন্দরী বধ' নামক ব্যঙ্গকাব্যের পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে। বৈষ্ণবপদাবলী সংগ্রহে ইঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। ইঁহার সংগৃহীত 'শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী' সাহিত্য-ভাণ্ডারে রত্ন-বিশেষ।

৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কার—'বিষ্ণুপুরাণ' 'কল্কিপুরাণ' 'পরাশর সংহিতা' প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া এবং সময়ে সময়ে 'পরিদর্শক' 'বিজ্ঞান কৌমুদী' প্রভৃতি সংবাদ পত্রে প্রচার করিয়া বঙ্গভাষার যথেষ্ট সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছেন।

কলিকাতার দক্ষিণ বড়িশাগ্রামনিবাসী ৺জয় নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত। মাধবাচার্য্য-প্রণীত সংস্কৃত 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থবর্ণিত ষড়্‌-দর্শনাদির স্থূলমর্ম্ম বঙ্গভাষায় বিবৃত করিয়াছেন।

শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুত জয় গোপাল গোস্বামী—'কাব্য দর্পণ' 'সীতাহরণ' 'শৈবলিনী' 'রত্নযুগল' প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীযুত জলধর সেন—হিমালয়' 'নৈবেদ্য' 'প্রবাসচিত্র' 'পথিক' 'কুমারী' প্রভৃতি রচয়িতা। হিমালয় প্রভৃতি গ্রন্থগুলি ভ্রমণ-বিষয়ে লিখিত হইলেও উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য।

শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর—'সরোজিনী' 'পুরুবিক্রম' 'অশ্রুমতী' 'হিতে বিপরীত' প্রভৃতি কয়েকখানি সুন্দর নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইনি 'অভিজ্ঞান 'শকুন্তলা' 'উত্তর চরিত' 'রত্নাবলী' 'মালতী মাধব' 'মুদ্রারাক্ষস' 'মৃচ্ছকটিক' 'মালবিকাগ্নিমিত্র' 'চণ্ডকৌশিক' 'বিক্রমোর্ব্বশী' 'মহাবীর-চরিত' 'বেণী সংহার' প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকগুলির অনুবাদ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। অনূদিত নাটকগুলি এরূপ সুন্দর হইয়াছে যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও মূল সংস্কৃত নাটকের রসাস্বাদনে বঞ্চিত হন না।

ঠ।

খুলনা জেলার অন্তর্গত সারসাগ্রাম নিবাসী ৺ঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায়—'সাহিত্যমঙ্গল' 'সাতনরী' 'শারদীয় কাব্য' 'বিড়ন বালা' প্রভৃতির প্রণেতা। সাধারণী, নবজীবন, নব্য ভারত, সাহিত্য, সাধনা, প্রচার প্রভৃতি সাময়িক পত্রে ইঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

ত।

চব্বিশ পরগণার চাঙ্গড়িপোতা নিবাসী শ্রীযুত তারাকুমার কবিরত্ন—সংস্কৃত শ্লোকের সরল পদ্যানুবাদে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত কৃষ্ণভক্তি রসামৃত, পদ্যামৃত,

তারা মা, কবিবচনসুধা প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার বিশিষ্ট পরিচায়ক। স্কুলপাঠ্য অনেক গ্রন্থও ইনি প্রকাশ করিয়াছেন।

৺ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডাক্তার)— 'স্বর্ণলতা' 'তিনটি গল্প' 'অদৃষ্ট' 'হরিষে বিষাদ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। স্বর্ণলতার ন্যায় গার্হস্থ্য উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল।

নদীয়া জেলার কাঁচকুলিগ্রাম নিবাসী ৺তারাশঙ্কর কবিরত্ন—'কাদম্বরী' ও 'রাসেলাস' নামক দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়াছেন। প্রথম খানি সংস্কৃতের ও দ্বিতীয় খানি ইংরেজির অনুবাদ। কাদম্বরী এক কালে দেশ মধ্যে বহু সমাদৃত ছিল।

৺ ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ বি, এল— 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা' 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' 'বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবির জীবনী' 'নেপালের পুরাতত্ত্ব' 'রাজতরঙ্গিণী' 'বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা' প্রভৃতি পুস্তক রচয়িতা এবং বিবিধ সাময়িক পত্রিকার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ লেখক।

৺ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—'কঙ্কাবতী' 'ভূত ও মানুষ' 'ফোগ্লাদিগম্বর' 'মুক্তামালা' প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। 'বিশ্বকোষ' নামক সুবৃহৎ অভিধান ইঁহার অগ্রজ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে প্রথমে সম্পাদিত হয়। এক্ষণে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু উহার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়—'নবীন সন্ন্যাসী' নামে বৃহদাকার (দুই খণ্ডে পূর্ণ) উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। উপন্যাসখানির বিস্তারিত অংশ বাদ দিয়া ছোট করিলেই ভাল হইত। ইঁহার 'গল্প পঞ্চে' মায়া, সৎসঙ্গ প্রভৃতি পাঁচটি প্রবাদমূলক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। গল্পগুলি যেমন কৌতুকোৎপাদক, সেইরূপ লেখকের লিপিকুশলতার বিশিষ্ট পরিচায়ক।

দ।

গোয়াড়িকৃষ্ণনগর নিবাসী ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় 'মৃন্ময়ী' 'মা ও মেয়ে' 'দুইভগিনী' 'বিমলা' 'কর্ম্মক্ষেত্র' 'শান্তি' 'সোনার কমল' 'যোগেশ্বরী' 'অন্নপূর্ণা', 'সপত্নী' প্রভৃতি অনেক গুলি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার 'কমলকুমারী' (Scott এর Lammermoor এর অনুবাদ) এবং 'শুক্লবসনা সুন্দরী' (১ম, ২য়, ৩য়) (Wilkie Collins এর Woman in White এর অনুবাদ) সুখপাঠ্য গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন ইনি ৯টী টীকাভাষ্য ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ শ্রীমদ্ভগবতগীতার একটি উপাদেয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

৺ দ্বারকানাথ রায়—'প্রকৃতি-প্রেম' ও 'প্রকৃত সুখ' নামক কবিতা পুস্তক এবং 'পাঠামৃত' ও 'ছাত্রবোধ' নামক পদ্যগদ্যময় বিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থ রচয়িতা।

চুঁচুড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর বি-এল-'কংসবিনাশ কাব্য' 'মাতৃবিয়োগ' 'ত্রিশূল' 'উষাচরিত' 'উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর' প্রভৃতি রচয়িতা ও আনন্দভট্ট কৃত সংস্কৃত বল্লাল চরিতের বঙ্গানুবাদক। কবিতারচনায় ও হাস্য-রস-পরিস্ফুরণে ইঁহার প্রসিদ্ধি আছে। এডুকেশনগেজেটে ও আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত ইঁহার 'বিবিধ চাটনি' ও চুঁচুড়ার মাথাঘসা' (কৌতুককণা) উপভোগের সামগ্রী।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় 'অজয় সিংহের কুঠি' (ডিটেক্‌টিব উপন্যাস) 'পল্লীচিত্র' 'নন্দন কানন' 'অমৃতলাল' 'জাল মোহান্ত' প্রভৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। নূতন ধরণের ডিটেক্‌টিব গল্প লিখিতে ইনি বিশেষ নিপুণ।

হুগলীজেলার সোমড়া গ্রামনিবাসী ৺ দুর্গাচরণ রায়—'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। দেবগণের ভারতভ্রমণ উপলক্ষ্য করিয়া গ্রন্থকার উপন্যাসাকারে কৌশলে প্রসিদ্ধ স্থান ও তথাকার খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের পরিচয় দিয়াছেন। 'পাস করা ছেলে' 'চিনির বলদ' প্রভৃতি শ্লেষাত্মিকা পুস্তিকাও ইঁহার রচিত।

বর্দ্ধমান জেলার চকবেড়িয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী—'দ্বাদশনারী' 'রাণী-ভবানী' 'স্বাধীনতার ইতিহাস' প্রভৃতি রচয়িতা। তাঁহার রাণীভবানী উপন্যাসাকারে লিখিত রাণী মহোদয়ার জীবনচরিত, পুণ্য-শ্লোক রাণীর জীবনবৃত্ত জানিবার জন্য অনেকেই সমুৎসুক, লাহিড়ীমহাশয় ভাষা ও লেখার গুণে সেই ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত করিতে পারিয়াছেন। ইঁহার সম্পাদিত 'বৈষ্ণবপদ-লহরী'—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ পদাবলীসংগ্রহ। ইঁহার 'বাঙ্গালীর গান'এ রামপ্রসাদ হইতে আধুনিক সঙ্গীত-রচয়িতাদিগের সঙ্গীত সমূহ বহু আয়াসে সংগৃহীত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। রচয়িতাদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনীও দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'স্বপ্নপ্রয়াণ' 'হারামণির অন্বেষণ' 'আর্য্যামি ও সাহেবিয়ানা' 'অদ্বৈতমতের আলোচনা' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে রূপকচ্ছলে মানবীয় বৃত্তিসমূহের গুণ ও কার্য্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। ইনি একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি, এল, রায়) 'কল্কিঅবতার' 'আর্য্যগাথা' 'আষাঢ়ে' 'হাসির গান' 'ত্র্যহস্পর্শ' 'বিরহ' 'পাষাণী' 'তারাবাই' 'রাণাপ্রতাপ' 'দুর্গাদাস' 'নুরজাহান' 'মেবার-পতন' প্রভৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি 'পূর্ণিমা সম্মিলন' নামে সাহিত্যসেবীদের মাসিক সম্মিলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। হাসির গানে ইনি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাতে দ্বিজেন্দ্র বাবু স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে অশ্লীলতা রসিকতার অঙ্গ নহে। অশ্লীল

রসিকতা বা বিদ্রূপাত্মক কবিতা (personal satire) লোক বিশেষকে ক্ষণিক আনন্দ প্রদান করিলেও মানবমাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে না। তিনি 'সাজাহান' 'মেবার-পতন' প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের নাটক লিখিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এগুলিতে তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণপটুতা এবং গম্ভীরভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। ইঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি বড়ই মধুর ও হৃদয়-স্পর্শী।

ঢাকা জেলার শ্রীবাড়ী গ্রাম নিবাসী দীনেশচন্দ্র বসু—'মহাপ্রস্থান' (কাব্য) 'কবিকাহিনী' 'কুলকলঙ্কিনী' 'মানসবিকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

ঢাকা জেলার কাজুরীগ্রামনিবাসী শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন—'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' 'তিন বন্ধু' 'বেহুলা' 'সতী' 'ফুল্লরা' 'রামায়ণী কথা' প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

শ্রীযুত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী—'বিরাজমোহন' 'সন্ন্যাসী' 'ভিখারী' 'নবলীলা' 'সোপান' 'জ্যোতিঃকণা' 'প্রসাদ' 'সান্ত্বনা' 'যোগজীবন' 'পুণ্যপ্রভা' 'শরচ্চন্দ্র' 'মুরলা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি একজন সুলেখক ও উচ্চ অঙ্গের সমালোচক।

শ্রীযুত দেবকুমার রায় চৌধুরী--'অরুণ' 'প্রভাতী' 'ব্যাধি' ও 'প্রতিকার' 'মাধুরী' গ্রন্থ রচয়িতা।

ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিপোষ্টা স্বনাম প্রসিদ্ধ ৺দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর (মহর্ষি) 'ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্যসহিত' (১ম ও ২য় খণ্ড), 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান' 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস' 'উপদেশাবলী', 'জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি' 'পরলোক ও মুক্তি' 'আত্ম-জীবনী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ ও উপ-নিষদের সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় বৃত্তি রচনা করেন। বেদের উচ্চভাব ইনি সহজ ও সুন্দর ভাষায় অবতারিত করিয়া সাধারণের প্রভূত হিতসাধন করিয়াছেন।

শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ সেন—এম এ, বি এল, 'অশোকগুচ্ছ' 'হরিমঙ্গল' প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা। ইঁহার কবিতা অধিকাংশই ভক্তি-রসাশ্রিত। ইনি একজন সুকবি।

ন।

শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব— 'কায়স্থের বর্ণনির্ণয়' ও 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' (ব্রাহ্মণখণ্ড) দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন জয়নারায়ণের কাশীপরিক্রমা, রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদন করিয়াছেন। ইঁহার সম্পাদিত 'বিশ্ব-কোষ' নামক বঙ্গভাষার বৃহদভিধান ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—(বোম্বাইবাস) 'লীলা' 'তমস্বিনী' 'জীবন ও মৃত্যু' 'অমর সিংহ' 'পর্ব্বত

ষাসিনী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ভারতী, সাহিত্য প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। অল্পদিন হইল ইনি শ্রীযুত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের সহযোগে বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলীর একটি সটীক সুবৃহৎ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

৺ নগেন্দ্রবালা মুস্তোফি, সরস্বতী—'গার্হস্থ্য ধর্ম্ম' 'কুসুমগাথা' 'সতী' 'ব্রজগাথা' 'প্রেম গাথা' 'অমিয়গাথা' 'মর্ম্মগাথা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িত্রী।

৺ নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ স্বামী) 'ভক্তি যোগ' 'কর্ম্মযোগ' 'রাজযোগ' 'বর্ত্তমান ভারত' প্রভৃতি ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীযুত ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—'অমৃতপুলিন' 'যুগলপ্রদীপ' 'বসন্তের রাণী' 'শৈলবালা' 'রুদ্রসেন' (ওথেলোর অনুবাদ) প্রভৃতি রচয়িতা।

শ্রীযুত নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, এম, এ, বি, এল—সংস্কৃত 'রঘুবংশ' ও 'কিরাতার্জ্জুনীয়' কাব্যের পদ্যানুবাদক। অনুবাদে মূলের প্রকৃত মর্ম্ম ও শব্দসম্পদ্ যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে।

চন্দননগর খলসিনি নিবাসী শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি,এ—ইংরাজকবি টেনিসনের Enoch Arden অবলম্বনে 'গৃহহারা' ও ঐ কবির 'Princess' অবলম্বনে 'মনীষা' নামক পদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীযুত নিখিলনাথ রায়, বি, এল—'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাস' 'প্রতাপাদিত্য' 'সোনার বাঙ্গালা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া ঐতিহাসিক আলোচনায় যশস্বী হইয়াছেন। ইনি বহরমপুরের প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার রামদাস সেনের জামাতা।

৺ নিত্যকৃষ্ণ বসু এম·এ—ক্ষুদ্র২ কবিতা ও 'সাহিত্য সেবকের ডায়েরী' রচয়িতা। 'সাহিত্য' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তাঁহার বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-সেবকের ডায়েরীতে তিনি সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক বিবিধ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

চুঁচুড়ায় কৃতনিবাস ৺ নিমাইচরণ সিংহ—'সাহিত্যপাঠ' নামক স্কুলপাঠ্য রচয়িতা। তদ্ভিন্ন ইনি মূলরামায়ণের আদি ও সভাপর্ব্বের মূলানুযায়ী পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

চুঁচুড়া নিবাসী ৺ নিমাইচাঁদ শীল—'এঁরাই আবার বড়লোক' 'চন্দ্রাবতী' 'ধ্রুবচরিত্র' 'তীর্থ মহিমা' নামে কয়েকখানি নাটক এবং সুবর্ণ বণিকের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ও বৈশ্যত্ব সংস্থাপন বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

কলিকাতার ৺ নীলমণি বসাক—'আরব্য উপন্যাস' 'পারস্য উপন্যাস' 'বত্রিশ সিংহাসন' 'নবনারী' ও তিন ভাগ 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রণয়ন করিয়াছেন। 'নবনারী' গ্রন্থে সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, লীলাবতী, খনা, অহল্যাবাই, রাণীভবানী এই নয়টি নারীর পূত-চরিত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীযুত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন এম,এ, বি,এল 'জ্যামিতি' 'পরিমিতি' 'জমিদারিমহাজনী ও বাজার হিসাব' ও অনেক স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

৺নীলকণ্ঠ মজুমদার—এম,এ 'গীতারহস্য' ও 'বিবাহ ও নারীধর্ম্ম' রচয়িতা। ইঁহার গীতারহস্যে দুই বন্ধুর কথোপকথনচ্ছলে গীতার সুগভীর ভাবসমূহের সুন্দর অভিব্যক্তি আছে।

ভট্টপল্লী নিবাসী শ্রীযুত পঞ্চানন তর্করত্ন—পুরাণাদি বহুসংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া বঙ্গভাষার বিশেষ পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। বঙ্গবাসী সম্পাদক ৺যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু তাঁহার সংবাদ পত্রের সহিত যে বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ উপহার দিয়াছিলেন তর্করত্ন মহাশয়ের সাহায্য ব্যতীত সেই কার্য্য সম্পাদিত হওয়া সহজ হইত না।

কলিকাতা নিবাসী ৺পূর্ণচন্দ্র বসু—কাব্যচিন্তা, কাব্যসুন্দরী, দেবসুন্দরী, সমাজ চিন্তা, সাহিত্য চিন্তা, সমাজতত্ত্ব, ফলশ্রুতি, সৃষ্টিবিজ্ঞান, হিন্দুধর্ম্মেরপ্রমাণ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। ইঁহার লেখায় চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতা প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়।

কাঁঠাল পাড়া নিবাসী শ্রীযুত পূর্ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'শৈশব সহচরী' ও 'মধুমতী' নামক দুইখানি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি বঙ্কিম বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

৺প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' 'মণিহারী' 'গ্রীক ও হিন্দু' 'অনুভূতি,' প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাবলী ব্যতীত বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদ্ পত্রিকায় 'কৃত্তিবাস পণ্ডিত', 'বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ ইহার দৃষ্টান্ত।

খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী ৺প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী—বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্ব প্রথম পাটীগণিত লিখিয়াছেন। তাঁহার পাটীগণিত বহুদিন পর্য্যন্ত এদেশের বাঙ্গালা স্কুলগুলির একমাত্র পাঠ্য ছিল।

কলিকাতানিবাসী ৺প্রতাপচন্দ্র ঘোষ—'বঙ্গাধিপ পরাজয়' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের চরিত্র অবলম্বনে এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানি লিখিত।

শ্রীযুত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (ব্যারিষ্টার)—নবকথা, অভিশাপ, ষোড়শী, রমাসুন্দরী প্রভৃতি রচয়িতা। ইঁহার ছোট গল্পগুলি সুখপাঠ্য।

শ্রীযুত প্রমথ নাথ চট্টোপাধ্যায় এম, এ—'নব.না জননী' নামক একটী সুন্দর উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন।

ময়মনসিংহ জেলার সন্তোষের জমীদার শ্রীযুত প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী—পদ্মা, গৌরাঙ্গ, যমুনা, স্বপন, গীতিকা, দীপালি, আরতি প্রভৃতি রচয়িতা।

শ্রীমতী প্রজ্ঞা সুন্দরী দেবী—আমিষ ও নিরামিষ আহার (১ম, ২য় ভাগ প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ডি, এস সি, পি, এইচ, ডি,—'রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুদিগের রসায়ন বিদ্যায় কি পর্য্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল এই পুস্তক তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

শ্রীযুত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়—তান্তিয়াভীল ডিটেক্‌টিব পুলিশ (১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড), দারোগার দপ্তর (১ম—১২শ বর্ষ), ঠগী কাহিনী, বুয়ার ইতিহাস, বুয়ার যুদ্ধ প্রভৃতি প্রণেতা। বাঙ্গালা ভাষায় ডিটেক্‌টিব কাহিনী লেখায় ইনি প্রথম প্রবর্ত্তক।

প্রেমলতা রচয়িত্রী—শান্তিলতা, প্রেমলতা, প্রসূনাঞ্জলি, স্নেহলতা, লুৎফউন্নিসা প্রভৃতি কাব্যের রচয়িত্রী।

শ্রীযুত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ—উমা ও রূপলহরী নামক দুইখানি উপাদেয় উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন।

ব।

৺বলেন্দ্র নাথ ঠাকুর—চিত্র ও কাব্য, মাধবিকা, শ্রাবণী প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা। বলেন্দ্রনাথ অকালে কালকবলিত হইলেও গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুত বিজয় চন্দ্র মজুমদার বি, এল—ফুলশর, যজ্ঞভস্ম, কথানিবন্ধ, বিদ্রূপ ও বিক্রম প্রভৃতি কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কবিতা রচনায় ইঁহার বেশ ক্ষমতা আছে। তদ্ভিন্ন ভারতী, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়), প্রবাসী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ইনি নিয়মিতরূপে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন।

৺বিহারি লাল চট্টোপাধ্যায়—প্রভাসমিলন, জন্মাষ্টমী, সীতা স্বয়ম্বর, রাজসূয় যজ্ঞ, বাণযুদ্ধ, নন্দ-বিদায়, মোহশেল প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ 'বেঙ্গল' থিয়েটারের অধ্যক্ষ ছিলেন।

শ্রীযুত বিহারি লাল সরকার—শকুন্তলা-রহস্য, ইংরেজের জয়, তিতুমীর, বিদ্যাসাগর, গান প্রভৃতি রচয়িতা। শকুন্তলা রহস্যে পদ্মপুরাণান্তর্গত শকুন্তলা উপাখ্যানের সহিত মহাকবি কালিদাস কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলার তুলনা বিবৃত হইয়াছে। ইংরেজের জয়ে ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইব কর্ত্তৃক আরকট অবরোধ ও বিজয় লাভ এবং পলাশীর যুদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন বৃত্তান্ত ও সমসাময়িক ঘটনাবলী বিশদভাবে সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহার স্বরচিত গানগুলিতে রচয়িতার ভাবুকতা ও কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীযুত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়—পাক প্রণালী, মিষ্টান্ন পাক, রন্ধন শিক্ষা, যুবতী জীবন, জননী জীবন প্রভৃতি রচয়িতা।

রাজসাহী নিবাসী শ্রীযুত ব্রজ সুন্দর সান্যাল— মুসলমান বৈষ্ণব কবি সৈয়দ মর্ত্তুজা, আলিরাজা, আলাওল প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীযুত ব্যোমকেশ মুস্তোফী—'ললাট লিখন' নামে অদৃষ্টবাদ-মূলক কয়েকটী ক্ষুদ্র গল্পের রচয়িতা। বহু মাসিক পত্রে ইঁহার নানা বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুত বীরেশ্বর পাঁড়ে—মানবতত্ত্ব, ধর্ম্মবিজ্ঞান, অদ্ভুত স্বপ্ন, স্ত্রী-পুরুষের দ্বন্দ্ব, ধর্ম্মশাস্ত্র তত্ত্ব ও কর্ত্তব্য বিচার, উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। ইনি বঙ্গভাষার একজন সুলেখক এবং ইঁহার ভাষাও ওজস্বিনী।

ভ।

৺ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১১৯৪-১২৫৪) নব-বাবু-বিলাস (গদ্য ও পদ্য), কলিকাতা কমলালয়, দূতীবিলাস, গয়াপদ্ধতি, পুরুষোত্তম-চন্দ্রিকা, হাস্যার্ণব প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীযুত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—'হরিদাসের গুপ্তকথা' প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।

ম।

শ্রীযুত মনোমোহন বসু—হরিশ্চন্দ্র নাটক, সতী নাটক, রামাভিষেক নাটক, প্রণয়পরীক্ষা, পার্থ-পরাজয় নাটক, রাসলীলা নাটক, হিন্দুর আচার ব্যবহার, দুলীন প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। পদ্যমালা প্রভৃতি স্কুলপাঠ্য কবিতা পুস্তকও ইঁহার রচিত। ইনি একজন সুলেখক।

বর্দ্ধমানাধিপতি ৺ মহতাপ চাঁদ বাহাদুর— মহাভারত ও রামায়ণের বাঙ্গালা অনুবাদ করাইয়া পাঠার্থীদিগের বিশেষ ইষ্টসাধন করিয়াছেন।

কলিকাতা নিবাসী ৺ মধুসূদন মুখোপাধ্যায়— 'গার্হস্থ্য পুস্তকালয়ে সংসৃষ্ট থাকিয়া ছোট বড় অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'সুশীলার উপাখ্যান' বহুসমাদৃত।

নবদ্বীপের ৺ মতিলাল রায়, কাব্যকণ্ঠ— সীতাহরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, গয়াসুরের হরিপাদ-পদ্মলাভ, নিমাইসন্ন্যাস, ভীষ্মের শর-শয্যা প্রভৃতি অভিনয়োপযোগী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীমতী মানকুমারী দাসী—কাব্যকুসুমাঞ্জলি, কনকাঞ্জলি, প্রিয়-প্রসঙ্গ বা হারাণপ্রেম, বীরকুমার বধ কাব্য প্রভৃতি রচয়িত্রী।

শ্রীমতী মৃণালিনী (সেন)—প্রতিধ্বনি, নির্ঝ-রিণী, কল্লোলিনী, মনোবীণা প্রভৃতি রচয়িত্রী।

শ্রীমোজাম্মল হক্—মহর্ষি মনসুর, ফরদৌসী চরিত, প্রেমহার, মহম্মদ জীবনী প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।

য।

নদীয়ার অন্তর্গত গরীবপুরনিবাসী ৺ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার)—শরীর-পালন, ধাত্রী-শিক্ষা, জ্বরচিকিৎসা, রোগবিচার, চিকিৎসা কল্পদ্রুম, চিকিৎসা দর্শন, উদ্ভিদ বিচার প্রভৃতি

অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। যদিও ইহার মধ্যে অধিকাংশই চিকিৎসা-বিষয়ক তথাপি তদ্দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সিংহ—'সাকার ও নিরাকার তত্ব বিচার' 'উড়িষ্যার চিত্র' 'ধ্রুবতারা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে যশস্বী হইয়াছেন।

কোন্নগর নিবাসী ৺যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—তিনভাগ 'পদ্যপাঠ' 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' 'সেক্‌সপিয়ারের গল্প' প্রভৃতি লিখিয়াছেন। ইঁহার 'পদ্যপাঠ'গুলি প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত।

শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ—'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত' 'অহল্যাবাই' 'তুকারাম চরিত' প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন 'সরল কৃত্তিবাস' ও 'সরল কাশীদাস' নাম দিয়া কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের বালকবালিকার পাঠোপযোগী সচিত্র সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সরকার—হাসি ও খেলা, ছবি ও গল্প, রাঙ্গাছবি, হাসি খুসি, নূতন ছবি প্রভৃতি ছেলেদের পাঠোপযোগী পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

শ্রীযুত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়—'আগন্তুক ও অন্যান্য গল্প', 'জামাই বাঙ্গাল' প্রভৃতি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। ক্ষুদ্র গল্প লেখায় ইঁহার যথেষ্ট পটুতা আছে।

শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় এম,এ—আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ, পত্রালী, রত্ন-পরীক্ষা প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—'বিক্রমপুরের ইতিহাস' লিখিয়াছেন।

শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—বিসর্জ্জন, সমরশেখর, সমীরা, জয়াবতী প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। কর্ণেল টড সাহেব প্রণীত সুবিখ্যাত 'রাজস্থান' নামক ইংরাজি গ্রন্থের সরল বঙ্গানুবাদ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

র।

শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বঙ্গভূমির কৃতী সন্তান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বিষয় ছোটই হউক বা বড়ই হউক তাঁহার লেখনীর এমন একটি মধুর আকর্ষিণী শক্তি আছে যে, যিনিই তাঁহার রচনা পাঠ করিয়াছেন তিনি মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার কবিতাগুলি বড়ই মধুর, সে গুলি যেন কবিজন সুলভ কল্পনা ও ভাবের কোমল উপাদানে গঠিত। তাঁহার রচিত 'কড়ি ও কোমল,' 'মানসী' 'সোণার তরী', 'ক্ষণিকা' প্রভৃতি কাব্যগুলি তাঁহার কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচায়ক। প্রণয়, প্রীতি, প্রেম—ইহাদের জ্বলন্ত, জীবন্ত চিত্র তাঁহার কবিতায় যেমন ফুটিয়াছে, তেমন অন্যত্র

দুষ্প্রাপ্য। তিনি যে শুধু একজন আদর্শ কবি তাহা নহে সঙ্গীত রচনায়ও বিশেষ পটু, আপনিও সুগায়ক। তিনি গদ্যেও অনেকগুলি গল্প ও উপন্যাস রচনা করিয়াছেন; তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার ক্ষুদ্র গল্পলেখার প্রবর্ত্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার লেখনী বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন রীতি আনয়ন করিয়াছে। তিনি জগতের সকল বিষয়ের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিয়া কতকগুলি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। চরিত্র বিশ্লেষণে ও মনোবৃত্তির অতি ক্ষুদ্র তথ্য অনুশীলনে তাঁহার যেরূপ চেষ্টা দেখা যায়, সেরূপ অন্যত্র দুর্লভ। উপন্যাসের ঘটনা সংস্থানে ও চরিত্রগুলির মধুরতাসম্পাদনে উপন্যাস অপেক্ষা ক্ষুদ্র গল্পগুলিতে তাঁহার অধিকতর কৃতিত্ব লক্ষিত হয়; বস্তুতঃ তাঁহার 'সমাপ্তি' 'সদর ও অন্দর' 'গিন্নি' 'কাবুলিওয়ালা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বঙ্গসাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন।

রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটকগুলিতে কবিসুলভ বর্ণনা, পদলালিত্য এবং দার্শনিকসুলভ মনস্তত্ত্বের যেরূপ বিকাশ লক্ষিত হয়, চরিত্র-অঙ্কনে ততটা সফলতা দেখা যায় না; কিন্তু তাঁহার প্রহসন বা শ্লেষাত্মক কাব্যগুলিতে (গোড়ায় গলদ, বীরকুমার সভা প্রভৃতিতে) চরিত্র-চিত্রণে অসাধারণ কৃতিত্ব লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বহুসংখ্যক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে সমালোচনা-মূলক, ধর্ম্মমূলক, শিক্ষাসংক্রান্ত এবং প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী যেমন সারবান্, তেমনি রচয়িতার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সুন্দর নিদর্শন।

বর্দ্ধমান জেলার রামচন্দ্রপুর নিবাসী ৺রাজকৃষ্ণ রায়—রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী নামক বৃহদাকারের পুস্তক (সাত ভাগ) প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে অবসর সরোজিনী, নিভৃত নিবাস, লৌহ-কারাগার, হিরণ্ময়ী, প্রহ্লাদ চরিত্র, ভীষ্মের শরশয্যা, চন্দ্রহাস, শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা, চমৎকার চন্দ্রাবলী, হীরামালিনী, লক্ষহীরা প্রভৃতি গ্রন্থ সন্নিবেশিত আছে। তদ্ভিন্ন তিনি সংস্কৃত মূল রামায়ণ ও মহাভারত পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার কবিত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়।

চব্বিশ পরগণার রাহুতাগ্রামনিবাসী ৺ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—হরিদাস সাধুর জীবনী লিখিয়াছেন। সমস্যাপূরণে ইঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ইঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত ত্রৈলোক্যনাথের সহযোগে 'বিশ্বকোষ' প্রতিষ্ঠার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

নদীয়া জেলার মেহেরপুর নিবাসী ৺ রমণী-মোহন মল্লিক—'চণ্ডীদাস' 'জ্ঞানদাস' 'বলরামদাস' প্রভৃতির পদাবলীর সুন্দর সটীক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

যশোহর জেলার মহেশপুর নিবাসী ৺ রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী—নরদেহ নির্ণয়, অর্থ ব্যবহার, প্রকৃতিপাঠ প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বোড়ালগ্রাম নিবাসী ৺রাজনারায়ণ বসু—ব্রাহ্মধর্ম্মের বক্তৃতা, ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, সেকাল আর একাল, বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক

বক্তৃতা, আত্মচরিত প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার সকল পুস্তকই প্রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক এবং বক্তৃতাই তন্মধ্যে অধিক।

নদীয়া জেলার গোস্বামীদুর্গাপুরনিবাসী ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল—কবিতামালা, মিত্র বিলাপ, কাব্যকলাপ, রাজবালা, মেঘদূত, বাঙ্গালার ইতিহাস, নানা প্রবন্ধ প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি অকালে কালকবলিত না হইলে তাঁহার নিকট আরও কত উপাদেয় বস্তু পাওয়া যাইত।

উক্ত গ্রাম নিবাসী ৺রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—স্বাস্থ্যরক্ষা ও ভূবিদ্যা নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। পুস্তক দুই খানি অনেক বিদ্যালয়ে অধীত হইয়া থাকে।

৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—নীতিবোধ ও টেলিমেকসের কিয়দংশ প্রচারিত করিয়াছেন। নীতিবোধ দেশমধ্যে বহুল প্রচার ছিল।

কলিকাতার সন্নিহিত শুঁড়ো নিবাসী ডাক্তার ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সি, আই, ই—প্রাকৃত ভূগোল, শিল্পিক দর্শন, পত্রকৌমুদী, রহস্য সন্দর্ভ ও বিবিধার্থ সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। বিবিধার্থ সংগ্রহের বিষয় গ্রন্থের ৩৮৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে। রাজেন্দ্রবাবু প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী (antiquarian) বলিয়া দেশমধ্যে বিখ্যাত।

শ্রীযুত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম এ, পি, আর, এস—ন্যায়শাস্ত্রের 'ভাষা পরিচ্ছেদ' নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। সংস্কৃতে ও দর্শন শাস্ত্রে ইনি সুপণ্ডিত। সমালোচনায় ইঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে।

৺রামকমল বিদ্যালঙ্কার—'বেকন সন্দর্ভ' (প্রসিদ্ধ দার্শনিক বেকন সাহেবের ইংরাজি কয়েকটি প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ) এবং 'প্রকৃতিবাদ অভিধান' নামক উৎকৃষ্ট অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন।

৺রামচন্দ্র দত্ত (ডাক্তার) রাসায়নিক বিজ্ঞান, রামকৃষ্ণের জীবনী প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহার রচিত ভক্তিবিষয়ক গানগুলি অতি মনোরম।

বহরমপুরের ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন—শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ সহ একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুত রামপ্রাণ গুপ্ত—রিয়াজ উস সলাতিন, হজরত মহম্মদ, মোগল বংশ প্রভৃতি রচয়িতা।

শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ—আরব্যোপন্যাসের ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের সচিত্র ও বালকবালিকার পাঠোপযোগী সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, পি, আর এস—প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, ধর্ম্মের জয় প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সাহিত্য,

ভারতী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ইহার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

ল।

শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুত লালমোহন বিদ্যানিধি সম্বন্ধ নির্ণয়, কাব্যনির্ণয়, আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থের নূতন পরিচয় অনাবশ্যক।

গোয়াড়ীকৃষ্ণনগর নিবাসী ৺লোহারাম শিরোরত্ন দুইখণ্ড বাঙ্গালা ব্যাকরণ, সংস্কৃত মালতীমাধব নাটকের অনুবাদ, নীতিপুষ্পাঞ্জলি নামক একখানি পদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ব্যাকরণখানি দেশমধ্যে প্রসিদ্ধ।

শ।

শ্রীযুত শশধর রায় এম, এ, বি, এল—আদিম বৈদিক সময়ের সভ্যতা, রাঘব বিজয় কাব্য, ত্রিদিব বিজয় কাব্য প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীযুত শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— বীরপূজা, বঙ্গসংসার, বাঙ্গালীর বল, নীরদা, শিবাচার্য্য ঠাকুর প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি বঙ্কিম বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র।

শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী—শঙ্করাচার্য্যচরিত ও দক্ষিণাপথভ্রমণ রচয়িতা। শেষোক্ত গ্রন্থে দক্ষিণা পথের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সহ বর্ত্তমান দৃশ্য ও স্থানীয় অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার, সভ্যতা প্রভৃতি সরল ভাষায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

চব্বিশপরগণার অন্তর্গত মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ—মেজবৌ, হিমাদ্রি কুসুম, নয়ন তারা, পুষ্পমালা, যুগান্তর, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক ইঁহার বক্তৃতা সকল বিলক্ষণ প্রীতিপ্রদ।

শ্রীযুত শিবরতন মিত্র—'বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক' প্রভৃতি রচয়িতা। সাহিত্যসেবকে বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবীদের অকারাদি ক্রমে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীযুত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল—'প্রয়াস' 'বিদ্যাসাগর' (প্রবন্ধ) প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অনেক সাময়িক পত্রিকায় ইনি লিখিয়া থাকেন।

শ্রীযুত শিশির কুমার ঘোষ—অমিয় নিমাই চরিত (১ম-৫ম ভাগ), অমিয় ভাণ্ডার, 'কালাচাঁদ (গীতা), 'নয়সো রূপেয়া,' 'নরোত্তম চরিত' প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। 'অমিয় নিমাই চরিত' একখানি সুলিখিত চিত্ত-রঞ্জন গ্রন্থ। ইহার ভাষা ও ভাব সরল এবং হৃদয়গ্রাহী। বৈষ্ণবসাহিত্যভাণ্ডারে কালাচাঁদ গীতা একটি অমূল্য রত্ন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইঁহার বিশিষ্ট অধিকার আছে।

শ্রীযুত শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার—চিত্র বিচিত্র ও ইন্দু নামক দুইখানি ক্ষুদ্র সামাজিক উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন।

৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার—শক্তিকানন, ফুলজানি, কৃতজ্ঞতা, বিশ্বনাথ প্রভৃতি কয়েকখানি সুন্দর উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার 'পদ-রত্নাবলী' বৈষ্ণব কবিদিগের উৎকৃষ্ট কবিতার সংগ্রহ।

ঢাকা কামারখাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন—'ভাষাতত্ত্ব' দুই ভাগ প্রণয়ন করিয়াছেন। ভাষা তত্ত্বে বাঙ্গালা কারক বিভক্তি.ক্রিয়াবিভক্তি কৃৎ ও তদ্ধিতপ্রত্যয় এবং নিত্য ব্যবহৃত শব্দাদি যাহাকে ভাষার প্রাণ বলা যায় এবং যাহা এত কাল এ দেশের আদিম অসভ্যজাতির ভাষা বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল, সেই সমুদয়ই যে সংস্কৃত বিভক্তি প্রত্যয়াদির রূপান্তর বা উচ্চারণ-ব্যতিক্রমমাত্র ইহা গ্রন্থে বিশদ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীনাথ বাবুর মতে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভিন্ন নহে, একই ভাষার সাহিত্যিক আকার (literary form) এর নাম সংস্কৃত এবং কথিত আকারের (spoken form) নাম প্রাকৃত। এই প্রাকৃত বিভিন্নস্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে; তাহারা একে অন্য হইতে উৎপন্ন নহে। বাঙ্গালা তাহারই এক আকার।

স।

শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর—বাজীরাও, ঝান্সীর রাজকুমার, আনন্দীবাঈ, দেশের কথা, রাণাডে জীবনী প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন।

কাঁঠালপাড়া নিবাসী ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মাধবীলতা, কণ্ঠমালা, জালপ্রতাপচাঁদ, রামেশ্বরের অদৃষ্ট, পালা মৌ প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি বঙ্কিম বাবুর অগ্রজ।

ঢাকা টঙ্গিবাড়ী নিবাসী ৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—ললনা সুহৃদ্, দম্পতি সুহৃদ্, স্বামী স্ত্রীর পত্র, রায় পরিবার প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার রায়পরিবার স্বর্ণলতার প্রতিচ্ছায়া।

শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ--ভবভূতিও তাঁহার কাব্য, আত্মতত্ত্ব প্রকাশ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। পালিভাষায় ইনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন।

শ্রীযুত সত্যচরণ শাস্ত্রী—ছত্রপতি শিবাজী, মহারাজ প্রতাপাদিত্য, মহারাজ নন্দকুমার, জালিয়াৎ ক্লাইব, ভারতে এলেকজেণ্ডার প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়বিষয়ে ইঁহার আগ্রহ ও অধ্যবসায় নবযুগের অবতারণা করিয়াছে।

শ্রীযুত সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত—বেণু ও বীণা, হোম শিখা, তীর্থ সলিল প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রণেতা। ইনি ৺অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র।

শ্রীযুত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর—নবরত্নমালা, বৌদ্ধধর্ম্ম, গীতার গদ্যানুবাদ, বোম্বাই চিত্র প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীমতী সরোজ কুমারী দেবী—কাহিনী, অশোকা, হাসি ও অশ্রু প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহার কবিতাগুলি বড়ই মধুর।

শ্রীযুত সুধীন্দ্র নাথ ঠাকুর বি, এল—'মঞ্জুষা' মায়ার বন্ধন, চিত্ররেখা প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। ছোট ছোট গল্প লেখায় ইঁহার বেশ নিপুণতা আছে।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী—ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের কন্যা। দীপনির্ব্বাণ, বসন্তোৎসব, মালতী, গাথা, পৃথিবী, হুগলীর ইমামবাড়া, মিবার-রাজ, ছিন্নমুকুল, স্নেহলতা, ফুলের মালা, প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। 'ভারতী' নামক মাসিকপত্রিকায় ইনি বহুকাল সম্পাদিকা ছিলেন এবং ইনি উহার বর্ত্তমান সম্পাদিকা। দেবী স্বর্ণকুমারী অস্মদ্দেশের বিদুষী নারী লেখিকাগণের মধ্যে একটি সমুজ্জ্বল রত্ন।

শ্রীযুত সারদাচরণ মিত্র এম. এ, বি, এল— 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামক বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অনেক মাসিক পত্রিকার কলেবর ইঁহার গবেষণামূলক প্রবন্ধাদির দ্বারা সমলঙ্কৃত।

শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য— জন্মান্তর রহস্য, দীক্ষা ও সাধনা, দেবতা ও আরাধনা, যোগ ও সাধন রহস্য প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—কয়েকটি ক্ষুদ্র গল্প 'সাজি' নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উহার অন্তর্গত প্রাইভেট টিউটর, প্রভা, বাঘের নখ প্রভৃতি গল্পগুলি বড়ই কৌতুকোৎপাদক ও মনোরম।

হ।

নৈহাটি নিবাসী শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ—বাল্মীকির জয়, ভারতমহিলা, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন; ভাষা সহজ ও সুপ্রণালীসিদ্ধ। ইঁহার 'বাল্মীকির জয়' গদ্যগ্রন্থ হইলেও একখানি ক্ষুদ্র মহাকাব্য।

হুগলী বাবুগঞ্জ নিবাসী ৺ হরচন্দ্র ঘোষ— ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক, কৌরব বিয়োগ নাটক, রজতগিরিনন্দিনী নাটক, রাজতপস্বিনী, বারুণীবারণ প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাকরে ইঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ঢাকার ৺হরিশ্চন্দ্র মিত্র—'পদ্য কৌমুদী' 'কবিতা কৌমুদী' 'চারুকবিতা' 'নির্ব্বাসিতা সীতা' 'কীচকবধ কাব্য' ও 'মিত্রপ্রকাশ' রচনা করিয়াছেন। ইনি পূর্ব্ববাঙ্গালার এক জন খ্যাতনামা কবি।

গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর নিবাসী ৺হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'রাজস্থানের পুরাবৃত্ত' 'জয়াবতীর উপাখ্যান' 'মণিমালিনী নাটক' 'পদ্যপাদপ' 'কবিচরিত' প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। আমাদের এই পুস্তকের প্রণয়ন সময়ে কবিচরিত হইতেও অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

হুগলীজেলার সানিহাটি (সেনেট) গ্রামনিবাসী শ্রীযুত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়— 'বঙ্গভাষার লেখক' 'ভজহরি সর্দ্দার' 'নকুড়-বাবু' প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। বঙ্গবাসী অফিস হইতে প্রকাশিত 'সঙ্গীততরঙ্গ' ও

'দাশরথি রায়ের পাঁচালি' প্রভৃতি ইঁহারই সম্পাদিত। বঙ্গভাষার লেখকে গ্রন্থকার চণ্ডী-দাস বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বিখ্যাত বাঙ্গালা লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'ভজহরি সর্দার' উপন্যাস খানি সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীযুত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—'রঙ্গমহল' 'ছায়াচিত্র' 'পঞ্চপুষ্প' 'ঔরঙ্গজেব' প্রণয়ন করিয়াছেন। 'রঙ্গমহলে' মোগল বাদসাহদিগের প্রেমস্মৃতিবিজড়িত বিচিত্র কাহিনী উজ্জ্বল-বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

২৪ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুরনিবাসী শ্রীযুত হারাণচন্দ্র রক্ষিত (রায় সাহেব)—

দুলালি, মন্ত্রের সাধন, বঙ্গের শেষবীর, জ্যোতি-র্ময়ী, কামিনী ও কাঞ্চন, প্রতিভাসুন্দরী, রাণী ভবানী, ভক্তের ভগবান প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। অমরকবি সেক্‌সপিয়রের নাটকাবলীর মূলানুবাদ করিয়া ইনি বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি, এল—

'গীতায় ঈশ্বরবাদ' নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে ষড়্‌দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তদর্শনের বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐ সকল দর্শনের সহিত গীতার কি সম্বন্ধ এবং গীতায় কি ভাবে ঐ সকল দার্শনিক মত বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, বি, এ—'প্রেম' ও 'আমি' নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 'প্রেম' গ্রন্থে প্রেমের লক্ষণ, বিকাশ ও উহার বিচিত্র সামর্থ্যাদি উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত হইয়াছে।

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুর নিবাসী ৺হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বাল্মীকি রামায়ণের বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন।

শ্রীযুত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ বি.এ—'অধঃপতন' 'বিপত্নীক' 'আষাঢ়ে গল্প' 'নাগপাশ' প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন এবং ইংরাজি রবিনসন ক্রুসোর বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন।

পরিশিষ্ট।

(খ)

রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি।

এই স্থলে স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র তাম্রফলকে
উৎকীর্ণ একটী দেবীমূর্ত্তি কীলক-
দ্বারা সম্বদ্ধ আছে।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

বিদ্যুদ্‌যস্য মণিদ্যুতিঃ ফণিপতে র্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালা বলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্‌ভূতয়ে
ভূয়াদ্বঃ স ভবার্ত্তিতাপ-ভিদুরঃ শম্ভোঃ সপর্য্যাম্বুদঃ ॥১॥
আনন্দোঽম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুঃখচ্ছিদাত্যান্তিকী-
রুদ্ধাবেহতমোহতীবতিপতাবেকোঽহ মেবেতিধীঃ। (?)
যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়ন্ত্যাশুপ্রকাশাজ্জগ-
ত্যত্রের্ধ্যানপরস্য বা পরিণতজ্যোতিস্তদাস্তাং মুদে ॥২॥
সেবাবনম্রনৃপকোটিকিরীটরোচিরম্বুল্লসৎপদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ।
তেজোবিষজ্বরমুষো দ্বিষতা মভূবন্ ভূমীভুজঃস্ফুটমথাষধিনাথবংশে ॥৩॥
আকৌমারবিকস্বরৈ র্দিশিদিশিপ্রস্যন্দিভির্দোযশঃ-
প্রালেয়ৈররিরাজবক্ত্রনলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্।
হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবলী-
শালিশ্লাঘ্যবিপাকপীবরগুণ স্তেষা মভূদ্বংশজঃ ॥৪॥

যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিতভুজতেজঃসহচরৈ র্যশোভিঃশোভন্তেপরিধিপরি
[ণদ্ধাঃকরদিশঃ। (?)

ততঃকাঞ্চীলীলাচতুর চতুরম্ভোধিলহরীপরীতোর্ব্বীভর্ত্তাঽজনি বিজয়
[সেনঃ স বিজয়ী ॥৫॥

প্রত্যক্ষঃ কলিসম্পদা মনলসো বেদায়নৈকাধ্বগঃ
সদ্‌গ্রামঃ শ্রিতজঙ্গমাকৃতি রভূ দ্বল্লালসেন স্ততঃ।
যশ্চেতো ময়মেব শৌর্য্যবিজয়ী দস্তোষধং তৎক্ষণা-
দক্ষীণা রচয়াঞ্চকার বশগাঃ স্বস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ঃ ॥৬॥
সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগুণগণাভোগ প্রলোভাদ্দিশা
মীশৈরংশসমর্পণেন ঘটিত স্তত্তৎপ্রভাবস্ফুটৈঃ।
দোরুদক্ষপিতারি-সঙ্গর রসো রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়ঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাঽজনি ॥৭॥

স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্ধবারান্মহারাজাধিরাজশ্রীবল্লালসেন-পাদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বরপরম বীরসিংহপরম স্তভাবক মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ সমুদ্রং প্রতীর্য্য রাজরাজন্য করাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র রাজামাত্য পুরোহিত ধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধিবিগ্রহিক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাবিক্ষত অন্তর দুর্ভয়দ পরিক মহাক্ষপাটলিক মহাপ্রতীহার মহাভোগিক মহাপীঠপতি মহাগণপ দৌঃস্বারিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপ্রতরু গৌল্মিক দণ্ডপাণিক দণ্ডনায়ক বিষয়পত্যাদীন্ বন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপজীবিনোঽক্ষধ্যক্ষ প্রচারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান্ চড়ভচ্ছজাতীয়ান্ জানপদান্ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতিচ। মত মস্ত ভবতাম্—. যথা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনস্তকান্তঃপাতিনি থাড়ীমণ্ডলিকান্তল্লপুরচতুরকে পূর্ব্বে শান্ত্যশাবিক-প্রভাসশাসনং সীমা—দক্ষিণে চিতাড়িখাতার্দ্ধং সীমা—পশ্চিমে শান্ত্যশাবিক রামদেবশাসন পূর্ব্বপার্শ্বঃ সীমা—উত্তরে শান্ত্যশাবিক বিষ্ণুপাণিগড়োলীকেশব গড়োলীভূমি সীমা—ইত্থ চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ শ্রীমদুগ্রমাধব পাদীয়স্তম্ভাঙ্কিত দ্বাদশাঙ্গুলাধিকহস্তেন দ্বাত্রিংশদ্ধস্ত পরিমিতান্মানেনাধস্তয়া সার্দ্ধকাকিনীদ্বয়াধিক

ত্রয়োবিংশত্যন্মানোত্তর খাববকসমেতঃভূদ্রোণত্রয়াত্মকঃ সম্বৎসরেণ পঞ্চাশৎ-পুরাণোৎপত্তিকঃ সবাস্তচিহ্নঃ মেগুলগ্রার্মীয়ঃ কিয়ানপি ভূভাগঃ সমাটবিষ্টঃ সজলস্থলঃ সগর্ত্তোদরঃ সগুবাকনারিকেলঃ সক্ষদশাপবাধঃপরিহৃতসর্ব্বপীড়োহচড়-ভচ্ছপ্রবেশোহঞ্চিৎপ্রগ্রাহস্তৃণপূতি গোচরপর্য্যন্তঃ জগদ্ধরদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় নারায়ণধরদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় নরসিংহধরদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় গার্গ্যসগোত্রায় অঙ্গিরো বৃহস্পতি শিন গর্গভরদ্বাজ প্রবরায় ঋগ্বেদাশ্বলায়ন শাখাধ্যয়িনে শান্ত্যশাবিক শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মণে পুণ্যেহহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রো রাত্মনশ্চ পুণ্যযশোহভিবৃদ্ধয়ে উৎসৃজ্য-চন্দ্রার্কস্থিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রান্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোহস্মাভিঃ। তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং—ভাবিভিরপি নৃপতিভি রপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎপালনীয়ম্। ভবন্তিচাত্রধর্ম্মানুশংসিনঃশ্লোকাঃ। ভূমিং যঃপ্রতিগৃহ্নাতি যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌপুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাং। স বিষ্ঠায়াং কৃমি র্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥ কতিকমলদলাম্বুবিন্দুলোল শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ। সকল-মিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ॥ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষৌ-ণীভানুসান্ধিবিগ্রহিকেশ বিপ্র বাধিনা য়স্কারাৎ কৃষ্ণধরস্যাস্য শাসনীকৃতং। সংহমাঘদিনে ১০ মানে মতাসাতিঃ॥*

---

* ওয়েষ্টমেকট সাহেব ১৮৭৫ সালের এসিয়াটিক সোসায়িটির জর্ণালের ২য় পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার দত্ত এই তাম্রশাসনের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন 'পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার প্রণীত 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামক পুস্তকে লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনের যে প্রতি-লিপি দিয়াছেন, তাহা প্রায়ই ঠিক আছে, তবে লিপিকারের ভ্রমক্রমে অতি অল্প স্থানেই অক্ষরের 'তারতম্য' ঘটিয়াছে।

——০:০:০——

সাধারণ সূচী।

অ।

আ।

ই।

ঈ।

উ।

এ।

ক।

ফ।

ব।

ভ।

ম।

য।

র।

ল।

শ।

ষ।

স।

হ।